চরণ ছুঁয়ে যাই

শংকর



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

Special Price Rs. 45
Charan Chue Jai : Bengali
By : Sankar
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700 073
ISBN 81-7079-528-1

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার টাইপ সেটিং :
পেজমেকার্স
২৩বি রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০২৬

প্রচ্ছদ
উজ্জ্বল সাহা

মুদ্রাকর :
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

মৌসুমী মুখোপাধ্যায়
তনয়া মুখোপাধ্যায়

যাঁদের কথা এই বইতে লিখলাম তাঁদের অনেকেই তোমাদের অজানা। কখনও ইচ্ছা হলে, সময় করে এঁদের কীর্তিকে এবং সৃষ্টিকে জানবার চেষ্টা কোরো। মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা এঁদের অনেকের মধ্যেই অবিশ্বাস্যভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। আমার নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রায় এঁদের কেউ কেউ অপ্রত্যাশিতভাবে অভাবনীয় পাথেয় জুগিয়েছেন। তোমাদের জীবনযাত্রায় এঁরা অদৃশ্যলোক থেকে অনুপ্রেরণা যোগান এই প্রার্থনা।

২৬শে জানুয়ারি ১৯৬০ বাবা

শংকর-এর বই

বিশেষ রচনা

চরণ ছুঁয়ে যাই ৪৫্
কত অজানারে ৪০্
এই তো সেদিন ৩০্
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ১৬্

ভ্রমণ সাহিত্য

মানবসাগর তীরে ৬০্
জানা দেশ অজানা কথা ৩০্
এপার বাংলা ওপার বাংলা ৪০্
যেখানে যেমন ৩০্

ত্রয়ী উপন্যাস

জন্মভূমি ৩৫্
(স্থানীয় সংবাদ, সুবর্ণ সুযোগ ও বোধোদয়)
স্বর্গ মর্ত পাতাল ৩৫্
(জন-অরণ্য, সীমাবদ্ধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা)

যুগল উপন্যাস

তনয়া ৪৫্
(নগর নন্দিনী, সীমন্ত সংবাদ)
তীরন্দাজ ৩৫্
(তীরন্দাজ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট)
মনজঙ্গল ৪০্
(মনোভূমি ও মনজঙ্গল)

আরও কয়েকটি বই

সপ্তরথী ৩০্
এখানে ওখানে ২৫্
মানচিত্র ২০্
পাত্রপাত্রী ১৫্
এক যে ছিল ১৬্
সার্থক জনম ২০্
এক দুই তিন ১০্
যা বলো তাই বলো ১৫্

উপন্যাস

বাংলার মেয়ে ৩০্
সুখসাগর ৩০্
দিবস ও যামিনী ২৫্
অনেক দূর ২৫্
ঘরের মধ্যে ঘর ১০০্
এবিসিডি ৩০্
কাজ ২০্
মুক্তির স্বাদ ২৫্
নগর নন্দিনী ৩০্
সীমন্ত সংবাদ ৩০্
মাথার ওপর ছাদ ২০্
একদিন হঠাৎ ২০্
নবীনা ১৫্
মানসম্মান ৩০্
রূপতাপস ১৫্
সোনার সংসার ২৫্
জন-অরণ্য ৩০্
আশা-আকাঙ্ক্ষা ৩০্
সুবর্ণ সুযোগ ২৫্
সম্রাট ও সুন্দরী ৩০্
মরুভূমি ৩০্
চৌরঙ্গী ৫০্
বিত্তবাসনা ২০্
বোধোদয় ১৬্
স্থানীয় সংবাদ ২৫্
সীমাবদ্ধ ৩৫্
নিবেদিতা রিসার্চ
ল্যাবরেটরী ২০্
পদ্মপাতায় জল ১৫্

ছোটদের বই

এক ব্যাগ শংকর ২০্
চিরকালের উপকথা ২০্

লেখকের নিবেদন

ষাট বছরে হাজির হয়ে যাঁদের কথা প্রায়ই মনে পড়ে তাঁদের চরণ ছুঁয়ে একদিন ধন্য হয়েছি। খ্যাত ও অখ্যাতদের সঙ্গে এই তালিকায় আছেন সেই সব প্রখ্যাতরা যাঁদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসার বিরল সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি নানা সময়ে।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত আমার যত বই আছে 'চরণ ছুঁয়ে যাই' তার থেকে আলাদা। এই বই লেখা শেষ করতে পেরে আমি একটু হালকা হলাম। প্রণাম জানাই তাঁদের সবাইকে যাঁদের একদিন দেখেছি অথচ শত ইচ্ছা থাকলেও যাঁদের এখন আর দেখার উপায় নেই।

শংকর

নতুন সংস্করণের নিবেদন

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বই যে বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছে তার জন্যে আমি অভিভূত। যা লিখেছি তার থেকে যাঁদের কথা লিখেছি তাঁদের জন্যেই পাঠক-পাঠিকাদের এই অবিশ্বাস্য কৌতূহল তা আন্দাজ করে স্মরণীয়দের আবার জানাই আমার প্রণাম।

এবারে আরও চারটি নতুন শ্রদ্ধার্ঘ সংযোজিত হলো। আগের মুদ্রণে এগুলি দেওয়া সম্ভব হয় নি বলে আমি দুঃখিত। বিশেষ সংযোজনের ফলে বইয়ের আকারও আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেলো — পাঠক-পাঠিকারা ধৈর্যচ্যুত না হলেই আমার আনন্দ।

শংকর

স্মরণীয় যাঁরা

অবশেষে ষাট বছরে পদার্পণ করা গেলো— অকাল বার্ধক্য ও স্বল্প আয়ুর দেশে যা একটা বড় ঘটনা। ষাটে পৌঁছনো বঙ্গজীবনের অঙ্গ নয় বলে বাঙালিরা এই নিয়ে কখনও তেমন মাতামাতি করেননি। সায়েবরা কেন অহেতুক মাতামাতি করে ষাটের সঙ্গে হীরের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তাও আমরা বুঝতে পারি না।

আমার বাবা পারেননি, দাদামশাই পারেননি এই ষাট স্কোর করতে, তাই মনে একটু বাড়তি আনন্দ। ষাট বছরের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে এই মুহূর্তে পুরনো দিনের হারানো মানুষদের কথা ভাবতে ভাল লাগছে।

প্রথমেই মনে পড়ে মায়ের কথা। মায়ের শরীরের ভিতর বহু সপ্তাহ অবস্থান করে, তাঁকে অতখানি ভিতর থেকে দেখেও অনেকে মাকে চিনতে পারে না।

আমি একসময় ভাবতাম মাকে আমি চিনি। কিন্তু এতদিন পরে আজকাল প্রায়ই মনে হয়, মা যখন বেঁচে ছিলেন তখন তাঁকে ঠিক চেনার চেষ্টা করিনি। মায়ের কাছ থেকে কী পেয়েছি এবং কী না-পেয়েছি তার হিসেব করতে করতেই সময়টা নষ্ট করেছি। মা তাঁর জীবনে কী পাননি কিন্তু পাওয়া উচিত ছিল তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। এই পৃথিবী থেকে যাবার আগে মায়ের কথাগুলো পাকাপাকি লিখে যেতে হবে, লোকের জানা উচিত মা দুর্গা শুধু বছরে চারদিন আমাদের সঙ্গে বসবাস করেন না, গর্ভধারিণী জননী রূপেও তিনি ঘরে ঘরে বিরাজমানা। আমাদের দুর্ভাগ্য এই দুর্গাকে আমরা চিনতে পারি না। সংসারের ক্ষুদ্রতার খরস্রোতে

আমাদের বিচারবুদ্ধি ও বিবেক প্রায়ই ক্ষুদ্র হয়ে ওঠে। বিশ্বাসই হতে চায় না যে স্বয়ং দশপ্রহরণধারিণী আমাদের মধ্যেই বসবাস করছেন। আমাদের মঙ্গল ছাড়া তাঁর কোনো কাজ নেই।

মায়ের কথাটা লেখা প্রয়োজন শুধু আমার নিজের জন্য নয়। চরম অর্থনৈতিক বিপদে পড়ে আটটি নাবালক সন্তানের জননী কীভাবে স্বামীর অকালমৃত্যুর পরে দশভুজা হয়ে সংসার রক্ষে করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত পরবর্তী প্রজন্মের অভাগা এবং অভাগিনীদের জানা প্রয়োজন। হয়তো কিছুটা মনোবল পাবেন তাঁরা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করার।

আমার মা কোনোদিন ইস্কুলে পড়েননি, নিজের চেষ্টায় বাংলাটা আয়ত্ত করেছিলেন এবং বিশ্বসংসার সম্পর্কে তাঁর সমস্ত জ্ঞান এসেছিল বাংলা বই থেকে। আমার যখন চোদ্দ বছর বয়স, যখন হাওড়ার বাড়িতে বাবা হঠাৎ আমাদের অনাথ করে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তখন মা শান্তভাবে বলেছিলেন, "তোমাকে কিছু রোজগার করতে হবে। এই শহরের কাউকে আমি চিনি না। তোমাকে নিজেকেই পথ খুঁজে নিতে হবে।"

মাকে প্রণাম করে আমি হাওড়া থেকে কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলাম জীবিকার সন্ধানে। পাথেয় ছিল শুধু মায়ের উপদেশ, তোমাকে এমনভাবে এগোতে হবে যে কেউ যেন প্রতিযোগিতায় তোমার সঙ্গে পেরে না-ওঠে।

বেঁচে থাকার জন্য এক নম্বর হওয়ার চেষ্টা রণকৌশল হিসেবে যে তুলনাহীন.তা পরবর্তী জীবনে বারবার বুঝতে পেরেছি। যখন চাপরাশির চাকরির জন্য ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে রাস্তায় কাপড়কাচা সাবানের বিক্রিওয়ালা হয়েছি তখনও চেষ্টা করেছি অন্য বিক্রিওয়ালার থেকে আমার যেন কিছু পার্থক্য থেকে যায়। দু'জন সাবানওয়ালা একই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকলে যেন আমারই কাছে খরিদ্দার আসে। পরবর্তী যুগে যখন বেয়ারা হয়েছি, তখন মা হা-হুতাশ করেননি যে প্রতিষ্ঠিত আইনজীবীর ছেলে টেমপোরারি সার্ভিসে বদলি বেয়ারা হয়েছে।

তিনি বলেছেন, "তুমি এমন বেয়ারা হও যেন পৃথিবীর কোনো বেয়ারা তোমার সঙ্গে পেরে না-ওঠে।" আমি চেষ্টা করেছি—লোককে জল দিয়েছি, কিন্তু তার আগে গেলাসটা সযত্নে ধুয়ে তার দাগ তুলেছি। চা এনেছি, জলখাবার কিনেছি রাস্তা থেকে। এক একজনের এক এক রকম নির্দেশ—কারুর মুড়িতে তেল থাকবে কিন্তু লঙ্কা থাকবে না, কেউ কেউ এমন

মশলা চান যাতে মুড়ি চিবোতে চিবোতে চোখ দিয়ে জল গড়ায়, আবার কারুর মুড়িতে তেল থাকবে কিন্তু শক্ত ছোলা থাকবে না। লোকের পছন্দমতন বেয়ারা হওয়া যে বেশ কঠিন কাজ এবং তার জন্যে যে বিশেষ নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য প্রয়োজন তা আমি কর্মজীবনের শুরুতেই হাড়ে হাড়ে বুঝে গিয়েছি।

বাড়ি ফিরলে মা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব প্রশ্ন করতেন, এমনকি কাঁচের গেলাসের দাগ কী করে তুলে ফেলতে হয় তা [illegible] দিয়েছেন। মনে মনে কষ্ট পেয়েছেন কি না জানি না। কষ্টের কারণ ছিল। মায়ের ছিল সোনার মতন রঙ, তাঁর কোলে কালো ছেলে দেখে আমার জন্মস্থান বনগ্রামে কিছু কিছু সমালোচনা হয়েছিল মেয়ে মহলে। সেইসময় আমার দাদু ক্ষীরোদ ব্যানার্জি এসেছিলেন মেয়েকে দেখতে। তিনি বললেন. "অভি, তোর ছেলে ব্যারিস্টার হবে!" ব্যারিস্টার তো দূরের কথা, ব্যারিস্টারের বাবু হওয়াটাও আমার কাছে একসময়ে সুদূরপরাহত স্বপ্নের মতন ছিল।

ভাগ্যচক্রে হাওড়ার বিভূতিদার অনুগ্রহে উকিলের ছেলে শেষপর্যন্ত ব্যারিস্টারের বাবু হয়েছিল। সে এক মস্ত গল্প, যার সবটুকু জানতেন হাওড়ার কালী ব্যানার্জি লেনের বিভূতিদা যাঁকে সবাই গণাদা বলে ডাকতো।

অদ্ভুত মানুষ এই বিভূতিদা। কিছুদিন হলো দেহরক্ষা করেছেন, সুতরাং ইতিহাসের জন্যে কিছু রেখে যেতে হলে কাজটা আমাকেই করতে হবে। আমার দুঃখময় অচরিতার্থ জীবনের মধুসূদনদাদা এই বিভূতিদা। বিভূতিদার বাইরে একটা কঠিন আবরণ ছিল। কিন্তু তাঁর ভিতরে ছিল ভালবাসার অমৃতসাগর।

মায়ের কথা, বিভূতিদার কথা, বারওয়েল সাহেবের অসম্পূর্ণ কথা এসব লিখতে বেশ কিছুটা জায়গা লাগবে, সময়ও লাগবে। স্মৃতিকে চিরকাল বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত নয়। ষাট বছরের সীমানা পেরোলেই যা-কিছু না-লিখলে-নয় তা লিখে ফেলা ভাল। লিখবো-লিখবো করতে করতে কত স্মৃতি হারিয়ে যায় চিরদিনের জন্যে।

কেন এইসব লেখা? আত্মতুষ্টির জন্যে অবশ্যই নয়, আত্মপ্রচারের থেকে বড় দোষ তো সমাজে নেই। প্রয়োজন কেবল স্বীকৃতির। প্রয়োজন কিছু গল্প-হলেও-সত্যি মার্কা দৃষ্টান্তের যাতে অনাগতকালের সহায়-সম্বলহীন দরিদ্ররা বিশ্ব সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারিয়ে না ফেলেন। এঁদের কাছে

আমার বলার আছে একটাই, এই পৃথিবী এখনও ভালবাসা শূন্য হয়নি। জীবনের জটিল যাত্রাপথে বারবার অনাত্মীয় মানুষের ভালবাসা পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। আমি বারবার প্রণাম করি সেই নরদেবতাকে, যিনি বহু মানুষের মধ্যে তাঁদের অজ্ঞাতেই বিরাজ করছেন।

নরদেবতা! বড্ড বড় কথা, পাঠক মহাশয়। দেবতা কথাটার কদর্থ হয়েছে আজকাল। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই মানবতীর্থে আমি বারবার তাঁকে খুঁজে পেয়েছি, পেয়েছি তাঁর অপার স্নেহপ্রশ্রয়, যা আমাকে এই দয়াহীন প্রেমহীন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে এবং বিকশিত হতে সাহায্য করেছে। সীমাহীন মরুভূমিতে এঁরা বটবৃক্ষের মতন দাঁড়িয়ে থাকেন, মানুষের মনে সমাজ সম্বন্ধে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে, মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগরিত করতে। কেউ কেউ বলবেন, এ তো ব্যক্তিপূজা! আমি অতসব জানি না। কোনো পূজাতেই আমার আপত্তি নেই, পাঠক মহাশয়, কারণ আমি সমস্ত জীবন ধরে স্বর্গলোকের দেবতাদের পিছনে সময় নষ্ট না করে, স্মরণীয়, বরণীয়, পূজনীয় ও প্রিয়তমদের জীবন থেকে দুর্গম তীর্থযাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করেছি।

যেমন ধরুন আমার মাস্টারমশাই সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য ওরফে হাঁদুদার কথা। ভাগ্যের বিচিত্র খেয়ালের কাছে নতিস্বীকার করে আমার হাওড়ায় আসা বনগ্রাম থেকে। যে-পরিবর্তনটা আগে অপ্রীতিকর, অস্বস্তিকর মনে হয়েছিল তা-ই একদিন পাকে-চক্রে আশীর্বাদের মতন হয়ে উঠেছিল। কারণ বনগ্রামে স্থায়ী বাস থাকলে কোনোদিন হাওড়া-কাসুন্দিয়ার সুধাংশুশেখরের সঙ্গে আমার দেখা হতো না।

বনগ্রামের ব্যাপারটা মোটামুটি এইরকম। সাহিত্য, বিশেষ করে নাটকের পিছনে অযথা অনেক সময় ব্যয় করে পিতৃদেব হরিপদ মুখোপাধ্যায় বনগ্রাম মহকুমা আদালতে আইন ব্যবসায়ী হয়েছেন। মফস্বলের দাঁড়িপাল্লায় কৃতী আইনজীবী। কিন্তু মফস্বলের মেঘ যত গর্জায় তত বর্ষায় না। অর্থের তাগিদে সাহিত্য থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত হয়েও পিতৃদেব বহুক্ষণ সাহিত্যপাঠে মগ্ন থাকতেন। ব্যর্থ লেখকের ক্ষণিকের সুখ মিলতো পাঠকের স্বর্গলোকে।

বনগ্রামের যে ভাড়াবাড়িতে আমার জন্ম তার নাম ছিল ননীবাবুর বাড়ি। নিশ্চয় কোনো বিত্তবান ননীবাবু এই বাড়ির মালিক ছিলেন। কিন্তু মফস্বলের তুলনাতেও বাড়িটা হতশ্রী। ভাড়াটে বাড়িতে সমস্ত জীবনযাপনের কী দুঃখ,

কী অপ্রাপ্তির বেদনা তা আজন্ম ভাড়াটিয়ারাই জানেন। নাকউঁচু মধ্যবিত্তরা এই শ্রেণীর স্থায়ী ঠিকানাহীন ভাড়াটিয়াদের নাম দিয়েছেন 'বাসাড়ে'। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সময় এই বাসাড়েদের কোনো সামাজিক সম্মান ছিল না। তবে পিতৃদেব প্রথমা স্ত্রীর (নিভা) অকাল প্রয়াণের পর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হননি। তার প্রধান কারণ, আমার দাদু ক্ষীরোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মেজাজ গরম করে সওদাগরি অফিসের এক গোরা সাহেবকে অফিসের মধ্যে চড় মেরে চাকরি হারান। তাঁর এই তেজের মূল্য দিতে হয়েছিল ভীষণভাবে, কারণ চারটি বিবাহযোগ্যা কন্যা নিয়ে তিনি অথৈ জলে। এঁর অসামান্যা সুন্দরী দ্বিতীয়া কন্যা অভয়ারানীই মদীয় পিতৃদেবের হস্তে সমর্পিত।

তেত্রিশ সালের শেষ মাসে আমার জন্মের পরই বাবা বনগ্রামে কিছু জমি কেনেন। আরও কয়েকবছর পরে হঠাৎ কোনোদিন বাড়িওয়ালার সঙ্গে সামান্য মনোমালিন্য হয়। সন্ধ্যার পর তখন লিচুতলায় রসিকদের আড্ডা বসতো যার উল্লেখ আছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। লিচুতলায় তখন সাহিত্য, শিল্প, নাটক নিয়ে সান্ধ্য আড্ডা জমতো। সেখানে উপস্থিত থাকতেন মফস্বল শহরের মাথারা। এই সভায় সেদিনের আলোচনার বিষয় ভাড়াটে বাড়ি ও নিজের বাড়ি। সকলেই একমত হলেন হরিপদ উকিলের ভাড়াটে বাড়িতে থাকা মানায় না। বাবার পোস্টঅফিসের সেভিংস বইতে তখন সামান্য কয়েকশ' টাকা। কিন্তু জাহান আলি বিশ্বাস বলে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ঐ সভায় আসতেন। তিনি বললেন, "এখনই আমি ইট, সিমেন্ট, সুরকি সাপ্লাই করছি, দাম পরে দেবেন।" একজন এই সময় হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে পাঁজি নিয়ে এলেন এবং ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, এখনই অতি শুভসময় রয়েছে। উঠলো বাই তো কটক যাই! একটা হ্যারিকেন জ্বালানো হলো। লিচুতলা ক্লাবের মন্মথ চ্যাটার্জি দু'খানা ইট উপহার দিলেন। সবাই চললেন রাতের অন্ধকারে পোস্তাপাড়ায় হরিপদ মুখার্জির নতুন গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে।

এই বাড়ি তৈরি করতে গিয়েই দেশছাড়া হতে হলো বাবাকে। বাড়ির দেনা অনেক জমে গিয়েছে। মফস্বলের উকিলের হাতে এমন পয়সা নেই যে দেনা শোধ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় আদালতের এক্তিয়ার পরিবর্তন হওয়ায় কাজের পরিমাণও বনগ্রাম কোর্টে কমে গিয়েছে। এমনই অবস্থায় শিয়ালদহ স্টেশনে বাবার সঙ্গে দেখা হলো এক প্রাক্তন মুনসেফ সাহেবের,

যিনি কোনো সময়ে বনগ্রামে বিচারক ছিলেন এবং বাবাকে শ্রদ্ধা করতেন।

বাবার মনে শান্তি নেই জেনে বিচারক বললেন— "আপনি মহকুমা থেকে বড় জায়গায় চলে যান, আপনার যথেষ্ট প্রতিভা রয়েছে।" বাবার উত্তর, "যেখানেই যাবো প্র্যাকটিস জমাতে তিন-চার বছর লেগে যাবে। হাঁড়ি চড়িয়ে চাল কিনবার তাগাদা থাকলে ওকালতি হয় না!"

বিচারক বললেন, "শুনুন, আমি এখন হাওড়ার জেলা জজ। আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি, যাতে মাসে মাসে আপনার শ'দুই-আড়াই টাকা রোজগার হয়। আমার হাতে একটা জমিদারি মামলা রয়েছে যার জন্যে রিসিভার নিয়োগ করতে হবে। আপনি দু'-তিন দিনের মধ্যে হাওড়া কোর্টে নিজের নাম লেখান এবং লিখিয়েই আমাকে খবর দিন।"

ভাগ্যের বিচিত্র খেয়ালে পাঁচবছর বয়সে এমন সাধের স্বর্গরাজ্য ছেড়ে আমি হাওড়মুখো হলাম ভায়া শিয়ালদহ স্টেশন। তখন শিয়ালদহ স্টেশনে যারাই নামতো তাদেরই বাঙাল বলা হতো।

হাওড়ায় চৌধুরীবাগান লেনের এক কানাগলিতে একখানা বাড়িতে আমরা আশ্রয় পেলাম। এই গলি কাশীর গলিকেও হার মানায়। অপরিচিত লোকের পক্ষে দিশাহারা হওয়া এখানে কোনো ব্যাপারই নয়। আমাদের বাড়ির নম্বর ১৮/এল। আমাদের সামনের বাড়ি ১৮/কে। এইখানেই নগরবাসের প্রথম দিনেই আমার আলাপ হলো বাদলচন্দ্র বসুর সঙ্গে — যাঁকে পরবর্তী জীবনে বাদলকাকু বলে ডেকে এসেছি।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন এই বাদলবাবু। যে দু'জন মানুষ আমার জীবনে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছেন, যাঁরা বেঁচে না থাকলেও যাঁদের ছায়া আমার দেহমনের মধ্যে বেঁচে রয়েছে, বাদলকাকু তাঁদের একজন। এঁকে নিয়ে অনেকদিন আগে দু'-একটা গল্প লিখেছিলাম। বাদলকাকু হয়ে গিয়েছিলেন গল্পের অশ্রুমামা।

অসাধারণ চরিত্র এই বাদলকাকুর। এখন ওঁর কথা বলতে গেলে লেখাটা এমন বড় হয়ে যাবে যে, পাঠক-পাঠিকারা অসুবিধায় পড়ে যাবেন। ষাট বছর, মানে অ্যাভারেজ ভারতীয়র জীবনসীমা আমি ইতিমধ্যেই উপভোগ করেছি, এখন ব্যবহৃত হবে ধার করা সময়— ইংরেজিতে যাকে বলে বরোড টাইমস। অর্থাৎ নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে, অথচ যবনিকা পতন ঘটেনি, কিছু সময় অনিবার্য কারণে ধার দেওয়া হয়েছে বিনা সিকিউরিটিতে। সুতরাং পুরনো দিনের যত স্মৃতি ঝটপট লিখে ফেললেই হবে, না হলে

বাদলকাকুর মতন মানুষের কথা নতুন প্রজন্মের মানুষ জানতেই পারবে না।

ষাট বছরের সীমানায় এসে বুঝতে পারি, অশেষ ভাগ্য না হলে বাদলকাকুর মতন মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া যায় না। বাঙালির ঘরে ঘরে কত অবিশ্বাস্য চরিত্র রয়েছেন ভাবলে বিস্ময় বোধ হয়।

বাদলকাকুর ব্যাপারটা মোটামুটি এইরকম—মুগকল্যাণ ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ভাগ্য সন্ধানে হাওড়ায় আসেন এবং কোনো কিছু যোগাযোগ করতে না পারায় পিটম্যান শর্টহ্যান্ড শেখেন। এমন পরিচ্ছন্ন এবং অসাধারণ স্টেনোগ্রাফার ইংরেজ যুগেও বিরল ছিল। শর্টহ্যান্ড শিখে ছোট্ট এক বিদেশী প্রতিষ্ঠান 'কালামাজু'-তে কাজ নেন। সেখানেই ভক্ত হয়ে ওঠেন অফিসের প্রধান লিভিংস্টোন সাহেবের। এই লিভিংস্টোন সাহেব স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিলেও বোস-এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং দু'জনের পত্রালাপ চলতো নিয়মিতভাবে। লিভিংস্টোন মাসে দুটি চিঠি লিখতেন, বাদলকাকু লিখতেন দুটি। এই পর্বের শেষ চিঠিটি লেখেন লিভিংস্টোন-দুহিতা, "প্রিয় মিস্টার বোস, আপনার চিঠি গতকাল এসেছে। দুঃখের সঙ্গে জানাই গত সপ্তাহে আমার বাবা এবং আপনার বন্ধু সজ্ঞানে পরলোকগমন করেছেন। আপনার নিয়মিত চিঠি তাঁকে ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত রেখেছিল, মৃত্যুশয্যাতেও তিনি কলকাতার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করেছেন।"

লিভিংস্টোনের অন্ধভক্ত হলে কী হয়, বাদলকাকু ছিলেন কট্টর স্বদেশী। তিনি বলতেন, "ব্যবসায়ী ইংরেজ এবং শাসক ইংরেজ এক নয়। ইংরেজ মস্ত ভুল করেছিল ব্যবসায়ীর ভূমিকা অবহেলা করে শাসকের গদিতে বসে।" বাদলকাকুর কথা যে মিথ্যে নয় তা একসময় প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ প্রকৃত কুশলী ইংরেজ প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবর্ষে অবিশ্বাস্য ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছিল সাতচল্লিশ সালের পরে।

বাদলকাকু ছিলেন আদর্শবাদী। ছোটভাইকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার অভিলাষে নিজে বিয়ে করলেন না। তাঁকে কট্টর নীতিবিদও বলতে পারেন। সিগারেট খেতেন না, মদ স্পর্শ করতেন না, এমনকি বাড়িতে চায়ের ব্যবস্থাও ছিল না। একবার শুধু এমার্জেন্সি কাপ কিনেছিলেন। লিভিংস্টোন সাহেব বাড়িতে আসতে পারেন বলে। বাদলকাকু ছিলেন সস্তা গান, সস্তা রুচির চিরশত্রু। প্রখর নীতিজ্ঞান ছিল। হেঁটে হাওড়া থেকে কলকাতার ক্লাইভ রোডে অফিস করতেন; প্রায় অর্ধ শতাব্দীর কেরিয়ারে একদিনও লেট

করেননি। কখনও ক্যাজুয়াল লিভ নেননি, দুটি দিন ছাড়া। সেই দুটি দিনের ইতিহাস যে নাটকীয় তা পাঠক আপনার বিপুল অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছেন।

বাদলকাকুর বাড়িতে লিভিংস্টোন সাহেবের একটা ছবি টাঙানো ছিল। সেই সঙ্গে গান্ধী, নেতাজী ও নেপোলিয়ন। অ্যাবটের লাইফ অফ নেপোলিয়ন বইটা ব্যক্তিগত সংগ্রহে রেখেছিলেন এবং প্রায়ই পড়ে শোনাতেন আমাকেও, যার কিছুই সেই বয়সে আমার মাথায় ঢুকতো না। ব্যাখ্যা শুনতাম মন দিয়ে, ইংরেজের ঘুম যদি কেউ কেড়ে নিয়ে থাকে তা এই ফরাসি নেপোলিয়ন।

অকৃতদার বাদলকাকুর সব দুঃখ ও ব্যর্থতা তাঁর ছোট ভাইকে নিয়ে। নিজে যা হতে পারেননি অথচ হতে চেয়েছিলেন তা ভাইয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হোক এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। স্পার্টান ডিসিপ্লিনের বাংলা আমার কাছে ছিল 'বাদল বসু শৃঙখলা' অথবা নিয়মানুবর্তিতা। কিন্তু অতিরিক্ত এই প্রত্যাশার চাপে ছোট ভাই এমন নিষ্পিষ্ট বোধ করলেন যে একদিন তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। বাদলকাকুর সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে ছোটভাই, মায়ের মিনতি অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে গেলেন হাওড়ার বাড়ি থেকে। সে এক স্মরণীয় দৃশ্য যা এতোবছর পরেও আমার সুস্পষ্ট মনে আছে। সেদিন বাদলকাকু প্রথম অফিস কামাই করেছিলেন এবং পরের দিনও অফিস কামাই। সে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। বোস অফিসে আসেনি, অথচ কোনো আগাম খবর নেই জেনে কালামাজু কোম্পানির উদ্বিগ্ন লিভিংস্টোন সাহেব স্বয়ং হাওড়ার বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন। সেই আমার প্রথম লিভিংস্টোন সাহেবকে দেখা।

বড় সংসারে আট সন্তানের এক হওয়ার ঝামেলা অনেক। একের পর এক সন্তান ধারণ করতে করতে এবং বিশাল সংসারের বোঝা বহন করতে করতে মা তখন এতোই ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁর সান্নিধ্য থেকে সেই বয়সে বঞ্চিত হয়েছি। মাকে নিবিড়ভাবে পেয়েছিলাম বাবার মৃত্যুর পর যখন আমার চোদ্দ বছর বয়স। আর বাবা ? তাঁর সঙ্গেও দূরত্ব থেকে গিয়েছিল। আদালত থেকে ফিরে মক্কেলদের নিয়ে বসতেন, আইনের বই পড়তেন, আর মাঝে মাঝে বকুনি দিতেন জুনিয়র গিরীন্দ্রনাথ বসু এবং মুহুরি যোগেন মামাকে। শুনেছি মুহুরি কথাটা এখন অচল, বলা হয় লইয়ার্স ক্লার্ক। আমাদের সময়ে উকিলের মুহুরি এবং ব্যারিস্টারের বাবুর সঙ্গে সিপাইকা

ঘোড়ার তুলনা করা হতো। বাবাকেও কিছুদিন খুব কাছে পেয়েছিলাম বেশ কয়েকমাস। তখন কলকাতায় ইভাকুয়েশন বলে একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়েছে ব্ল্যাক-আউট ও ব্যাফলওয়ালের সঙ্গে। আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা সবাই লোডশেডিং জানে, কিন্তু ব্ল্যাক-আউটের মর্মার্থ বোঝে না। আরও দুটো শব্দ আমাদের জীবনকালেই হারিয়ে গেলো—দুর্ভিক্ষ এবং কলেরা। এখন কোনো পরিস্থিতিতেই আর 'ফ্যামিন' হবে না, কারণ তার নাম পালটে গিয়ে হয়েছে 'খরা'। কলেরাও নতুন নাম নিয়েছে আন্ত্রিক বা ওই ধরনের কিছু।

পুরনো কথায় ফেরা যাক। বাড়িতে সবাই জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত—কারও সময় নেই একটা বাড়ন্ত বালকের অন্তহীন কৌতূহল মেটাতে। তখন দু'জন মানুষ আমার জীবনে মস্ত ভূমিকা নিয়েছিলেন, মুহুরিমশাই যোগেন মান্না, যাঁকে আমি মাস্টারমশাই বলতাম, আর বাদলকাকু। আমার জন্যে অঢেল সময় ছিল বাদলকাকুর। আমাকে সিরিয়াসলি নিতেন তিনি। আমার সব প্রশ্নের সিরিয়াস উত্তর দিতেন। সকালবেলায় দ্য স্টেটসম্যান কাগজ পড়বার সময় বাদলকাকু চেম্বার্সের ডিকশনারি নিয়ে বসতেন, বিকেলে অফিস থেকে ফিরে মুড়ি-দুধ খেয়ে বাদলকাকু আবার দ্য স্টেটসম্যান নিয়ে বসতেন, অনেক শব্দে সরু পেন্সিলের দাগ দিতেন। পড়তে পড়তে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উত্থানপতন নিয়ে নানা উদ্বেগ প্রকাশ করতেন। বাদলকাকু চাইতেন, ইংরেজ নাস্তানাবুদ হোক হিটলারের হাতে, কিন্তু হেরে না যায়। হারলে লিভিংস্টোনের খুব ক্ষতি হবে। তখন কলকাতায় পেট্রোলের আকাল, লিভিংস্টোন সাহেব সাময়িকভাবে ঘোড়ার গাড়ির যুগে ফিরে গিয়েছিলেন এবং সেই বিখ্যাত গাড়িতে আমিও চড়বার সুযোগ পেয়েছি বাদলকাকুর দাক্ষিণ্যে।

খবরের কাগজ তন্নতন্ন করে পড়ে এমন পরিপাটিভাবে বাদলকাকু সাজিয়ে রাখতেন যে মনে হতো প্রত্যেকটা কাগজ নতুন রয়েছে।

আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম সেই দিনটির জন্যে যেদিন এই কাগজ সের দরে বিক্রি হবে।

এই বিক্রি পর্বটি অসাধারণ। একের পর এক বিক্রিওয়ালার সঙ্গে নিদারুণ দরদস্তুর—সেরা দাম না পেলে কাগজ বিক্রি হবে না। এরপর ওজন নিয়ে টানাটানি—ওজনে ফাঁকি দিতে গিয়ে কত বিক্রিওয়ালা ধরা পড়ে গিয়েছে বাদলকাকুর কাছে। তারপর গুনেগুনে পয়সা নিলেন বাদলকাকু। এরপর

বস্তা তুলে নিয়ে বিক্রিওয়ালা যখন কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে তখন হাঁ-হাঁ করে তাকে ফেরানো হলো। বিক্রিওয়ালা ভাবলো, আবার কোনো হাঙ্গামায় পড়তে হলো। এবার কারণটা অন্য! কাগজ বিক্রির পয়সাটা ইতিমধ্যেই তিনভাগ করা হয়ে গিয়েছে। একভাগ বাদলকাকুর মা পাবেন, একভাগ আমার জন্যে লজেন্স কেনা হবে, আর একভাগ ফেরত গেলো বিক্রিওয়ালার কাছে, বাদলকাকুর প্রীতি উপহার হিসেবে। কত বিক্রিওয়ালা যে বাদলকাকুর এই ব্যবহারে বিস্মিত হয়েছে তার ঠিক নেই, এমন অদ্ভুত বিক্রেতাকে তারা কখনও কেউ দেখেনি।

বাদলকাকুর কাছে পেয়েছি কাজের নিষ্ঠা। বাদলকাকু বলতেন, "টাকা নেবার জন্যে লোক অসংখ্য — বাড়িওয়ালা, কাগজওয়ালা, দুধওয়ালা, কয়লাওয়ালা, ঘুঁটেওয়ালি, মুদি, কলু, ঝি, চাকর, রাঁধুনি, মনিহারিওয়ালা, ডাক্তার, কমপাউন্ডার এমনকি পকেটমার পর্যন্ত তোমার পকেট হালকা করার জন্যে রেডি রয়েছে, অথচ টাকা পাবার সূত্র একটাই, কালামাজু কোম্পানির লিভিংস্টোন সায়েব। সুতরাং পাল্লার একদিকে বসাতে হবে বিশ্বসংসারকে আর অন্যদিকে লিভিংস্টোন সায়েবকে!"

কথাটার তাৎপর্য তখনও বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন হাড়ে-হাড়ে বুঝি। কাজের প্রতি, দায়িত্বর প্রতি অবহেলা করে কলমপেষা বাঙালি ভারতসভায় বদনাম জুটিয়েছে। আড্ডাবাজ বাঙালি যেদিন কর্মক্ষেত্রকে বৈঠকখানায় রূপান্তরিত করেছে, এবং কাজকে অন্তর থেকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে আমাদের অধঃপতন।

বাদলকাকুর নিয়মনিষ্ঠা, সময়নিষ্ঠা, কর্মনিষ্ঠার কথা যখন ভাবি তখনই বিস্ময় বোধ করি। সেইসঙ্গে তাঁর গুছনো স্বভাব ও পরিচ্ছন্নতা বোধ —যে জিনিসটি যেখানে থাকবার ঠিক সেখানে থাকবেই। ঘুম থেকে উঠে রাত্রে আবার ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত সব কিছুর টাইম টেবিল বিস্ময়কর — এক মিনিট এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। সেইসঙ্গে স্বনির্ভরতা। নিজের কাপড় নিজে কাচবেন, নিজে ইস্ত্রি করবেন। জুতো পরিষ্কার করবেন আর্টিস্টের মেজাজে — আমার জুতোটার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কী করে বাদলকাকুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলাম ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

বিশ্ব-সংসারের সব কথা বাদলকাকু আমাকে বলতেন, আমার মতামতের মূল্য দিতেন। প্রতিদিন কালামাজু অফিসে কী হচ্ছে, লিভিংস্টোন সাহেব কী কী মন্তব্য করলেন, সায়েবদের ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ভবিষ্যৎ কী,

এসব আমার নখদর্পণে ছিল। লিভিংস্টোন সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তার রিপোর্ট বাদলকাকু ইংরিজিতেই দিতেন এবং তা শুনে আমার ইংরিজি জড়তা কমবয়সেই কেটে গিয়েছিল। ইংরিজিটা মোটামুটি ব্যাকডোরে আয়ত্ত হয়ে যাওয়াটা আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল পরবর্তী যুগে যখন সহায়সম্বলহীন আমি ভাগ্যসন্ধানে ওল্ড পোস্টাপিসের আদালতী কর্মক্ষেত্রে বারওয়েল সায়েবের নিকট-সান্নিধ্যে এলাম। ইংরিজিটা আয়ত্তে না থাকলে অনেক জিনিসই হারিয়ে যেতো, হয়তো 'কত অজানারে' লেখবার সুযোগও পেতাম না।

বাদলকাকুর ছোটভাই বিজয়কে আমরা পচুকাকু বলে ডাকতাম। পচুকাকুও আমাকে খুব ভালবাসতেন। তিনিই আমাকে হাওড়া জেলা ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে। তখনও ভর্তির পরীক্ষা ছিল, তবে এখনকার মতন ভয়াবহ নয়। বয়সটা ক্লাসের তুলনায় একটু কম, কিন্তু বয়স নিয়ে তখন কেউ মাথা ঘামাতো না। দুর্ভাগ্যবশত, পরীক্ষা নেওয়া হলো কেবল অঙ্কে, এবং আমি ওই বিষয়টিতে তখন ভীষণ দুর্বল ছিলাম। মনে আছে পরীক্ষার হল্-এ খাতা নিয়ে আমি চুপচাপ বসে আছি, বয়স সবে ছয় পেরিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে পচুকাকু হল্-এ ঢুকলেন, মাস্টারমশাই সতীশ তরফদারের সন্ধানী চোখকে ফাঁকি দিয়ে, ঝড়ের বেগে বাঁ হাতে কয়েকটা অঙ্ক কষে ফেললেন। এবং বলাবাহুল্য আমি জেলা স্কুলের ছাত্র হয়ে গেলাম ১৯৪০ সাল থেকে। লাফ দিয়ে একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে। কম বয়সে ইস্কুলে ঢোকার প্রচণ্ড বেনিফিট পেয়েছিলাম পরবর্তী সময়ে। বাবা যখন মারা গেলেন ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে তখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র। তখন যদি আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়তাম তাহলে ম্যাট্রিক পাশ করাও আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। এদেশে যে লোক বি এ পাশ নয় তার কোনো সামাজিক সম্মান নেই, আর যে স্কুল ফাইন্যাল অথবা ম্যাট্রিক নয় সে তো অস্পৃশ্য !

জেলা স্কুলের জীবন তেমন আনন্দময় হয়নি। জাপানি বোমার ভয় তখন কলকাতার ঘাড়ের ওপরে এসে পড়েছে। শুরু হলো ইভাকুয়েশন—অর্থাৎ কলকাতা ছেড়ে দল বেঁধে পালাবার পালা। আমরা গেলাম বনগাঁয়ে। তারপর আমি ও বাবা ফিরে এলাম বিহারী চক্রবর্তী লেনে। বাবাকে ওকালতি করে সংসারের টাকা তুলতে হবে, আর আমাকে স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।

কিন্তু কোথায় ইস্কুল ! স্কুলবাড়িতে তখন মিলিটারিদের আপিস। মেয়ে

ইস্কুলের মর্নিং সেকশন তখন জেলা ইস্কুল। তারপর তাও বন্ধ। গুজব রটলো ইস্কুল আর কখনও খুলবে না। বাবার এক মক্কেল বললেন, "হরিপদবাবু, ওকে এখনই বিবেকানন্দ ইস্কুলে ট্রাই করতে পাঠান।"

বাবা কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছেন। ফলে টার্মের মধ্যপথে আমি খুরুট রোডের বিবেকানন্দ স্কুলে হাজির হলাম নিজেই ভর্তি হবার জন্যে। হেডমাস্টারের ঘরের সামনে জেলা ইস্কুলের ছেলেদের লাইন পড়েছে। সেই প্রথম সুধাংশুশেখরকে দেখলাম। শ্বেতশুভ্র খাদির পাঞ্জাবি এবং ধুতি পরেছেন, ময়লা রঙ, একটু ভারী চেহারা। আমাদের পুরানো স্কুলের হেডমাস্টার মাখনলাল চক্রবর্তী সারাক্ষণ স্যুট পরতেন।

প্রথম দর্শনেই প্রেম। সুধাংশুশেখর যখন শুনলেন আমার সঙ্গে কেউ নেই এবং আমি একলাই ভর্তি হতে এসেছি তখন খুব অবাক হয়ে গেলেন। ভাগ্যে তখন কাগজের আকাল ! মুখে মুখেই প্রশ্ন এবং উত্তর। আমাকে কিছু বলতে বললেন। ওই কাজটা কিছু নয়—বাদলকাকু ও লিভিংস্টোন সাহেবের ডায়ালগ আমার কণ্ঠস্থ। আমি মোহনবাগান ভারসাস ক্যালকাটা ক্লাবের বিষয়ে কিছু বললাম। হেডমাস্টার মশাই সেদিন আমার মধ্যে কী দেখলেন কে জানে, ওঁর ধারণা হয়ে গেলো আমি কেউকেটা হবো একদিন। যুগলবাবু স্যার এসে জিজ্ঞেস করলেন অঙ্কটা টেস্ট করবেন কি না, কিন্তু সুধাংশুশেখর বললেন, প্রয়োজন নেই, ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট !

অঙ্কের জন্যে আমি কোনোদিন ব্রিলিয়ান্ট হতে পারিনি পরীক্ষায় এবং সে নিয়ে সুধাংশুশেখর ও তাঁর ভাই হিমাংশুশেখর-এর দুঃখের অন্ত ছিল না।

দুই ভাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শে নিবেদিত। অথচ তীব্র স্বাধীনচেতা। সন্ন্যাসীর মতন থেকে, সন্ন্যাসের সমস্ত অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সংসারী। নামে সংসারী, দু'জনেই কেউই দারপরিগ্রহ করেননি। ছাত্রঅন্তপ্রাণ, ইস্কুলের সঙ্গেই যেন তাঁদের বিবাহবন্ধন ঘটেছে।

এমন অসাধারণ শিক্ষক পাওয়া যায় বহু জন্মের তপস্যায়। সুধাংশুবাবু যা পড়ান তা আর বই খুলে দেখার প্রয়োজন হয় না। তীব্র নিয়মনিষ্ঠা। এই সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ও বিনম্র ভাব তাঁর শত শত ছাত্রের স্বভাবে প্রবেশ করেছে বছরের পর বছর।

এই যে আমার লেখক হওয়া তার আদিতেও সুধাংশুশেখর। ইস্কুলের সাপ্তাহিক সাহিত্য সভায় নানা বিষয়ে লিখতে উৎসাহ দিতেন। আমার

লেখক হবার কথা নয়, ওই ধরনের কোন স্বপ্নও ছিল না, কিন্তু সুধাংশুশেখর একদিন ক্লাসে জিজ্ঞেস করলেন কে কে প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় নাম দিচ্ছে ? আমি চুপচাপ বসেছিলাম। সুধাংশুশেখর কেন জানি না ধরেই নিলেন আমি এরমধ্যে আছি। অজান্তে আমার সাহিত্য জীবন শুরু হলো গুরুর আশীর্বাদে। আমি তাঁর হাতের পুতুলের মতন।

বাংলা ও ইংরিজি দুটি ভাষাতেই অসাধারণ দক্ষতা ছিল সুধাংশুশেখরের। বলতেন, সহজ হওয়াটাই সবচেয়ে কঠিন। মানুষ যেমন সহজ হলে সবার প্রিয় হয়, সহজভাবে লিখলে তেমন মানুষের হৃদয় জয় করা যায়। কিন্তু যে কঠিন বিষয়কে হজম করতে না পেরেছে তারপক্ষে সহজ হওয়া সম্ভব নয়। আর জোর দিতেন পরিমিতিবোধের ওপর।

ঠিক জায়গায় থামতে শিখতে হবে, তিনি বলতেন। "দেখেছো তো রামরাজাতলা স্টেশনের রেলগাড়ি। ঠিক জায়গায় না থামলে প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে যায় কামরা, নামা-ওঠা দুই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।" সেইসঙ্গে সরসতা। সরসতা হলো নুন এবং টকের মতন, পাতে একটু না থাকলে সমস্ত ভোজনটাই বিস্বাদ। দেখো না একবার ঠাকুর রামকৃষ্ণের দিকে, সারাক্ষণ রসরসিকতা করে দুষ্পাচ্য জিনিস সব হজম করিয়ে দিয়েছেন, লোকে এখনও পড়ে আনন্দ পাচ্ছে, ভরসা পাচ্ছে।"

এই সুধাংশু-ঘরানাই আমার সাহিত্যপথের প্রথম ও প্রধান পাথেয়। নিজের লেখাতেও তিনি এই স্টাইল অনুসরণ করতেন। যা এক কথায় বলা চলে তার জন্যে পাঁচ কথা ব্যবহার করতেন না। বাংলার এই স্টাইল যে মহামূল্যবান তা তখন বুঝিনি। কিন্তু যা খুঁজে পাবার জন্যে অনেক লেখককে দীর্ঘদিনের অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা চালাতে হয়েছে তা সুধাংশুশেখর নিজের হাতে আমাদের উপহার দিয়ে গিয়েছেন নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে।

সুধাংশুশেখর প্রতিদিন বিকেলে ভ্রমণে বের হতেন। পাক্কা পাঁচমাইল ভ্রমণ অপরিহার্য। খুরুট রোড ধরে কাসুন্দিয়া থেকে রামরাজাতলা পর্যন্ত পদযাত্রায় তাঁর সঙ্গী হতেন একজন প্রিয় ছাত্র। ওঁর পকেটে থাকতো পুরনো খবরের কাগজ। যদি সময় থাকে তাহলে রেলের প্ল্যাটফর্মে একটু বসে পড়া এবং বি এন আর বম্বে মেল ট্রেনকে চলে যেতে দেখা।

বেশ কয়েকবছর ধরে সুধাংশুশেখরের যাত্রাসঙ্গী হয়ে আমি যে বিরল জ্ঞানের স্বর্ণভাণ্ডার লাভ করেছি উত্তরাধিকার সূত্রে তার জন্যে ভাগ্যের

দেবতাকে আমি প্রণাম জানাই। আলোচনার মাধ্যমে এই শিক্ষার সূত্রপাত সক্রেটিসের সময়, এর নাম সক্রেটিক মেথড, এবং এই পথের তুলনাহীন শিল্পী সুধাংশুশেখর। আমার দুঃখ এইসময় দিনলিপি রাখা হয়নি, রাখলে মানুষের কিছু উপকার করা যেতো।

সুধাংশুশেখর কিন্তু ছিলেন ডিসিপ্লিনের ভক্ত। সেখানে কোনো বিচ্যুতির ক্ষমা নেই। প্রতিদিন সকালে ছাত্ররা সমবেত হয়ে বেদগান করতো। একদিন এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ক্লাসেই বসে রইলাম। প্রার্থনার পরে সুধাংশুশেখর জানতে চাইলেন ক্লাসে এসে, কে কে প্রার্থনায় যাওনি ? দোষ স্বীকার করতে হলো, কিন্তু ক্ষমা মিললো না। তিন ঘণ্টা ডবল বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। এমন আঘাত জীবনে কম পেয়েছি। হেডমাস্টারমশায়ের প্রিয় ছাত্রর এই অবস্থা দেখে অনেকেই পুলকিত, কেউ কেউ বিস্মিত। অভিমানে ভেবেছিলাম সব সম্পর্কের ছেদ হলো।

কিন্তু সেদিন অঘটন ঘটলো। বিকেলে ভ্রমণের সময় আমি কাসুন্দিয়ার বাড়িতে উপস্থিত না হওয়ায় সুধাংশুশেখর নিজেই হাজির হয়েছেন বিহারীলাল চক্রবর্তী লেনে। তারপর বেরিয়ে আসতে হলো। সারাক্ষণ এমন ব্যবহার করলেন যেন সকালে কিছুই ঘটেনি। সেদিন রামরাজাতলা থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়ে যেতে পারে মনে হলো। কিন্তু সময়ের সম্মানে সুধাংশুশেখর তুলনাহীন। এইসব ক্ষেত্রে তিনি বাসে উঠে পড়েন। ছাত্রের টিকিটও কাটেন। এবং তাকে নির্দিষ্ট জায়গায় নামিয়ে দিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন।

সুধাংশুশেখর ও হিমাংশুশেখর অতি সাধারণ মিতব্যয়ী জীবন যাপন করতেন। বিলাসিতা বলতে চায়ের আপ্যায়ন। নির্দিষ্ট সময়ে বাড়িতে যে আসবে, তার মিলবে চা। এই চা স্টোভ জ্বালিয়ে নিজে তৈরি করতেন ভাইদের--একজন। এঁদের দু'জনকে একজন কৃতী ছাত্র পরবর্তী সময়ে গৃহীসন্ন্যাসী বলে বর্ণনা করেছেন। ইস্কুল থেকে মাইনে নিতেন সামান্য। কিন্তু ইস্কুল-অন্তপ্রাণ। স্বামী বিবেকানন্দর আদর্শ প্রতিফলিত হোক নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই ছিল স্বপ্ন ও সাধনা।

আগেই বলেছি, নিরেট পাথরকে সরস পান্তুয়ায় পরিবর্তিত করার দুর্লভ গুণ ছিল সুধাংশুশেখরের। সেই বিরল ক্ষমতা তিনি ছাত্রদের দান করবার জন্য ব্যগ্র থাকতেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শত শত বই লেখা হয়েছে এবং হবে। প্রবন্ধর তো সংখ্যা নেই। কিন্তু সেই তো চর্বিতচর্বণ। ক'জন

আর নতুন কথা বলতে পারছেন ? কিংবা এঁদের জটিল জীবনের ওপর নতুন আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছেন ? সেইখানেই সুধাংশুশেখরের বিশিষ্টতা। আমাকে বলতেন, "পড়ো, পরের মুখে ঝাল খেয়ো না। সোজাসুজি কথামৃতে অথবা বিবেকানন্দ রচনায় ডুবে যাও। দ্যাখো, তোমার মনের মতন ভাবনা-চিন্তার খোঁজ পাচ্ছো কি না। মনে রাখবে, রামকৃষ্ণ ছিলেন সীমাহীন শান্ত আকাশ আর বিবেকানন্দ অতলান্ত উদ্দাম সমুদ্র। দূরদূরান্তে কোথাও আমাদের দৃষ্টির আড়ালে আকাশ ও সমুদ্রের মিলন হয়েছে।"

হেডমাস্টারমশায়ের প্রত্যাশা ছিল একদিন আমি তাঁদের মুখোজ্জ্বল করবো। কেন এমন প্রত্যাশা করে আমাকে বাড়তি বিপদে ফেলে দিলেন হাঁদুদা ? আপনার কোনো প্রত্যাশার তো পূরণ হবে না আমার মধ্যে। কোনো এক সময়ে মনে হবে আপনার সমস্ত প্রচেষ্টা জলে গিয়েছে।

ভাগ্যের দেবতা আমার ওপর আঘাত হানলেন। ছেচল্লিশ সালের মাঝামাঝি বাবার শরীর খারাপ শুরু হলো, রক্তে চিনি পাওয়া গেলো। ছেচল্লিশের বিধ্বংসী দাঙ্গার সময় অসুখ বাড়লো। তারপর সাতচল্লিশের এপ্রিলে একদিন গভীর রাতে বাবা চলে গেলেন মরণসাগরের ওপারে। ঠিক সেই মুহূর্তে কিছুক্ষণের বিশ্রাম নেবার জন্যে আমি ঘুমোতে এসেছিলাম। মায়ের কান্নায় ঘুম ভেঙে গেলো। মনে আছে তখন কারফিউ চলছে। আমার সমস্ত ভবিষ্যতের ওপরেও যেন কারফিউ নেমে এলো।

শোক কাকে বলে তখনও ঠিক মতন জানা ছিল না। সেই মুহূর্তে শোকের থেকেও পরিবারের ভবিষ্যৎই যে আমার উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠলো তা অস্বীকার করে নিজেকে আরও ছোট করবো না। প্রকৃত শোক এসেছিল অনেক পরে। তখন আমি খানিকটা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছি এবং প্রথম বই 'কত অজানারে' যেদিন প্রকাশিত হয়েছে, ১৯৫৫ সালের সেই দিনটিতে প্রথম বাঁধানো বইটি নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। বইটা মায়ের হাতে তুলে দিলাম। তিনি হাতে নিলেন, ভিতরের পাতা কিন্তু দেখলেন না। তারপর কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর আমরা দু'জনে একসঙ্গে কেঁদে উঠলাম। স্বস্তি লাগছে। বিপদমুক্ত হয়েছি আমরা। অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা দূরে সরে গিয়েছে। মা হঠাৎ বললেন, "তোর বাবা লিখতেন। এই বইটা দেখলে তিনি খুব খুশি হতেন।" আমারও কেন জানি না বাবাকে নতুন ভূমিকায় দেখতে পেলে আনন্দ হতো। সংসার চালানোর দায়িত্ব তোমায় নিতে হতো না, বাবা। ও কাজ আমি চালিয়ে দেবো। তুমি শুধু আমাদের মধ্যে থাকো,

থাকো। দেখো, তোমার শংকরও লেখক হয়েছে। সেই রাতে বুঝলাম, আমি শোকার্ত। যে শোকে স্বার্থ মেশানো থাকে তা শোক নয়, তা কেবল লোকসানের দুঃখ।

বাবার মৃত্যুর পর নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম। সুধাংশুশেখর দূর থেকে দেখেছেন আমাদের দুঃখ। ইস্কুলের মাইনে আবেদন করার আগেই মকুব করে দিলেন। হিমাংশুশেখর ছাত্রদের কোচিং ক্লাস চালাতেন। আমাকে আমন্ত্রণ করলেন, ওখানে এসো। মাইনের কোনো কথাই তুললেন না। এই সংসার থেকে দয়ামায়া উঠে গিয়েছে যারা বলে তারা মানুষের প্রতি অবিচার করে।

ম্যাট্রিক পাশ করে বাড়িতে বসে আছি। প্রতিদিন মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে হাওড়া থেকে বেরিয়ে পড়ি। হাঁটতে হাঁটতে হাওড়া স্টেশন। তারপর ব্রিজ পেরিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত। এ অঞ্চলের প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি খুপরি আমার পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোথায় চাকরি? চাকরি অত সহজ নয়।

বিপত্তারণের ভূমিকায় এগিয়ে এলেন সুধাংশুশেখর। আমার প্রয়োজন, কিন্তু চাইবার শক্তি নেই। তিনি বুঝলেন। মধুর বাক্যে আমার সমস্ত লজ্জা ও দ্বিধা ঢেকে দিলেন। বললেন, "আমার প্রয়োজন, আমাদের স্কুলে কাজ করো।" প্রয়োজন তাঁর ছিল না, কিন্তু আমার প্রয়োজনের কথা ভেবেই তিনি এগিয়ে এসেছেন। আমার ভীষণ লজ্জা হলো, এখনও তিনি আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করছেন কিছু সাফল্য। হে ঈশ্বর, আমাকে আর লজ্জা দিও না, আমাকে মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যেতে দাও। আমার সকল লজ্জার অবসান ঘটুক।

বিবেকানন্দ ইস্কুলের শিক্ষকতা জীবনে আর এক সুধাংশুশেখরকে দেখলাম। জীবনের সমস্ত সুখকে ত্যাগ করে নতুন প্রজন্ম তৈরির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেই আনন্দ। কবে নরেন দত্তমশাই মিটিং কা বাঁত কী বলে গিয়েছেন তা অক্ষরে-অক্ষরে জীবনে প্রতিফলিত করার জন্যে কী শান্ত সাধনা। ছেলেরাই সব। ওদের মধ্যেই মুক্তির স্বাদ ও মোক্ষের সন্ধান। রামকৃষ্ণ বলেছেন, ছোটছেলেরা খাঁটি দুধ। একটু গরম করে নিলেই দেবতার কাজে লেগে যায়। এই গরম করার দুঃসাধ্য ব্রত নিয়ে তিলে তিলে দিনে দিনে মাসে মাসে বছরের পর বছর নিজেকে নিবেদন করার সীমাহীন ধৈর্য তিনি আয়ত্ত করেছেন। কোথাও কোনো সংশয় নেই দ্বিধা নেই। সংশয়

থাকবে কেন ? রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যা বলে গিয়েছেন তা তো ভুল হবার নয়—কী সীমাহীন বিশ্বাস !

তারপরের ঘটনা দীর্ঘ। ইতিমধ্যে আমি শর্টহ্যান্ড ও টাইপিং আয়ত্ত করে ফেলেছি এম এন দত্তর টাইপিং স্কুলে। এবিষয়ে আমার পরামর্শদাতা গণাদা, যাঁর ডাক নাম বিভূতি রায়। বিভূতিদার ভাই অনিল স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল, সে-ই যোগাযোগটা করিয়ে দেয়। বিভূতিদা কলকাতা হাইকোর্টের ইংরেজ ব্যারিস্টার নোয়েল বারওয়েলের বাবু। সায়েব বুড়ো হচ্ছেন, তাই চাকরি-সন্ধান করতে হতে পারে এই আশঙ্কায় বিভূতিদা নিজেও তাঁর শর্টহ্যান্ড শানিয়ে নিচ্ছেন।

ইতিমধ্যে একটা চাকরি পাওয়া গেলো বিড়লা কোম্পানিতে। হেডমাস্টারমশাই বললেন, "তোমাকে যা দিই তাতে তো সংসারের সুরাহা হবে না। তুমি ওখানে জয়েন করো চুপিচুপি। আমি এখানকার পদটা খালি রাখছি। যদি সামলাতে না পারো তাহলে ফিরে আসবে।"

ফিরতে হয়নি। বরং নতুন সুযোগ। বিভূতিদা নতুন চাকরি পেয়েছেন। তিনি চান আমাকে বারওয়েল সায়েবের কাছে রেখে যেতে। প্রথমে দ্বিধা ছিল। বুড়ো সায়েব হঠাৎ মরে গেলে আমার কী হবে ? বিভূতিদার কিন্তু অন্ধবিশ্বাস সায়েবের সংস্পর্শে যে আসবে সে সোনা হয়ে যাবে।

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কি সারাজীবন টাইপিস্ট থাকতে চাস ? না জীবনকে দেখতে চাস ?" আমি তো সব স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে এসেছি বাঁশতলা বার্নিং ঘাটে, আমি এখন কোনোক্রমে বাঁচতে চাই। কিন্তু বাঁচতে বাঁচতে যদি আবার বিকশিত হওয়া যায়। তাহলে মন্দ কী ?

সুধাংশুশেখর সব শুনলেন। বললেন, "যাও। ওই যে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, নিয়ত প্রতিকূল অবস্থামালার বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের চেষ্টার নামই জীবন।"

এরপরে তো মস্ত গল্প। বারওয়েল সায়েবের চেম্বারে আমার নবজন্ম হলো, জীবনকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পেলাম। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পরে কেমন করে আচমকা আমি লেখক হয়ে উঠলাম তার বিবরণ অনেকের কাছে অজানা নয়।

আমার এই নবজন্ম পর্বে 'কত অজানারে' গ্রন্থের প্রথম বাঁধানো কপিটার কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় কপিটা দিয়েছিলাম বিভূতিদাকে। অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদলেন। সুধাংশুশেখরের কাছে যেমন বিবেকানন্দ,

বিভূতিদার কাছে তেমন নোয়েল বারওয়েল। তৃতীয় কপিটা আমি কাসুন্দিয়ার বাড়িতে সুধাংশুশেখরের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারা যায় না মানুষটাকে।

"স্যার, আমি পেরেছি। আপনি যা চেয়েছিলেন। অন্ধকার কুয়ো থেকে আমি আস্তে আস্তে উঠে আসছি, স্যার। আমি আলো দেখতে পাচ্ছি।" আমার চোখে জল। ছাত্রের সাফল্যের মধ্যে সুধাংশুশেখর যেন নিজের সাফল্যই খুঁজে পেলেন। আমাকে আলিঙ্গন করলেন। আশীর্বাদ করাটা ওঁর স্বভাবে ছিল না। বলতেন, আমি আশীর্বাদ করার কে? তোমার মধ্যেই তো নারায়ণ রয়েছেন। নমো নারায়ণায়।

সুধাংশুশেখরকে জীবনের এই পর্বে প্রায় সখার মতন পেয়েছি। বড় স্নেহের শরীর ছিল। এইসব লোক ঘরসংসারী না হয়ে বিশ্বসংসারকে দরিদ্র করে গিয়েছে। কিন্তু আরও বড় দায়িত্ব রয়েছে যে। নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা, তাদের মধ্য দিয়ে নবযুগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা। সংসার বড় জড়িয়ে দেয়, পদে পদে তাকে অবহেলা না করলে সামাজিক স্বপ্ন সফল হয় না। দুনিয়ায় যারা কিছু স্বপ্ন দেখেছে তারা স্বপ্ন সফল করার জন্যে প্রিয়জনের প্রতি অবিরাম অন্যায় করেছে— বুদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ, গান্ধী, সুভাষ পর্যন্ত একই কথা।

সুধাংশুশেখর বলতেন, ইস্কুলের কাজটা ভালভাবে হবে না বলেই তো বিয়ের হাঙ্গামায় যাইনি।

আমি অবাক। আমাদের ইস্কুলের সুধাংশুবাবু স্যার কোনোদিন এমন সখার মতন আমার সঙ্গে সব আলোচনা করবেন ভাবতে পারিনি।

এরপরে আরও সময় অতিবাহিত হয়েছে। সুধাংশুশেখরের জীবন যে এইভাবে মোড় নেবে তা কল্পনা করতে পারিনি। সত্তরের দশকে তখন সমস্ত বাংলায় অন্ধকার নেমে এসেছে—অনেকটা মাৎস্যন্যায়ের মতন। বিদ্যাসাগর থেকে আশুতোষ পর্যন্ত কেউ ছাড়া পাচ্ছেন না ঘৃণার হিংস্র ছুরিকাঘাত থেকে। সুধাংশুশেখর শুনলাম, ইস্কুলে যান না। তারপরে শুনলাম, তিনি হাসপাতালে।

হাসপাতালে দেখতে গেলাম। কথায় কথায় তার স্বপ্নভঙ্গ ও বিতৃষ্ণার ইঙ্গিত পেলাম। যে শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা তাঁর কর্মজীবনের ভিত্তিভূমি ছিল তা লুপ্ত হয়েছে বঙ্গভূমি থেকে। একজন ভদ্রলোক কথায় কথায় তাঁকে বললেন, কোনো একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দেবেন।

সুধাংশুশেখরের মতন মানুষ বললেন, "না, পাঠাবেন না। তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে দেখলে আমার অস্বস্তি হয়।"

তবে ওরা যে খাঁটি দুধ! দুধ কি পচতে শুরু করেছে? গুরুতর অসুস্থ সুধাংশুশেখরকে এসব প্রশ্ন করা তখন সম্ভব হলো না।

এরপরে তিনি ইস্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন অশান্ত এক দশকে। যে ইস্কুল তাঁর প্রাণ, যেখানে দিনের চোদ্দ ঘণ্টা, কখনও ষোল ঘণ্টা কাটিয়েছেন সেখান থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিলেন অভিমানী সুধাংশুশেখর।

আরও কিছুদিন পরে আমাকে একান্তে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "একটা উইল করিয়ে দাও। সামান্য কিছু টাকা এবং পৈত্রিক বাড়িটা আছে।" আমি ভাবলাম তিনি প্রিয় ইস্কুলকে সব দিয়ে যাবেন।

এবার সত্যিই বিস্ময়ের পালা। সুধাংশুশেখর ইস্কুলের নাম মুখে আনলেন না। বললেন, "বাবা ছিলেন টোলের পণ্ডিত। যদি পারো এই বাড়িতে একটা টোল খুলো নিত্যানন্দ পণ্ডিতের সাহায্য নিয়ে। এইসবই ভাল। যদি আবার ভারতবর্ষকে মাটি খুঁড়ে বের করা যায়।"

কোনোরকম পরামর্শ দেবার স্পর্ধা বা সাহস আমার নেই। ইস্কুলের কথাও তুলতে পারলাম না। আমার মনে হলো আমারই চোখের সামনে একজনের সারাজীবনের স্বপ্নভঙ্গ হলো। সারাজীবন কিস্তিতে প্রিমিয়াম জমা দিয়ে একজন মানুষ শেষদিনে শুনলো, বিমা কোম্পানি ফেল করলো।

আমরা দু'জনে মুখোমুখি বসে আছি। কথা বলা প্রয়োজন, নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কথা আসছে না। শেষে বিবেকানন্দকে স্মরণ করলাম। "সতত প্রতিকূল অবস্থামালার বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের চেষ্টার নামই জীবন।"

সুধাংশুশেখর আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। কোনো উত্তর দিলেন না। আমি অনেকক্ষণ ওই শীর্ণশরীর বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার মনে হলো, গাছটার শিকড় উপড়ে দেওয়া হয়েছে। শিকড় না থাকলে আত্মবিশ্বাস যে সম্ভব নয় তা এই বিশ্বসংসারের কে না জানে?

বিবেকানন্দ ইস্কুলের আরও একটা গল্প বলে নেওয়া যাক। কানাই মাস্টার এখানে মাস্টারিতে ঢুকবার আগে এন ডি রাজপাল বলে এক বেপরোয়া পাঞ্জাবির কাছে আজব কাজ করেছি। এই রাজপালকে নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস বলে একটা গল্প লিখেছিলাম। গল্পটা হাতের গোড়ায় নেই।

রাজপালের রাজ্যে জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে উঠছিল, ঠিক সেই সময়েই

হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টারমশায় শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য ডেকে পাঠালেন। তাঁর কাছেই একদিন পড়াশোনা করেছি ; প্রতিদিন প্রার্থনা করেছি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পবিত্র আদর্শে নিজেকে যেন গড়ে তুলতে পারি। সে-প্রচেষ্টা সে-স্বপ্ন আমার সফল হয়নি, কিন্তু তবু বলবো আমাদের সমগ্র ছাত্রজীবন এক অসীম আনন্দের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে।

পৃথিবীর অনেক ছাত্র অপেক্ষা আমরা বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের ছাত্ররা ভাগ্যবান। আমরা কোনো শৈলাবাসের পাবলিক ইস্কুলে পড়িনি বটে, বেঁকিয়ে ইংরেজি উচ্চারণের রহস্যও আমরা হয়তো আয়ত্ত করিনি, কিন্তু সুধাংশু ভট্টাচার্য, ওরফে হাঁদুদার কাছে পড়েছি।

হাঁদুদা আমাকে ভালবাসতেন। পয়সার অভাবে লেখাপড়া ছেড়ে দেবার পরের অধ্যায়টা তিনি বিস্তারিতভাবে জানতেন না। ভেবেছিলেন—আমি চুপচাপ বেকার বসে আছি, এবং চাকরির চেষ্টা করছি। একদিন আমাকে ডেকে হাঁদুদা বললেন, "ইস্কুলে মাস্টারি খালি আছে। যা মাইনে তাতে হয়তো তোমার অভাব মিটবে না। কিন্তু আনন্দ পাবে।"

সেদিনের সেই সামান্য চাকরিটা আমাকে কিভাবে নরপশু রাজপালের হাত থেকে রক্ষা করেছিল তা হাঁদুদা কখনও জানেননি। আমিও বলতে সাহস করিনি। ভয় হয়েছিল, কে জানে সব শুনে তিনি হয়তো আমার নাম উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ করবেন। বুঝবেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় আমাদের মানুষ করবার আজীবন প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু চাকরিটি তখন আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অতীত সম্বন্ধে আমাকেও নীরব থাকতে হয়েছিল।

যে ইস্কুলে পড়াশুনা করেছি, সেই ইস্কুলের শিক্ষক হওয়ার মধ্যে এক বিশেষ আনন্দ আছে। সেই আনন্দ আমি পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেছিলাম। তার একটা প্রধান কারণ কানাইবাবু স্যার তখনও মাস্টারি করছিলেন। আর কানাইদার সান্নিধ্যে কে নিরানন্দ থাকতে পারে? কানাইদাকে আপনারা কেউ চেনেন না। তিনি খ্যাতিমান নন—স্ব বা ছদ্ম কোনো নামেও তিনি ধন্য নন। তবু তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে হয় ; আর অবাক হয়ে ভাবি, মানুষের ইতিহাসে এই সব 'সামান্য' জনদের কেন স্থান হয় না? কানাইদা আমার মাস্টারিজীবনকে আনন্দময় রেখেছিলেন। তারপর যথাসময়ে ভাগ্যসন্ধানে ইস্কুল মাস্টারি ছেড়ে

হাইকোর্টে হাজির হয়েছি এবং কোনো একসময়ে নিজেই লেখক হয়ে বসেছি।

কাজকর্ম সেরে সেদিন বিকেলবেলায় বাড়ি ফিরছিলাম। পথে শুনলাম কানাইদা নেই। সেইদিন ভোরেই আমাদের এই অখ্যাত শহরের সবাই যখন ঘুমে অচেতন তখন বিবেকানন্দ ইস্কুলকে, কাসুন্দেকে, আশ্রমকে এবং আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে জলের পোকা চুপি চুপি আবার জলে ফিরে গিয়েছে।

বাস থেকে নেমে সোজা ইস্কুলে চলে গিয়েছিলাম। যা কোনোদিন দেখিনি তা এবার দেখলাম। ইস্কুলের দরজা-জানালা সব বন্ধ। অন্যদিন এই সময় নেতাজী সুভাষ রোডে রাস্তার উপরে অফিস ঘরটায় আলো জ্বলে। দোতলার কয়েকটা ঘরেও যে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির বিদ্যুৎ ব্যয়িত হচ্ছে তা রাস্তা থেকেই বোঝা যায়। এখন কিন্তু সব অন্ধকার—যেন কিছুক্ষণের জন্যে মেন-সুইচ ফিউজ হয়ে গিয়ে, বাড়িটা তরল অন্ধকার বোঝাই একটা বিশাল গামলার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে।

তবুও ফিরে যেতে পারিনি, কিছুক্ষণের জন্যে কানাইদার বহু স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থেকেছি। এবার কাসুন্দের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। ওইখানেই সবার হেডমাস্টারমশায় এবং আমাদের মতো কয়েকজনের হাঁদুদার বাড়ি। হেডমাস্টারমশায়ের উপর সহজবোধ্য কারণে অপ্রসন্ন কিছু ছাত্রের দল এই পথ দিয়ে যাবার সময় বলতো 'বাঘের খাঁচা'। আর রসিকজনেরা বলতো মডার্ন টোল—অর্থাৎ স্থানীয় অনেক সাধুজনের প্রাত্যহিক ও সান্ধ্য আড্ডার কেন্দ্রস্থল। কাসুন্দে রোডের এই বহুদিনের অবহেলায় মলিন বাড়িটা সম্বন্ধে একদিন আমাকে আরও অনেক কথা লিখতে হবে। এই বাড়িতেই সকাল-বিকেল দু'বেলায় কানাইদার চা বরাদ্দ ছিল। এতো দীর্ঘ সময় কানাইদা এখানে থাকতেন, সময়ে-অসময়ে তাঁকে এমন নিয়মিতভাবে বাইরে ঘরের নীচু তক্তাপোশটার উপর বসে থাকতে দেখা যেতো যে, বাড়িটাকে অনেকেই ভুল করে কানাইদার বাড়ি ভাবতো।

বাড়িটা আজ নিঝুম। ঠিক যেন একটা পোড়োবাড়ি। অনেকদিন আগে এই বাড়ির সবাই যেন একসঙ্গে কোনা দৈবদুর্বিপাকে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল, তারপর কেউ যেন সাহস করে এর ত্রিসীমানায় আসতে সাহস করেনি।

না। ভুল করেছি আমি। ভেজানো জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে মনে হলো, কে যেন ভিতরে বসে রয়েছেন। এই শীতের আমেজের মধ্যেও তিনি আস্তে আস্তে হাতের পাখাটা ঘোরাচ্ছেন। এই তক্তাপোশটার উপর কানাইদা রোজ এসে বসতেন, আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন, দরকার হলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন ; বলতেন, 'তোরা সকলে সবজান্তা হয়ে বসে আছিস্ ! এই যা বললুম, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত চলে যাবে। মার্সি পিটিশন ছাড়া এখন তোদের কোনো গতি নেই।'

সেই তক্তাপোশটারই এক কোণে হাঁদুদা নিশ্চল পাথরের মতো বসে আছেন—হাতের পাখাটা মাঝে মাঝে কোনো ভৌতিক শক্তির বলে যেন নড়ে উঠছে।

হাঁদুদার সত্যিই যে কোনোদিকে খেয়াল নেই তা তাঁর দিকে তাকিয়েই বুঝলাম। প্রায় ডজনখানেক পরিপুষ্ট মশা তাঁর নিরাভরণ উর্ধ্বাঙ্গের উপর পরম নিশ্চিন্তে বসে রক্ত শোষণ করছে। পিঠে এবং কানে বসতেও তাদের দ্বিধা হয়নি। তবুও হাঁদুদা নিশ্চল, মশা তাড়াবার কোনো আগ্রহ নেই। কয়েকটা এঁটো চায়ের কাপ সামনের টেবিলের উপরে ছড়ানো পড়ে রয়েছে। হাঁদুদার সামনে একটা চা বোঝাই কাপও ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। উপরে পুরু সর ভাসছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে বুঝলাম—পোড়োবাড়ি নয়, আরও লোক রয়েছেন। হাঁদুদার প্রাত্যহিক আসরের অন্যতম আজীবন সভ্য প্যাটারসনদা কানে কানে বললেন—"কানাই-এর কাপ।" ভুলে চা নিয়ে ফেলেছে হাঁদুদা—অভ্যেসটা তো আজকের নয়। কিন্তু ঐ চায়ের ভাগ নিতে এবং চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলতে কানাই আজ আর আসবে না।

কোনো কথা বলিনি আমি। নিঃশব্দে পথে বেরিয়ে পড়েছি। দেখলাম, প্যাটারসনদা অর্থাৎ আমাদের রবীন্দ্রনাথ পাত্রদা-ও আমার পিছন পিছন আসছেন। একটু দাঁড়িয়ে রইলাম, প্যাটারসনদা আমার পাশে এসে পড়লেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের দিকে চলেছি আমরা। কিন্তু কোনো কথা হলো না। প্যাটারসনদা ও আমি যেন কোনো মূক-বধির ইস্কুলের ছাত্র।

লোকে বলে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম। আমরা প্রথম দুটো শব্দ ছেঁটে দিয়ে বলি আশ্রম। এই আশ্রমেরই কয়েকজন চিরকুমার উৎসাহী সভ্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদা আমাদের বিবেকানন্দ

ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আশ্রম বলতে মনের মধ্যে যে ছবিটা সাধারণত ভেসে ওঠে, আমাদের আশ্রমের পরিবেশ অনেকটা তাই। অহেতুক উত্তেজনা নেই সেখানে। সন্ধ্যাপূজা এবং আরতির পর পরিবেশটা শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে ওঠে।

নস্করপাড়া লেনের আশ্রমকে আজ আরও নিস্তব্ধ মনে হলো। আলোগুলোও জ্বলছে না আজ। দূরের রাস্তা থেকে ল্যাম্পপোস্টের কিরণ এসে পড়েছে ; তার মধ্যেই অস্পষ্টভাবে দেখলাম আশ্রমবাসীদের কয়েকজন শূন্য নয়নে আশ্রমের পুকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রয়েছেন তাঁরা। কিন্তু কানাইদা থাকলে তা হতো না। স্বভাবসিদ্ধ দ্রুতগতিতে আশ্রমে ঢুকেই তিনি চিৎকার করে উঠতেন—'কী ব্যাপার তোদের ? মুখে সব সাইলেন্সার লাগিয়ে বসে আছিস নাকি ? বুঝি না বাপু তোদের। কেমন করে যে বাবু সেজে বারান্দার বেঞ্চিতে বসে থাকিস তা তোরাই জানিস। ওটি চলছে না বাপু।' এই বলে দু'একজনের হাত ধরতেন কানাইদা, তারপর হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতেন পুকুর ধারে। সান-বাঁধানো সিঁড়ির উপর ধড়াস করে বসে পড়তেন তিনি। তারপর শুরু হতো গল্প-গুজব।

কিন্তু এই সন্ধ্যায় কে গল্পগুজব করবে ? আমাদের পিছনে ফেলে রেখে তাঁর সোনার তরী এখন কোন অজানা বন্দরের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে কে জানে।

আশ্রমে বসে থাকা সম্ভব হলো না। উঠে পড়লাম। আমার সঙ্গী প্যাটারসনদাও দেখলাম কোনো কথা বললেন না, আমাকে একবার বসতেও অনুরোধ করলেন না। অন্যদিন হলে সবাই হাঁ-হাঁ করতেন। বলতেন, 'ওটি হচ্ছে না। এর মধ্যে উঠবে কী ?' আজ সবাই নিজের যন্ত্রণার মধ্যেই ডুবে রয়েছেন।

সোজা বাড়ি ফিরে এসেছি। এবং সেই থেকেই ভাবছি কী হারালাম। অন্তত এই একদিন, শনিবারের এই সন্ধ্যাটা আমার কাছে কানাইদার সন্ধ্যা হয়ে থাক। মনে আজ সাহিত্য নেই, রাজনীতি নেই, অর্থনীতি নেই। শুধু আছেন কানাইবাবু স্যার, কানাইদা, কানাইলাল বাগ।

আমার সামনে টেবিলের উপর লেখার কাগজ রয়েছে। আমাদের সামান্য ইস্কুলের সামান্য পত্রিকায় কানাইদার তিরোধানের সংবাদ হাঁদুদা হয়তো আমাকে কিংবা শংকরীদাকে লিখতে বলবেন। কিংবা তিনি নিজেই হয়তো

শেষপর্যন্ত কলম ধরবেন। তাঁর অভ্যস্ত সাধু বাংলায় কী লেখা হবে তা আমি এখনই বলে দিতে পারি। লেখা হবে :

"লোকান্তরিত কানাইলাল বাগ আমাদের বিদ্যালয় এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের সঙ্গে অতি বাল্যকাল হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত সেবাসম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার সহিত এই উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক এত নিকট ও অঙ্গাঙ্গী ছিল যে, তাঁহার বিয়োগের ক্ষতিপূরণ হইতে পারে কি না এই প্রশ্নও আমাদের নিকট অবান্তর। কানাইলালের মৃত্যু-শোক সান্ত্বনাহীন, নিরুপায়ে তাহা আমাদের সহ্য করিতে হইবে।

"মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। আমাদের বিদ্যালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৩২ সালে শিক্ষকরূপে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি একবার মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিতে গিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনের বৃত্তি নির্বাচনকালে বিবেকানন্দ স্কুলের শিক্ষকতাকেই বাছিয়া লইলেন। সম্ভবতঃ না লইয়া পারেন নাই, কারণ কাসুন্দিয়া অঞ্চলের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রণোদিত যে যুবকগোষ্ঠীর দ্বারা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আশ্রম ও বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের পত্তন হয়, শিশু সদস্যরূপে কানাইলাল সে দলের সহিত স্বাভাবিকভাবেই মিশিয়া গিয়াছিলেন। স্বামী বিরজানন্দের মন্ত্রশিষ্য কানাইলাল শেষদিন পর্যন্ত দেশঋণ ও দেবঋণ শোধ করিয়া গিয়াছেন।

"কানাইলাল সোজা ও সহজ মানুষ ছিলেন। আবেগের বশীভূত হইতে ভালবাসিতেন না, যত্ন করিয়া কাজ করিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল, এবং এই নিরহঙ্কার অনাড়ম্বর মানুষটি সযত্নে তাঁহার প্রতিষ্ঠানের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। তীক্ষ্ণ ও সরল বাকপটুত্বের অধিকারী কানাইলালের সাহচর্য তাঁহার বন্ধু ও জ্যেষ্ঠদের নিকট পরম আনন্দদায়ক ছিল, ছাত্রগণ অবশ্য মাধুর্যের সঙ্গে তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাইত।

"তাঁহার আত্মার চিরশান্তি হোক, শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে ইহাই প্রার্থনা।"

কিন্তু আমাদের কাছে কানাইদার আরও পরিচয় আছে। কোনো দার্শনিক বলেছেন—সংসারে আমরা সবাই অন্তত দু'বার রাজা হতে পারি—বিয়ের দিন বরবেশে ; আর জীবনের শেষে নিদ্রিত রাজা যেদিন মরণসাগরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কানাইদা কিন্তু মাত্র একবারই রাজা হলেন। প্রথমবার রাজা হওয়ার সুযোগটা চিরকৌমার্যের ব্রত নিয়ে কানাইদা স্বেচ্ছায় বর্জন

করেছিলেন। আজ তিনি রাজা। কিন্তু একদিনকার সুলতান—আজকের রাজত্ব কেবল আজকেরই জন্যে। বার বার নিজের কক্ষপথে পাক খেতে খেতে এই পুরনো পৃথিবীটা সামনের বছরে যখন আবার আজকের দিনে ফিরে আসবে, তখন কেই বা তাঁকে মনে রাখবে?

সংসারের পাকা খাতায় যাঁরা নাম লেখাতে চান, তাদের কঠিন পরীক্ষায় পাশ দিতে হয়। হিসেবী সংসার সুদখোর এক বুড়োর মতো লালরঙের জমাখরচের খাতা নিয়ে বসে আছে। তোমার সুখের, তোমার দুঃখের, তোমার পাপের, তোমার পুণ্যের, তোমার গ্রহণের এবং ত্যাগের ; তোমার মহৎ কর্ম আর অপকর্মের কড়াক্রান্তি পর্যন্ত হিসেব দাও। তারপর বুড়ো যোগ কষবে, বিয়োগ কষবে, গুণ কষবে, ভাগ কষবে। হিসেবের শেষে জমার দিকে যদি একটা বিরাট অঙ্ক পড়ে থাকে তবেই নাম উঠবে খাতায়।

কিন্তু কানাইদা কি সে হিসেব দিয়েছেন, না দিতে চেয়েছেন? এখন যদি আমি তাঁর হয়ে ওকালতি করতে যাই, সুদখোর সংসার-বুড়োটা হেসে গড়িয়ে পড়বে। সত্যি কথা বলতে কি, সে-হাসিকে অবজ্ঞায় উড়িয়ে দেওয়ার মতো সাহসও আমার নেই। অথচ যেদিন তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল, সেদিন কী-না করতে পারতাম।

বেশ মনে পড়ছে কথাগুলো। তখন সবেমাত্র ইস্কুলে ঢুকেছি। প্রতিদিন পাঁচপাতা হাতের লেখা দেখাতে না পারলে যাঁর হাতে নিশ্চিন্ত বিড়ম্বনা এমন একজন স্যারের ক্লাস। মুখ শুকনো করে বসে আছি আমরা কয়েকজন। টিফিনের সময় লুকোচুরি খেলা বিসর্জন দিয়ে, বড়ো বড়ো হরফের বোম্বাই মেল চালিয়েও দু'পাতার বেশি ভরাতে পারিনি। প্রয়োজনের সময় মাথায় উদ্ভাবনী বুদ্ধি আসে ; ঐ দুঃসময়ে আমার মনে হলো, হায়রে, যদি এমন একটা কল বের করা যেতো যাতে আপনি লেখা হয়ে যায়। তখন কে আর হাতের লেখার জন্যে ভয় পাবে? ইস্কুলের বদমেজাজী মাস্টাররা সবাই এক সঙ্গে জব্দ হয়ে যাবে।

নিজের উর্বর মস্তিষ্কের তারিফ যখন নিজেই করতে যাচ্ছি, তখন পাশের বন্ধু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, "ওরকম কল তো বহুদিন আগেই সায়েবরা বের করেছে।" আরও বললো যে, "ওই কল দেখবার জন্য সায়েবদের কাছে যাবারও দরকার নেই। একটু ধৈর্য ধরে ইস্কুলের আপিস ঘরের দিকে নজর রাখলেই তার দর্শন মিলবে।"

বন্ধুর কথা প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু পরের দিনই দেখলাম অফিস

ঘরে একটা অদ্ভুত কলের মধ্যে কাগজ পরিয়ে আমাদের ইস্কুলের এক ভদ্রলোক বোর্ডের দিকে না তাকিয়ে বেমালুম লিখে যাচ্ছেন! নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। কল দিয়ে লেখা, তাও কিনা না দেখে! ইনি কে? ইনি কি মনুষ্য সন্তান, না শাপভ্রষ্ট দেবদূত?

বন্ধু আঁতকে উঠলো। "চিনিস না, ছোটবাড়িতে দেখিসনি?"

কী করে চিনবো? ছোটবাড়িতে পড়বার সুযোগ তো আমার হয়নি। জয়নারায়ণবাবু লেনের প্রাইমারি সেক্শনের ঘোড়া ডিঙিয়ে একেবারে খুরুট রোডে হাই স্কুলের ঘাসে মুখ দিয়েছি আমি। বন্ধু কানে কানে বললো, "কানাইবাবু স্যার।"

সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠেছি। চাক্ষুষ পরিচয় নেই। কিন্তু সেই দুর্মূল্যের বাজারেও বিনা আয়েসে কানাইবাবুর গাঁট্টা পয়সায় আটটা পাওয়া যায় তা বহুমুখে বার বার শুনেছি। তাঁর চিমটির মূল্যও অতি সুলভ— প্রতি পয়সায় তিনটি। মনে মনে এক বিশালবপু ভয়াবহ কানাইবাবু স্যারের ছবিও এঁকে রেখেছিলাম। নিরাপদ আশ্রয় থেকে এক দুর্দান্ত বাঘকে দেখবার আনন্দ পাচ্ছিলাম। হঠাৎ কানে এলো—"এই, ভিতরে শুনে যা।" ডাক শুনে বুঝতে দেরি হলো না যে বাঘ দেখতে এসে দুর্ভাগ্যক্রমে বাঘের খাঁচার ভিতরেই পা দিয়ে ফেলেছি। বন্ধুরা দে ছুট। কাঁদ-কাঁদ মুখে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, "আমি স্যার দেখতে চাইনি। ওরাই তো আমাকে দেখতে বললো।"

গম্ভীরভাবে মেসিন থেকে কাগজ নামাতে নামাতে কানাইবাবু স্যার বললেন, "না, তুই কি দেখতে চেয়েছিস, তোর মাথা দেখতে চেয়েছে!"

পাশে রাখা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন স্যার। তারপর কলে আর একটা কাগজ পরালেন! আমি তখন সকালে ঘুম থেকে উঠে যাদের যাদের মুখ দেখেছি তাদের সবাইকে অভিসম্পাত করছি।

"কী নাম তোর?" কোনো রকমে নিজের নামটা বলে, আমি যে নির্দোষ সেটা আবার প্রমাণ করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু চটাপট চটাপট আওয়াজ আরম্ভ হলো। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছি—স্যার নিশ্চয়ই তাঁর গাঁট্টা শানাচ্ছেন। কিন্তু নিজের মাথায় গাঁট্টা বর্ষণের কোনো অনুভূতি না হওয়ায় চোখ খুললাম। খুলেই অবাক। পৃথিবীতে যে বস্তুটি আমার সবচেয়ে প্রিয় সেই আমার নিজের নামটাই কলের মধ্যে পরানো কাগজটায় জ্বলজ্বল করছে। আমার বিস্ময়ের ঘোর পুরোপুরি কাটবার আগেই দেখি, নামের

চারধারে ফুলকাটা বর্ডার বসে গিয়েছে।

সেই পরম মূল্যবান সম্পত্তিটি নিয়ে কি বিজয়গর্বে সেদিন বন্ধুদের কাছে ফিরেছিলাম তা আজও মনে আছে। আরও মনে আছে, সেই মুহূর্ত থেকেই অন্যান্য বাঘা-বাঘা স্যারদের নিরীহ কীট-পতঙ্গ মনে হতে লাগলো। আমার মানস-আকাশে তখন মাত্র এক জ্যোতিষ্কের শোভা—সে জ্যোতিষ্ক কানাইবাবু। যুগলবাবু স্যার, হিমাংশুবাবু স্যার, মায় হেডমাস্টারমশায় পর্যন্ত কেউ কি পারেন এমন কল দিয়ে লিখতে, ফুলের নকশা কাটতে?

সেইদিন থেকেই স্যারকে আবার ধরবার জন্য অপেক্ষা করেছি। কাসুন্দের মোড়ে স্যারের সঙ্গে একদিন দেখা। হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললাম, "স্যার, আর একটা ফুলকাটা নাম লিখে দেবেন? হাতের লেখার খাতায় লাগাবো।" তিনি আমার নমস্কারে ভ্রূক্ষেপ করলেন না, কিন্তু বললেন, "এ আর কি শক্ত কাজ।"

বলেন কি। শক্ত কাজ নয়?

অবাক হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়েছি কাসুন্দে রোডের মোড়ে। আমারই চোখের সামনে দিয়ে কড়কড়ে করে কাচা সাদা হাফশার্ট ও কাপড় পরা কানাইবাবু স্যার তাঁর স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেদিন, অর্থাৎ মে মাসের সেই সন্ধেবেলায় যদি আমি লিখতে জানতাম এবং যদি কেউ আমাকে কানাইবাবুর কথা লিখতে বলতো, তাহলে আমি জোর করে বলতে পারি, আমার হাতে এমন একটা চরিত্রের সৃষ্টি হতো যাঁর কাছে বুদ্ধ, রামানুজ, শংকরাচার্য, আলেকজাণ্ডার, আকবর, নেপোলিয়ন সকলকেই ক্ষুদ্র আর অপ্রয়োজনীয় মনে হতো। এঁদের কেউ কি এমন না-দেখে কল চালাতে পারতেন? আর চালাতে পারলেও কি এমন নিশ্চিন্তভঙ্গিতে একটি বালকের অপ্রতিভ নমস্কার উপেক্ষা করে বলতে পারতেন—ও আর কি।

হায়, তখন কি জানতাম—তারপরও আমার সঙ্গে পথে ঘাটে, ইস্কুলে, ট্রামে-বাসে কতবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে; জীবন-প্রভাতের স্বপ্নমায়া আমারই জীবন-মধ্যাহ্নে হিসেবী সংসারের চাপে চৌচির হয়ে যাবে। এমন একদিন আসবে যেদিন আমি নিজেই কল চালাতে শিখবো। জানবো, টাইপিস্ট বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা সংসারের সার্থকনামা সফলদের দলে পড়েন না। নিতান্ত কিছুই যার হয় না, সে-ই শেষ পর্যন্ত টাইপ শিখে 'বাক্স' বাজাতে শুরু করে। অথচ তখন ভাবতেও পারিনি যে, একদিন বিবেকানন্দ

ইস্কুলের মাস্টার হিসেবে আমি কানাইদার লেভেলে উঠে যাবো ; ইস্কুলের সেই একই অফিস ঘরে বসে কানাইদা বলবেন, "আমরা হাতুড়ে টাইপিস্ট, তেমন সুবিধা করতে পারি না। শংকর, এটা তুমি টাইপ করো, অনেক তাড়াতাড়ি অনেক ভাল জিনিস হবে।"

কিন্তু সেসব কথা আজকের রাত্রে ভেবে কী লাভ ? সারাজীবন ধরে যিনি আমাদের হাসিয়ে এলেন, একসঙ্গে হৈ-চৈ হল্লা করলেন, তাঁর জন্যে হা-হুতাশ করলে তাঁর পরলোকগত আত্মা নিশ্চয়ই সুখী হবে না। পেঁচোয়-পাওয়া ছিঁচকাঁদুনে ছেলেদের কানাইদা মোটেই দেখতে পারতেন না। বলতেন, "কান্না-ফান্না বুঝি না বাপু। হৈ চৈ করবে, গণ্ডগোল করবে, জিনিসপত্তর ভাঙবে, গুরুজন বা মাস্টারে মারলে মাথা নীচু করে মার খেয়ে, পরের মুহূর্তে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে আবার খেলাধুলো করবে, দরকার হয় আবার ভাঙবে, তবে তো ছেলে। যারা মিন মিন করে, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদে, তাদের আমি বুঝতে পারি না বাপু।"

সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, "আপনার গাঁট্টা কি সত্যিই শায়েস্তা খাঁর আমলের চালের মতো সুলভ ?"

"এই গাঁট্টা খেয়েছিস বলেই তো ব্রেনটা তোর অতো খুলেছে, এটা বুঝিস না কেন ?" বেশি আলোচনা বা চিন্তার ধার ধারতেন না কানাইদা। তাই বললেন, "তোর সঙ্গে বকবক করে কি আমার পেট ভরবে ?"

একটু পরেই দেখি, তিনি ক্লাস ফোরের ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ইটের উইকেটের সামনে ক্রিকেট খেলছেন। কানাইদার সমবয়সী আশ্রমের কর্মীরা ডাকছেন, "কানাই, চলে আয়, ঠাকুরঘরে কাজ আছে।"

কানাইদার খেয়াল নেই, তিনি তখন একটা বল বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে, ছেলেদের বলছেন, "এ-সব কব্জির জোর আলাদা ! সারাদিন বল করেও আউট করতে পারবি না।"

নীচু ক্লাস থেকে বড় ক্লাসে উঠে যখন একটু চালাক হয়েছি, তখন অন্য সকলের সঙ্গেই জানলাম, কানাইবাবু স্যার আসলে কানাইলাল বাগ। প্রাইমারি সেকশনে পড়ান এবং উঁচু ক্লাসের ছেলেদের মাইনে জমা নেন। প্রতিমাসে ওই মাইনে দেওয়ার দিনই তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ কাজকারবার। আমাদের ইস্কুলের অফিস ঘরের কাউন্টার ছিল না। একটা জানলার ভিতর কানাইদা বসতেন, আর আমরা বাইরে থেকে জানলা গলিয়ে মাইনের বইটা তাঁর সামনে ফেলে দিতাম। চশমার কাচের মধ্যে

দিয়ে কানাইদা বিলটার উপর চোখ বুলিয়ে নেন, লাল পেন্সিলের দাগ কাটেন, এবং তারপর একটা রবারস্ট্যাম্প মেরে বিলের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে বইটা ফেরত দেন।

কারও কারও বিলটা হাতে নিয়েই কানাইদা রেগে ওঠেন। "এটা আর মানুষ হলো না। ক্লাস ফোরেও যেমন বাঁদর ছিল এখনও ঠিক তেমন রয়ে গেলো। এগজামিন ফি-র ঘরে ম্যাগাজিন ফি, ম্যাগাজিন ফি-র ঘরে পাখা-ফি বসিয়েছে। গার্জেনকে রিপোর্ট করতে হবে দেখছি।"

যাকে বললেন, সেই বেচারার মুখ তো চুন। বিল বইটা নিয়ে সে যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন কানাইদা হাসতে হাসতে বললেন, "দেখিস, মনে মনে গালাগালি করিস না যেন। শেষে চা খাবার সময় বিষম খেয়ে মরবো। সত্যিই কিছু তোর গার্জেনকে বলে দিতে যাচ্ছি না!"

লাইনে দাঁড়িয়ে, এইসব কথাবার্তা শুনে আমি ততক্ষণ ফিক করে হেসে ফেলেছি। স্যারের চোখ এড়াতে পারিনি। বললেন, "কী? দাঁত বার করে অত হাস্য হচ্ছে কেন? নিজের তো ওই কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং লেখা।"

অনেকদিন পরে এই কথা শুনে কানাইদার এক বাল্যবন্ধু বলেছিলেন, "কানাই-এর ঐ স্বভাব। মুখে রাগ করে, কিন্তু ও রাগ বুকে পৌঁছায় না। শুধু কি তাই। সব কিছুতেই একটা মজা না করতে পারলে ওর ভাত হজম হয় না। ওই যে অঙ্ক না পারলে ছোট ছেলেদের ও চোখ রাঙায়, ওটাও ওর মজা। আবার ওকে নিয়ে তোমরা মজা করো, কিছু বলবে না। বরং খুশি হবে। যার যত গুল, যত বানানো ঘটনা আর কেচ্ছা নির্ভাবনায় কানাই-এর নামে চালিয়ে দিতে পারো। এই বিবেকানন্দ ইস্কুলের হিসেবে ওর নামে যে কত মজার ঘটনা রটানো হয়েছে!"

কানাইদার বন্ধু বলেছিলেন, "একবার আমাদের ক্লাসে ট্রানস্লেশন জিজ্ঞাসা করা হলো—"মহৎ ব্যক্তিরা সাধারণত মহৎ পরিবার হইতে আসেন।" কে একজন পেছন থেকে এক মুহূর্ত চিন্তা না করে বললেন, 'Great men come from reliable source.' সবাই হো হো করে হেসে ফেললেন—কিন্তু কে বলেছে ধরা গেলো না। মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'চেম্বারসায়েবের ভাইপো এই Reliable সায়েবটি কে?' সায়েবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যখন, তখন অগতির গতি কানাই আছে। ছেলেরা হৈ হৈ করে তারই নাম করলো "Reliable source!"

বন্ধু একটু থামলেন, তারপর বললেন, "কিন্তু একটুও রাগ করতো না

কানাই। খেলাধুলোর ব্যাপারটা ধরো। ওকে ছাড়া ফুটবল, ক্রিকেট, হকি কোনো টিমই তৈরি করা যেতো না। অথচ গোল খাবার যত দোষ, হেরে যাবার যত দায়িত্ব সর্বসম্মতিক্রমে ওর ঘাড়েই চাপানো হতো। ভলি খেলায় তো একটা ভুল মারের নাম আশ্রমে 'কেনিয়ান' স্ট্রোক বলে পরিচিত।"

ছাত্রাবস্থায় ক্লাসে কানাইদা কোন বেঞ্চিতে বসতেন জানি না। কিন্তু কর্মজীবনে কখনও প্রথম সারিতে আসতেন না। অথচ, ইস্কুল এবং আশ্রমে সব কাজের সবচেয়ে গোলমেলে এবং খাটুনির অংশটুকু বেছে নিয়ে তিনি খুশি হতেন।

সংসারে এমন এক ধরনের মানুষ থাকে যারা ঠিক নুনের মতন। কোনো কিছুতেই তারা সামনে থাকে না ; অথচ যারা না থাকলে সবকিছুই বিস্বাদ হয়ে পড়ে। এরা ফিস্টিতে ময়দা মাখে, লুচি ভাজে, অথচ খেতে বসে সবার শেষে। এরা খেটে মরে, কিন্তু ধন্যবাদ কুড়োয় না। সভা-সমিতি উৎসবে তারা বেঞ্চি বয়ে নিয়ে আসে, চেয়ার সাজায়, চিঠি বিলি করে ; কিন্তু ধোপভাঙা পাঞ্জাবি পরে অতিথিদের অভ্যর্থনা করে না। নাটকে পাদপ্রদীপের অন্তরালে থেকে তারা প্রম্পট্ করে, অথচ ঢাল-তরোয়াল নিয়ে কখনও রাজা সাজে না। কেউ এদের মেডেল দেয় না, এদের নামও কাগজে ছাপা হয় না। অথচ এদের না হলে ফিস্টি হয় না, সভা হয় না, থিয়েটার হয় না—আসলে এদের না হলে জীবনই চলে না।

কিন্তু পৃথিবীর তাতে কিছু এসে যায় না। নরকুলের মনোমন্দিরে যে ঢুকতে চায় তাকে নির্ধারিত সেলামি দিতেই হবে। আর সেইজন্যেই তো আমার ভয়। বুড়ো সংসার নিষ্প্রাণ পাথরের মতো জিজ্ঞাসা করবে—যার জন্যে এতো লেকচার ছাড়ছো, কে তিনি ?

কে তিনি ? আমাকে বলতে হবে, তিনি এম-এ নন, পি-এইচ ডি নন—সামান্য ম্যাট্রিক পাশ। টাইপ জানতেন, ড্রাইভারি জানতেন, অথচ মাস্টারি করতেন প্রাইমারি সেকশনে। পৃথিবী জানতে চাইবে, জগৎকে কী দিয়েছেন তিনি ? আমাকে নতমস্তকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তখন করুণাভরে হয়তো আমাকে প্রশ্ন করা হবে, অন্তত এক-আধটা সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রকে ছোটবেলায় পড়িয়েছেন কি ? আমাকে তখনও মাথা নীচু করে থাকতে হবে।

কিন্তু সে লজ্জা কানাইদার নয়। সে লজ্জা কেবল তাদের যারা তাঁর কাছে পড়তো। সে-লজ্জা কেবল তাদের যারা তাঁকে জানতো, কাছে থেকে

দেখতো—যারা জানে আজ ভোরবেলায় তারা কী হারিয়েছে। কারণ এ হারানোর জের তো একদিনে মিটবে না। যখনই ইস্কুলে সরস্বতী পুজো হবে, মাস্টারমশায়েরা ছুটোছুটি করবেন, ছেলেরা হৈ-চৈ বাধাবে, তখনই মনে হবে, কাকে যেন তারা হারিয়েছে।

কানাইদার আর এক রূপ দেখেছি দুর্গাপূজার সময়। আশ্রমের দুর্গাপূজা আমাদের জীবনে কতখানি স্থান অধিকার করে আছে, তা যে না দেখেছে সে হয়তো বুঝবে না। আশ্রমের দুর্গোৎসবের রূপটাই যেন আলাদা। চারদিন ধরে সব কিছু ভুলে একদল আনন্দলোভী লোক দিনরাত এইখানেই পড়ে থাকে। পরিচিত-অপরিচিতের দীর্ঘ দল তখন আসে আর যায়। তারা ঠাকুর দেখলো কি না, দেখলেও প্রসাদ না নিয়ে চলে গেলো কি না, বেঞ্চিতে তাদের বসবার জায়গা আছে কি না, না চ্যাংড়া ছেলেরা সেগুলো আগাম দখল করে বসে আছে—এ সব দেখবার জন্যেই তো কানাইদা ছিলেন।

আমাদের আশ্রমে আর একটা জিনিস আছে। কখনও পুজোর জন্যে চাঁদা চাওয়া হয় না। কিন্তু বহুজনেই কিছু দিয়ে যেতে চান।

তাঁদের জন্য এবং খরচের টাকা-পয়সার হিসেব রাখবার জন্যে অষ্টপ্রহর বাক্স সামনে নিয়ে যাঁকে হাসিমুখে বসে থাকতে দেখতাম তিনি কানাইদা। রাত এগারোটার সময়েও তাঁকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখেছি—'বলা যায় না, যদি কেউ এসে পড়ে!'

তাছাড়াও আরো কত। সকালে বাদলবাবু স্যার রেগে বলেছেন, "কানাই, দেড়ঘণ্টা ধরে বসে আছি, আমরা এখনও চা পাইনি। এই তোমাদের ম্যানেজমেন্ট!" চা তৈরি বা বিতরণের দায়িত্ব তাঁর নয়, তার জন্যে অন্য লোক আছেন, তবুও দোষ মাথায় নিয়ে, অথচ রাগে গজগজ করতে করতে কানাইদা চায়ের সন্ধানে বেরোলেন।

আশ্বিনের মাঝামাঝি কোনো সোনা-ঝরা ভোরবেলায় যখন ঢাকের আগমনী আওয়াজে নস্করপাড়া লেনটা ভরে উঠবে, প্রসাদের আশায় ফুল হাতে করে কাসুন্দের লোকেরা যখন আশ্রমের লাল পথটা মাড়িয়ে টালির বারান্দায় এসে বসবেন, যখন প্যাটারসনদা নাড়ু আর চা বিলোতে আসবেন, তখনই মনে হবে কার যেন এখানে থাকা উচিত ছিল, কিসের যেন অভাব, কে যেন এখানে নেই।

বাবাকে মনে পড়ে

একসময় পুজোর ছুটির ক'দিন প্রচুর আড্ডা মারতাম। হাত-পা ছড়িয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে পরিচিতজনদের সঙ্গে অষ্টপ্রহরী গল্পের আসর বসতো। আজকাল কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে ফেলবার লোভ হয়, মনে হয় নিজেকেই ঠিকমতো জানা হলো না, আত্ম-অনুসন্ধানেও কিছুটা সময় নিয়োগ করা উচিত। এক্‌সট্রোভার্ট চরিত্রের লোক হঠাৎ এইভাবে বিনা নোটিসে ইন্ট্রোভার্ট হলে ভুল বোঝাবুঝি হয়। যাঁদের স্নেহপ্রশ্রয়ে একদিন মানুষ হয়েছি তাঁরা দুঃখ করেন, আমার স্বভাব পরিবর্তন হচ্ছে, আমি সাফল্যের নেশায় বুঁদ হয়ে পরিচিতজনদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছি।

ব্যাপারটা মোটেই কিন্তু সে রকম নয়, জীবনের অনেকগুলো পুজো অবকাশ যেমন তেমনভাবে কাটিয়ে এখন আমি একটু হিসেবী হতে চাই, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন বলবার মতো পর্যাপ্ত সময় আমার হাতে আর নেই।

আমি চাই পুজোর ক'দিন লেখার চিন্তায় বুঁদ হয়ে থাকি সারাক্ষণ, আমার যেন মুহূর্তের মুক্তি না জোটে। পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ, ঘড়ির চোখ রাঙানো নেই। কেবল মনের জানালা খোলা, দেবী সরস্বতীর চরণকমল জড়িয়ে ধরে নির্লজ্জভাবে দেহি দেহি করা ছাড়া আমার অন্য কোনও কাজ নেই। সাহিত্যের এই রহস্যটুকু কয়েক দশকের চেষ্টাতেও বুঝতে পারলাম না—কখনও চেষ্টা ছাড়াই মাথায় গল্প এসে যায়, কখনও আসে না, মা সরস্বতীর চরণে শতবার মাথা খুঁড়লেও তাঁর দয়া হয় না। পুজো মণ্ডপের ঠাকুরের মতন তিনি নিজের মধ্যেই বিভোর হয়ে থাকেন।

ভিক্ষে চেয়ে না-পাওয়ার মুহূর্তগুলোই বিপজ্জনক। নিজের সম্বন্ধে বিশ্বাস কমতে থাকে, অথচ আত্মবিশ্বাসই হলো সকল সৃষ্টির ভিত্তিভূমি। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখেও নিজেকে যিনি মুছে ফেলতে পারেন তিনিই

শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। আর আমার মতো অভাজনরা, যারা মা সরস্বতীর কারখানায় ক্যাজুয়াল শ্রমিকের কাজ করে, তারা মায়ের দৈনন্দিন দয়ার ওপরে নির্ভরশীল, পেলে ভাল, না-পেলেও কিছু বলার নেই।

যখন কৃপাভিক্ষা জোটে না তখন অভিমানী মন সামনে না এগিয়ে পিছু হটতে শুরু করে—মনের ধর্মই এই। জয় মানে এগিয়ে যাওয়া, পরাজয় মানেই পিছু হটা। পিছু হটা মানেই তাঁদের কথা স্মরণ করা যারা একদিন ছিল অথচ এখন নেই।

আমি জানি এবারেও পুজোর ক'দিন আমার মধ্যে তাঁদের পুনর্মিলন হবে। এঁরা ভিড় পছন্দ করেন না, ওপারে গিয়েও ওঁরা লাজুক। আমার হাতে অনেক সময় না থাকলে ওঁরা আমাকে জ্বালাতন করতে চাইবেন না। আমাকে বলতে হবে, ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ—এখানে আসুন, এখানে অবস্থান করুন। আমি যে আপনার 'সান্নিধ্য কামনায় ব্যাকুল। সেই সব কথা লেখা চলে না, পাঠকের ক্রীতদাস লেখকেরও কোনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে প্রাইভেসির প্রয়োজন হয়ে ওঠে। তখন করজোড়ে নিবেদন করতে হয়, আমি কলমকে অন্যত্র ফেলে এসেছি, আমি কেবল তোমারই সান্নিধ্য কামনা করি। অপ্রকাশিত অনুভূতির আনন্দলোকে আমাকে একটু স্থান করে দাও। আমি তোমার অমর্যাদা করবো না।

যাঁরা এইভাবে আসেন চুপি-চুপি, তাঁরা ভিজিটর্স বুকে সই রাখেন না, তাঁরা সম্পর্কের মানুষ হয়েও যেন সম্পর্কচ্যুত। এ এক বিচিত্র অবস্থা। আজকাল আমার প্রায়ই মনে হয় মৃত্যু যেন এক ধরনের ডাইভোর্স। যিনি আমার পিতা, মাতা, সন্তান, ভ্রাতা তাঁরা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্ন—তাঁরা যেন এখন ভূতপূর্ব পিতা, ভূতপূর্ব মাতা, ভূতপূর্ব সন্তান—ঈশ্বরের আদালত থেকে ডাইভোর্স নিয়ে আমার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়েছেন, মিলেছে মুক্তির স্বাদ।'

আমি ভাবছি, পুজোর কদিন এবার কে কে আমার স্মরণপথের ধারে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে ধন্য করবেন? মৃত্যুরূপে ডাইভোর্সের সংখ্যা তো বেড়েই চলেছে—কত লোককে এই পৃথিবীতে জানতাম, কত লোকের ভালবাসায় এই দুঃখের জীবন আমার কাছে সহনীয় হয়ে উঠেছে, কত লোকের প্রাপ্য মেটানো হয়নি। তাঁরা হিসেবের জন্যে অপেক্ষা করলেন না, চলে গেলেন নিজেরাই চিরবিচ্ছেদের ডিক্রি জারি করে। সারা বছর হাজার কাজের মধ্যে পাগল হয়ে বেশ থাকি, আমি যে শতসহস্র ডাইভোর্সের

শিকার তা মনেই থাকে না, বিপদ হয় শারদীয় শুভলগ্নে আকাশে বাতাসে যখন পুনর্মিলনের ডাক ছড়িয়ে পড়ে।

এবার পুজোয় যাঁরা আসবেন, ভাবছি তাঁদের সহজে ছাড়বো না। আমি তাঁদের ইন্টারভিউ করবো অভিজ্ঞ সাংবাদিকের স্টাইলে। যেসব প্রশ্নের উত্তর জীবিতকালে সংগ্রহ করতে পারিনি, যেসব সন্দেহ মৃত্যুকে অতিক্রম করে এখনও মনের মধ্যে বসবাস করছে তার নিরসন ঘটাবো। যেসব পাওনার হিসেব মেটানো হয়নি সেগুলোর কী ব্যবস্থা করা যায় তা জেনে নেবো। যেমন বাবাকে জিজ্ঞেস করবো, সেই টাকাটার কী হবে?

আমার বাবা, ভীষণ রাশভারি লোক ছিলেন। সারাক্ষণ জীবিকার তাগিদে ব্যস্ত হয়ে থাকতেন। মস্ত বড় সংসার, কোনও সঞ্চয় নেই, বাড়তি দায়দায়িত্ব আছে। হাতের গোড়ায় প্রলোভন অনেক, অপরের টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি সাময়িকভাবে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে। তবু বাবা প্রাণপণ চেষ্টা করতেন নিজেকে কলুষিত না করতে। এমনিতেই তো উকিলদের বদনাম, ভাল থাকলেও লোকে ভাল বলে বিশ্বাস করতে চায় না।

বাবার কাছ থেকে একবার পয়সা চেয়েছিলাম। এক পয়সা দু' পয়সা নয়, একটা আধুলি। বাবা তখন অনেকগুলো কাঁচা টাকা গুনছিলেন গোমস্তামশায়ের সঙ্গে। বাবা এক জমিদারের রিসিভার ছিলেন। আদালতী নির্দেশে।

বাবা এক মনে হাজার হাজার টাকা এবং আধুলি সিকি দুয়ানি গুনেই চলেছেন, থাক থাক করে সাজিয়ে রাখছেন, অথচ আমাকে একটা আধুলি দিলেন না। বললেন, টাকা পেলে দেবো।

ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকলো না। যাঁর সামনে এতো টাকা, টাকা গুনতে গুনতে দুটো লোক হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, তিনি কিনা বলেন, টাকা পেলে দেবো?

আমি ভেবেছিলাম গোমস্তামশায়ের কাছ থেকে একটা আধুলি চেয়ে নেবো। কিন্তু তার উপায় নেই। গোমস্তামশাই একবার আমাকে একটা আনি দিয়েছিলেন, সে নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড। আনিটা বাবাই ওঁকে ফেরত দিলেন। হুকুম হলো, বাড়িতে যাঁরা আসেন তাঁদের সঙ্গে পয়সার কোনও লেনদেন চলবে না।

আমার খুব রাগ হয়েছিল। কিন্তু বাবার ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি

গোমস্তামশায়ের সঙ্গে টাকা গুনেই চলছেন।

বাবা বললেন, "যাও, অঙ্ক কষতে যাও। আজেবাজে সময় নষ্ট কোরো না।"

কিন্তু তখন বাল্য বয়স, সময়ের মূল্য বোঝবার সময় তখনও আসেনি। তারপরের ব্যাপারটা আমাকে যথাসময়ে খুব আনন্দ দিয়েছিল। আমি চাইছিলাম, আমি যখন আধুলি পাইনি তখন বাবার কোনো ক্ষতি হোক। বাবা যেন কোনও ঝামেলায় পড়ে যান।

হলোও তাই। বাবা ও গোমস্তামশাই কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছেন না। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে বার বার খুচরো টাকার থাক গুনে যাচ্ছেন। একটা টাকা কম পড়ছে। বারবার গোনা হচ্ছে, কিন্তু হিসেব মিলছে না। বাবা এবার বকুনি লাগালেন গোমস্তামশাইকে, "তুমি নিশ্চয় জয়নগর থেকে কম টাকা এনেছো।" গোমস্তামশায় বলছেন, "আমি ওখানে তিনবার গুনেছি, পাই পয়সা পর্যন্ত ঠিক ছিল।"

অগত্যা আবার গোনা শুরু হলো। একই অবস্থা। কিছুই ফল হলো না। গোমস্তামশাই উঠে দাঁড়ালেন, কাপড় ঝাড়লেন, তবিলে হাত দিলেন, কিছুই ফল হলো না। শেষ পর্যন্ত গোমস্তামশাই বলে ফেললেন, "এখান থেকে কেউ সরিয়ে নিলো না তো?" বাবা খুব বিরক্ত হলেন। "এসব কী বলছো, বরদা? এখানে তুমি, আমি, যোগীন মুহুরি এবং শংকর ছাড়া তো কেউ নেই। আমার ছেলেকে নিশ্চয় তুমি অবিশ্বাস করো না?" গোমস্তামশাই লজ্জায় জিভ কাটলেন। "আপনার ছেলে, তাকে আমি অবিশ্বাস করবো, এমন দুর্মতি যেন কোনোদিন না হয়।"

বাবাও একমত হলেন। তাঁর ছেলে সম্পর্কে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। পড়াশোনায় মন দেয় না, কিন্তু সে অমানুষ হবে না বিশ্বাস বাবার পুরোপুরি।

"একটা টাকা বাকি থাক, পরের বার দিয়ে যাবো," গোমস্তামশাই অবশেষে বললেন। বাবা রাজি হলেন না। তিনি মাকে ডাকলেন। বললেন, "বাজার খরচের টাকা থেকে একটা টাকা দিয়ে যাও।" বাজার খরচের একটা টাকা তখন অনেক দামি, হিসেবের কড়িতে টান পড়ছে, কিন্তু উপায় নেই। কষ্ট হলো, তবু মা নির্দেশ পালন করলেন। মাকে বাবা বললেন, "এমাসে আমার দুধটা কমিয়ে দাও। হিসেবে মিলে যাবে। সামান্য একটু দুধের থেকে সম্মান অনেক বড়।"

এরপর সময় হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছে। কয়েক বছর পরে বাবা হঠাৎ অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন সেই অমৃতধামে যেখানে সন্তানদের কোনো দুঃখের কথাই পৌঁছয় না। কেন অকারণে আমরা অসময়ে পিতৃহারা হলাম সে নিয়ে সেই বাল্য বয়সে অনেক চিন্তা করেছি। কোনো একটা গল্পে তখন পড়েছিলাম, সন্তানরা কোনো অন্যায় করলে তার পাপ বাবা-মায়ের ওপর পড়ে।

মাকে জিগ্যেস করেছিলাম। মা জোর গলায় বলেছিলেন, "আমার ছেলেমেয়েরা হীরের টুকরো। তারা তো কোনো অন্যায় করেনি। নিশ্চয় গত জন্মে আমার কোনো পাপ ছিল।" আমি তখন নিরুত্তর। মায়ের সঙ্গে কখনই সোজাসুজিভাবে ভাবের আদানপ্রদান তেমন ছিল না।

এইবার পুজোর দীর্ঘ অবসরে বাবার সঙ্গে যদি যোগাযোগ হয়, তা হলে আমি ওই এক টাকার হিসেবটা মিটিয়ে ফেলবার চেষ্টা করবো। সামান্য একটা টাকা! অমৃতলোকের বাসিন্দা এতোবছর পরে সে নিয়ে হয়তো মাথা ঘামাতে চাইবেন না। কিন্তু আমাকে বলতেই হবে, "বাবা, আপনি আমাকে গ্লানিমুক্ত হতে সাহায্য করুন। সেদিন রাগের মাথায় আমিই আপনাদের চোখের আড়ালে একটা টাকা সরিয়ে নিয়েছিলাম। আমাকে সার্চ করলেই টাকাটা পাওয়া যেতো, কিন্তু আপনি আমাকে বিশ্বাস করে বসে রইলেন—হরিপদ মুখুজ্যের ছেলে আর যাই হোক অমানুষ হতে পারে না।"

বাবা, সেদিন টাকাটা সমেত ধরা পড়লে আমার জীবন কোন্ সর্বনাশা পথে প্রবাহিত হতো তা আমি এখনও কল্পনা করতে ভয় পাই।

আমাকে বিশ্বাস করে আপনি বাঁচিয়ে দিলেন। সারাজীবন যখনই কোনও প্রলোভনের সামনে পড়েছি, মনে পড়ে গিয়েছে হরিপদ মুখুজ্যের ছেলে আর যাই হোক অমানুষ হতে পারে না।

সেই টাকাটা আমি খরচ করতে পারিনি, আপনাকে ফেরত দেবারও সাহস হয়নি। আমি টাকাটা সেইদিনই জানলা দিয়ে নর্দমায় ছুড়ে ফেলেছিলাম। কেন জানি না, সমস্ত বাল্যকালটা আমি গভীর যন্ত্রণায় অতিবাহিত করেছি। আমারই অপরাধে বাবা কি অকালে চলে গেলেন? কত দিন আগেকার কথা। কিন্তু এই একটাকার হিসেব-নিকেশটা মিটিয়ে ফেলবার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে আছি। এবার পুজোয় বাবার কাছে ভয়ে ভয়ে আমি কথাটা আবার পাড়বো।

মাটির মা ও আসল মা

পাদ্য অর্ঘ্য সাজিয়ে বিশ্বভুবন যখন নানা উপচারে মাটির মায়ের পুজোয় ব্যস্ত হয়ে উঠবে তখন আমার নিজের মায়ের কথা মনে পড়বে এবার। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের সান্নিধ্য পেয়েছি, তারপর সেবার ডিসেম্বরের এক শীতার্ত সন্ধ্যায় তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। নিজের মাকে বিসর্জন দেবার পরে মা দুর্গা প্রতিবার এসেছেন। প্রথমবার ছিলাম শোকে মুহ্যমান—সেই প্রথম মাতৃহারার মাতৃপুজো।

তারপর আর এক বছর কাটলো। শোক এখন সেইরকম নির্লজ্জভাবে আমাকে আক্রমণ করে না। আবার পুজো এলো। এবার শোক ছাড়াই মাতৃস্মৃতির আনন্দময় সলিলে অবগাহন করা যাবে কয়েকদিন। হাতে থাকবে না কোনো কাজের চাপ, ঘড়িটা সরিয়ে রাখা যাবে কয়েকদিন সময়ের শাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্য। কোনো দায়দায়িত্ব নেই, স্রেফ নিজের ঘরে চুপচাপ বসে মাতৃচিন্তা। হয়তো বিশ্বজননীর আবাহন ছেড়ে নিজের জননীর এই আবাহনের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা আছে ; কিন্তু এমনও তো ভাবা যায় যে-রক্তমাংসের মাকেই পুজো করতে পারলো না সে কেমন করে. মাটির মায়ের পুজোয় নিজেকে নিমগ্ন করবে ?

জননী বলতে অনেকেরই সামনে এক চওড়া লালপেড়ে শাড়িপরা স্নেহময়ীর ছবি ভেসে ওঠে, যাঁর হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর—দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। যাঁরা এমন ভাবতে পারেন তাঁরা ভাগ্যবান—তাঁরা পিতৃদেবকেও অনেকদিন পেয়েছেন। আমার মাতৃমূর্তির কোথাও রঙ নেই—একটি সাদা থান কাপড় তাঁর যোগিনী রূপকেই প্রধান করে তোলে। স্বামীর অকালমৃত্যুতে আমার মা শুধু আমার জননী নন, পিতাও বটে—সংসারের সমস্ত অকল্যাণ থেকে সন্তানদের রক্ষা করার সম্পূর্ণ দায়িত্বটুকুই তাঁকে তুলে নিতে হয়েছে নিজের স্কন্ধে। নিরাশ্রয়,

নির্বান্ধব, অর্থহীনা, গৃহবধূর স্কন্ধে এমন দায়িত্ব ঈশ্বর কী করে চাপিয়ে দেবার যুক্তি খুঁজে পেলেন তা একমাত্র তিনিই জানেন।

দিকে দিকে অসুরমর্দিনী জননীর পুজো চলছে মহাসমারোহে, কিন্তু বাঙালির ঘরের জননীর অবস্থা ক্রমশই ম্লান হয়ে আসছে। সংবাদপত্রে বধূনিপীড়নের সংবাদ বারবার প্রকাশিত হয়ে আমাদের মনে ভ্রান্তি সৃষ্টিও করছে—এদেশের বয়োজ্যেষ্ঠা জননীরা জীবনের অপরাহ্নবেলায় যেভাবে জীবনযাপন করছেন তা আমাদের গর্বের কারণ নয়। একসময় মাতৃভক্ত হওয়ার মধ্যে গর্ব ছিল। এদেশের শ্রেষ্ঠ মানবগণ ছিলেন গর্ভধারিণী জননীর পূজারী—বিদ্যাসাগর থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত কেউ এর ব্যতিক্রম নন। সন্ন্যাসী হয়ে সর্বস্বত্যাগ করেও বিবেকানন্দ তাঁর জননী-চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারেননি ; মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করছেন সমস্ত কাজ থেকে ছুটি নিয়ে কিছুদিন মাতৃসেবার। সংসারত্যাগী শঙ্করাচার্যও নাকি দুর্জয় সাহসে মাতৃসেবা করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর দু' বছর আগে।

কিন্তু পশ্চিমা মনস্তাত্ত্বিকরা এখন অন্য কথা বলছেন। তাঁদের ভাবনাচিন্তা এদেশেও বিভ্রান্তি ঘটাতে শুরু করেছে—মাতৃভক্ত হওয়াটা এখন আর ফ্যাশনেবল নয়। কেউ এখন গর্ব করে বলতে সাহস পায় না, আমি মায়ের সন্তান, জননীর আশীর্বাদই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আমি মাতৃআজ্ঞা অবহেলা করি না। আমরা ক্রমশই সায়েব হয়ে উঠছি—আমরা আর মাতৃপূজারী বলে গর্ব বোধ করতে পারবো না। এই চিন্তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফলও দেখছি অনেক সংসারে—মা আজ আর বয়োপ্রাপ্ত সন্তানের মহামূল্যবান সম্পদ নয়, মা এখন প্রায়ই একটি দায়িত্বের বোঝা— যে দায়িত্বের মধ্যে বড়জোর কর্তব্যবোধের তাড়না আছে, কিন্তু ভালবাসার তপ্ত স্পর্শ নেই। অথচ এই ক'বছর আগেও তো মায়েরা প্রায়ই আমাদের অকালে ছেড়ে চলে যেতেন, আমরা মাকে ভালবাসার সুযোগই পেতাম না। বিজ্ঞান আজ বাঙালির ঘরে নতুন আশীর্বাদ এনেছে, মায়েরা এখন দীর্ঘজীবী হচ্ছেন, কিন্তু দীর্ঘ জীবন যদি ক্রমশই বিড়ম্বনার কারণ হয়, সন্তানের সান্নিধ্যসুখ ও উষ্ণ ভালবাসা থেকে তাঁরা যদি সুদূরে অবস্থান করেন তা হলে বেশিদিন বেঁচে থাকার কী লাভ ?

হয়তো আমাকে একটু সেকেলে মনে হচ্ছে—গৃহবধূর নির্যাতন সম্পর্কে আলোচনা করাটাই এখনকার ফ্যাশন, বৃদ্ধা বিধবা মায়ের অবস্থা পর্যালোচনা করার পরিবেশ এখন নয়। তবু কেন জানি না, প্রায়ই মনে

হয়, প্রকৃত সুখের সংসারে জায়া ও জননী দু'জনেই সমান সম্মানের সঙ্গে বিরাজ করতে পারেন, সোনার সংসারে কারও অবহেলা অথবা অপমান হয় না।

মাটির মায়ের পুজোর জন্যে লাগে নানা উপচার। ঘরের মায়ের জন্যে ঘরের ডালভাতই যথেষ্ট, বাড়তি কিছুই প্রয়োজন হয় না, একটু ভালবাসার উষ্ণ স্পর্শ ছাড়া। "মা কেমন আছো?" বললেই মায়ের বুক জুড়িয়ে যায়, তোমার ভাল হলেই তাঁর সুখ, তোমার সাফল্যই তাঁর স্বর্গ। এ-এক আশ্চর্য সৌভাগ্যের চাবিকাঠি, কত সহজেই আমরা আনন্দের এই স্বর্গলোকে পৌঁছতে পারি, অথচ সেখান থেকে আমরা স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করছি।

আমার মায়ের শেষ বয়সে আমি বলতাম, তোমার কষ্টের এবং দুঃখের দিনের অবসান হয়েছে, এবার সংসারের বাইরে কিছু সুখের সন্ধান করো। মা আমার কথা বুঝতে পারতেন না, ছেলেমেয়েদের সুখদুঃখের বাইরে যে অন্য কোথাও আনন্দ থাকতে পারে তাও তাঁর অজানা ছিল।

যিনি স্বর্গাদপী গরীয়সী তাঁকে সন্তুষ্ট করা কিন্তু মোটেই শক্ত নয়। স্বল্পে সন্তুষ্ট বলে শিবের সুনাম আছে, কিন্তু অভিজ্ঞরা জানেন, বিধবা জননীর সন্তুষ্টি সাধারণত আরও সহজ। না, পার্থিব কোনো সুখের জন্য তিনি লালায়িত নন—কয়েকটি পাড়হীন কাপড়, নিরামিষ অন্ন এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে একটু আশ্রয় ছাড়া তাঁর কীই বা প্রয়োজন আছে? আমার মায়ের ক্ষেত্রে বাড়তি প্রয়োজন ছিল একটু পান এবং জর্দা। তাঁর যতকিছু বিলাসিতা ছিল ওই পানের সাইজের ওপর—পান ছোট হলে তাঁর বকুনি অবধারিত।

মায়ের পুজোর জন্য যা প্রধান প্রয়োজন তা পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না, তার নাম ভালবাসা। এই বস্তুটি কী তার বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ দাখিল নিষ্প্রয়োজন—চোখ বুজে নিজেকে জিজ্ঞেস করলেই ভালবাসার নানা রূপ যে-কেউ জানতে পারে। অনেক পরিবারে পুত্র এবং পুত্রবধূ অত্যন্ত সহজেই এই কাজটি সেরে যাচ্ছেন, অথচ গোপনে কারা প্রচার করে দিয়েছে বাঙালি সংসারে শাশুড়ি-বধূ সম্পর্ক নাকি বিষময়। আমার মনে হয়, বাঙালিরা ম্যানেজমেন্টে দক্ষ নন, ম্যানেজমেন্টের নীতি তাঁরা সংসার পরিচালনায় প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সাংসারিক অশান্তি বলতে সচরাচর আমরা যা লক্ষ্য করি তা ভালবাসার অভাব নয়, ম্যানেজমেন্টের ব্যর্থতা।

শাশুড়ি-বিজয়িনী কয়েকজন মধ্যবয়সিনী বধূর সঙ্গে আমার পরিচয়

আছে। তাঁরা বলেন, সংসারে মায়ের পিছনে কত টাকা ঢালা হচ্ছে এইটাই বড় কথা নয়, ভালবাসার প্রকাশটাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। অথচ কে না জানে, বাঙালি সংসারে যে মান-অভিমানের পালা চলে তার অন্যতম কারণ আমার মনের ভাব প্রকাশ করতে দক্ষ নই, আমরা নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে অপরপক্ষের বিস্তার প্রত্যাশা করি।

মাকে সুখী করার সবচেয়ে সহজ উপায় নিজে সুখী হওয়া। ছেলের ভাল হচ্ছে—এর থেকে ভাল টনিক মায়ের জন্যে তৈরি হয়নি। আগেকার দিনে ছেলে কত মাইনে পায় তা জানবার অধিকার বাবা-মায়ের ছিল। এখন কেউ-কেউ তা লুকিয়ে রাখে। অথচ আমি দেখেছি, ছেলের মাইনে বেড়েছে শুনলে সবচেয়ে যিনি সুখ পান তিনি হলেন বাবা-মা, বাড়তি টাকায় ভাগ বসাবার জন্যে তাঁরা উন্মুখ হয়ে আছেন এ-কথা ভাববার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেই।

পুজো আসবার অনেক আগে থেকেই মা আমাকে মনে করিয়ে দিতেন, 'এবার কেনাকাটা শুরু করো।' লেখার হাঙ্গামায় প্রায়ই এ-কাজে নেমে পড়তে দেরি হয়ে যেতো এবং মায়ের বকুনি খেতে হতো। মায়ের ধারণা ছিল, পুজো যত কাছে এগিয়ে আসে দোকানদাররা তত দাম বাড়িয়ে দেয়!

পুজোতে কী কিনতে হবে তার তালিকা মায়ের কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু নিজে তিনি কলম ধরবেন না। জ্যেষ্ঠপুত্র তার কাগজকলম নিয়ে অনুলেখকের কাজ না-করা পর্যন্ত তাঁর সন্তোষ ছিল না। এই তালিকায় দু'জনের নাম থাকতো না—তাঁর নিজের এবং জ্যেষ্ঠপুত্রের। পুত্র যে পয়সা খরচ করে নিজের জন্যে কিছু কেনবার পাত্র নয় তা তিনি জানতেন বলেই একদিন হঠাৎ দুপুরে বেরিয়ে পড়তেন নিজের অর্থে বড়ছেলের ধুতি কেনবার জন্যে। এবং পুত্রকেও মায়ের কাপড় কেনবার জন্যে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার অন্তত বাজারে ছুটতে হতো। এই কাপড় কেনবার সুবিধে অনেক—কারণ বিধবার কাপড়ের রঙ পাল্টায় না, স্টাইলেরও পরিবর্তন হয় না। শুধু প্রতি বছর দাম বাড়ে। এই দামের ব্যাপারটা একটু কমিয়ে না বললে উপায় ছিল না—মায়ের উদ্বেগ বেড়ে যেতো, এতোবড় সংসারের ক্রমবর্ধমান খরচ কীভাবে ছেলে বহন করবে ভেবে তিনি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন।

এ-নিয়ে কেউ-কেউ মুখটিপে হাসতো। এখন এইসব দুশ্চিন্তা নিয়ে হৈ-চৈ বাধাবার লোক আমার ঘরে নেই, আমাকে থান কাপড় কিনতে দোকানে যেতেও হবে না। তবু ছোটবেলার একটা দৃশ্য মনে পড়ে যাচ্ছে। বাবার

অকালমৃত্যুর পরে সাতটি নাবালক সন্তান নিয়ে অথৈ জলে পড়ে গিয়েছিলেন মা। তখনও জীবনবীমার টাকা হস্তগত হয়নি। যাদের কোনোরকমে দিন কাটে তাদের আবার পুজো কী? গোবরডাঙার একটা ছোট্ট আমবাগান জমা দিয়ে কয়েকটা টাকা আসবে এবং সেই টাকায় সবচেয়ে ছোট যারা তাদের কারও জামা এবং কারও হাফপ্যান্ট হবে এই ঠিক করে রেখেছেন মা। প্রতিদিন ডাক-পিওনের হাত থেকে মানি অর্ডার নেবার জন্যে মা অপেক্ষা করেন, কিন্তু তার দেখা নেই।

অবশেষে ষষ্ঠী এলো, তখনও জামাকাপড় না-হওয়ায় আমার ছোট ভাইদের সে কী কান্না। অবশেষে সপ্তমীর ভোরবেলায় মা আমার হাতে কয়েকটা টাকা তুলে দিলেন, ছোট ভাইবোনের জামার জন্যে। আমার নিজেরও তখন বয়স বেশি নয়। মনে আছে, সপ্তমীর দিনে দোকানে ঢুকতে বেশ লজ্জা-লজ্জা করছিল। বিশ্বসংসার যেন সন্দেহ করছে, আমরা টাকা জোগাড় করতে পারিনি বলেই সপ্তমীর আগে দোকানে আসতে পারিনি, অথচ আমরাও সেই দলে ঢুকতে চাই যারা সময়ের অভাবের জন্যেই শেষমুহূর্তে দোকানে ঢোকে। কেনাকাটা হলো, কান্নাকাটি থামলো এবং মা অবশেষে সন্তানদের মুখে হাসি ফেরাতে পেরে নিজেও শান্ত হলেন। আমি মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, গোবরডাঙার বাগানের টাকা কবে এলো? কিন্তু মা কিছুই বলেননি, প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলাম কিছুকাল পরে। নাবালক হলেও তখন আমি রুজিরোজগার শুরু করেছি। একবার একটা বাড়তি কাজ ধরে সারারাত জেগে আমি আচমকা তিরিশ টাকা হাতে পেয়ে গেলাম। যা প্রত্যাশার মধ্যে ছিল না তা পেয়ে আমার খুব আনন্দ, এবং তা আমার মায়ের মধ্যেও সংক্রামিত হলো। আমার ভীষণ ইচ্ছে, মায়ের জন্যে কয়েকটা কাপড় কিনে ফেলি। তখন মায়ের কাপড়ের খুব অভাব। কিন্তু মা বললেন, "কাপড় পরে হবে, তুই বরং আমার সোনার বালাটা অমুক বাবুর কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আয়।"

মা যে কবে গহনা জমা দিয়ে টাকা ধার করেছেন তা আমার জানা ছিল না। যিনি ধার দিয়েছিলেন, তিনিই বললেন, "সেবার সপ্তমীর দিনে ভোরবেলায় তোমার মা হাতের বালা জমা দিয়ে টাকা নিয়ে গেলেন। মায়ের পুজোর দিনে বন্ধক দিতে নেই তোমার মাকে বললাম, তিনি শুনলেন না।"

এর পরে আমাদের দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। পুজোর সময়ে আমাদের প্রত্যেক প্রিয়জনেরই জামাকাপড় হয়, কিন্তু প্রতি সপ্তমীর দিন ভোরবেলায় আমি দেখতে পাই, আমার সহায়সম্বলহীন বিধবা মা নিজের হাতের বালাটি গোপনে বন্ধক রেখে ছেলেদের পুজোর জামা কেনবার টাকা সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরছেন।

মাটির মায়ের পাশাপাশি রক্তমাংসর মাকে বসাবার জন্যে আমার মতো অভাগার প্রাণ ছটফট করে। যাঁরা এখনও অভাগা হননি তাঁরা এই সুবর্ণসুযোগ হাতছাড়া করবেন না।

আমার পুজো

বেশ বুঝতে পারছি, এবার পুজোয় সুবোধ রায় আমাকে জ্বালাবেন। গতবার পুজোয় কয়েকদিন ধরে শুধু মায়ের কথা ভেবেছিলাম। কত দুঃখের মধ্যে তিনি আমাদের সারাক্ষণ রক্ষে করবার চেষ্টা চালিয়েছিলেন, কী অসীম সাহসে তিনি বিপদের বৃত্রাসুরকে দূরে সরিয়ে রেখে আমাদের মানুষ করেছিলেন তা সেই ছোটবেলায় ঠিক বুঝতে পারিনি, আর জীবন সায়াহ্নে দেবীদুর্গার উপাসনাকালে দুর্গতিনাশিনী দেবীর সঙ্গে আমার গর্ভধারিণী জননীর কোনও পার্থক্য দেখতে পাই না।

চোখ বুজলে আমার মাকেই দশভুজা দুর্গার মতো দেখতে পাই। শুধু একটি মাত্র পার্থক্য, মৃত্তিকার মূর্তিময়ী লাল রঙে বিভূষিতা, তাঁর সর্বাঙ্গে নানা উজ্জ্বল সমারোহ, আর আমার মা বিষণ্ণ বৈধব্যের প্রতিমূর্তি। একটি সাদা থান ধুতি পরে তিনি মাত্র দুটি হাতেই দশভুজার বিপুল বিক্রমে সমস্ত বিপদ থেকে আমাদের মতো কয়েকটি শিশু ও বালককে রক্ষা করছেন।

দশপ্রহরণধারিণী জননী দুর্গাকে বৈধব্যের বেশে কল্পনা করাও হয়তো

অন্যায়, কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও শুভ্রবসনা অলঙ্কারবিহীনা সেই যোগিনী মূর্তিকে আমি মন থেকে বিদায় করতে পারি না। বহুদিন আগে সংসার অনভিজ্ঞ একজন সন্ন্যাসীর রচনায় যা পড়েছিলাম, অথচ প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারিনি, তাই সেবার পূজার চারদিন আমাকে সারাক্ষণ জ্বালিয়ে গেলো। "সেই সর্বমহিমময়ী, যিনি আমার শরীর দিয়াছেন তিনি কোথায়? নয় মাস যিনি আমাকে তাঁর শরীরে ধারণ করিয়াছেন তিনি কোথায়? কোথায় তিনি যিনি আমার প্রয়োজন হইলে বার বার জীবন দিতে প্রস্তুত? কোথায় তিনি আমার প্রতি যাঁহার স্নেহ অফুরন্ত?"

পুজোর সময় মা চিরকালই দায়িত্বের বাড়তি বোঝা বহন করেছেন। বিবাহের পূর্বে তিনি ছিলেন অনেকগুলি সমর্থা অথচ অবিবাহিতা কন্যার একজন। আমার বদমেজাজি দাদু অফিসে এক দুর্বিনীত ইংরেজ নন্দনকে চপেটাঘাত করে জাতীয় কর্তব্য পালন করলেও কর্মহীন অবস্থায় নিজের সন্তানদের প্রতি প্রাথমিক কর্তব্যও পালন করতে পারেননি। দ্বিতীয় পক্ষের সংসারে এসেও পুজোর সময় মা কখনও পরিপূর্ণ আনন্দ পাননি। যখন সকলের খরচ বাড়ে তখন বাবার রোজগার কমে যেতো, পুজোর নাম করে আদালত অনেকদিন বন্ধ এবং উকিলদের আয়ও থাকে না। তৃতীয় পর্বে তো কথাই নেই—তখন পূজা আছে, ছেলে-মেয়েদের বায়না আছে, কিন্তু স্বামী নেই এবং উপার্জনের পথ নেই। সামান্য যা কিছু সঞ্চয় ছিল তা সেবার ব্যাঙ্ক ফেল করে নিঃশেষ হলো। তবু মা ছিলেন সত্যিই লক্ষ্মীস্বরূপা, প্রতি পুজোয় আমাদের কিছু নতুন দিয়েছেন। একবার আমাকে জামা দিতে না পেরে গেঞ্জি দিয়েছিলেন, আমার মনে আছে।

আমি তখনও দুঃখের কথা কিছুটা বুঝতাম। মনে মনে ভাবতাম, আর কয়েকটা দিন যাক, আমিও অনেক রোজগার করবো এবং মায়ের কোনও দুঃখ রাখবো না। আমি কল্পনা করেছিলাম টাকা পেয়ে চুপি চুপি দোকানে গিয়ে মায়ের জন্য একটা ঝলমলে বেনারসি শাড়ি কিনে এনে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবো। মূর্খ আমি! যখন আমার উপার্জন ক্ষমতা হলো তখন বুঝলাম সন্তান যত অর্থই রোজগার করুক, বিধবা মাকে রঙিন বেনারসি পরাবার সামর্থ্য তার কোনওদিন হবে না।

তবে এই পুজোর বাজারের ব্যাপারে মার সঙ্গে আলোচনা করে এবং তাঁর ওপর সমস্ত দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে পরবর্তী জীবনে আমার ভীষণ আনন্দ হতো। জীবনের প্রধান অংশ যে-সুখ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন

তার কিছুটা ফেরত পেয়ে মায়ের আনন্দেরও অন্ত থাকতো না।

নিজের এই মাকেই আমরা নিজের ঘরে পুজো করতে, আদর করতে দ্বিধা করি। আনন্দময়ীর আনন্দ-উৎসবে যে নিজের মাকে প্রণাম করার সুযোগ পায় তার থেকে ভাগ্যবান এ-সংসারে কে আছে? অপূর্ব, স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা এই আসল মা-ই তো বিশ্বজননী। "আমাকে পৃথিবীতে আনিবার জন্য তিনি তপস্বিনী হইয়াছিলেন। আমি জন্মাইব বলিয়া তিনি বৎসরের পর বৎসর তাঁহার শরীর-মন, আহার-পরিচ্ছদ, চিন্তা-কল্পনা পবিত্র রাখিয়াছিলেন। ...জননীকে কেন পূজা করিতে হয়। কারণ তিনি নিজেকে পবিত্র করিয়াছেন। পবিত্রাস্বরূপিণী হইবার জন্য তিনি দুশ্চর তপস্যা করিয়াছেন।"

বাবার অকালমৃত্যুর পর কোনও রকম আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও প্রায় সম্বলহীন অবস্থায় মা যখন দশভুজার মতো তাঁর আটটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে রক্ষা করছেন তখন তাঁর ভূমিকার গুরুত্ব যে সম্যক উপলব্ধি করিনি, তা এখন স্বীকার না-করলে অপরাধ হবে। মা যখন অসাধ্য সাধন করে চলেছেন তখন আমরা ভেবেছি এই তো স্বাভাবিক, মা দেখবে না তো কে দেখবে? আমাদের সমস্ত কিছুর দায়িত্বই তো তাঁর!

এইভাবে সময় কেটেছে। আমার মা স্বার্থশূন্য সর্বংসহা হলেও সন্তানদের প্রতি নিত্যক্ষমাশীলা ছিলেন না। শাসনেও তিনি পারদর্শিনী ছিলেন। পরিণত বয়সেও তাঁর কত বকুনি যে খেয়েছি।

মায়ের প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে আমার তেমন জ্ঞান হয়নি, যতদিন না আমার সুবোধ রায়ের সঙ্গে আকস্মিকভাবে দেখা হলো। এবার পুজোয় তিনি যে নিশ্চয় হাজির হবেন, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। সুবোধ রায় অনেকদিন ইহলোক ত্যাগ করেছেন, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। যাঁরা অনেক দূরে সরে গিয়েছেন পুজোর ক'দিন তাঁরাই তো আমার কাছে এসে হাজির হন। আমাকে নিয়ে যান সেইসব দিনে যা একদিন আমি অতিক্রম করে এসেছি, অথচ যা পার হওয়া সহজ ছিল না। পুজোর সময় আজকাল তাই আমি বাড়ি থেকে বেশি বার হই না, ঘরে প্রচুর ভিড়ও জমতে দিই না, যাঁরা দূরে রয়েছেন তাঁরা যাতে নিঃশব্দে কাছে আসতে পারেন।

আমার প্রথম বই 'কত অজানারে' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হবার আগে চুঁচুড়ার সুবোধ রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয়ই ছিল না।

আমার লেখা বেরোচ্ছে, পরিচিতজনরা উৎসাহ দিচ্ছেন, আমি জীবনে প্রথম আত্মবিশ্বাস অর্জন করছি। স্বীকৃতি লাভের ঊষাকালে সে এক মধুর লগ্ন। আমি তখন চৌধুরীবাগান লেনের এক অবিশ্বাস্য সর্পিল গলির শেষ প্রান্তে থাকতাম, স্রেফ ঠিকানার জোরে যেখানে কাউকে খুঁজে বার করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

সেইখানেই শনিবারের এক উত্তপ্ত অপরাহ্ণে প্রচণ্ড জোরে কড়া নাড়া আরম্ভ হলো। বলা বাহুল্য আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক কলিং বেল তো দূরের কথা ইলেকট্রিকও ছিল না। জোরে কড়া নাড়ায় লেখা ছেড়ে বাইরের ঘরে এলাম এবং দরজা খুলে দেখলাম একজন ছোট্ট সাইজের রোগা বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে তাঁর আধময়লা পাঞ্জাবি এবং ধুতি ও পায়ে একটা ভারী শু। মাথার চুলগুলো ছোট করে কাটা।

ভদ্রলোক ছাতিটি বগলে রেখে সুগম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি অমুক নম্বর এবং অমুক কি এখানে থাকে? আমিই যে অমুক এই বলতেই ভদ্রলোক তিড়িং করে ভিতরে ঢুকে এলেন এবং জুতো সমেত ঘরের তক্তপোষে উঠে বসলেন। দারুণ রোদে ভদ্রলোক যে প্রচণ্ড ঘেমেছেন তা আমি বুঝতে পারছি।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে একবার মাত্র তাকালেন, তারপর বললেন, "অনেক কষ্টে দেশ পত্রিকার আপিস থেকে ঠিকানা জোগাড় করেছি।"

তারপর আবার হুমকি ছাড়লেন, "মা আছেন?"

আমি বললাম, "মা রান্নাঘরে রয়েছেন।"

"ডাকো, ডাকো," তড়িৎ-ঘড়িৎ নির্দেশ।

ভিতরে গিয়ে মাকে খবর দিলাম, "একজন অদ্ভুত লোক এসেছেন, যিনি তোমাকে ডাকছেন।"

"মা রান্নাঘরের কাজ শেষ করে বাসন মাজছেন। আসবেন এখনই," বলতে বলতে বাইরের ঘরে গিয়ে দেখি ভয়ানক অবস্থা। ভদ্রলোক ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বোধহয় বুকের যন্ত্রণা হচ্ছে।

আমি কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না। ভদ্রলোক তখনও যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বলছেন, "মা কোথায়? মাকে ডাকো।"

মা এবার এলেন। তাড়াতাড়ি ভদ্রলোকের পাঞ্জাবিটা খুলিয়ে মাথায় একটা বালিশ দিলেন। তারপর দুখানা হাতপাখা নিয়ে দু-জনে খুব জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগলাম। একটু পরে মা খাবার জল আনলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, "একটু জল খাবেন?"

ভদ্রলোক একটু জল খেলেন। তারপর ইঙ্গিতে মাকে পাখা টানা বন্ধ করে আমাকে হাওয়া চালাতে বললেন।

প্রায় মিনিট কুড়ি পরে ভদ্রলোক একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন। এবং মার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হঠাৎ তিড়িং করে উঠে পড়ে মাকে প্রণাম করলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম সুবোধ রায়। চুঁচুড়ায় থাকি। লেখা পড়েই সেখান থেকে সোজা গিয়েছি চিৎপুরে বর্মণ স্ট্রিটে দেশ-এর আপিসে। সেখান থেকে ছুটে এসেছি এই হাওড়ায়। বাড়ি খুঁজতে অনেক সময় লেগেছে।"

জানা গেলো আমার অনুরাগী প্রথম অপরিচিত পাঠকটির ডাইলেটেড হার্ট, রক্তের উচ্চচাপ, প্রবল হার্নিয়া এবং নানাবিধ ব্যাধি।

মা ততক্ষণে কয়েকটা বাতাসা এবং একটু কুঁজোর জল আনতে গিয়েছেন। আমি ভাবলাম, এইবার ভদ্রলোক বোধহয় সুস্থ হয়ে আমার সঙ্গে কিছু সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করবেন। কিন্তু সে রকম কোনও আগ্রহ নেই। মাকে দেখার জন্যে সুবোধ রায় অধীর হয়ে উঠেছেন।

মা এবার এলেন। সুবোধ রায় বললেন, "মা, আপনি বসুন। আপনার ছেলে ভাবছে, তাকে দেখতে আমি এই রোদ্দুরে প্রাণ হাতে করে এখানে এসেছি। লেখকদের দেখে কোনও লাভ নেই। ওদের পরিচয় ওদের লেখায়। গাছের পাতার নমুনা দেখে আমার মাথায় মা ভূত চাপলো আমি আসল গাছটাই দেখবো। তাই ছুটে এসেছি।"

মায়ের সঙ্গে গল্প করতে বসলেন সুবোধ রায়। আমাকে ছুটি দিয়ে দিলেন, ইচ্ছে করলে আমি ওপরে গিয়ে নিজের লেখা চালাতে পারি।

কিছুক্ষণ পরে আবার ডাক হলো আমার। সুবোধ রায় বললেন, "আমি চালাক লোক! পাতা দেখে কখনও সন্তুষ্ট হই না, চান্স পেলেই আসল গাছটা দেখে নিই। আমার ইচ্ছে পূরণ হলো। আমি চলি, এখনই ট্রেন ধরতে হবে।"

এই বৃদ্ধ অসুস্থ অথচ প্রাণবন্ত সাহিত্যরসিক সুবোধ রায়ের সঙ্গে মায়ের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। চুঁচুড়ার সুবোধবাবু আমাকে পাত্তাই দিতেন না, খোদ গাছের সঙ্গেই সাহিত্য সম্পর্কে নানা কথাবার্তা বলে বিদায় নিতেন। সুবোধবাবু বলতেন, "লেখার পূর্ণ রসাস্বাদন করতে হলে লেখকের

জীবনকে জানা চাই যারা বলে তারা বোকা, লেখা যদি সত্যিই বুঝতে চাও, তাহলে লেখকের মাকে জানো।"

বেশ কয়েক বছর ধরে মায়ের সঙ্গে সুবোধবাবুর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। আমার একটা বদঅভ্যাস, আমি অসমাপ্ত অবস্থায় পাণ্ডুলিপি কাউকে দেখাতে চাই না। কেন জানি না, ভীষণ লজ্জা লাগে এবং অস্বস্তি হয়।

সে সময় চৌরঙ্গী লেখা চলছে। লেখাটা বড্ড বেশি সময়ও নিচ্ছে। মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে অথচ লেখা এগোচ্ছে না। সুবোধ রায় মাঝে মাঝে এসে লেখার খোঁজখবর নেন। সেবার ষষ্ঠীর দিন সকালে সুবোধ রায় তাঁর অসুস্থ শরীর নিয়ে চুঁচুড়া থেকে হাওড়ায় হাজির হলেন। সুবোধ রায় পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আমার স্বভাবের কথা জানেন।

মায়ের সঙ্গে তাঁর কীসব কথাবার্তা হলো। তারপর মা আমাকে ডাকলেন। "সুবোধবাবুর শরীর খুবই অসুস্থ। পুজোর দিন সকালে একটুখানি লেখা শোনবার আশায় বেচারা কোথা থেকে ছুটে এসেছে, অথচ ডাক্তারের নির্দেশ শুয়ে থাকার। আমাকে বলছেন, আপনি ছেলেকে বলে দিন। তা হলে ও আমাকে অন্তত একটা চ্যাপ্টার পড়তে দেবে।"

মহাষষ্ঠীর দিন। মায়ের নির্দেশ অমান্য করতে পারলাম না। চৌরঙ্গীর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে বাইরের ঘরে নেমে এলাম। আমার মুখে বোধহয় একটু বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল। সুবোধ রায় তখন বালিশে মাথা রেখে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে রয়েছেন। পাশেই রয়েছে এক প্লেট হালুয়া।

মা বললেন, "তুমি এবার পড়ে দেখো ও কী লিখছে। তার আগে হালুয়াটা খেয়ে নাও।"

সুবোধ রায় হুঙ্কার ছাড়লেন, "মায়ের তৈরি হালুয়ার অবশ্যই ফার্স্ট প্রেফারেন্স। তারপর লেখকের পাণ্ডুলিপি।"

সেদিন খুব মন দিয়ে তিনি একটা পরিচ্ছেদ পড়তে লাগলেন। আমি এই দুঃসহ অবস্থার সামনে বসে থাকতে পারলাম না। ওপরে চলে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে মা আমাকে ডাকলেন। নেমে এসে দেখি, আমার পাণ্ডুলিপিটা তক্তপোষের ওপর পড়ে রয়েছে।

মা বললেন, "হ্যাঁরে, তোর নতুন বইতে কী লিখেছিস? ভদ্রলোক লেখা পড়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নিজের ছাতাটি নিয়ে চলে গেলেন। তোকে ডাকতেও বললেন না।"

এর পর সুবোধ রায় আর কখনও আমাদের বাড়িতে আসেননি। আমার 'চৌরঙ্গী' যখন প্রকাশিত হলো তখন তিনি ইহলোকে নেই।

মায়ের কথা মনে পড়লেই আমার সুবোধ রায়ের কথা মনে পড়ে যায়। আমার কেমন যেন আশঙ্কা, এবার পুজোয় সমস্ত পৃথিবী যখন আনন্দে মত্ত হবে, যখন চার দিনের অবিচ্ছিন্ন অবসর পড়ার ঘরে আমাকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ করে তুলবে, তখন সুবোধ রায় আবার আসবেন এবং গাছের পাতা দেখে সন্তুষ্ট না-হয়ে খোদ গাছেরই খোঁজখবর করবেন।

সাগরসঙ্গমে

অনেকদিন পরে আবার পিছন ফিরে তাকাবার নির্দেশ দিয়ে সাগরদা আপনি আমাকে বেশ বিপদে ফেলে দিলেন।

যা একদিন নিয়ত আয়ত্তের মধ্যে ছিল অথচ আজ যা কেবল স্মৃতিমাত্র তা নিয়ে নিজেকে আবার বিভোর করতে হলে কষ্ট হয়, সাগরদা। গীতার শ্রীকৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে দুনিয়ার বড় বড় লেখকদের জীবন দেখুন, আপাত অন্তরঙ্গতার আড়ালে কোথায় দূরত্ব ছড়িয়ে রয়েছে। যাঁরা এ-সংসারে বড় হয়ে আসেন এবং বড় কাজে লিপ্ত থাকেন তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ বিশেষ একটা ধ্রুবের দিকে, সেই কাজ ছাড়া এঁদের জীবনে সত্যিই কিছুই নেই। এমনকি দারাপুত্রপরিবার তুমি কার কে তোমার? যখন সাহিত্যপথে প্রথম যাত্রা শুরু করেছিলাম, তখন এই মানসিকতাকে ভীষণ নিষ্ঠুর মনে হতো। ভাবতাম নিজের কেরিয়ারের জন্যে সব কিছু বিসর্জন দিতে রাজি যে সে আবার লেখক হবে কী করে? কী রকম একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল, একমাত্র ভাল মানুষরাই ভাল লেখক হতে পারেন।

কিন্তু কুড়িবছর বয়স·থেকে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে (দেশ পত্রিকার দাক্ষিণ্যে) যেসব দৃশ্য দেখলাম তাতে পরিণত বুদ্ধি হতে প্রায় চার দশক

লেগে গেলো, যা হতে চেয়েছিলাম তা হওয়া যে সম্ভব নয় তা বুঝতে যেমন সময় লাগালো, তেমন যা হয়েছি তাতেও আমার তেমন হাত নেই একথা স্বীকার করে না গেলে মিথ্যাচার হবে।

মিথ্যাচার দিয়ে যে চিরকালের পাকশালায় কিছু রান্না করা যায় না, এই বিশ্বাস ছিল আমাদের যুগের প্রায় সব লেখকেরই। আসলে ১৯৫৪ সালে 'কত অজানারে'-র ধারাবাহিক প্রকাশ থেকে যে সাহিত্যিককুলকে আমার নিজের চোখে দেখলাম এঁরা সবাই আদর্শবাদী, এক অপরিসীম মূল্যবোধ নিয়ে এঁরা ধরায় এসেছিলেন। সাধারণ সমাজ এঁদের দেখেও দেখেনি, বা এঁরা সত্যিই যে কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন তা বুঝেও বুঝে উঠতে পারেনি।

এইটাই আমার বড় দুঃখ, সাগরদা। স্বাধীনোত্তর বাংলা সাহিত্যে আমরা যেসব দিক্‌পাল লেখকদের পেলাম, তাঁদের জটিল জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার মালমশলাগুলো আমরা হেলায় নষ্ট করলাম। এঁদের যাঁরা দেখেছেন, যাঁদের সঙ্গে ভাবের বিনিময় হয়েছে, তাঁরা পরস্পর সম্বন্ধে কী ভাবলেন, কীসের সন্ধানে ছুটে শেষ পর্যন্ত হাতে কী পেলেন তার প্রমাণপত্রগুলো কালের গর্ভে লোপ পেলো বলে। আমাদের অনাগত বংশধররা আর কোনোদিন এঁদের সম্পূর্ণরূপে যাচাই করবার সুযোগ পাবেন না। এঁদের রচনার একমাত্র সাক্ষী হিসেবে পাথরের মতন নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে থাকবে এঁদের সৃষ্টি। এই সৃষ্টির গভীরে প্রবেশ করার জন্যে অন্য কোনো আলো কেউ ব্যবহার করতে পারবেন না।

সাগরদা, বড় বেশি তত্ত্বকথায় চলে যাচ্ছি, বোধ হয়। আমার সাহিত্যগুরু এবং আপনার বন্ধু বিমল মিত্র বলতেন, "তথ্যে ফাঁকি দিও না। তথ্যের ফুটো যারা তত্ত্ব দিয়ে ঝালাই করবার চেষ্টা চালিয়েছে তারাই সাহিত্যের হাটে ফুটো মগ বিক্রির বদনাম কুড়িয়েছে। লাভ হবে না, ফুটো একদিন ধরা পড়বেই।"

যত দিন যাচ্ছে, ততই বুঝি বিমল মিত্রের মতন একজন বৃহৎ আকারের লেখকের প্রতি সমকালের ক্ষুদ্র আকারের লোকরা কত অন্যায় ও অবিবেচনা করেছে। সাহিত্যের বিভিন্ন সম্মান থেকেও আমরা তাঁকে বঞ্চিত রেখে একটাই মস্ত উপকার করেছি— অনাগত কালের লেখকরা কোনো কিছু না পাওয়ার বেদনার মুহূর্তে বুঝতে পারবেন, নগদ প্রাপ্তিটাই লেখকের সব নয়। লেখকের প্রকৃত প্রাপ্তি হলো নিজের তৃপ্তি এবং সেটা না-

পাওয়া পর্যন্ত তাঁর সব প্রাপ্তিই বৃথা।

এতোক্ষণে আপনি নিশ্চয় রক্তচক্ষু হচ্ছেন, সাগরদা। সাহিত্যের ক্রীড়া অঙ্গনে আপনি ডিসিপ্লিনে বিশ্বাস করেন। সাহিত্য এখন আর একজনের কালোয়াতি নয়! সাহিত্য এখন টিমওয়ার্ক। সেখানে প্রত্যেকের একটা পূর্বনির্ধারিত ভূমিকা থাকে, যা নিশ্চিতভাবে স্থির করেন মাননীয় সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং। চুপিচুপি আমাকে একটা নির্দেশ দিয়ে মাঠে ছেড়ে দিয়েছেন, অথচ আপনি দেখছেন আপনার নির্দেশিত পথে না গিয়ে আমি অন্য দিকে ছুটছি। আপনি চেয়েছেন, আমি প্রাণ খুলে, দরাজ হাতে লিখি দেশ-এ প্রথম প্রকাশিত হবার আনন্দ সম্পর্কে, আর আমি চলেছি উজান বয়ে, ভাবছি তাঁদের কথা যাঁরা আমাদের সমকালের সাহিত্যপ্রাঙ্গণে অসামান্য প্রতিভা নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন বঙ্গভারতীর পূজায়। তাঁদের অনেকেই অবশ্য টিমওয়ার্কে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁরা চাইতেন দেশের পাতায় সামান্য সুযোগ, তারপর হতো ব্যক্তিগত প্রতিভার একক প্রদর্শনী।

বিমল মিত্র যেভাবে ধারাবাহিক সাহেব বিবি গোলাম, যেভাবে কড়ি দিয়ে কিনলাম কিংবা বেগম মেরী বিশ্বাস লিখেছেন তাতে সম্পাদকীয় পরিকল্পনায় নিশ্চয় নানা অসুবিধে হতো। কারণ লেখক নিজে প্রায়শই জানতেন না, লেখা বাড়তে বাড়তে কত বড় হবে, অন্য কোনো ধারাবাহিক রচনার সঙ্গে তার সঙ্গতি থাকবে কি না। সাপ্তাহিক কিস্তির আকার কখনও খুব বড়, কখনও খুব ছোট হয়ে সম্পাদকের মাথাধরার কারণ হবে। কিন্তু ওই একক ব্যক্তিত্বকে মেনে নিলে সে-এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। বাংলার পাঠক সমাজ বারবার বিস্মিত ও মুগ্ধ—লেখক নিজেও সৃষ্টিযন্ত্রণায় বিপর্যস্ত, কিন্তু পাঠকের পরিতৃপ্তিতে তার সব দুঃখের সুমধুর অবসান। নতুন যুগের ইলেকট্রনিক বা কমপুটারাইজ্‌ড্ সম্পাদনায় এই ধরনের সুযোগ পাগল এবং খেয়ালি লেখকদের দেওয়া সম্ভব হবে কি? সত্যিকথা বলতে কি, সেকেলে গুরুর কাছে দীর্ঘদিনের তালিম নিয়ে এই ধরনের কমপুটারাইজ্‌ড্ রচনা সম্বন্ধে আমায় ভয় ধরে গিয়েছে; অযথা চিন্তায় মন ভরে ওঠে যখন দেখি সম্পাদক লিখছেন উপন্যাস চাই, কিন্তু শব্দসংখ্যা হবে ষাট হাজার।

উপন্যাসের এই আয়তন নিয়েও আমার যুগের পূর্বসূরিদের মধ্যে নানা মতানৈক্য ছিল। যেমন, শ্রদ্ধেয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন, "পৃথিবীতে এমন কোনো ভাবনা নেই যা আড়াইশ/তিনশ পাতার মধ্যে প্রকাশ করা

যায় না। এদেশের পাঠক বোকা সে পাতার হিসেবে বইয়ের দাম দেয়, প্রতিটি পাতায় কতটা ভাবনা-চিন্তা আছে তার হিসেবে না।"

উল্টোদিকে ছিলেন উপন্যাস সম্রাট বিমল মিত্র। তিনি বলতেন, "বড় গল্পের লেখকরা নিজেদের ঔপন্যাসিক হিসেবে চালাতে গেলে ভুগবেনই তো। কার কত দৌড়, কার কত কব্জির জোর তা প্রমাণ সাইজের উপন্যাস লিখতে গেলেই ধরা পড়ে যায়। প্রকৃত অর্থে উপন্যাস বলতে সায়েবরা যা বোঝেন তার ক'খানা বাংলায় লেখা হয়েছে তা পাঠকরাই বলুন। উপন্যাস হলো বিরাট বটবৃক্ষের মতন, বেগুনগাছের সঙ্গে তার তুলনা চলে না।"

আরও একজন ছিলেন আমাদের সমকালে, প্রেমেন্দ্র মিত্র। মস্ত বড় প্রতিভা, কিন্তু গোলাপফুলের মতন 'ফ্র্যাজাইল'—বড়বাজারের মুটের মতন শব্দের গুরুভার বহন করার জন্যে তাঁর জন্ম নয়, কিন্তু তা হলেও কথাকার হিসেবে মস্ত মানুষ। তিনি আমার প্রথম বইয়ের নামকরণ করে দিয়েছিলেন 'কত অজানারে'—তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এই প্রেমেন্দ্র বলতেন, "পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলা মানেই উপন্যাস লেখা নয়। ছোট্ট আয়নাতেও বটগাছ দেখানো যায়। সেরা সাহিত্যে অনেক কিছুই জাপানি বনসাইয়ের রূপগ্রহণ করে। যে কমকথায় বড় চিন্তার উদ্রেক করে সেই বড় লেখক।"

এলোমেলো অনেক কথা বকলাম, সাগরদা। এবার আপনার নির্দেশিত পথে আসা যাক। দেশের এবং আমার বয়স প্রায় একই। দেশের জন্ম তেত্রিশ সালের নভেম্বরে, আমার জন্ম কয়েক সপ্তাহ পরে একই বছরের ৭ই ডিসেম্বরে। আমার বাবা সাহিত্যপিপাসু ছিলেন। একসময়ে কিছু সাহিত্যসৃষ্টিও করেছিলেন। বড় কৃতিত্বের মধ্যে অত্যন্ত ক্রমবয়সে তাঁর রচিত 'দুর্গাবতী' নাটক কোহিনূর থিয়েটারে সেকালের মানে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। তারপর বাবা চলে গিয়েছিলেন বনগ্রামে আইনব্যবসায় নিযুক্ত হতে। মায়ের কাছে শুনেছি, বাবা হঠাৎ একদিন বললেন, "নতুন একটা কাগজ বেরুচ্ছে আজ, নিয়ে আয়।"

কয়েক বছর পর ভাগ্যসন্ধানে আমরা হাওড়ায় চলে এসেছি। এবং এই পর্বেও আমাদের বাড়িতে 'দেশ' আসতো। তারপর বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উকিল ও ডাক্তারদের মাসমাইনের চাকরি নেই। এঁদের পক্ষে দীর্ঘকাল অসুস্থ হয়ে পড়ার বিপদ অনেক। যথারীতি দেশ পত্রিকা

বাদ পড়লো। তারপর বাবা তো চলেই গেলেন। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে, আমার তখনও চোদ্দ বছর বয়স হয়নি। থাকি হাওড়ার এক ভাড়াটে বাড়িতে। সঞ্চয় যা কিছু তা ভাবলে আঁতকে উঠতে হয়। আটটি নাবালক সন্তান নিয়ে আমার মা তাঁর বড় ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। কোনোরকমে ম্যাট্রিক পাশ করা গেলো। এরই মধ্যে চাকরির জন্যে এখানে-ওখানে যাই, কিন্তু কেউ কথা তোলে না কানে। এই অবস্থায় কলকাতার রিপন কলেজে ঢুকেছি, যার সদ্য পরিবর্তিত নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।

কলেজে যাই, স্কুলের ছেলে পড়াই, এবং সময় পেলে সামান্য ফেরিওয়ালাগিরি করি। তখন যে সাবানটা রাস্তায় বেচতাম তা বিখ্যাত 'সানলাইট'-এর নকল, নাম 'সনলাইট'। এই সাবান আমি নিয়ে যেতাম বিভিন্ন পান-বিড়ির দোকানে এবং ডজনে এক আনা রোজগারের দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করলাম। এই কাজের মাধ্যমে কলকাতার ওড়িয়া দোকানদারদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। এঁদের কাছ থেকে জীবনসংগ্রামে যে সাহায্য পেয়েছি তা ভুলবার নয়। ওড়িয়া দোকানদারদের যা বিশেষ ভাল লাগতো তা হলো নগদ বিদায়। সাবানের দাম নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু আজ মাল রেখে যাও, চারদিন পরে এসো টাকার জন্যে এই ধরনের দাবি ছিল না।

জীবনের এই পর্বে সাহিত্যের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ স্থাপিত হলো। প্রধান মাধ্যম অবশ্যই দেশ পত্রিকা। তখন কাগজ পড়ার জন্যে যেতে হতো ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের ফ্রি-রিডিং রুমে। কোনোরকম চাঁদা দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলেও এঁরা বিনামূল্যে কাগজ পড়তে দিতেন। এবং সেখানে চলতো দেশ পত্রিকা দখল করবার জন্যে এক অঘোষিত যুদ্ধ। যত আগেই যাই গিয়ে দেখি দু'জন বৃদ্ধের কেউ-না-কেউ সদ্য আগত পত্রিকাটি বগলদাবা করে বসে আছেন। কিন্তু হয়ার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে! ভদ্রলোকরা একটা লম্বা টেবিলের কোণে চলে যেতেন। আমিও গিয়ে, চেয়ারের পিছনে দাঁড়াতাম। তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে আড়চোখে একই সঙ্গে দেশ পত্রিকা পাঠ শুরু করতাম। শরীরটা দুর্বল হলেও চোখ জোড়া তখন বিশ্রীরকম ভাল ছিল, তাই গল্পের রস আহরণে কোনোরকম অসুবিধা হতো না। এইভাবে, বছরের পর বছর ট্যারা চোখে আমি দেশ পত্রিকা পড়েছি, সাগরদা। এতে একটা অসুবিধা হয়েছিল, পরবর্তী জীবনে যখন বাড়িতে দেশ পত্রিকা কিনে পড়বার সুযোগ

হলো তখন সোজাসুজি পড়তে পারতাম না, পত্রিকাটি বেশ দূরে রেখে ঈষৎ ট্যারা চোখে পড়াটা মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।

ট্যারা চোখে, কিন্তু উষ্ণ হৃদয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করে গিয়েছিলাম অতি সহজে। আমি এইভাবে পড়েছি জরাসন্ধের 'লৌহকপাট', ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের 'যখন পুলিশ ছিলাম' এবং অবশ্যই আমার প্রিয়তম উপন্যাসটি। তার কথাতেই আসা যাক। দুই বৃদ্ধ পাঠক এবং আমার রুচির মধ্যে মিল ছিল। বই হাতে নিয়েই এঁরা প্রথমে খুলতেন হাস্যরসের পাতাটি। ওইটি শেষ করেই চলে আসতেন ভূতনাথ, জবা ও পটেশ্বরী বৌঠানের জগতে। আমি দূর থেকে গোগ্রাসে গল্পটা পড়ে ফেলতাম, আর মূলপাঠক মহোদয় রসিয়ে-রসিয়ে ধীরে ধীরে পড়তেন। এক একসময় ইচ্ছে হতো শ্লথগতি বুড়োর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, কেড়ে নিই বইটা, তারপর সাহেব-বিবি-গোলামের শেষ পর্বটা পড়ে নিয়ে ওঁর হাতে ফিরিয়ে দিই। কিন্তু বিনা পয়সার লাইব্রেরিতে ঢুকে নিজের মর্জি মতন কাজ করা যায় না। কিন্তু এর একটা ভাল ফল হয়েছিল, বৃদ্ধ যে-পাতাটা খুলতেন তা একবার শেষ করে আর একবার পাঠ হয়ে যেতো আমার। বিমল মিত্র পরে বলেছিলেন, ভাল লেখা অন্তত তিনবার না পড়লে ঠিক রস পাওয়া যায় না। প্রথমবারের পাঠক সাসপেন্সের ঘোরে থাকে, কী হবে, কী হবে এই ভেবেই সে ব্যাকুল। দ্বিতীয়বারের পাঠক চরিত্রগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পায়। আর তৃতীয়বারের পাঠক খুঁজে পায় শব্দ-সৌন্দর্য। যে লেখায় শব্দ-সৌন্দর্য অত্যধিক এবং যার ভারে চরিত্র ও ঘটনা শ্লথগতি হয় তা উপন্যাসের উপযোগী নয়। এঁরা হলেন বড়লোকের বউয়ের মতন, নিজের গহনা দেখাতেই ব্যতিব্যস্ত, গহনার চাপে আসল মানুষটা যে হারিয়ে যাচ্ছে তার খেয়াল থাকছে না।

সপ্তাহে সপ্তাহে আড়চোখে সাহেব-বিবি-গোলাম পড়া—সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। শীতে, বসন্তে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শরতে, হেমন্তে এবং হেমন্ত পেরিয়ে আবার শীতে আমরা ভূতনাথের মানবতীর্থ পরিক্রমার অংশীদার হয়েছি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি যেন এই যাত্রা কোনোদিন শেষ না হয়, অনন্তকাল ধরে চলে ভূতনাথের এই তীর্থ দরশন। মাঝে মাঝে ইনস্টলমেন্টের আকার ছোট হতো, আমি বিরূপ হতাম লেখকের ওপর। সবচেয়ে যা আশ্চর্য ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোক চুপচাপ গল্পের রস আহরণ করতেন কিন্তু আমাকে কোনো কথা বলতেন না। অথচ তিনি আমাকে মেনে

নিয়েছিলেন, আমি কেন তাঁর কাঁধের ওপর গরম নিশ্বাস ফেলছি তা জিজ্ঞেস করতেন না।

মনে আছে শেষ পর্বের কথা। এই পর্ব যে শেষ পর্ব তা সম্পর্কে আপনি সাবধান করে দিয়েছিলেন — 'আগামী সংখ্যায় সমাপ্য' কথাটা ভক্তপাঠকের পক্ষে বড় বেদনাময় সাগরদা। লেখা শেষ করলাম দু'জনে। বুড়ো পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছলেন, আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, বঙ্কিমবাবু, রবিবাবু, শরৎবাবু কেউ কখনও এমন লেখা লেখেননি। এরপর, বৃদ্ধ ভদ্রলোক, আরেকবার লেখাটা পড়তে শুরু করে দিলেন, আমিও তাঁর সহপাঠী হলাম। বাংলা কথাসাহিত্যের নবযুগের শুরুতে আমি উপস্থিত ছিলাম ভাবতে ভীষণ গর্ববোধ হয়।

এবার নিজের কথায় ফিরে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে সাগরদা। বাবার যে একসময় সাহিত্যের নেশা ছিল তা তো আপনি জানেনই। আমিও ছোটবেলায় লেখক হবার স্বপ্ন দেখেছিলাম—বালকেরা কত স্বপ্ন তো দেখে, অপরাধ নিতে নেই। এইসময় ইস্কুলের সাহিত্যসভার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। নিজের প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ নয়, স্রেফ বিবেকানন্দ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের প্রিয় ছাত্র হিসেবে। তিনিই আমার লাইনটা ঠিক করে দিলেন। এই মাস্টারমশাই কেন জানি না আমার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করতেন। ছাত্রদের সাফল্য ছাড়া অকৃতদার সুধাংশুবাবুর জীবনে আর কোনো স্বপ্ন ছিল না।

উৎসাহের প্রথম ধাক্কায় আমি একটা প্রবন্ধ লিখে ফেললাম—গান্ধীবাদ ও চরকা সম্পর্কে। আমাদের ইস্কুলের শিক্ষক দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন স্বাধীনতাসংগ্রামী, তাঁর একটি পরিষদে চরকা কাটতাম। সেই প্রবন্ধই কাল হলো, আমার নিজের ধারণা জন্মালো, কেউকেটা হবো একদিন। বাবা অবশ্য সুখী হননি, লেখার প্রশংসা না করে, অঙ্কে অবহেলার জন্যে পাঁচকথা শোনালেন।

আরও কিছুদিন পর ১৯৪৭ সালের গোড়ায় আমাদের ভাগ্যবিপর্যয় হলো। আমি তখন ক্লাস টেনে পড়ি, বাবা চলে গেলেন। পাঁচটি ভাই, দুটি বোন ও মায়ের দায়িত্ব আইনত আমার ওপর।

মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লো। হেডমাস্টারমশাই সব ভাইকে ফ্রি করে দিলেন। আমার জন্যে বাড়তি ফ্রি প্রাইভেট টিউশনির প্রস্তাব

দিলেন। সামান্য কিছু লাইফ ইনসিওরের টাকার ওপর আমাদের ভরসা। সেই টাকা আমরা রেখেছি এক বাঙালি ব্যাংকে।

চোদ্দ বছরের ছেলেকে কেউ চাকরি দেয় না। ১৬ বছরের গোড়ায় আই-এ পাশ করলাম রিপন (তথা সুরেন্দ্রনাথ) কলেজ থেকে। তারপর আর উপায় নেই—আমি একেবারে পথে। কারণ যে-ব্যাংকে টাকা রাখা হয়েছিল তা লাটে উঠেছে।

সে এক কঠিন সময়, পরিচিত সবাইকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলি। একটা বেয়ারার চাকরির জন্যে কলকাতা শহর চষে ফেলেছি। কেন বেয়ারার চাকরি? কারণ, আমাকে বলা হয়েছিল, আঠারো বছর বয়স না হলে কেরানির চাকরি হয় না।

এই সময় রোদে ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে কলকাতার এসপ্ল্যানেড ম্যানসনের দোতলায় ইউ এস আই এস লাইব্রেরিতে হাজির হলাম। শুনলাম, এখানে যতক্ষণ খুশি বিনামূল্যে বই পড়া যেতে পারে। ঢোকবার মুখে বেশ বিপদে পড়ে গেলাম। একটি খাতায় নাম ঠিকানা লিখতে হয়। শেষ কলমটিতে গিয়ে ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেলাম—পেশা। আমি ছাত্র নই, চাকুরে নই। "বেকার এবং চাকুরিসন্ধানী" হচ্ছে আমার প্রকৃত পরিচয়, কিন্তু কেমন করে নিজের হাতে তা লিখি? শেষ পর্যন্ত, ধাঁ করে লিখে বসলাম—"লেখক"। আমার দু'তিনখানা লেখা ইস্কুল কলেজের ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে। সুতরাং আমি অবশ্যই "লেখক"।

ওই লাইব্রেরির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে আমার সাহিত্য জীবনে। ওখান থেকে আমি অনেক কিছু পড়েছি, যা আমার লেখক জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। লাইব্রেরির ভিতরে বসে ভীষণ লজ্জা হলো, মনে হলো আমি মিথ্যা পরিচয় দিয়ে এখানে প্রবেশ করেছি। অবশেষে মনের সঙ্গে রফা হলো। বেকার ও চাকুরিসন্ধানী তো কী? ভগবান তাদের ওপরে তো লেখক হতে বাধানিষেধ আরোপ করেননি। আমি ওই লাইব্রেরিতে বসেই বাংলায় একটা প্রবন্ধ লিখে ফেললাম। আমার শুভানুধ্যায়ী ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে ওই লেখা পাঠিয়ে দিলাম দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় এবং তা রবিবারে প্রকাশিত হলো। পরপর কয়েকটা লেখা বেরিয়ে গেলো। শুনেছিলাম, লেখার কিছুদিন পর বাড়ির ঠিকানায় মানিঅর্ডার আসে। তার প্রতীক্ষায় থেকে নিরাশায় ভুগেছি।

এরপরে ওই ইউ এস আই এস লাইব্রেরিতে বসেই লিখেছি আনন্দবাজার

পত্রিকার রবিবাসরীয়তে। সেই প্রথম 'জাত' লেখক হওয়া। কারণ কিছুদিন পরেই ডাকপিওন এসে দশটাকা দিয়ে গিয়েছিল।

আমার কর্মজীবনের কথা আপনি কিছু কিছু জানেন। প্রথম কার্যসন্ধানে বেরুবার সময় মা বলেছিলেন, তোমার কেউ নেই। কিন্তু দায়িত্ব অনেক। সুতরাং নিজেকেই কাজ খুঁজে নিতে হবে।

সেদিনকার কথা ভুলবার নয়, সাগরদা। হাওড়া থেকে বেরিয়ে, হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে কলকাতায় এসে লালদিঘির জিপিও-র তলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি। হিসেব করার চেষ্টা করছি, কোন অফিসে কোন চেনা-জানা লোক আছেন? পিতৃদেব ছিলেন উকিল, মাইনে-করা লোকদের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না। বহুক্ষণ ভেবেও একজন কেরানি অথবা বেয়ারার কথা মনে পড়লো না যাঁর অফিসে আমি যেতে পারি। তবু জনস্রোত ঠেলে এ-অফিসে ও-অফিসে ঢুকে পড়েছি। প্রত্যেক অফিসে লিফট্ থাকা সত্ত্বেও আমি ওই যন্ত্রে প্রবেশ করতাম না, আমার কেমন ধারণা ছিল লিফটে উঠতে গেলে টিকিট কাটতে হয়।

আমার এই কর্মসন্ধান পর্ব ঠিকমতন লিখতে গেলে মস্ত বড় লেখা হয়ে যাবে। মানুষকে কত রকম রূপে যে দেখেছি। অসুর ও দেবতা যে একই সঙ্গে আমাদের মনোজগতে বিরাজ করেন সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইলো না ওই কর্মসন্ধান পর্বে।

যখন কোনো কর্ম জুটছে না তখন আমার পাড়ার ছেনোদার খপ্পরে পড়েছিলাম। টাইপরাইটার যন্ত্রটি বড়ই বাবু, মাঝে-মাঝে তার দেখভাল প্রয়োজন হয়, যার নাম সার্ভিস। এই ব্যবসায় সুদক্ষ ছিলেন ছেনোদা। এঁর কথা আমি লিখেছি অন্যত্র। এঁদের অসামান্য ভালবাসার স্বীকৃতি না রাখলে মানুষ হয়ে জন্মাবার মানে থাকে না।

টাইপরাইটার রিপেয়ারিং-এ ব্যর্থ হয়ে এবং প্রায় হাজতে যাবার পথ থেকে বেরিয়ে এসে কী করবো ভাবছি সেইসময় বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টারমশাই আবার ডাক দিলেন। আমার আত্মসম্মান রক্ষা করবার উদ্বেগে তিনি এমন ভাব করলেন যেন আমাকে ইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে না পেয়ে তাঁর ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে। অথচ পরে শুনেছি আমাকে পদটা দেওয়ার জন্যে তিনি অনেক ছোটাছুটি করেছেন।

হেডমাস্টারমশায়ের একটা প্রত্যাশা ছিল। দুপুরে চাকরি করে আমি যদি সত্বর রাত-কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাই। কিন্তু আমি

তখন অন্য পথের পথিক। সংসার চালাবার নিরন্তর তাড়নায় আমি গোটা আষ্টেক প্রাইভেট টিউশনি ধরে নিয়েছি যা শুরু হয় ভোর সাড়ে পাঁচটায় এবং শেষ হয় রাত সাড়ে-নটায়। প্রাইভেট টিউশনে তখন ঢালা রোজগার ছিল ছাত্র পিছু ১২ টাকা থেকে ১৫ টাকা। এই লাইনে কিছু টাকা মারও যেতো ; বিদ্যাবিক্রয়কে বিদ্যাবিতরণ অ্যাকাউন্টে বদলি করে মানসিক দুঃখ এড়ানো যেতো।

সেই সঙ্গে শেষ হতে চলেছে আমার শর্টহ্যান্ড টাইপরাইটার শিক্ষাপর্ব। শিক্ষাই সব নয়, প্রয়োজন অভিজ্ঞতার। সেই সুযোগ করে দিলেন হেডমাস্টারমশাই। ইস্কুলের চিঠিপত্তর টাইপ করতাম। তবে এই কাজের জন্যে তিনি খাওয়াতেন সিঙাড়া, দরবেশ ও গরম চা।

নিজের সংগ্রামপর্ব ছোট করা যাক। এর যেন শুরুও নেই, শেষও নেই। একসময়ে আমি আমার ইস্কুলের সহপাঠী অনিলের মাধ্যমে তার দাদা বিভূতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তিনি বুড়োবয়সে আবার শর্টহ্যান্ডে হাত পাকাবার তালিম নিচ্ছিলেন। আমি ওঁকে ডিক্‌টেশন দিতাম, পরিবর্তে তিনি ডিক্‌টেশন দিতেন এবং শর্টহ্যান্ডের ভুল সংশোধন করে দিতেন। এমন জবরদস্ত স্টোনোগ্রাফার আমি কম দেখেছি। সমস্ত কাজে তাঁর ছিল অসাধারণ নিষ্ঠা ও সেই সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা। মন পরিচ্ছন্ন না হলে আচরণ বোধহয় এমন পরিচ্ছন্ন হয় না।

এই স্টেনোগ্রাফি থেকেই ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা হলো। বিবেকানন্দ ইস্কুল থেকে প্রথমে গেলাম বিড়লার এক অফিসে। সেখানে তখন ৮৩ টাকা মাইনে পাচ্ছি। এই অবস্থায় বিভূতিদা খবর দিলেন, ব্যারিস্টার বারওয়েলের চাকরি ছেড়ে তিনি যাচ্ছেন সাহেবী প্রতিষ্ঠানে। নতুন চাকরির পিছনে রয়েছে সায়েবের প্রচেষ্টা। চাকরি ছাড়ার কারণ, সায়েবের বয়স হচ্ছে, বিভূতিদাও সংসারী হয়ে পড়েছেন। বিভূতিদা আমাকে বললেন, "তুই চলে আয় বারওয়েল সাহেবের কাছে।" কী অদ্ভুত প্রস্তাব ! ওঁর নিজের যে সমস্যাগুলো রয়েছে তা বুঝি আমার নেই ? বিভূতিদা বললেন, "তুই কি সারাজীবন রেমিংটনের বাক্স বাজাতে চাস ? না মানুষ হতে চাস ?" কেষ্টবিষ্টু কে হতে চায় না, বিভূতিদা ? "তা হলে তুই আর চিন্তা করিস না। চলে আয়, তোর ভাল হবে।" অনিশ্চয়তা যতটুকু ছিল তার ঝুঁকি নিলেন বিভূতিদা। বারওয়েল সায়েবের স্পর্শে এলে সবাই নাকি সোনা হয়ে যায়, তার আর যাই হোক চাকরির অভাব হয় না।

আমি বেপরোয়া কাজই করে ফেললাম, একটা প্রতিষ্ঠানের পাকা চাকরি ছেড়ে সত্তর বছরের বৃদ্ধ ব্যারিস্টারের বাবুগিরি করতে চলে এলাম কলকাতা হাইকোর্টের আদালতী কর্মক্ষেত্রে। সে এক অপরূপ অভিজ্ঞতা। হাওড়া চৌধুরীবাগানের কানাগলি থেকে বেরিয়ে আমি অজানা অচেনা এক আশ্চর্য বিশ্বের মুখোমুখি হলাম। আমি শুধু নতুন নতুন মানুষকে আবিষ্কার করলাম তাই না, নিজেকেও আবিষ্কার করলাম। সায়েবের শরীর তখন ভাল নয়, পসারও পড়তির দিকে, তবু যা দেখলাম যা শুনলাম তুলনা তার নাই। আমি ধন্য, মানবতীর্থের পর্যটক হিসেবে। বারওয়েল সায়েবকে আমি ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি।

তারপর যা আশঙ্কার ছিল তাই হলো। মাদ্রাজে মামলা করতে গিয়ে আদালতেই দ্বিতীয় হার্ট অ্যাটাকের মুখোমুখি হলেন নোয়েল বারওয়েল। লেডি উইলিংডন নার্সিং হোমে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে, রাতের অন্ধকারে চলে গেলেন জীবনসাগরের ওপারে।

নতুন চাকরির খোঁজ পেতে অসুবিধে হয়নি সত্যিই। বারওয়েল সায়েবের প্রশিক্ষণের মূল্য আছে তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি নিঃস্ব হলাম। কিছু পেতে গিয়েও পাওয়া হলো না। আর মনে পড়েছে, এই দয়াহীন প্রেমহীন সংসারে এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি আমাকে ভালবাসার দুর্লভ অনুভূতি দিয়েছেন, যিনি আমার মনে, নতুন এক মানুষের জন্ম দিয়েছেন, যে বিশ্বাস করে সে একজন অসাধারণ মানুষ। "একসেপশনাল" কথাটা কীভাবে আমাকে তড়িতাহত করেছিল সে কাহিনী অন্যত্র বলেছি, তার আর পুনরাবৃত্তি করবো না।

কিন্তু সার সত্য হলো, নিদ্রাহীন এক রজনীতে বারওয়েল সায়েবের বলা "ইউ আর অ্যান একসেপশনাল পার্সন" আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। মনে হয়েছিল, আমার মধ্যে নতুন কোনো 'আমি' জন্মগ্রহণ করেছে, বিশ্ববিধাতা আমার কপালে ইতিমধ্যেই জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন।

কিন্তু সে তো কেবল একটি মাত্র রাতের অভিজ্ঞতা। তারপর নিষ্ঠুর ছেঁদো কাজের বাঁধন আমাকে বেঁধে ফেলেছে। যার বাবা নেই, যার ঘাড়ে বিশাল এক পৈতৃক সংসারের দায়িত্ব, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি, পয়সা বাঁচাবার জন্যে যে পায়ে হাঁটে অথবা ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করে স্বপ্ন দেখা তার নিষেধ।

নতুন চাকরি পেয়েছি। কিন্তু আবার শুরু হয়েছে দিনযাপনের

গ্লানি—দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি। এই সময় মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে, এই দয়াহীন প্রেমহীন সংসারে একদিন এমন একজন ছিলেন যিনি আমার মতো ক্ষুদ্রের মধ্যেও মহতের উপস্থিতির ইঙ্গিত দেখেছিলেন, যিনি স্থির বিশ্বাস করেছিলেন গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে আমি একদিন বড় হবো, বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। ইতিমধ্যেই এই অভিজ্ঞতাকে রূপকথার মতন মনে হচ্ছে, সময়ের অবিরাম স্রোতে স্মৃতি আরও কত দূরে সরে যাবে কে জানে? অতএব নিজের জন্যেই, নিজেকে যেন কখনও অবিশ্বাস করতে না হয় এই আশঙ্কায় লিখতে শুরু করেছি বারওয়েল সায়েবের পবিত্র জীবনকথা। এই সামান্য ক'দিনে ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রিটের আদালতী কর্মক্ষেত্রে কত বিচিত্র চরিত্রের সামান্য সাহচর্যে এসেছি—কী আশ্চর্য এই সব মানুষ, কী অসীম ভালবাসায় বিদেশী বারওয়েল সায়েব তাঁদের দুঃখ অপনোদনের চেষ্টা করেছেন।

এই সময় যেখানে চাকরি করতাম সেখানে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সায়েবের অত্যাচারে জর্জরিত হতাম প্রতিদিন। নিজের ওপরেই ঘৃণা শুরু হবার সময় এসে যাচ্ছিল। তখন আমার এক বন্ধু ছিলেন সাহিত্যগুণগ্রাহী ভবানী ঘোষ, যিনি আমার গল্পগুলো শুনতেন। এবং যথাসময়ে একদিন অফিসে এলেন তাঁর বন্ধু প্রথিতযশা কথাশিল্পী ও সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ। গৌরকিশোর ও আমরা দু'জনে একদিন কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় কফি হাউসে বসেছিলাম এবং সেখানেই পাকেচক্রে আমার পরিচিত কয়েকটি চরিত্রের কথা শুনলেন গৌরকিশোরবাবু। তিনিই বললেন, "আপনার লেখাগুলো নিয়ে একদিন আসুন, আমি আপনাকে দেশ পত্রিকার সাগরময়বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।"

এর পরের ঘটনা এতোদিন পরে আপনার মনে থাকবার কথা নয়। আপনি বললেন, "লেখাটা রেখে যান। তবে তিন সপ্তাহের মধ্যে জ্বালাতন করবেন না।" তিন সপ্তাহের অসহ্য উত্তেজনার পরে যখন আপনার কাছে এলাম বর্মণ স্ট্রিটে, আপনি জিজ্ঞেস করলেন, "এতোদিন কোথায় ছিলেন? আমরা খোঁজ করছি। অথচ আপনি পাণ্ডুলিপিতে ঠিকানা লেখেননি।"

এরপর সাগরদা, আপনি বসতে বললেন এবং চায়ের প্রস্তাব দিলেন। স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ের দপ্তরে বসে সসম্মানে চা পান, ভাবা যায় না! হে ঈশ্বর, আমার কপালে এতো সুখের সম্ভাবনা ছিল!

এরপর একের পর এক কিস্তি দেশে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়েছে।

তখনও বইটার নাম নির্ধারণ হয়নি—তখন হাইকোর্টের চূড়ার একটা ছবি থাকতো, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে নাম পাল্টাতো। আমি ভাগ্যবান, জীবনসংগ্রামে লাথিঝাঁটা খেয়েছি অনেক, কিন্তু সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশপত্র কত সহজে মিলে গেলো আপনার অনুগ্রহ ও আশীর্বাদে।

নানাদিক থেকে প্রশংসা আসতে আরম্ভ করলো। অনেকদিন পর হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো ডালহৌসি পাড়ায়। সে বললো, দেশের লেখাটা নাকি তুই লিখেছিস? লজ্জাবোধ করলেও স্বীকার করতে হলো। বন্ধু হঠাৎ ফস করে একটা কাগজ বার করে বললো, অটোগ্রাফ দে। আমি ভাবলাম ব্যঙ্গ করছে। তারপর সে নিজেই বললো, তুই কোথায় উঠে যাচ্ছিস তা তুই নিজেই জানিস না! দে একটা সই, একদিন বলতে পারবো, শংকর-এর প্রথম অটোগ্রাফটা আমার কাছে আছে।

আরও অনেক কিছু হতে লাগলো, সাগরদা। কলকাতা হাইকোর্টের বাঙালি প্রধান বিচারপতি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। এও এক আশ্চর্য ব্যাপার একজন ব্যারিস্টারের বাবুর কাছে। তিনি বললেন, আপনি অতি চমৎকার কাজ করছেন, সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে আদালতটা কী। আমি বিস্মিত হলাম দেশ-এর আশ্চর্য শক্তির পরিচয় পেয়ে—সমাজের সর্বস্তরে তার কী অবলীলাক্রম গতিবিধি।

এককথায় আপনি আমাকে জাতে তুলে দিলেন, সাগরদা। হাজির হলাম উলটোপুরাণের দেশে। ছিলাম, হাফ বেকার উকিলের বাবু, হয়ে গেলাম সাহিত্যিক। দুনিয়ার সবার কাছে সবিনয়ে মাথা ঠুকতাম কিছু পাবার প্রত্যাশায়, আর আমিই হয়ে গেলাম কেষ্টবিষ্টু। জানাতে গেলাম একজনকে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা, বিধাতার রসিকতায় আমিই হয়ে উঠলাম কিছু লোকের শ্রদ্ধার পাত্র, যারা প্রকাশ্যসভায় আমাকে মাল্যভূষিত করতে চায়, আমার সই চায়।

জীবনের এই পর্বে দুটো বড় পরিচয়ের সূত্রপাত। নিউ এজ-এর জানকী সিংহরায়ের দাক্ষিণ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রর সঙ্গে। তিনি তখন নামের রাজা। আমি নিজে বইয়ের নাম দিতে পারিনি জেনে তিনি নাম দিলেন—কত অজানারে। আর বর্মণ স্ট্রিটে আমার একদিন দেখা হয়েছিল বিমল মিত্রর সঙ্গে। তিনি আমার প্রথম প্রকাশক নির্বাচন করেছিলেন এবং ভূমিকাটির পুনর্লিখন করেছিলেন। এই লেখার সূত্র ধরে আর একজনকে পেয়েছিলাম পরম আপনজন হিসেবে, তাঁর নাম শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। অসাধারণ

মানুষ এই ত্রয়ী। এঁদের এক এক জনকে নিয়ে এক একটা বই লেখা যায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাকে দিয়েছেন স্নেহ, কখনও শাসন করেননি। বিমল মিত্র নিয়েছিলেন শিক্ষকের ভূমিকা। তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত কত সময় যে একসঙ্গে ব্যয় করেছি, কত বিষয়ে তাঁর মতামত শুনেছি ভাবলে অবাক হতে হয়। গল্প করতে ভীষণ ভালবাসতেন বিমল মিত্র। অথচ বড় উদাসী মানুষ, একাকীত্বর মশারির মধ্যে লুকিয়ে থাকতেন। নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে তৎপর। কিন্তু একবার যদি দূরত্ব ঘুচলো, তাহলে বিমল মিত্র যেন কথামৃতের নব কথাকার। এই বিমল মিত্রের আশীর্বাদ ও সমালোচনা ছাড়া আমার পক্ষে সাহিত্যের অঙ্গনে দীর্ঘজীবী হওয়া সম্ভব হতো না। তবে আমার কাছে তাঁর প্রত্যাশা ছিল অনেক, সেই প্রত্যাশা আমি পূরণ করতে পারিনি। কেন আমি তা পারিনি তা আমার নিজের অজানা নয়। আজ তিনি মরণ সাগরের ওপারে অবস্থান করছেন, আমিও বাংলা মতে ষাটে পৌঁছলাম। পুনর্মিলনের যদি দেরি না থাকে, তা হলে ওখানে গিয়েও গুরুর কাছে কর্তব্যকর্মে ভুল, সমস্ত অবহেলার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে নতমস্তকে।

সাগরদা, এই ফাঁকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে দুটো কথা বলে ফেলি। এ প্রিন্স এমং মেন। যিনি আমাকে বলেছিলেন, "একজন বড় মানুষই একজন বড় লোক হতে পারেন, যিনি মানুষ হিসেবে বড় নন তিনি নিজে লেখক হিসেবে বড় হবেন কী করে?" এই কথাটা মনে লেগে গিয়েছিল। দোটানায় পড়ে গিয়েছিলাম। বিমল মিত্র বলতেন, উপন্যাস লেখা বাউনের কম্মো নয়, ব্রাহ্মণোচিতগুণে কবি হওয়া যায়, কিন্তু ঔপন্যাসিকের মন শয়তানিতে ভরা থাকতে পারে। সারাবিশ্বের তিক্ত ও মধুর রস যে একই পাত্রে পান করেছে সেই পারবে প্রকৃত ঔপন্যাসিক হতে।

আমি অনেক ভেবেছি। দু'জনের কাছে গিয়ে দু'জনের কথাই সত্য বলে মনে হতো। তারপর আমি শরদিন্দু-মোহে আচ্ছন্ন হয়েছি, আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি, একজন লেখক হবার আগে একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা ভীষণ প্রয়োজন। যে মানুষই হতে পারলো না সে লেখক হয়ে কী করবে?

বিমল মিত্র তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে নিজের বিশ্বাসকে আঁকড়ে রইলেন,

কখনও বিচলিত হলেন না বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও। কিন্তু বিমল মিত্র আরেকটা জিনিস হাতে ধরে শিখিয়েছেন—গল্পের বুননে ফাঁকিবাজি থাকবে না। দুনিয়ায় পাঠক সেই অনাদিকাল থেকে গল্পের নামে গল্পই চেয়ে এসেছে, অগল্পকে গল্প বলে চালানোয় তাই তাঁর প্রবল আপত্তি। গল্প বোনা সোজা কথা নয়, এতে উৎপাদন সংখ্যা কমে যায়, শরীরস্বাস্থ্য সব নষ্ট হয়ে যায়, কারণ আপাত যখন গল্প লেখা হচ্ছে না, তখনও মনের মধ্যে গল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে নিরন্তর। তাঁর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে, একটা বদ্‌ অভ্যাস্ সৃষ্টি করেছি, গল্প উপন্যাসের শেষ কটা লাইন মনে মনে প্রথমেই রচনা করে নিই। শেষ ক'টা লাইন না পেলে প্রথম লাইন লেখার কথাই ওঠে না। বিমল মিত্র বলতেন, সব লেখকই তাই করে। কেউ জ্ঞানত, কেউ অজান্তে। আরে মশাই, নাগপুর যাবেন না কানপুর যাবেন তা না জানলে হাওড়া স্টেশনে রেলের টিকিট কাটবেন কী করে?

সাগরদা, দেশ পত্রিকার মাধ্যমে অবনতমস্তকে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশের পর প্রায় চল্লিশ বছর হতে চললো। যখন আমার সমকালের শ্রদ্ধেয়জনদের কথা ভাবি তখন বিস্ময়ে মাথা নত হয়ে আসে। আমি যে-যুগে সাহিত্যের আসরে প্রবেশের অনুমতি পেলাম বাংলাসাহিত্যের সে এক স্মরণীয় কাল। অথচ তখনও দুর্মুখরা বলতো বাংলায় আগের মতন লেখক নেই, লেখা তেমন হচ্ছে না। অথচ যখন মুখ ফিরে তাকাই তখন গর্বে বুক ফুলে ওঠে। আমাদের এই যুগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সদ্যপ্রয়াত (তিনি ও আমি জন্মসূত্রে বনগ্রামের লোক)। সগৌরবে সসাগরা সাহিত্য সাম্রাজ্য পালন করছেন তারাশঙ্কর, মানিক, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়রা। আমার কালে মুজতবা আলী মধ্যগগনে, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত সৃষ্টির চূড়ান্ত অধ্যায়ে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মগ্ন। শরদিন্দু, বিমল মিত্র ও প্রেমেন্দ্র মিত্র বঙ্গসরস্বতীর আরাধনায় বিভোর। এযুগে আমার আরও কয়েকজন প্রিয় লেখক-লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী, যাযাবর, জরাসন্ধ, শিবরাম চক্রবর্তী, সন্তোষ ঘোষ ও রূপদর্শী। এইসব লেখকদের সঙ্গে একই পত্রপত্রিকায় লেখার সুযোগটা যে কত দুর্লভ সম্মানের তা সেই সময়ে বুঝতে পারিনি।

সবচেয়ে রোমাঞ্চকর, দেশের পাতায় একসঙ্গে ব্যাটিং করা, অর্থাৎ একই সঙ্গে ধারাবাহিক উপন্যাস রচনা করা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে। আমার 'চৌরঙ্গী' ও বিমল মিত্রর 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' একই সঙ্গে বেরিয়েছিল।

সে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে। অনেকসময় এক টেবিলেও কিস্তি লেখা হয়েছে—ন্যাশনাল লাইব্রেরির রিডিং রুমে। বিমল মিত্র বলতেন, একটা বড় উপন্যাস, লেখকের পরমায়ু দশ বছর কমিয়ে দেয়। আরও বলতেন, সবাই সুপ্রসবিনী হয় না, গর্ভকালে জাতক ও জননীর মৃত্যু সম্ভাবনা দেখা দেয়।

আরো কত কথা বলতেন বিমল মিত্র। নিষ্ঠাহীন লেখক-লেখিকাদের ওপর তাঁর ছিল জাতক্রোধ— বহুজনকে দেখতে পারতেন না, কিন্তু যাকে ভালবাসতেন তাকে প্রাণভরে ভালবাসার মত হৃদয় তাঁর ছিল।

যৌবনের প্রারম্ভে আপনার আশীর্বাদে যাঁদের সঙ্গে সাহিত্যযাত্রা শুরু করেছিলাম তাঁদের অনেকেই আজ নেই আমাদের মধ্যে। কমবয়সে শুরু করার সুবিধে অনুযায়ী আমি এখনও টিকে আছি। কল্লোলযুগের লেখকদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত চমৎকার একটা বই লিখে ফেলেছিলেন। আমাদের এ-যুগ নিয়ে কেউ লিখলে মন্দ হতো না, একটা কালের ইতিহাস অনাগত কালের পাঠকদের জন্যে তোলা থাকতো। যদি তেমন বই লেখা নাও হয়, তেমন দুঃখ নেই, কারণ এযুগের সমস্ত সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার কথা অনন্য প্রতিভাধরদের কলমের স্পর্শে অক্ষয় হয়ে অপেক্ষা করবে অনাগত কালের পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে। এঁদের অনেকের বাণী বাংলার সীমানা পেরিয়ে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে বিস্তৃত হয়েছে। কে জানে তেমন হাতে পড়লে মৃত্যুর পরেও এঁদের কেউ কেউ বিশ্বজনের প্রীতি ও ভালবাসা অর্জন করতেন। যতই এইসব কাণ্ড ঘটবে ততই যার গৌরববৃদ্ধি হবে তার নাম দেশ পত্রিকা। বাংলা সাহিত্যের গত ষাটবছর ধরে দেশপত্রিকা যেভাবে পাঠক ও লেখকের সেতুবন্ধন ঘটিয়ে গেলো তার কোনো নজির নেই, সাগরদা।

রমণীয় স্মৃতি

সাগরদা, দেশের জন্যে রম্যরচনা লিখতে নির্দেশ পাঠিয়ে আপনি আমাকে বেশ বিপদে ফেলে দিয়েছেন। ফাল্গুনের এই ভোরবেলায় যতই আমি মধুময় কোনো অভিজ্ঞতা স্মরণের চেষ্টা করছি ততই পুরনো যেসব স্মৃতি আমার চোখের সামনে ভিড় করছে তাকে তেমন রমণীয় বলা চলে না।

মনে পড়ছে, অনেক দিন আগে আপনি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রম্য রচনার সংকলনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'পরম রমণীয়'। সেই সংকলনে আমার লেখা ছিল না, কিন্তু আপনার ভূমিকা পড়ে এবং আপনার সঙ্গে কথা বলে যা ধারণা হয়েছিল তা হলো— যে-লেখা রমণীয় নয় তা অবশ্যই রম্যরচনা নয়। আমাদের এক চ্যাংড়া বন্ধু তখন মন্তব্য করেছিলেন যে বাংলা রচনায় রমণী নেই তা কখনও রম্যরচনা পদবাচ্য হতে পারে না।

সত্যি কথা বলতে কী, রম্যরচনা শব্দটি তখন আমার মতো অনেক তরুণ লেখকের মনে নানা সন্দেহ জাগিয়ে তুলে চলেছে। দ্বিতীয় যুদ্ধপরবর্তী সেই সময়ে বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনার দোর্দণ্ডপ্রতাপ। অনেকদিন আগে প্রমথ চৌধুরী যে বীজ নীরবে বপন করেছিলেন তাই মহীরুহ আকারে প্রকাশমান হয়েছে। একজন রোমান্টিক তরুণ যুবকের তথাকথিত দমদম বিমানবন্দর থেকে দিল্লি ভ্রমণবৃত্তান্ত রাতারাতি বাঙালি পাঠকের হৃদয় জয় করেছে। সাহিত্যের সিংহাসনে যে গল্প-উপন্যাস অনেকদিন দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজত্ব করেছে তার তখন দুর্দিন। দৃষ্টিপাত নামক বইতে গল্প নেই, নায়ক-নায়িকার সম্পর্কের বিকাশ অনুযায়ী পরিচ্ছেদ বিভাগ নেই, আছে কেবল

চমকপ্রদ কিছু কথাচিত্র যা কখনও কখনও চলচ্চিত্রের মতো চলমান হয়ে পাঠকদের অভিভূত করে, আর কিছু শানীত বুদ্ধিদীপ্ত ডায়ালগ যা অচিরেই আধুনিক শিক্ষিত বাঙালির বাচনভঙ্গির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ালো।

যেহেতু এক কোকিলে বসন্ত আসে না, তাই প্রায় একই সময়ে আবির্ভাব ঘটলো আর এক দিক্‌পালের—রম্যরচনা শাস্ত্রের চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সৈয়দ মুজতবা আলীর। যাযাবর এবং মুজতবা আলী—এই দুই ব্যাটসম্যানের যৌথ কৃতিত্বে অতীতের সমস্ত রেকর্ড ম্লান হলো—লোকের রুচি বদল হলো। অনেকেই বলতে লাগলেন—কোন দুঃখে ফোলানো-ফাঁপানো গল্প-উপন্যাস পড়তে যাবো? এখন রম্যরচনার যুগ— জয় রম্যরচনার। সুযোগ বুঝে একে একে আরও অনেকেই রম্যরচনার নামাবলী গায়ে জড়িয়ে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হলেন।

এই সময় ঔপন্যাসিক বিমল মিত্রর সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি একদিন বিরক্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যে বই লিখেছো, ওটা কী?" তখন আমার 'কত অজানারে' সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাস, ছোটগল্প, স্মৃতিচিত্র কোনো কিছুর মধ্যেই ফেলতে না পেরে, অনেক গ্রন্থাগারিক এই বইটিকে রম্যরচনা তালিকাভুক্ত করেছেন। বিমল মিত্র বললেন, "তোমাকে বলে রাখলাম, রম্যরচনার যুগ বাংলায় কখনও আসেনি, আসবেও না। মানুষ যুগযুগান্ত ধরে, কথাসাহিত্যকে ভালবেসে এসেছে এবং এই ভালবাসাই অব্যাহত থাকবে।"

যেন এই তত্ত্ব প্রমাণের জন্যেই তার কিছুকাল আগে বিমল মিত্র 'সাহেব বিবি গোলাম' উপন্যাস রচনা করেছেন এবং সেই মুহূর্তে সাহেব বিবি গোলাম একের পর এক রেকর্ড ভেঙে চলেছে।

বিমল মিত্র আমাকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিলেন। তিনি বললেন, তুমি যা লিখেছো তা অবশ্যই রম্যরচনা নয়। ফাঁকা কথায় বাহাদুর পাঠককে জয় করে গল্পের ব্যাপারে তাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা তুমি তো করোনি। তুমি তো নির্ভেজাল স্মৃতিচিত্রও রচনা করোনি—সুতরাং নিজেকে তুমি কথাসাহিত্যিক মনে করবে, কখনও রম্যরচনাকার ভাববে না।

বিমল মিত্রের এই কথাগুলো আমার মন্দ লাগেনি। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল, যাঁরা পাঠককে গল্পরস থেকে বঞ্চিত করেন তাঁরা কখনও আমার প্রিয় হবেন না। সুতরাং সম্ভব হলে প্রত্যেক গ্রন্থাগারিককে অনুরোধ করতাম, অনুগ্রহ করে আমার প্রথম বইকে রম্যরচনার রবার স্ট্যাম্প দেবেন না।

কিন্তু কেন তাঁরা আমার কথা শুনবেন ? আমাকে কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় একজন প্রতিষ্ঠিত সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, উনি আবার কথাসাহিত্যিক হলেন কবে ? উনি তো উকিলের মুহুরী। একজন জবরদস্ত ইংরিজি অধ্যাপক তো বিখ্যাত ইংরিজি কাগজে লিখেই ফেললেন—বাংলা সাহিত্যের এখন বড়ই দুর্দিন ! সাহিত্যের কমল বনে জেলের প্রহরী, উকিলের মুহুরী এবং প্রাক্তন পুলিশরাও ঢুকে পড়ছে !

কষ্ট লেগেছিল খুব। কিন্তু করবার কিছু নেই—সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করতে গিয়ে কত বিখ্যাত লোকের অপমান যে মাথা পেতে নিতে হয়েছে তা ভাবলে বেশ কষ্ট হয়।

রম্যরচনার দুই নায়কের একজন নিজেই ইনিংস ডিক্লেয়ার করে লেখা থেকে সরে দাঁড়ালেন কোনো এক অজ্ঞাত কারণে। আর একজন 'দেশে বিদেশে' যা শুরু করেছিলেন তা দোর্দণ্ডপ্রতাপে চালিয়ে যেতে লাগলেন। তখন মুজতবা আলী পাঠকপ্রীতির তুঙ্গশিখরে অবস্থান করছেন। ট্রামে, বাসে, ক্যানটিনে, অফিসে সর্বত্র তাঁর সম্পর্কে আলোচনা। প্রায় দুই দশক ধরে তিনিই যে বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক উল্লেখিত লেখক ছিলেন তা বোধ হয় সবাই স্বীকার করবেন।

আলী সাহেবের ভালবাসা পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি ছিলেন সম্রাটের মতো— তাঁর কাছে এসে কে যে তাঁর স্নেহপ্রশ্রয় পায়নি তা আমার জানা নেই। তাঁর মহৎ গুণ ছিল, শুধু লেখায় উৎসাহ দিতেন তা নয়, প্রকাশিত লেখার ভুলগুলির দিকে গোপনে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে, কতবার তাঁর কাছ থেকে ওয়ার্নিং পেয়েছি। বোকার মতো সেসব চিঠির মূল্য বুঝিনি, যত্ন করে কিছুই সাজিয়ে রাখা হয়নি।

আলী সাহেব একদিন রসিকতা করে বললেন, "আমাকে দেখলে তুই খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করিস, কিন্তু তোর মন পড়ে থাকে বিমল মিত্রের কাছে।" আমি বোকার মতো জিজ্ঞাসা করে বসলাম, "রম্যরচনা কি টিকে থাকবে ?"

হা-হা করে অনেকক্ষণ হাসলেন আলী সাহেব। তারপর বললেন, "রমণ, রমণীয়, রম্য এসব ডেনজারাস কথা ! যা প্রীতিপ্রদ তাই রমণীয়। আবার রতিরতরাগিণীরমণ বসন্ত। একই শব্দের দুই অর্থ—কামদেব অথবা গর্দভ। তাই রম্যরচনা কখনও রমণীয়, মনোহর, মনোরম— আবার কখনও গাধার গান।"

সেদিন আলীসাহেব একটু নেশার ঘোরে ছিলেন। আমাকে বিদায় করবার আগে বললেন, "তোকে একটা গোপন কথা শুনিয়ে দিই। সারাজীবন গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ঘাসপাতা যাই লিখিস মনে রাখবি— যে রচনা রম্য নয় তা রচনাই নয়। অর্থাৎ এ-দুনিয়াতে যা কিছু প্রিয় লেখা তা সবই রম্যরচনা !"

অর্ধমত্ত অবস্থায় সেদিন আলী সাহেব আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন। আমি আর কোনোদিন কথাসাহিত্য ভারসাস রম্যরচনার টানাপোড়েনে ব্যতিব্যস্ত হইনি। আমি বুঝেছি রমণীয় রচনাই সব লেখকের লক্ষ্যবস্তু— সেখানে যে পৌঁছতে পারবে সেই ভাগ্যবান।

এর অর্থ দাঁড়ায়, রম্যরচনার নাম করে আমি যা-খুশি রচনা করতে পারি। যাঁরা আমার প্রথম বইকে কথাসাহিত্যে স্থান না দিয়ে রম্যরচনার অন্তর্গত করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে আজ আমার কোনো অভিযোগ নেই।

আমি এই মুহূর্তে আর যেন প্রথম বইয়ের প্রধান চরিত্রকে আবার দেখতে পাচ্ছি। কতদিন আগেকার সব কথা—কিন্তু মনে হচ্ছে এই তো সেদিন।

কথাসাহিত্যই বলুন, স্মৃতিচিত্রই বলুন, রম্যরচনাই বলুন—বারওয়েল সায়েব আমার বুকের মধ্যে আজও উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জেগে রয়েছেন। যখনই মনের মধ্যে যন্ত্রণা অনুভব করি, যখনই মানুষের হিংসা এবং অবিবেচনা আমাকে যন্ত্রণা দেয়, যখনই আমার পথ খুঁজে পাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখনই আমি তাঁকে চোখ বুজে স্মরণ করি এবং তিনি মুহূর্তের মধ্যে কোনো অদৃশ্যলোক থেকে আমার কাছে চলে আসেন। তিনি আমাকে স্নেহপ্রশ্রয় দেন, তিনি আমাকে আলোকিত পথের সন্ধান দেন। কে বলে বহুবছর আগে ১৯৫৩-র এক অন্ধকার অস্পষ্ট রাত্রে নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁকে আচম্বিতে পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে?

মৃত্যুর নানা রূপ আমি দেখেছি। মনে পড়ে প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয়ের কথা—সাতচল্লিশ সালের মধ্যরাতে যখন বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তখন আমার বয়স চোদ্দ—বিধবা মা ও সাতটি অসহায় ভাই বোনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ওপর। যাক সেসব কথা—যাঁর স্নেহপ্রশ্রয়ে পিতৃদেবের মৃত্যুকে অতিক্রম করে কোনোক্রমে বেঁচে থাকতে পেরেছি তাঁর নাম বারওয়েল সায়েব। তারপর দারিদ্র্য আমাকে নিয়ে নিরন্তর অগ্নিপরীক্ষা করেনি। কিন্তু আমি শোকের কোপানলে দগ্ধ হয়েছি—আমার একমাত্র পুত্রসন্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা নিজের চোখে অসহায়ভাবে নিরীক্ষণ করেছি।

তারপর এই তো সেদিন নিজের মায়ের শেষ শয্যাপার্শ্বে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। যিনি দীর্ঘ ৫০ বছর আমাকে সমস্ত দুঃখ ও যন্ত্রণা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন, তিনি নিজেই প্রবল যন্ত্রণার মধ্যে শ্বাসরোধকারী মৃত্যুর বলি হলেন।

তবু আজ হঠাৎ মনে পড়ছে মৃত্যু সম্পর্কে বারওয়েল সায়েবের রসিকতার কথা। বহুবছর আগে ১৯৪৪ সালে তাঁর যে বড় ধরনের হৃদরোগ হয়েছিল তা আমার জানা ছিল না। সেই আক্রমণ থেকে বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই নাকি ছিল না, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের দুঃসাহসী সৈন্যের মতো প্রথম আঘাতকে অবহেলা করেই তিনি আবার প্রাণময় হয়ে উঠেছিলেন।

তখন আমার কতই বা বয়স? তবু বাবার অকালমৃত্যু আমার মনের মধ্যে চিরস্থায়ী এক বিভীষিকা সৃষ্টি করে গিয়েছে। সায়েব একদিন আমাকে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের টেগোর পড়েছি। মৃত্যুকে তিনি মাধুর্য দিয়েছেন, এমন অভিজ্ঞতা ইউরোপের কোনো সাহিত্যে পাওয়া যায় না। জানো, সমস্ত পশ্চিমে মৃত্যুকে মানুষের ঘৃণা। আমার স্ত্রীর এক দূর সম্পর্কের কাকা ছিলেন, তিনি ভারতীয় ভাবধারায় মৃত্যুর মধ্যে নবরূপ আবিষ্কার করেছিলেন। একবার তাঁর এক নিকটজনের মৃত্যু হলো। কিন্তু মৃত্যু শব্দটি তিনি ব্যবহারই করলেন না—বললেন, হি হ্যাজ পাস্‌ড্ অ্যাওয়ে— সে চলে গিয়েছে। প্রিয়জনেরা সবাই যখন শোকে ভেঙে পড়েছে তখন তিনি বলে উঠলেন, তোমরা কাঁদছো কেন? সে তো কেবল এক ঘর থেকে অন্য ঘরে গিয়েছে।"

আমি বয়সের তুলনায় একটু পাকা ছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনি এ-কথা বিশ্বাস করেন?"

সায়েব একটু ভেবে বললেন, "বিশ্বাস করতে পারলে কী সুন্দর হতো বলো তো। কিন্তু অবিনাশী আত্মার কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি না, জানো শংকর, আমার স্ত্রী পারেন। অনেক চেষ্টায়, ম্যারিয়ন এমন এক চিন্তার জগতে প্রবেশ করেছে যেখানে মৃত্যু শত চেষ্টায় কারও কিছু হরণ করতে পারে না।"

বারওয়েল সায়েব! বহুবছর আগে ১৯৫৩ সালে এই বিশ্বভুবন থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর স্মৃতি এই সামান্যজনের হৃদয়ে আজও অমলিন হয়ে আছে। আত্মীয়জন নন, কিন্তু আমার বুকের মধ্যে নতুন এক অভিজ্ঞতার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে, এই পৃথিবীকে নতুনভাবে দেখবার

সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি—তাই চেষ্টা করলেও তাঁকে ভোলা যাবে না।

তাঁর সম্বন্ধে নানা কথা লিখেছি নানা সময়ে। কিন্তু মধুসূদন দাদার ভাঁড়ের মতো স্মৃতির সঞ্চয় যেন কিছুতেই শেষ হতে চায় না। যখন ভাবি সব কথা শেষ হয়ে গিয়েছে তখনও অনেক কিছু পড়ে থাকে। আসলে যার সঙ্গে যার মজে মন। বারওয়েল সায়েব বিদায় নেবার পরেও তো অনেক সময় অতিক্রান্ত হলো, আমার চোখের সামনে ঘটলোও অনেক কিছু—কিন্তু মন যেখানে ছিল সেখানেই ফিরে যেতে চায় পবিত্র তীর্থযাত্রীর মতো। যা কিছু দেবার তা নৈবেদ্যস্বরূপ সেই মধুসূদন দাদারূপী মানুষটির চরণে নিবেদন করতে চায়, যাঁর হাত ধরে একদিন এক অপরিণতবুদ্ধি বালকের মানবতীর্থযাত্রা শুরু হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের আদালতী প্রাঙ্গণে।

আজও অনেকে কত রকমের প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেন। কেউ কেউ ভয় পেয়ে যান। মানুষকে দেবতা বানাবার চেষ্টা। না, তাঁরা এই অপচেষ্টার প্রশ্রয় দেবেন না। আমি সবিনয়ে বলি, দেবতা নয় গো, মানুষ। আমি অনেক কষ্টে, অনেক পথ ঘুরে, আমার ভালবাসার মানুষকে খুঁজে পেয়েছিলাম আইন পাড়ার অপ্রত্যাশিত এক আপিস ঘরে।

কেউ কেউ সন্তুষ্ট হন। কেউ কেউ অধৈর্য হয়ে উঠে প্রশ্ন করেন, আর কত দিন তোমার কৈশোরের স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকবে। ওঠো, জাগো, বিদেশী এই মানুষটিকে পরিণত বয়সের দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করো।

বিশেষ করে একটি প্রশ্ন বেশ বড় হয়ে ওঠে। কেউ কেউ ফিস ফিস করে বলেন, বারওয়েল সায়েবের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন ছিল? ভাবছি, প্রশ্ন যখন উঠছে, তখন যা জানি তা আজ লিখে ফেলবো।

এ-কথা সত্য, যখন বিভূতিদার হাত ধরে ১৯৫০ সালে প্রথম টেম্পল চেম্বার্সে এসেছিলাম তখন কেবল সায়েবের সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল—মেমসায়েব শ্রীমতী ম্যারিয়ন বারওয়েল তখন আমাদের ধারেকাছে ছিলেন না। সায়েব রয়েছেন অথচ মেম নেই কেন? এইসব প্রশ্ন তখন আমার মনে তেমন উঠতো না—দাম্পত্য সম্পর্কের রহস্য তখনও আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো না। যাঁর কাছে কাজ করবো, মাসের শেষে যিনি আমাকে মাইনে দেবেন, তিনি তো রয়েছেন, আমি সন্তুষ্ট! বিশ্বসংসারে অন্যত্র কেন মেমসায়েব রয়েছেন তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই।

কিন্তু এখন বুঝতে পারি, কোনো কোনো মহলে চাপা গুঞ্জন ছিল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কী রকম সে নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতো। আমি যখন চাকরিতে ঢুকেছি, তার কিছুদিন আগেই বারওয়েল সায়েব তাঁর মিড্‌লটন স্ট্রিটের ভাড়াটে বাড়ির পাট তুলে দিয়ে হোটেলে উঠেছেন। এই সময় হাইকোর্টের দু' একজন বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেছেন, "কী ব্যাপার শংকরবাবু? সায়েব-মেমে হলো কী?" আমার বয়সটা তখনই এতোই অল্প যে দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে মনের মধ্যে কোনো কৌতূহল নেই। বোকার মতো বলেছি, "সায়েবকে জিজ্ঞাসা করে বলবো।" সেই না শুনে বাবুরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, বলেছেন, "না, তোমাকে জিগেস করতে হবে না!"

ছুটির দিনে সায়েব হোটেলে (এবং পরে ক্যালকাটা ক্লাবের সুইটে) বসে কাজ করতেন। প্রফেশনের কাজের মধ্যে মধ্যে একখানা চিঠির কাগজ টেনে নিতেন স্ত্রীকে চিঠি লেখার জন্যে। এ-এক অদ্ভুত রসিক লেখক! অনেকক্ষণ ধরে একমনে চিঠি লিখে, হাঁক দিতেন, "শংকর, তোমার কাজ বন্ধ করো। শোনো আমার স্ত্রীকে কী লিখছি।" এই বলে চিঠিটা পড়ে শোনাতে শুরু করতেন।

সে-কথা আমি হাইকোর্টের দু-একজন বাবুকে বলেছি। বাবুরা জিজ্ঞেস করেছেন, "সায়েব কী লেখেন বউকে?"

আমি বোকার মতো বলেছি, "কলকাতার আকাশ এখন কী রকম, রেড রোডের গাছগুলোয় কী ফুল ধরেছে এই সব নিয়ে অনেক কথা লেখেন সায়েব। আমার কথাও লেখেন সায়েব, মেমসায়েবকে অনেকবার জানিয়েছেন, আই অ্যাম এ ভেরি গুড বয়।"

এইসব চিঠি পড়বার সময় অনেক বিষয়ে আমার মতামত জানতে চাইতেন সায়েব। আমি হয়তো কোনো মন্তব্য করলাম তখন সায়েব খসখস করে লিখলেন—"পুঃ শংকর আমার সঙ্গে একমত হচ্ছে না, বলছে রেড রোডের গাছগুলো ইতিমধ্যেই বেশ সবুজ হয়ে উঠেছে।"

এসব কথা লেখবার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি লিখতেন এবং আমার ভীষণ ভয় করতো, মেমসায়েবের ওপর কী প্রতিক্রিয়া হবে তাই ভেবে।

কিন্তু সুদূর রানীক্ষেত থেকে উত্তর এলেই সমস্ত সন্দেহের নিরসন হতো। চিঠিখানা নিজে পড়েই সায়েব আমার দিকে এগিয়ে দিতেন। মেমসায়েব রানীক্ষেতের অরণ্য সৌন্দর্যের সবিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন এবং মন্তব্য

করেছেন, কলকাতাকে আমি যেটুকু জানি তাতে আমার শংকর-এর সঙ্গেই একমত মতে ইচ্ছে করছে—রেড রোডের গাছগুলো তো এখন ভেলভেট সবুজ হয়ে উঠবারই কথা। মিডলটন রো ও চৌরঙ্গীর মোড়ের সামনের গাছটার খবর জানিও।

"চোখে না দেখে কোনো রিপোর্ট দেওয়া যায় না", সায়েব রসিকতা করলেন। তারপর আমার হাতে ট্যাক্সির পয়সা গুঁজে দিয়ে বললেন, "যাও এখনই গাছটা দেখে এসো, পত্রপাঠ উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।"*

এমন অবস্থায় কখনও পড়িনি। ট্যাক্সি করে একটা গাছের সামনে এসে দাঁড়ালাম, অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখে আবার কর্মস্থলে ফিরে গেলাম। সায়েব তারপর লিখতে শুরু করলেন— "অমন চমৎকার গাছটার মস্ত দুটো ডাল ইতিমধ্যেই কারা ভেঙে নিয়েছে। জ্বালানীর দুর্ভিক্ষই এদেশের সমস্ত সবুজ সম্পদ নিশ্চিহ্ন করবে। শংকর নিজে ওই গাছের তলায় যে চাওয়ালা আছে তার সঙ্গে কথা বলেছে—খুব সম্ভবত এবার থেকে সে উনুনটা গুঁড়ি থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখবে। আমি আগামী সপ্তাহে খোঁজ নিয়ে তোমাকে জানাবো।"

মেমসায়েবের পত্রাবলীর ফাইল আমাদের কাছেই অন্য ফাইলের মতোই থাকতো—ব্যাপারটা আমাদের কাছেও অস্বাভাবিক মনে হতো না। সায়েব যে চিঠি লিখছেন তাও আমরা পড়বো এও ধরে নিয়েছিলাম। প্রত্যেকটা চিঠি আমি পড়তাম—কিন্তু মাঝে-মাঝে সায়েব বেশ চিন্তিত হয়ে উঠতেন। তাঁর মনের মধ্যে কী হচ্ছে তা আমি আন্দাজ করে উঠতে পারতাম না। মেমসায়েবকে লেখা চিঠি আমাকে পড়াতেন, কিন্তু চিঠিটা খামের মধ্যে সিল করতে দিতেন না।

আমার মনে হতো, আমাকে চিঠি পড়ে শোনাবার পরেও, চুপি চুপি কোনোও বাড়তি কথা লিখে, ঝটপট খাম বন্ধ করে আমাকে পোস্ট করতে দিতেন। আজ স্বীকার করতে দোষ নেই, চিঠি পড়িয়ে আবার গোপন কিছু সংযোজন করার ব্যাপারটা মনের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি করতো। আন্দাজ করতে চেষ্টা করতাম কী বাড়তি কথা লেখা হচ্ছে? গোপন কিছু হচ্ছে ভাবলেই বোধ হয় এই ভাবে মানুষের ঔৎসুক্য বেড়ে যায়। কখনও অপঠিত লাইনগুলি মানসচক্ষে পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা করতাম। কখনও মনে হতো, স্বামী হিসেবে স্ত্রীকে হয়তো এমন প্রিয় কথা লিখছেন যা আমাকে পড়ে শোনানো শোভন নয় বলেই কথাগুলো হয়তো পরে লিখে দিচ্ছেন।

কিন্তু আমার মনে পড়তো, যা কিছু আদরের সম্ভাষণ তা তো বিস্তারিতভাবে চিঠির শুরু ও শেষে বিস্তারিতভাবেই লেখা হয়েছে। এ-বিষয়ে আমি এতোই জ্ঞান সঞ্চয় করেছি যে কোনোদিন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে স্ত্রীকে ইংরিজিতে প্রত্যাশিত কথাগুলো লিখতে আমার কিছু মাত্র অসুবিধা হবে না।

মন তবুও সন্তুষ্ট হতো না—সেখানে অপঠিত লাইনগুলি মাঝে মাঝে সুড়সুড়ি দিতো। প্রশ্ন জাগতো, যদি প্রিয় সম্ভাষণই হবে, তা হলে প্রত্যেক চিঠিতেই তো ওই গোপন ব্যাপারটা ঘটবে। কিন্তু অনেক চিঠি তিনি আমার হাতেই দিয়ে দিতেন খোলা অবস্থায়—খাম সেঁটে রানীক্ষেতের ঠিকানা সমতে ডাকবাক্সে ফেলবার জন্যে।

এই সময় হাইকোর্টের বাবুদের বেঞ্চিতে এবং অন্যত্র কিছু কিছু অপ্রিয় কথা কখনো কানে আসতো। একজন বাবু তো জিজ্ঞেস করেই বসলেন, "তোমার সায়েব এবং মেম-এ কী হলো? হঠাৎ ঘরসংসার তুলে দিয়ে দু'জনে ছিটকে পড়লেন দু'দিকে?"

ব্যাপারটা মিথ্যে নয়—এখন দু'জনের মধ্যে প্রায় হাজার মাইলের দূরত্ব। অবশ্য মিড্‌লটন স্ট্রিটের সংসার ভেঙে যাবার পরই আমি সায়েবের চাকরিতে যোগ দিয়েছি—ওঁদের যৌথ সংসার কেমন ছিল তা আমার প্রত্যক্ষ দেখা নেই।

কিন্তু যাঁদের দেখা ছিল, তাঁরা এই ভাঙা সংসার দেখে খুব দুঃখ পেতেন। তাঁদেরই একজন আমাকে বলতেন, "তোমার কপাল খারাপ। সায়েবের মিড্‌লটন স্ট্রিটের সংসারই দেখলে না। যেমন সাজানো-গোছানো বাড়ি, তেমনি আনন্দময় পরিবেশ। একমাত্র সায়েববাড়ি যেখানে কলকাতার শ্রেষ্ঠ ভারতীয় এবং শ্রেষ্ঠ ইংরেজরা একই সঙ্গে জড়ো হতেন। বিশিষ্ট অতিথিদের সম্মানে পার্টি লেগেই থাকতো। কিন্তু বারওয়েল সায়েবের আতিথেয়তার বিশিষ্টতা ছিল। কলকাতার সায়েবী পার্টি মানে ককটেল— অর্থাৎ যথেচ্ছ হুইস্কি সেবন। হুইস্কি যে বিলেতের রসিক সমাজে তেমন আদরণীয় নয় তা সায়েব প্রায়ই বন্ধুদের মনে করিয়ে দিতেন। তিনি এই তীব্র পানীয়ের নাম দিয়েছিলেন 'ফায়ার ওয়াটার' বা 'তরল অগ্নি'! বারওয়েল সায়েব অতিথিদের এই তরল অগ্নি পরিবেশন করতেন না, নিজেও স্পর্শ করতেন না। তার বদলে তাঁর পার্টিতে থাকতো সঙ্গীতের ব্যবস্থা। আর খাওয়ার শেষে কিছু ইউরোপীয় ওয়াইন— যার সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছু জানতেন।

কেন এই সংসার পঞ্চাশের দশকের আগেই ভেঙে গেলো সেই নিয়েই

জল্পনা- কল্পনা। মেমসায়েব চলে গেলেন রাণীক্ষেতে। আর সায়েব অমন সাজানো বাড়িতে সারাজীবন কাটিয়ে প্রথমে হোটেলে এবং তারপর ক্যালকাটা ক্লাবে।

যারা দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে তারা নানা বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছে। দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন এই গবেষণার মূল বিষয়বস্তু। কেউ কেউ আমাকেই জিজ্ঞেস করেছেন, কবে ডাইভোর্সের মামলা শুরু হচ্ছে? কে এই বিপর্যয়ের জন্যে দায়ী সে-নিয়েও হিসেব-নিকেশ হয়েছে। কেউ কেউ বলেছে, দোষটা সায়েবেরই। এরপর যা কারণ দেখিয়েছে তা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। আমার বয়স নেহাতই কাঁচা, নাবালক ভাইবোন ও বিধবা মায়ের জন্য কিছু টাকা রোজগার করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া বিশ্বসংসারে আমার কোনো লক্ষ্য নেই। কিন্তু আমাকেও অসহায়ভাবে নোংরা কথা শুনতে হতো। শুনতে শুনতে ভয়ও লাগতো—কারণ সায়েবের কোনো অমঙ্গল হলে আমাদের আর্থিক নিরাপত্তা যে বিপন্ন হতে পারে তা বুঝবার মতো বয়স তখন আমার হয়েছে।

আমি সায়েব সম্বন্ধে যেসব নোংরা কথা শুনতাম তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না। যাঁকে প্রতিদিন দেখছি, যাঁর প্রতিটি কথা আমাকে মোহিত করছে, যাঁর ভালবাসা আমাকে নতুন এক অভিজ্ঞতার জগতে পৌঁছে দিচ্ছে তিনি কেমন করে দোষী হতে পারেন?

যাঁর কাছে কাজ করি তাঁর দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে প্রকাশ্যে আমার ওকালতি করার কোনো অর্থ হয় না। কে আমাকে বিশ্বাস করবে? কেনই বা করবে? সৌভাগ্যক্রমে গবেষণাকারীদের মধ্যে সর্ববিষয়ে মতৈক্য ছিল না। কেউ কেউ সায়েবের পক্ষ নিতে গিয়ে মেমসায়েবের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতো। তাঁদের কথার প্রতিবাদ করতে গেলেই আমি বকুনি খেতাম, "থামো থামো, তুমি তো কালকা যোগী! আমরা ব্যাচেলর বারওয়েল সায়েবকে দেখেছি। আইবুড়ো মিস্ ম্যারিয়ন প্লার যখন কলকাতায় এলেন তখনও দেখেছি। সুতরাং কোন ধান থেকে কোন চাল হয়েছে তা আমাদের জানা আছে।"

এসব খবর তখনও বিস্তারিতভাবে আমার জানা ছিল না। জেনেছি পরে স্বয়ং সায়েবের মুখে এবং কিছুটা সায়েবের মৃত্যুর পরে শ্রীমতী বারওয়েলের কাছে।

কিন্তু মিড্লটন স্ট্রিটের সংসার উঠে যাবার পরে যারা গবেষণা করছে

তাদের একজন বলছে— মেমসায়েবের জীবনে অন্য এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। আর একজন বলছে— ওসব কিছুই নয়, মেমসায়েবের সংসারাশ্রম ত্যাগ করে কোনো আশ্রমে যোগ দেবার সংকল্প করেছেন। তাঁর এই মানসিক অবস্থার জন্যে অবশ্যই দায়ী সায়েব নিজেই।

ইন্ডিয়াকে সায়েব যে ভালবাসেন, কিন্তু ইন্ডিয়ান আশ্রম সম্বন্ধে তাঁর যে বিশেষ উচ্চ ধারণা নেই তা আমার জানা আছে। মানে বাবুদের বেঞ্চিতে এইসব কথা শুনে আমার উদ্বেগ আরও বাড়তে লাগলো।

মনের এই অবস্থা নিয়েই সায়েবের কাছে যেতাম। এবং কী আশ্চর্য শনিবারের এক ভোরবেলায় সায়েব তাঁর স্ত্রীর গল্প শুরু করলেন। শনিবার আদালত বন্ধ থাকে— নিতান্ত প্রয়োজন না হলে সায়েব ওল্ড পোস্টঅফিস স্ট্রিটের চেম্বারে আসেন না। ক্লাবের সুইটে বসে নিজের কাজকর্ম করতেন। প্রথম কাজ হলো ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া, এই কাজ চলতো সকাল দশটা পর্যন্ত। তারপরেই তিনি আরও গুরুতর কাজে বেরিয়ে পড়তেন, আমি চিঠিপত্র টাইপে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। গুরুতর কাজটি হলো বেকার ছেলেদের জন্যে চাকরি খোঁজা। জার্ডিন হেন্ডারসন, অ্যানড্রু ইউল, স্টেটসম্যান, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই, বার্মাশেল—চাকরির সন্ধানে সায়েব কোথায় না যেতেন? যেখানেই উচ্চপদে তাঁর কোনো চেনা-জানা লোক আছেন সেখানেই তিনি ছুটতেন বেকার ছেলেদের নিয়ে। এই কাজে তিনি খুব আনন্দ পেতেন, কোথাও সামান্য লাভ হলে তো উৎসব লেগে যেতো। সায়েব বলতেন, যদি কখনও ব্যারিস্টারি থেকে অবসর নিতে পারি তখন এই চাকরিসন্ধানের কাজটাই সপ্তাহের ছ'দিন করবো। কত অসহায় যুবক এবং গার্জেন যে তাঁকে উত্যক্ত করতো তাঁর শেষ নেই। মাঝে মাঝে বিরক্তও হতেন। কিন্তু রাগ কমলে বলতেন, "দোষটা এইসব হতভাগ্য ছেলেদের নয়, দোষটা শিল্পপতি এবং সরকারের—আরও অনেক কলকারখানা কেন তৈরি হচ্ছে না?"

ছেলেদের চাকরির অ্যাপ্লিকেশন তিনি নিজে লিখে দিতেন, বলতেন কখনও "আই বেগ টু লিখবে না, কোন দুঃখে তুমি ভিক্ষে করবে? তাছাড়া এ-পৃথিবীতে ভিক্ষে করলেও কে তোমার আবেদনে সাড়া দেবে?" ছেলেদের বলতেন, "কেরানিগিরির যুগ শেষ হতে চলেছে। একটা কোনো বৃত্তি বেছে নাও। 'যে কোনো চাকরি করতে রাজি আছি' কথাটার কোনো মানে হয় না আজকাল।"

শনিবারের প্রভাতী চিঠিলেখা পর্ব শেষ হলো। সায়েব তাঁর স্ত্রীকেও একটা চিঠি লিখে ফেললেন। আমাকে পড়তেও নির্দেশ দিলেন। এবার আমি চিঠিটা খামের মধ্যে বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম, সায়েব বারণ করলেন এবং খাম ও চিঠি দুই আমার হাত থেকে নিয়েছিলেন। মনে হলো, আরও কিছু লিখবেন যা আমাকে দেখাতে চান না। অবশ্যই তাঁর সে অধিকার আছে। অপরের স্ত্রীকে লেখা চিঠি সম্পর্কে কে আগ্রহী হতে চায়? কিন্তু এইভাবে চিঠি পড়ানোর পর লুকোচুরি খেলার কী অর্থ?

মনে হলো, সায়েবের মুখে চিন্তার রেখা। কোনো বিশেষ ভাবনা তাঁকে অবশ্যই কাতর করছে। এরই মধ্যে তাঁকে বেরোতে হবে ছোকরাদের চাকরি সন্ধানে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সায়েব চিঠিখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। মনে হচ্ছে যেন এমন কিছু কথা লিখতে হবে যা লিখতে তাঁর মন চাইছে না। এই অপ্রিয় বাণী কী হতে পারে? আমারও দুশ্চিন্তা বাড়ছে। আদালতে বাবুদের বেঞ্চিতে যেসব গবেষণা হয়েছে তা আমাকে দুর্বল করে তুলছে।

ঘড়ির দিকে তাকালেন সাহেব। যে ছেলেটিকে নিয়ে বেরুবার কথা সে এখনও হাজির হয়নি। সায়েব বললেন, "টাইপরাইটার বন্ধ করো। তোমাকে আমার বিয়ের গল্প বলি।" আমার অবশ্যই আনন্দিত হবার কথা। কেননা এমন মজা করে ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমি কারও মধ্যে দেখিনি। শুনতে শুনতে নেশা হয়ে যায়। মনে হয় এসব গল্প যেন কখনও শেষ না হয়।

সায়েব বললেন, "স্কিপারের চিঠিটা আজই পোস্ট করতে হবে। ওর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের চুক্তি আছে, চিঠিপাওয়া মাত্রই পরের ডাকে উত্তর দিতে হবে!" হয়তো বিয়ের পরে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে! কিন্তু সায়েব আমাকে অবাক করে দিলেন, এই চুক্তির সুবর্ণজয়ন্তী পালনের সময় কেটে গিয়েছে।

আমার কৌতূহল আকর্ষণ করতে পারায় সায়েব মজা পেলেন, বললেন, "বৎস, তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে যখন আমার ভাবী স্ত্রী এবং আমার প্রথম আলাপ হয় তখন আমার বয়স কুড়ি এবং ম্যারিয়নের বয়স সাত। সালটা এই শতাব্দীর শুরুতে—১৯০০ খ্রিস্টাব্দ। আর এখন আমার বয়স সত্তর পেরিয়ে গিয়েছে।"

সায়েব বললেন, "তোমাকে গোপনে জানিয়ে রাখি, আমার স্ত্রীর থেকেও

বেশি ভাব ছিল ম্যারিয়নের বাবা ভিক্টর প্লার-এর সঙ্গে। মহাপণ্ডিত লোক ছিলেন তিনি—বিশেষ করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল, যদিও এদেশে আসবার সুযোগ তিনি কখনও পাননি।"

ভিক্টর প্লার-এর সাত বছরের মেয়ে ম্যারিয়নকে আমি কোলে নিয়েছিলাম বেশ মনে আছে এবং তার নতুন নাম দিয়েছিলাম, 'স্কিপার'। সেই নামই হাফ-এ-সেঞ্চুরি ধরে চলে আসছে।"

আমি মনে মনে ভাবছি, দেখা হলো তো সাত বছর বয়সে, কিন্তু বিয়ে হলো কবে ? কারণ সায়েবের দেশে তো বাপমায়ের মত থাকলেও কুড়ি বছরের আগে ছাদনাতলায় যাওয়া সম্ভব নয়।

সায়েব বললেন, "সে এক মজার সম্পর্ক। প্রথম দেখা হলো ১৯০০ সালে, মাঝে মাঝে যেতাম ওদের বাড়িতে। তারপর কেম্ব্রিজে আমার ছাত্রজীবন। সেখান থেকে ফিরে এসে ব্যারিস্টারি পড়া শুরু করলাম। তারপর লন্ডনে ব্যারিস্টারি প্র্যাকটিস শুরু হলো। তার আগে কিছুদিন আমি শহরের কাজে চাকরি করেছি। এই চাকরির সুবাদে অনেক দেশও ঘুরে বেড়িয়েছি। সত্যিকথা বলতে কি স্কিপার আমাকে ব্যারিস্টারি লাইনে যাবার উৎসাহ দিয়েছে।"

"তারপর ?" আমি গল্পের বঁড়শি গিলে ফেলেছি।

"তারপর আমি তো ব্যারিস্টারি নিয়ে সুখে লন্ডনে বসবাস করতে পারতাম। কিন্তু তা হবার নয়—প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। আমি গাউন ছেড়ে সাধারণ সৈন্যের ইউনিফর্ম পরলাম। তখন যে র‍্যাংকে আমি ঢুকলাম তার নাম 'সাব্‌লটার্ন' ! যুদ্ধের সময়কার গল্প তোমায় বলেছি—ফ্রান্সে ট্রেনচ ওয়ারফেয়ারে আহত হয়ে পড়লাম, বীরত্বের জন্য মিলিটারি ক্রস পেলাম। কিন্তু শরীর ভেঙে পড়লো। ইতিমধ্যে অনেকগুলো পদোন্নতি হয়েছে—সেদিনকার সাব্‌লটার্ন কয়েক বছরের মধ্যে লেঃ কর্নেল !"

সায়েবের মুখেই শুনলাম, আহত অবস্থায় যখন লন্ডনে রয়েছেন তখন ম্যারিয়ন প্রায়ই তাঁর খোঁজখবর করেছে।

যুদ্ধ শেষ হবার পরেও একদিন সায়েব হঠাৎ ভারতবর্ষে বদলি হয়েছেন। সেখানেও নানা নাটকীয় ঘটনার মধ্যে কর্নেল বারওয়েল কোনোসময়ে মিস্টার বারওয়েলে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং কলকাতার হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করেছেন।

"সময় কী ভাবে কেটে যায় !" রসিকতা করলেন সায়েব। "প্রথম দেখা

হলো ১৯০০ সালে আর নতুন করে পরিচয়ের বাসনা জাগল বত্রিশ বছর পরে ১৯৩২ সালে—যখন আমার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে—মাথা জুড়ে মস্ত টাক তখনই শোভা পাচ্ছে। ১৯৩২ সালে স্কিপার কী রকম হয়েছে তা আমার জানাই নেই—বহুবছর আমি দেশছাড়া। ওকে লিখেই দিলাম কিছুদিনের জন্যে কলকাতা ঘুরে যাও—এখানকার পরিবেশটা কেমন তা নিজের চোখে প্রথম দেখো, তারপর মনস্থির করা যাবে।"

সায়েব মৃদু হেসে বললেন, "স্কিপার অবশ্য গুরুতর অভিযোগ করে। তোমার সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন তুমি আসল লোকের কাছেই যখন সব শুনতে পাবে তখন আগে থেকেই বলে রাখাই নিরাপদ। আমার স্ত্রী বলেন, এদেশে এসে সব কিছু দেখে শুনে মনস্থিরের সুযোগই পাওয়া গেলো না—কারণ সমস্ত কলকাতার লোক তখন জেনে গিয়েছে আমার ভাবী স্ত্রী কলকাতায় আসছেন, শুধু বিয়ের দিনটা এখানে ঠিক হবে!"

ব্যাপারটা ঠিক রসিকতা নয়—কারণ অনেকদিন পরে যখন মেমসায়েবের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম তখন শুনেছিলাম—"মনস্থিরের কোনো সুযোগ রাখেনি তোমাদের সাহেব, তখন কেবল দিনস্থিরের অপেক্ষা! ১৯৩২ সালের শেষের দিকে এলাম—সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রালে বিয়ে হয়ে গেলো তার পরের বছর ১৯৩৩ সালে, যে বছরে তেমার জন্ম।"

মেমসায়েব একদিন দুর্বল মুহূর্তে আরও একটি কথা বলেছিলেন। আজ তা আবার মনে পড়ছে। মিস্টার ভিক্টর প্লার খুব ভালবাসতেন নোয়েলকে। এক সময় তাঁর বিশেষ ইচ্ছে ছিল নোয়েল তাঁর জামাই হোক। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় মেয়েকে কোনো অজ্ঞাত কারণে তিনি শেষ অনুরোধ করেছিলেন, নোয়েল বারওয়েলকে তুমি কিছুতেই বিয়ে কোরো না।

কেন এই উপদেশ? মেমসায়েব নিজেও তা কেন মান্য করলেন না, তা বলবার মতো জায়গা আজ নেই। সেটা নিজেই একটা গল্প। কিন্তু পাকে চক্রে দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পর দু'জনের বিবাহ হয়ে গেলো সেইটাই প্রয়োজনীয় কথা।

সায়েব বললেন, "স্কিপারের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে আমার মত ও রুচির পার্থক্য আছে। স্কিপার একলা থাকতে চায়, আমি অনেক লোকের সান্নিধ্য পছন্দ করি। স্কিপার সামান্য কয়েকজনকে তার ভালবাসা দিতে চায়, আমি যাকে কাছে পাই তার সঙ্গেই ভাব করি। স্কিপার বিশ্বাস করে মানুষের আত্মা অবিনাশী, আমি বিশ্বাস করি একটি মানব জন্মে স্বল্প সময়ের মধ্যে

আমাকে সবরকম আনন্দের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। দূরদর্শী হিন্দুর মতো স্কিপার শত সহস্র বছর অপেক্ষা করতে রাজি, কোথাও কোনো ব্যস্ততা নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যাপারে আমাদের দু'জনের মধ্যে রীতিমত মিল—আমরা দু'জনেই ভারতবর্ষ ছেড়ে কখনও কোথাও চলে যাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।"

সায়েবের মুখেই শুনলাম, ভারতবর্ষে ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম ও লোকাচার নিয়ে মেমসায়েব অনেক পড়াশুনো করেছেন—এসব বিষয়ে তিনি সায়েবের থেকেও ওয়াকিবহাল।

সায়েব বলেন, একবার এক জাঁদরেল ইংরেজ আমাদের বাড়িতে বসে এদেশের নিন্দা শুরু করলেন। কলকাতায় তাঁর অনেক ব্যবসাবাণিজ্য। স্কিপার তখন শিশুরক্ষা সমিতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। ভদ্রলোক বলে উঠলেন, খ্রিস্টান অথবা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শিশুদের জন্যে কিছু হোক, সেখানে অর্থ দেওয়া যাবে, কিন্তু অন্যদের জন্য কেন আমি টাকা নষ্ট করবো? কথাটা আমার মনঃপূত নয়, তবুও স্বাভাবিক সৌজন্যবোধে চুপচাপ থেকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ম্যারিয়ন বলে উঠলো, "আপনি কি কারণটা সত্যিই জানতে চান?" ম্যানেজিং এজেন্সির সায়েব মুখ তুললেন এবং ম্যারিয়ন জিজ্ঞেস করলো, "কোন দেশ আপনাকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে? যে দেশে জন্মেছিলেন সে দেশ থেকে কত টাকা এনেছিলেন?"

"বিজনেসম্যান সায়েব সেই যে মাথা নিচু করলেন আর মাথা তুলতে পারলেন না। তাঁকে আর কোনোদিন আমাদের বাড়িতে দেখা যায়নি।"

সায়েব বললেন, "ম্যারিয়নের আর একটা গল্প শুনে যাও। বিয়ের পর এক রাজবন্দীর মামলায় আমি উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলাম। স্কিপারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ডাক বাংলোতে উঠেছিলাম। এই মামলার স্থানীয় উকিল ছিলেন ওয়ান মিস্টার ব্যানার্জি। বয়স্ক আইনজ্ঞ। শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ইংরেজকে যারা দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চাইছে তাদের হয়ে মামলা করবার জন্যে তিনি আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন। আমি বললাম, স্বজাতির অন্যায়ের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিবাদ জানাতে পারবো না এমন কথা তো কোথাও লেখা নেই!"

উকিল মিস্টার ব্যানার্জি মেমসায়েবকেও বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখালেন এবং বললেন, আপনিও যে স্বামীর সঙ্গে এতোদূরে ছুটে এসেছেন তার

জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। তখন বিকেলবেলা, ডাকবাংলোর বেয়ারা তাঁদের সামনে চায়ের পট রেখে গেলো। ওঁদের আইনসংক্রান্ত আলোচনা বসেছে—মেমসায়েব চা তৈরি শুরু করলেন। প্রথম কাপটা তিনি উকিলবাবুর দিকে এগিয়ে দিতে গেলেন, কিন্তু তিনি তা নিলেন না। মেমসায়েব বুঝতে না পেরে বললেন, নিন, আপনার চা। মিস্টার ব্যানার্জি আবার তাকালেন কিন্তু চা নিলেন না। মেমসায়েব বোকার মতো জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি চা খান না?" ভদ্রলোক সোজাসুজি বললেন, "হ্যাঁ, চা খাই বই কি!" সায়েব ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছেন — মিস্টার ব্যানার্জি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তিনি ম্লেচ্ছের হাতে তৈরি চা খাবেন না। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্যে সায়েব বললেন, "ডার্লিং, কাপটা আমাকে দাও।"

এরকম অপমান এবং এরকম অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা মেমসায়েবের জীবনে কখনও হয়নি। মিস্টার ব্যানার্জি কিন্তু নির্বিকার। ইংরেজদের তিনি ভালবাসেন, কিন্তু তাই বলে তাদের হাত থেকে খাবার গ্রহণ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই! মেমসায়েবের অবস্থাও শোচনীয়, কেউ চড় মারলেও এর থেকে অপমানিত হতেন না তিনি। মিস্টার ব্যানার্জি এই সময় আবার ম্যাজিস্ট্রেট গৃহিণীর কথা বলতে শুরু করলেন—এই ইংরেজ নন্দিনীর সেবাযত্ন ছাড়া দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে পারতেন না। গল্পটা শুরু করার কারণ বোধহয়, মিস্টার ব্যানর্জি বোঝাতে চাইছিলেন, ইংরেজ মেমসায়েবদের সম্বন্ধে তাঁর কৃতজ্ঞতা আছে, কিন্তু তাই বলে তিনি জাত নষ্ট করতে প্রস্তুত নন।"

সায়েব বললেন, "অস্পৃশ্যতার এই প্রথম ধাক্কা থেকে সামলে উঠতে ম্যারিয়নের অনেকদিন সময় লেগেছিল। কয়েকমাস ধরে ঘটনাটা স্মরণ হলেই তার মুখ রাঙা হয়ে উঠতো। আমি যতোই ওকে বোঝাতে চেষ্টা করি যেদেশের যা আচার কিন্তু স্কিপার কিছুতেই বুঝতে চায় না।"

"আমার ভয় হয়েছিল, ম্যারিয়নের ভারতপ্রেম এবার শেষ হবে। কিন্তু আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম ম্যারিয়ন এবার ভারত ও ইংলন্ডের সম্পর্ক নিয়ে আরও পড়াশোনা শুরু করলো। তার ধারণা, পরস্পরের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে দুই দেশের যতটা উচিত ততটা জানা নেই।"

সায়েবের মুখেই শুনলাম, "এই সময় এক মজার ব্যাপার হয়েছিল, একজন ইংরেজ বন্ধু একদিন সকালে এদেশের নানা কুসংস্কার সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ উকিলের চা প্রত্যাখ্যানের খবর তখন

বন্ধুমহলে জানাজানি হয়ে গিয়েছে। বন্ধু বোধহয় সেই ভাষাতেই বললেন, "এদেশের পদে পদে কুসংস্কার৷"

মেমসায়েব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "কোন দেশে কুসংস্কার নেই?"

সায়েববন্ধু বললেন, "এদের ফিরিস্তি শুনলে আপনি মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। কোনদিন বিয়ে হবে তা স্থির করার জন্যে এরা পণ্ডিত ডেকে পরামর্শ করে।"

মেমসায়েব বললেন,"আমি উনচল্লিশ বছর লন্ডনে কাটিয়ে এদেশে এসেছি। আমার জানাশোনা কোনো ইংরেজ মেয়ে ১৩ই এপ্রিল থেকে ১লা জুনের মধ্যে বিয়ে করতে রাজি নয়। মে মাসে বিয়ে করার দুঃসাহস আবার কোনো বান্ধবীর ছিল না! আপনি বলছেন, এদেশের হিন্দুরা বিয়েতে শাদা বা কালো রঙ বর্জন করে। ধরে নিচ্ছি এটা কুসংস্কার—কিন্তু আপনি কোনো ইংরেজ মেয়েকে বলুন তো সবুজরঙের জামা পরে বিয়ে করতে!"

ইংরেজবন্ধু এবার বললেন, "এখানে মায়ের সামনে কোনো শিশুর স্বাস্থ্যের প্রশংসা করা চলবে না—কারণ তারপর যদি সেই শিশুর কোনো অসুখ হয় তাহলে আপনিই তার জন্যে দায়ী হবেন।"

মেমসায়েব বললেন, "আপনি কী জানেন, ইংল্যান্ডে এমন জায়গা আছে যেখানে মায়েরা কচি শিশুর নোখ নিজের দাঁতে কেটে দেন। তাঁদের বিশ্বাস, কাঁচি বা নেলকাটার ব্যবহার করলে বাচ্চার ভীষণ ফাঁড়া আসবে!"

ইংরেজবন্ধু বললেন, "গোরুর প্রতি এতো অযত্ন, কিন্তু গোরুর মাংসের কথা তুললে এদেশে রক্তারক্তি হয়ে যাবে!"

মেমসায়েব শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "ইংরেজকে আপনি ঘোড়ার মাংস খেতে বলুন না একবার? অথচ ইউরোপের অনেক জায়গায় তো ঘোড়ার মাংস চালু।"

ইংরেজ বন্ধু পিছু হটবার পাত্র নন। বললেন, "যুদ্ধের সময় পোল্যান্ডে আমি ঘোড়ার মাংস খেয়েছি। এরা না খেয়ে মরে গেলেও গোরু খাবে না।"

মেমসায়েব এবার অব্যর্থ বাণ ছাড়লেন। "চীনে কুকুরের মাংসে তৈরি একটা বিখ্যাত ডিশের নাম চাও পাপি—পারবেন খেতে?"

ইংরেজ বন্ধুর তো বমি হওয়ার যোগাড়। বললেন, "যাই বলুন এদেশের কাউ ওয়ারশিপ কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।"

মেমসায়েব বললেন, "দুষ্টজনেরা চুপিচুপি বলে ইংরেজের কুকুর

প্রশস্তিরও কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আদুরে শিশুর চেয়েও কুকুর ইংরেজের কাছে বেশি আদর পায়।"

ইংরেজ বন্ধু বললেন, "ইংরেজের কুসংস্কার তালিকা নিশ্চয় শেষ হয়েছে।"

"মোটেই নয়"। মেমসায়েব উত্তর দিলেন, "এই তো সবে শুরু। যেমন ধরুন, অসংখ্য ইংরেজ মই-এর তলা দিয়ে যাবে না। আয়না ভাঙা যে অলক্ষণ তা কে না জানে? একটা ছুরির ওপর আর একটা ছুরি ক্রস করে রাখা খুব খারাপ।"

"এসব অনেক পুরনো দিনের কথা", সায়েববন্ধু বলেছিলেন।

"বেশ! আপনি এই কলকাতায় কোনো ইংরেজকে বলুন রাতের ডিনার পার্টিতে তেরজনকে নিমন্ত্রণ করতে। শুনুন। অনেক ইংরেজ এখনও বাড়ির মধ্যে ছাতা খোলার কথা ভাবতে পারে না। নতুন জুতো কখনই টেবিলে বা কোনো ফার্নিচারের ওপর রাখা যাবে না এ-শিক্ষা আমিও আমার মায়ের কাছে পেয়েছিলাম।"

আমি এসব সংস্কারের কথা কিছুই জানতাম না। সায়েব বললেন, "আমিও খবর রাখতাম না—কিন্তু স্কিপার আমার চোখ খুলে দিয়েছে। সে বলে, ইংরেজের ফোক-লোর চর্চা বেশি দিনের নয়। ফোক-লোর সোসাইটি অফ ইংলন্ডের প্রতিষ্ঠা মাত্র সেদিনে—১৮৬৬ সালে।"

সায়েব বললেন, "স্কিপারের ওপর সেদিন আমি খুব খুশি হয়েছিলাম—কারণ মুখের ওপর যোগ্য জবাব পেলে ইংরেজের ঔদ্ধত্য সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়—তোমাদের দেশে একেই বলে জোঁকের মুখে নুন দেওয়া। তোমায় একটা কথা শিখিয়ে দিই—যে তোমাকে ছোট করার চেষ্টা চালাবে তাকে কখনও প্রশ্রয় দেবে না। তার মুখের ওপর জবাব দেবে। এদেশের মানুষ বড্ড নরম বলেই অত্যাচারীর সংখ্যা এতো বেশি।"

নিজের দেশের মানুষের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নেমেই মেমসায়েব আমার শ্রদ্ধাভাজনীয়া হয়ে উঠলেন। তাঁকে তখনও আমি চোখে দেখিনি, কিন্তু চোখের দেখাই সব নয়। লক্ষ্য করলাম, এই তেজস্বিনী ভাবকে সায়েবও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেন।

সায়েব বললেন, "আমার কর্মজীবনে স্কিপার সবসময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—কখনও প্রশ্ন করেনি কেন কম ফি'তে আমি এদেশের দুরন্ত ছেলেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করি।"

ক্যালকাটা ক্লাবের একতলায় পূর্বদিকের ঘরটাতে বসে আবার রবীন্দ্র কলিতার কথা উঠলো। পুলিশ-হত্যার অপরাধী, তার মৃত্যুদণ্ডের বর্ণনার কথা আমি কত অজানারে বইতেই লিখেছি। চট্টগ্রামের এই তরুণ রাজবন্দীকে আমি নিজের চোখে দেখিনি, কেবল তার পুরনো ব্রিফের কয়েকটা পাতা দেখেছি এবং সায়েবের কাছে শুনেছি কেমন করে রাজবন্দী থাকা অবস্থায় সে পুলিশ খুন করে এবং সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে ফাঁসির মঞ্চে জীবন আহুতি দেয়।

সায়েব শুরু করলেন, রবীন্দ্র কলিতার সব কথা সেদিন কিন্তু তোমাকে বলা হয়নি। ফাঁসি তো হয়ে গেলো, কিন্তু এখানেই সব শেষ করে দেবার পক্ষপাতী আমি ছিলাম না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ভাবছিলাম কীভাবে এই পরিবারের কিছু উপকার করা যায়। মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। তৎকালীন ছোটলাট স্যার জন অ্যান্ডারসনের সঙ্গে দেখা করলাম। সব চেষ্টা ব্যর্থ হবার পরেও ছোটলাটের কাছে একটা টেকনিক্যাল যুক্তি দেখিয়ে আবেদন করেছিলাম, বলেছিলাম ছেলেটির মস্তিষ্ক বিকৃতি আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা হোক। সেই আবেদন বিচারের মাথায় তাড়াতাড়ি করে ফাঁসি হয়ে গেলো। খবরটা স্যার জন অ্যান্ডারসনকে মোটেই খুশি করতে পারেনি এবং সেকথা তিনি আমার কাছে স্বীকারও করেছিলেন।

এই সুবাদে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করলাম। বললাম, "যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে, আপনি এই পরিবারের একটি ছেলের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিন।"

ছোটলাট না বলতে পারলেন না, এবং সেই সুযোগে রবীন্দ্রর ছোটভাইয়ের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলো। চট্টগ্রাম থেকে সরকারি খরচে তাকে কলকাতায় আনা হলো এবং সেখান থেকে ভর্তি করা হলো শ্রীরামপুর টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠানে। এখানকার পাশ করা বয়ন বিশেষজ্ঞদের খ্যাতি সমস্ত ভারতে। এখান থেকে পাশ করে কেউ বসে থাকে না। কলেজের সঙ্গে সুন্দর হোস্টেলও আছে—সুতরাং আমাদের মনে হলো, আর চিন্তার কিছু থাকবে না।

ছুটির দিনে সায়েব ও মেমসায়েব মাঝে মাঝে শ্রীরামপুরে যেতেন, কারণ আর্থিকভার লাটসায়েবের হলেও দেখাশোনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সায়েবের।

সায়েব আমার মুখের দিকে তাকালেন। "শোনো শংকর, এই দুঃখের

গল্পটা। কত আশা করে রবীন্দ্রর ছোটভাইকে শ্রীরামপুরে পাঠিয়েছিলাম। যখন শুনলাম যে পড়াশোনায় সে খুব ভাল করছে তখন আমার খুব আনন্দ। পড়াশোনা ছাড়াও খেলাধুলোয় সে এক নম্বর। স্পোর্টসম্যানের স্বাস্থ্যও কি সুন্দর। সেবার আমাদের দু'জনকে দেখে তার কী আনন্দ, হাঁটতে হাঁটতে আমরা শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে গেলাম। সে বললো, আপনাদের দু'জনকে নৌকোয় বসিয়ে আমি দাঁড় টানবো। ম্যারিয়ন আপত্তি তুলেছিল, ঐটুকু ছেলের অত পরিশ্রমের কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু সে শুনলো না। আমাদের নৌকোয় বসিয়ে সে এপার-ওপার করলো। সিংহের মতো বিক্রমে বললো, দেখলেন তো আমার কত ক্ষমতা।"

একটু থামলেন সায়েব। "আমার স্ত্রী কতবার যে দুঃখ করেছেন, কেন যে ওকে অতক্ষণ ধরে দাঁড় টানতে দেওয়া হলো। ঠিক একসপ্তাহ পরে খবর এলো দ্রুত শ্রীরামপুরে চলে আসতে। সুধীন্দ্রর টিবি হয়েছে। সে ছোট্ট একটা হাসপাতালে পড়ে রয়েছে। সে যুগে টিবির তেমন কোনো চিকিৎসা ছিল না। কোনো বাড়িতে টিবি হয়েছে শুনলে সে-বাড়িতে লোকে যাতায়াত বন্ধ করে দিতো।

"অনেক চেষ্টায় রোগীকে কলকাতার এক হাসপাতালে নিয়ে এলাম। তাঁরা বললেন কোনো স্বাস্থ্যকর স্যানাটোরিয়ামে পাঠান। আবার গেলাম স্যর জন অ্যান্ডারসনের কাছে। তাঁর খরচেই নার্স-সহ রোগীকে পাঠানো হলো দক্ষিণ ভারতের মদনাপল্লীতে।

"তারপরের ব্যাপারটা এই রকম। তখন আমি কলকাতার বাইরে গিয়েছি মামলা করতে। মেমসায়েবের কাছে টেলিফোন এলো এখনই শিয়ালদা স্টেশনে চলে আসতে। রোগীর শেষ অবস্থা। তার ইচ্ছা, নিজের দেশ চট্টগ্রামে গিয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করবে। রোগীকে মদনাপল্লী থেকে আনা হয়েছে, কিন্তু রাতের আশ্রয় প্রয়োজন, চট্টগ্রামের ট্রেন পরের দিন।"

শ্রীমতী বারওয়েল তখনই ছুটে গেলেন শিয়ালদহ স্টেশনে—সেখানে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটির সঙ্গে দেখা হলো—তাকে চেনাই যায় না। এরপর তিনি বার হলেন হাসপাতালে একরাতের আশ্রয়ের জন্য। কোনো হাসপাতাল তিনি বাদ দেননি—কিন্তু কোথাও সফল হলেন না।

"পরের দিন যখন আমি কলকাতায় ফিরে এলাম তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তিনি কোনো কাজে লাগেননি—একজন মৃত্যুপথযাত্রীর এক রাতের আশ্রয় সংগ্রহ হয়নি। বাড়িতে নিয়ে আসবো ভেবেছিলাম—কিন্তু

বাড়িতে যেসব কর্মী সপরিবারে থাকে তারা রাজি হলো না। অগত্যা গভীর রাতে ম্যারিয়ন আবার শিয়ালদহের প্ল্যাটফর্মে ফিরে গিয়েছে, তখন সহযাত্রীরা প্ল্যাটফর্মের ওপরেই বিছানা পেতে নিয়েছে।"

"স্ত্রীকে বললাম, স্কিপার, তুমি আমার থেকেও বেশি করেছো—আমি ব্যর্থ হয়ে আবার শিয়ালদহ স্টেশনে রোগীর কাছে ফিরে যেতাম না।"

কবেকার কথা—তবু অনেকদিন পরে আমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। সায়েব বললেন, "আমার স্ত্রীর একমাত্র সান্ত্বনা হতভাগ্য ছেলেটি জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পেরেছিল এবং সেখানে তিন দিন পরে মৃত্যু তার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে দেয়।"

সায়েব আরও বললেন, "বিশ্বাস করো, আমার স্ত্রী এইসব ব্যাপারে আমার থেকে আরও এগিয়ে। শত দুঃখের মধ্যেও মানুষকে ভালবাসতে ওর জুড়ি নেই।"

ঠিক এই সময় দরজায় বেল বাজলো। যার চাকরির খোঁজে সায়েব বেরোবেন সে এসে গিয়েছে। সায়েব হঠাৎ বললেন, "স্কিপারকে লেখা চিঠিটা দাও। আমি নিজেই পোস্ট করবো।"

এক কোণে গিয়ে আমাদের দৃষ্টির বাইরে সায়েব ঐ চিঠিতে আরও যেন কী লিখলেন তারপর চিঠিটা খামবন্ধ করে নিজের পকেটে পুরে বেরিয়ে গেলেন।

আমার যেন মনে হলো সায়েবের মুখে চোখে আমি যন্ত্রণার ছায়া দেখলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেলো—এমন যার আদর্শ স্ত্রী, তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ কেন? কেন হাইকোর্টের বাবুরা অপ্রিয় কথা বলে? ওঁদের সম্পর্ক কী সত্যই আর স্থায়ী হবে না?

এরপর মৃত্যু এসে একদিন সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে। মৃত ব্যক্তির বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় না! আমি যথাসময়ে শ্রীমতী বারওয়েলের সান্নিধ্যে এসেছি। তিনি বলেছেন, আমরা ঝগড়া করেছি বটে, কিন্তু আমি কখনও নোয়েলকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবিনি। নোয়েলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো জন্মজন্মান্তরের।

তা হলে আমাদের অলক্ষ্যে কী গোপন কথা চিঠিতে সায়েব লিখতেন? মেমসায়েব সেই চিঠি আমাকে আবার দেখিয়েছেন। সেখানে লেখা : সেবারের অসুখের পর তুমি আমাকে আবার নিয়ে রানীক্ষেতে চলে আসতে পরামর্শ দিয়েছিলে, বলেছিলে তোমার সামান্য যা আছে তাতে দু'জনের

চলে যাবে। আমি বিরক্তভাবে বলেছিলাম, ওইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে আত্মহত্যা ভাল। কিন্তু এবার আমি সত্যিই বিপদে পড়েছি। পয়লা তারিখে শংকর-এর এবং কর্মীদের মাইনে দেবার কোনো পথই দেখতে পাচ্ছি না।'

মেমসায়েব তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠিয়ে দিয়ে কর্মচারীদের কাছে স্বামীর মুখ রক্ষা করেছিলেন। মেমসায়েবের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল তখন তাঁর চোখ ছলছল করছে। তিনি বললেন, "নোয়েলের সঙ্গে আমাদের আবার দেখা হবে। আমি তাকে সেদিন স্বপ্নে দেখেছি। আমি তাকে বলেছি, সামনের বার যখন আসবে তখন আরও একটু ভাল স্বাস্থ্য এবং স্ত্রীর ওপর একটু কম রাগ নিয়ে এসো, নোয়েল।"

বারওয়েল সায়েব

১৯৫৩ সালের আগস্টের এক ম্লান সন্ধ্যায় কলকাতায় যাঁকে শেষ দেখেছিলাম, যাঁর আশ্চর্য জীবনকথার কয়েকটি উজ্জ্বল ছবি বুকের মধ্যে নিয়ে বিশ বছর বয়সে সাহিত্যযাত্রা শুরু করেছিলাম, বিজয়ার এই বিষণ্ণ দিনে তাঁর কথাই আবার স্মরণ করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

জীবনসংগ্রামের সমস্ত পথ যখন রুদ্ধ, আমার আশার প্রদীপটি নিবু নিবু, মানুষের ওপর সমস্ত বিশ্বাস যখন শেষ হতে চলেছে তখন ওল্ডপোস্টাপিসের টেম্পল চেম্বার্সে দেখা হয়েছিল সত্তর বছরের সেই বিদেশী বৃদ্ধের সঙ্গে—যাঁর মধ্যে শিশুর সরলতা এবং যুবকের প্রাণপ্রাচুর্য। আমার সহপাঠীরা আড়ালে আমাকে অকালবৃদ্ধ বলতো (বোধ হয় আমি তাই, আমি কখনও যৌবনের উত্তাপ অনুভব করিনি)। আর আমি যাঁর কাছে কর্মসূত্রে আবদ্ধ, তিনি বার্ধক্যেও শৈশব ও যৌবনের রঙিন আভায় সমুজ্জ্বল।

হে বৃদ্ধ বিদেশী, হে সদাহাস্যময় প্রাণবান পুরুষ, হে প্রসন্ন মানবতীর্থযাত্রী, হে সদাসংশয় ক্ষতবিক্ষত বন্ধু, তুমি কিছুক্ষণের জন্যে আমার মানসলোকে প্রত্যাবর্তন করো—তোমরা একদা স্নেহধন্য বালকটিকে আলো দাও, আনন্দ দাও, নতুন করে তাকে পুরনো স্মৃতির সলিলে অবগাহনের সুযোগ দাও।

কী বলি ? কোথায় শুরু করি ? কী এমন অবশিষ্ট আছে যা এতো বছর পরেও এই বুভুক্ষু কাঙালের সঞ্চয়শালায় অবশিষ্ট থাকতে পারে ?

আছে, আছে। এমন কিছু আছে যা এতোদিন বলা যায়নি। আমি তাঁকে ছোট করতে চাইনি। তাঁর স্ত্রীর কথাও আমাকে ভাবতে হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম এই সাধ্বী ইংরেজ রমণী একদিন বিদুষী ভার্যার কর্তব্যপালন করে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ওপর মূল্যবান আলোকপাত করবেন। একান্ত প্রিয়জনের বিশ্লেষণমাধুর্যে তা হয়ে উঠবে মহামূল্যবান। কিন্তু তা আর হবার নয়। মেমসায়েব জীবিত থেকেও এখন স্মৃতিভ্রষ্ট—তিনি এখন কাউকে চিনতে পারেন না, কোনো কিছুই স্মরণে নেই তাঁর। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী—স্মৃতিভারে শ্লথ সোনার তরী প্রিয় দেহটিকে জীবনসাগরের এপারে ফেলে রেখেই চিরবিস্মরণের অন্ধকার সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে।

সুতরাং যা পারিবারিক, যা নিতান্ত ব্যক্তিগত তা আর লুকিয়ে রাখার সময় নেই। স্মৃতি যেমন করে এই স্নেহময়ী পতিব্রতাকে আপন খেয়ালে সর্বস্বহারা করেছে তেমন শাস্তি একদিন অকস্মাৎ আমার ওপরেও নেমে আসতে পারে। লুণ্ঠনের আগেই আমি যা কিছু আছে, মূল্যবান না হলেও তা জমা দিতে চাই মুদ্রিত অক্ষরের মহাশক্তিমান প্রহরীর কাছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রিয় স্মৃতিতে আমি বেঁচে থাকতে চাই আমার অপরিচিত পাঠকজনের হৃদয়ে, মুদ্রিত অক্ষরের পাষাণ প্রতিমারূপে আমি নীরবে অপেক্ষা করতে চাই অনাগত যুগের রামচন্দ্ররূপী পাঠকের অপেক্ষায়, যাঁর পাদস্পর্শে আমি কিছুক্ষণের জন্য পুনরুজ্জীবিত হবো দৈহিক মৃত্যুর অনেক পরেও।

আমার নবীন আপনজনের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেন, সায়েব তোমার জন্যে এমন কী করেছিলেন ? এ-দেশের শত সহস্র মানুষ যেমন কোথাও-না-কোথাও কাজ করেন তুমিও তাই করেছো। কর্মস্থলে তিনি কি তোমাকে বিত্তবান করেছিলেন ?

—অবশ্যই নয়। আমার চেয়ে বেশি রোজগার করতেন হাইকোর্টের

অধিকাংশ ব্যারিস্টারের বাবু।

—তিনি তোমাকে প্রতিদিন কতক্ষণ কাজে ব্যস্ত রাখতেন?

—সেই সকাল দশটায় টেম্পল চেম্বারের দরজা খোলা হতো। তারপর চারটে পর্যন্ত কাজকর্ম। এরপর সায়েবের বাসস্থান। সেখানে সাধারণত সাড়ে সাতটার আগে ছুটি মিলতো না। একবার ইচ্ছে হয়েছিল পয়সার অভাবে কলেজের যে পড়াশোনায় ইতি হয়েছিল রাত-কলেজে অ্যাডমিশন নিয়ে তা আবার শুরু করা যাক। সায়েব উৎসাহ দেখাতে পারেননি, কারণ সন্ধ্যাবেলায় আমাকে তাঁর প্রয়োজন। পরামর্শ দিয়েছিলেন, প্রাইভেটে বি-এ পড়ো। একবার তখনকার ভাইস-চ্যান্সেলর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমাকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু লাভ হলো না। প্রথমনাথ বললেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং জেলবন্দী ছাড়া আর কাউকে প্রাইভেটে গ্র্যাজুয়েট হবার সুযোগ দেওয়া হয় না। সায়েব সন্তুষ্ট হননি, জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমরা তো সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েই অন্যের সঙ্গে সমান প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত। প্রমথনাথ এরপর যা বলেছিলেন তার সঙ্গে সায়েব একমত হয়েছিলেন—কলেজের শিক্ষাটা শুধু পরীক্ষার হল-এ প্রশ্নের উত্তর লিখে পাস করা নয়। পাঠ্যক্রমটা একটা অভিজ্ঞতা—বিদ্যাস্থানের অদৃশ্য আলো ও শিক্ষকদের দৈনন্দিন সান্নিধ্যে ছাত্রের জীবনে যে চিরস্থায়ী আলোকপাত করবে তাই শিক্ষা। অর্থাৎ প্রাইভেটে বি-এ পাস আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সায়েব অবশ্য আমাকে হতাশ হতে দেননি। বলেছিলেন, এই ব্যবস্থার আমি প্রতিবাদ করবো। কারণ, জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা প্রতিদিন শিক্ষা পাচ্ছে, কলেজের ক্লাসে তার থেকে বেশি কী পাওয়া যাবে? তিনি আরও বলেছিলেন, আমি সেনেটের সদস্য—আমি লিখে দিচ্ছি, যারা নামের পিছনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত অক্ষর (বি এ) লিখতে পারে তুমি তাদের অনেকের থেকে বিদগ্ধ। এরপর শুরু হয়েছিল তাঁর সহাস্য প্রাইভেটে কনভোকেশন। তিনি শোনালেন, "আমি বলে রাখছি, একদিন বিশ্ববিদ্যালয় তোমাকে ডেকে সম্মানিত করবে, সেদিন এই বৃদ্ধকে যেন ভুলে যেও না!"

আমার নবীন প্রিয়জনদের পরবর্তী প্রশ্ন—রবিবার এবং অন্য ছুটির দিন কি ছুটি মিলতো?

—না, মিলতো না। ছুটির দিনে চেম্বার বন্ধ, কিন্তু যেতে হতো অস্থায়ী নিবাস স্পেনসের্স হোটেল এবং পরে ক্যালকাটা ক্লাবের রেসিডেন্সিয়াল

সুইটে। ঐ ক্লাবে তখন কয়েকজন মেম্বারের বসবাসের সুবিধা ছিল।

পরবর্তী প্রশ্ন: ক্যালকাটা ক্লাবে তো তখন মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। তা হলে মেমসায়েব কোথায় থাকতেন?

—কলকাতার বাইরে। রানীক্ষেতে ফেয়ারল্যান্ড নামে রমণীয় এক কুঠীতে।

—তার তাৎপর্য কী? দু'জনের মধ্যে এই হাজার মাইল দূরত্বের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা চাই। যা গুজব আছে তাই কি সত্য, দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক তেমন সুখের এবং শান্তির ছিল না?

এর উত্তর—আমি সায়েবের চাকরিতে ঢুকেই দেখলাম সায়েব নিঃসঙ্গ, নিজের মিডলটন স্ট্রিটের সংসার তুলে দিয়ে তিনি হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন। স্পেনসের্স হোটেলে তখন মাসিক খরচ ছিল সাতশ টাকা। হাইকোর্টের পাশেই হোটেল, তাই পরিবহনের ঝামেলা, নেই, যদিও প্রায়ই ওইটুকু দূরত্বও আমরা বিকেলে ট্যাক্সিতে অতিক্রম করতাম।

—সায়েবের গাড়ি?

গাড়ি দেখিনি—তবে সায়েবের ড্রাইভারকে দেখেছি। প্রায়ই সায়েবের কাছে কিছু সাহায্যের প্রত্যাশায় বসে থাকতেন। নাম প্রভাত বৈরাগী। এই প্রভাতবাবুই বলেছেন, সায়েবের গাড়ি ছিল, বিরাট আমেরিকান গাড়ি। রাক্ষসের মতো যার পেট্রোলক্ষুধা। এই পেট্রোল-রাক্ষসকে স-সারথি হস্তান্তরের অনেক চেষ্টা করেছিলেন সায়েব, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত শুধু গাড়িই বেচেছিলেন। প্রভাতচন্দ্র তখনও সারথি পদে সশরীরে বহাল থেকে মাসিক মাহিনা অর্জন করেছেন এবং অবশেষে স্টেটবাসের ড্রাইভার পদটি সায়েবের এক পরিচিত প্রতিবেশী বন্ধুর সাহায্যে খুঁজে নিয়েছেন।

কোথায় স্টেটবাস আর কোথায় সায়েব! কোথায় ব্যারিস্টার আর কোথায় এক আনা দু'পয়সার টিকিট কাটা বাবু! বাস চালিয়ে এক সপ্তাহ ধরে প্রভাতচন্দ্রের মনে দুঃখের পাহাড় জমে উঠতো তার কিছু নমুনা আমাকে শুনতে হতো প্রতিটি ছুটির দিনে। "আপনার কপাল খারাপ, বড্ড দেরিতে এলেন।" প্রভাতচন্দ্র আমার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতেন, "গাড়ি দেখলেনও না, চড়লেনও না!" এরপর একদিন এসপ্ল্যানেডের বাস স্ট্যান্ডে প্রভাতচন্দ্র আমাকে দেখতে পেয়ে জোরে হর্ন দিয়েছিলেন। পাইলটের বিশিষ্ট অতিথি হয়ে টিকিট না কেটে স্টেটবাসে পরিভ্রমণের সেই অকল্পনীয় সুখের কথা এখনও আমার মনে আছে। বাস থেকে হাওড়া স্টেশনে নামার সময়

প্রভাতচন্দ্র আমাকে ভাঁড়ে চা না খাইয়ে ছাড়েননি। বলেছিলেন, "এই পাবলিক বাস আর ভাল লাগে না, যেন ঘরের বউ বাজারে বেরিয়ে পাপকর্ম করছি! সায়েবের একটা গাড়ির ব্যবস্থা হলেই আমাকে খবর দেবেন।"

আমার নবীন প্রিয়জনদের প্রশ্ন ঃ কত মাইনে পেতে? সে-টাকা কি তখনকার বাজার দরের তুলনায় বেশি?

—ইস্কুলে যখন চাকরি করতাম তখন পেতাম মাসে সাড়ে বাষট্টি টাকা। এক আনা রেভিনিউ স্ট্যাম্পে কাটা যেতো। আমাদের প্রধান শিক্ষক পেতেন একশ পঁয়তাল্লিশ টাকার মতন—পরিমাণটা তখন প্রচুর মনে হতো। ইস্কুল থেকে যেখানে চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, সেখানে মাইনে চাওয়ার কথা ছিল ১০০ টাকা। যিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই জুট অ্যান্ড গানি কোম্পানিতে তিনি সেইরকম পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু কর্তার সঙ্গে ইন্টারভিউয়ের সময় মানসিক উদ্বেগ এমন তুঙ্গে উঠলো যে উত্তেজনার মাথায় বলে ফেললাম তিরাশি টাকার এক পয়সা কমে কাজ করতে পারবো না। ওখানে সেই পয়সাই নির্ধারিত হলো, যদিও স্রেফ বোকামির জন্যে মাসে কুড়ি টাকা হাতছাড়া হওয়ার বেদনা প্রতি মুহূর্তে বুকের মধ্যে কাঁটার মতো ফুটতো। জুট অ্যান্ড গানিতে কিছুদিনের নরকযন্ত্রণা ভোগ করে যখন টেম্পল চেম্বার্সে সায়েবের কাছে এলাম তখন মাইনে আশি টাকাতে স্থির হলো।

শুধু আশা ছিল কিছু বাড়তি তহুরির, যার ইংরিজি নাম ক্লার্কেজ। ব্যারিস্টারের বাবুরা এক সময় সায়েবের ফিয়ের ব্যাপারে সর্বেসর্বা ছিলেন। সায়েবের ব্রিফে কত মোহর ফি মার্কা হবে তা ব্যারিস্টারের বাবুই ঠিক করতেন, ব্যারিস্টার নিজে কখনও এ-বিষয়ে নাক গলাতেন না। পয়সার ব্যাপারে সোজাসুজি আলোচনা করাটা এই মহান পেশার পক্ষে নাকি কখনও শোভন ছিল না। যে-জন্যে এক অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী বার অফ ইংলন্ডের মেম্বাররা তাঁদের প্রফেশনাল মক্কেলকে ক্লার্কের মাধ্যমে বিল পাঠালেও, অনাদায়ী বিলের জন্যে কোনোরকম মামলা-মোকদ্দমা করতেন না। নিয়ম ছিল, যদি প্রফেশনাল মক্কেল ব্যারিস্টারের প্রাপ্য বিল পেমেন্ট না করেন, তবে ব্যারিস্টার এই অভিযোগটি বার কাউন্সিলকে জানাবেন। এবং এক অলিখিত প্রথা অনুযায়ী খবরটি প্রচারিত হওয়া মাত্র ঐ প্রফেশনাল মক্কেলের কোনো ব্রিফ বার অফ ইংলন্ডের অন্য কোনো সভ্য গ্রহণ করবেন না।

এখানে প্রফেশনাল মক্কেল কথাটির উপর পাঠককে বিশেষ নজর রাখতে অনুরোধ করছি। একবার সায়েবের এই অনাদায়ী বিল নিয়ে আমরা বেশ হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছিলাম।

যিনি আমাকে সায়েবের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন সায়েবের সেই ভূতপূর্ব বাবু বিভূতিদা আমাকে শুরুতেই সাবধান করে দিয়েছিলেন, "এ তোর মফস্বলের আদালত নয় যে অর্ডিনারি মক্কেলের সঙ্গে ব্যারিস্টারের দহরম থাকবে। এখানে মক্কেল দু'রকম সাধারণ অথবা 'লে' ক্লায়েন্ট এবং বিশেষজ্ঞ অথবা 'প্রফেশনাল' ক্লায়েন্ট।

কলকাতার স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা এক সময় রোগীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন না। তাঁর কাছে যেতে হতো গৃহচিকিৎসক বা ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের মাধ্যমে। তিনিই একটি খামে রোগীর বিস্তারিত বিবরণ লিখে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে, রোগীকে পাঠাতেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে, যাঁর অপর নাম কনসালট্যান্ট। বিশেষজ্ঞ রোগীর হাত থেকে ফি নিতেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্য একটি পত্রে লিখে, অনেক সময় খামে পুরে গৃহচিকিৎসকের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, বলতেন, 'যা বলবার তা আপনার ডাক্তারবাবুই আপনাকে বলবেন।'

বার অফ ইংলন্ডের সভ্য, অর্থাৎ ব্যারিস্টার বা বিদগ্ধ কাউন্সেল (বাংলায় কৌশলি শব্দটার প্রতি লক্ষ রাখুন) বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতো সাধারণ ক্লায়েন্টের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতে উৎসাহী ছিলেন না, তাঁর কাছে আসতে হতো অ্যাটর্নির মাধ্যমে। অ্যাটর্নি যদি সাধারণ মক্কেলকে ব্যারিস্টারের কাছে পাঠাতেন তাহলেও সঙ্গে একটি টাইপ করা কাগজ দিতেন, যাতে মামলার বিবরণ দেওয়া থাকতো এবং ব্যারিস্টারের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করা হচ্ছে তারও ইঙ্গিত থাকতো। এই কাগজের পিছনে একটি নীলাভ কাগজের মলাট থাকতো যার নাম 'ব্যাক শিট' এবং কাগজটির নাম 'ইন্সট্রাকশনস ফর কাউন্সেল'। কাগজের একেবারে তলায় থাকতো প্রেরক অ্যাটর্নির নাম।

সায়েবের চেম্বারে কখনও-কখনও নতুন ক্লায়েন্ট তাঁর সমস্যা নিয়ে সরাসরি হাজির হতেন। প্রফেশনাল ক্লায়েন্টের মাধ্যমে আসেননি বলেই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করা সম্ভব হতো না। বদলে কোনো একজন পরিচিত অ্যাডভোকেট অথবা অ্যাটর্নিকে ফোন করা হতো এবং তাঁকে প্রফেশনাল ক্লায়েন্ট হিসেবে কাজ করবার অনুরোধ জানানো হতো। তাঁরা সানন্দে

টেলিফোনেই অনুমতি দিতেন, কারণ প্রায়ই ক্লায়েন্টকেও না দেখেই এক অথবা দু মোহর ফি রোজগার করতেন। জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের নামাঙ্কিত ব্যাকশিট তখনিই তৈরি করে নিতাম।

এই জি-এম অথবা গোল্ড মোহর রহস্য তিরিশ বছর আগেই ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু যাঁরা পড়েননি তাঁদের সাহায্যার্থে জানাই, হাইকোর্টে এখনও মোহরের রাজত্ব। অমুক কাউন্সেলের ফি একশ মানে একশ টাকা নয়, একশ মোহর অর্থাৎ সতের শ'টাকা। মোহর কোনোদিনই নাকি সতেরো টাকা ছিল না—বাবুদের বেঞ্চির গোপন খবর, মোহরের আদি মূল্য ষোলো টাকা। প্রতি মোহরের সঙ্গে বাবুকে এক টাকা দিতে হতো। কোনো এক সময়ে দূরদর্শী ব্যারিস্টার মক্কেলকে বললেন, আমাকেই সতেরো টাকা দাও, বাবুকে আমিই সামলাবো। তার কিছুদিন পর দেখা গেলো বাবুর পাওনা সম্পর্কে সায়েব কোনো উচ্চবাচ্যই করছেন না ! ফলে বাবু আবার মক্কেলের কাছ থেকে মোহর পিছু এক টাকা আদায় করতে লাগলেন, অথচ মোহরের দাম সতেরো টাকাই রয়ে গেলো। এই গল্পের পিছনে কতখানি ঐতিহাসিক সত্য আছে তা আমি জানি না, কিন্তু বাবুমহলের সবাই ব্যাপারটা 'নির্জলা সত্য' হিসেবে বংশপরম্পরায় শুনে আসছেন।

একবার এক প্রখ্যাত অ্যাটর্নি আমাদের সায়েবকে একটি অপ্রিয় ব্রিফ পাঠিয়েছিলেন। উপদেশ ও মতামতের (অ্যাডভাইস ও অপিনিয়ন) জন্য। সায়েবের একজন অতি প্রিয়জন এই আক্রমণের মুখ্য লক্ষ্য ছিলেন। ব্রিফটি পড়েই সাহেব সেটি বন্ধ করে অ্যাটর্নিকে ফেরত পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। কোনো প্রিয়জনের বিরুদ্ধে আইনগত মতামত দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এর পরেই সেই অ্যাটর্নির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হলো এবং পুরনো কিছু ফিয়ের টাকা পেমেন্টের ব্যাপারে তিনি সম্পুর্ণ নীরব হয়ে পড়লেন। অনেকবার তাঁর অফিসে ধরনা দিয়েও কোনো কাজ হলো না (টাকা আদায়ের এই অপ্রিয় কাজটি ব্যারিস্টারের বাবুর)। অবশেষে সায়েব বিস্তারিত অভিযোগ নিয়ে বার কাউন্সিলের কাছে তাঁর অভিযোগ দায়ের করলেন। কিন্তু আইনের কুটিল পাশা খেলায় ধুরন্ধর অ্যাটর্নির কাছে সায়েব পরাজিত হলেন। অ্যাটর্নি পাল্টা অভিযোগ করলেন, কাউন্সেল প্রচলিত নিমকানুন লঙ্ঘন করে লে-ক্লায়েন্টের সঙ্গে দহরম-মহরম করেছেন এবং প্রফেশনাল ক্লায়েন্টকে বিশেষ অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছেন। দেখা গেলো, মামলার প্রথম দিকে লে-ক্লায়েন্টের সই করা একটি চেক অভিজ্ঞ অ্যাটর্নি

সময় সংক্ষেপের ধুয়ো তুলে আমাদের হাতে দিয়েছিলেন এবং আমার সরল মনে সেটি সায়েবের ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছি। বার কাউন্সিলের বিচার সায়েবের বিরুদ্ধে গেলো। তাঁরা জানালেন, সাধারণ ক্লায়েন্টের কাছ থেকে সরাসরি অর্থ গ্রহণ করে ব্যারিস্টার হিসেবে সায়েব নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন, সুতরাং পরবর্তী পেমেন্টের জন্য অ্যাটর্নির ওপর চাপ সৃষ্টির নৈতিক অধিকার তাঁর নেই !

আইনের সূক্ষ্ম প্যাঁচে ব্যারিস্টারকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে সেই অ্যাটর্নি বিশেষ আনন্দবোধ করেছিলেন এবং তাঁর সেই উল্লাস আমার কাছে চেপে রাখেননি।

আমার নবীন প্রিয়জনদের আদি প্রশ্নটি ছিল, কত টাকা মাইনে পেতাম ? তার পুরো উত্তর দেওয়া হয়নি। নিশ্চিতভাবে, মাসিক আশি টাকা, বাকিটা অনিশ্চিত। সেই সময় বাড়তি রোজগারের সম্ভাবনা ক্রমশই অনিশ্চিত হয়ে উঠছে, কারণ সায়েবের প্র্যাকটিস পড়তির দিকে। এবং যাঁরা আসতেন তাঁদের অনেকেই ক্লার্কেজ দেবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহী ছিলেন না। আমার পক্ষেও তাঁদের কাছ থেকে তহুরির তাগাদা দেওয়া সম্ভব ছিল না।

দু' একজন ফিয়ের টাকাটা দিয়ে বলতেন, আপনার প্রাপ্যটা দুয়েকদিন পরে এসে দিয়ে যাবো। তারপর দুয়েক মাস কেটে যেতো, তাঁদের আর দেখা মিলতো না। এই প্রতিশ্রুতি যাঁরা দিতেন তাঁদের মধ্যে একজন ফাঁসির আসামী ছিলেন। সেই ফাঁসি আটকানো গেলো না। সবচেয়ে আশ্চর্য, বেশ কিছুদিন পরে এই আসামীর আত্মীয় আমাকে তহুরির টাকা শোধ করবার জন্যে এসেছিলেন। প্রচুর ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন, দেরি হয়ে গিয়েছে, আমি যেন কিছু মনে না করি। বলাবাহুল্য, এই তহুরির টাকা গ্রহণ করবার মতো শক্ত নার্ভ ঈশ্বর সেই চরম অভাবের দিনেও আমাকে দেননি।

ঐ আশি টাকা এবং সেই সঙ্গে সকালবেলার প্রাইভেট টিউশানি থেকে কুড়ি টাকা—মোট একশ টাকা থেকে বাড়িভাড়া এবং ভাইবোনদের বিরটি সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হতো। সকালবেলায় এমনভাবে খেয়ে আসতাম যে দুপুরে টিফিনের প্রয়োজন না হয়। সায়েব তা লক্ষ্য করেই বোধ হয়, হোটেল থেকে সঙ্গে করে আনা তাঁর কোল্ড লাঞ্চের সবটুকু খেতে চাইতেন না। নানা অজুহাত তুলে প্রায়ই বলতেন, "আজ আমার খিদে নেই, সবটুকু

খেতে পারছি না—শংকর তোমাকে সাহায্য করতে হবে, যাতে কোনো জিনিস নষ্ট না হয়!"

সামান্য রোজগার, কিন্তু আমার মা ছিলেন মূর্তিময়ী লক্ষ্মী! যখন যত সামান্য রোজগার করে থাকি না কেন মাসের শেষে মায়ের হাতে এক টাকা-দু' টাকা উদ্বৃত্ত থাকতোই। কোন্ ঐশ্বরিক শক্তিতে তিনি লক্ষ্মীর ঝাঁপিকে নিঃশেষ হতে দিতেন না তা আজও আমার কাছে রহস্যময় হয়ে আছে, কখনও মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে সাহস বোধ করিনি। মা' কাছে থাকলে সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে মাকে জিজ্ঞেস করতাম কেমন করে তিনি লক্ষ্মীর কৃপাধন্যা হয়েছিলেন? স্বল্পের মধ্যে প্রাচুর্যের উপলব্ধি আনার নীরব সাধনায় যাঁরা আমাদের সংসারে মগ্ন তাঁরা আমার প্রণম্য।

প্রাচুর্যের মধ্যেও অভাব কীরকম দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তার প্রমাণও কিছুদিনের মধ্যে সায়েবের সান্নিধ্যে পেয়েছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি আমার মনোহরণ করেছেন। তাঁর স্নেহপ্রশ্রয়ে নতুন এক পৃথিবীর বিস্ময় আমার কাছে ধরা দিয়েছে। হাওড়ার অন্ধকার কানাগলি থেকে প্রতিদিন সকালে বেরিয়ে পড়ে আমি এক অবিশ্বাস্য স্বপ্নময় জগতে প্রবেশ করি। বিস্ময়ভরা সেই পৃথিবীর কোনো খবরই এতোদিন আমার জানা ছিল না। আমি অকস্মাৎ কোনোরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই কলম্বাসের মতো নতুন এক বিশ্বভুবনকে আবিষ্কার করেছি। আমি দারিদ্র্যের নিপীড়নে পড়াশোনা ত্যাগ করেছি। আমার ছোটবেলার সমস্ত স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে, আমার পরিচিতজনেরা সভয়ে আমার থেকে দূরে সরে গিয়েছেন, আমার পিঠে বিরাট এক সংসারের দুঃসহ বোঝা—তবু আমার কোনো দুঃখ নেই। নতুন এক মহাতীর্থে আমি মানুষকে নবরূপে আবিষ্কারের দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছি! হাওড়া কাসুন্দিয়ার অপরিণতবুদ্ধি বালক বিদেশী পরশপাথরের সান্নিধ্যে রাশিরাশি স্বর্ণ সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠছে।

পড়াশোনায় কোনোদিন আমি প্রচণ্ড মেধাবী ছিলাম না। কিন্তু পরীক্ষাবন্ধনের বাইরে পড়ে গিয়ে সায়েবের সান্নিধ্যে আমি অধ্যয়নকে ভালবাসতে শিখলাম। এই প্রথম আমার ইংরিজি কবিতা পাঠের আগ্রহ জন্মালো। আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম, অর্থপুস্তকের সাহায্য ছাড়াই কবির বাণী আমাকে আকর্ষণ করছে, কবিতার স্নিগ্ধ আলোকে আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনও কিছুটা সহনীয় হয়ে উঠছে।

কেন এমন হলো? কী করে আমার মনের মধ্যকার প্রদীপটি জ্বলে

উঠলো তা আজও পুরোপুরি আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু আমি অনুভব করতে শুরু করেছি, আমার যেন নবজন্ম হতে চলেছে। দারিদ্র্যের পীড়নে, ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায় নতুন এই বিশ্বভুবনের সঙ্গে যোগাযোগ না ঘটলে আমার এই মানবজীবন অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। পার্থিব কিছু না জুটলেও আমার কোনো দুঃখ নেই—নতুন এক মানুষের হাত ধরে এই বিশ্বসংসারকে নতুনভাবে আবিষ্কারের দুর্লভ সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি।

এই অনির্বচনীয় আনন্দের মধ্যে ছন্দপতন ঘটাতো কেবল অর্থ। আমার অর্থাভাব নয়—আমি যাঁর কাছে কাজ করি তাঁর আর্থিক অনিশ্চয়তা। সায়েবের শরীর সুস্থ নয় এমন একটি গুজব আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর শ্রবণশক্তির গোলমাল ক্রমশই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার ওপর দুটি বড় আঘাত। রানীক্ষেত ক্লাব মামলায় কয়েকজন স্বার্থপর ইংরেজের অর্থলোভের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে ভারতীয়দের কাছে উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টায় সায়েব এলাহাবাদ হাইকোর্টে যে মামলা দায়ের করেছিলেন তা এদেশের ইংরেজ ব্যবসায়ীরা কখনও ভাল চোখে দেখেনি। ফলে সায়েবের কাছে বিলিতি সায়েবদের ব্রিফ আসা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছিল। প্র্যাকটিসের প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে জেনেও সায়েব পিছিয়ে আসতে রাজি হলেন না, অন্যায়ের সঙ্গে হাতমেলানোর বদ অভ্যাস তাঁর রক্তে নেই। যা সত্য তা বলার জন্য যে ক্ষতিই হোক তা মেনে নেবার দুঃসাহস রাখেন তিনি।

এ-দেশের মুক্তির প্রতি তাঁর ছিল অগাধ সম্মান। চার্লি অ্যান্ডরুজ, সরোজিনী নাইডু ছিলেন তাঁর অতি প্রিয়জন। গান্ধীজী ছিলেন তাঁর শ্রদ্ধেয় পুরুষ—জওহরলাল ছিলেন প্রীতিভাজন। ইংরেজ হয়েও তিনি এদেশের দুঃসাহসী যুবকদের প্রাণরক্ষার জন্যে হাসিমুখে আইনের যুদ্ধ করেছেন। (দু'-একটা গল্প পরে কখনও করা যাবে।) কিন্তু স্বাধীনতা যখন এলো তখন ইংরেজ হিসেবে বড় আঘাত তাঁর ওপরেও নেমে এলো। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের আইনজীবী ছিলেন—রেলপথের জটিল মামলায় তাঁর সময়ের অনেকটা কেটে যেতো। কিন্তু একদিন হঠাৎ স্বদেশী রেলপথের স্বদেশী কর্ণধার ইংরেজ বিতাড়নের নীরব সিদ্ধান্ত নিলেন—সায়েবের চেম্বারে রেলের ব্রিফ আসা বন্ধ হলো। কিন্তু এর জন্যে কোনো অভিযোগ ছিল না, ব্রিফ যাতে আবার পাওয়া যায় তার জন্যে কোনো চেষ্টাও ছিল না। ইংরেজের সন্তান বার অফ ইংলন্ডের নিয়মকানুন সম্বন্ধে বড়ই

সচেতন—কোনো ব্যারিস্টার নিজেকে বিজ্ঞাপিত করবেন না। ব্রিফের জন্যে পিছনে ছোটার যে হীনম্মন্যতা আছে তা মেনে নিতে প্রস্তুত নন বয়োবৃদ্ধ সৌম্যদর্শন এই বিদেশী।

একদা প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন সায়েব। মামলা-মোকদ্দমায় তখন নিশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না। কিন্তু অর্থ ও প্রতিভার গৃহিণীপনার জন্য যাঁরা খ্যাতনামা তাঁদের দলে নাম লেখাতে সায়েব কখনই ব্যস্ত হয়ে ওঠেননি। অর্থ সম্পর্কে এক বিচিত্র ছেলেমানুষি তাঁর যৌবনকাল থেকেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল বলে পরে শুনেছি। সায়েবের পিতৃদেব ছিলেন সাধারণ সরকারি কর্মচারী। ছেলেকে কেমব্রিজে পাঠিয়ে বিদ্বান করে তোলার আর্থিক সামর্থ্য তাঁর অবশ্যই ছিল না। কিন্তু তাঁর দূর সম্পর্কের এক কাকা ধনবান ছিলেন। শোনা যায়, এই কাকার স্নেহপ্রশ্রয় ছিল ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি এবং তিনিই হাতখরচ হিসেবে প্রভূত অর্থ তরুণ যুবকটির হাতে দিয়ে অর্থ সম্পর্কে তাঁর মনোবৃত্তি পাল্টে দেন। ছাত্রাবস্থাতেই অনেক অর্থ নিজের খুশিমতো ব্যয় করার স্বাধীনতা সায়েবের ছিল এবং অনেকেই আশা করেছিলন যে কাকার বিপুল সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর হাতেই আসবে।

সেই ধরনের একটা উইলও লেখা হয়ে গিয়েছিল। শোনা যায় ধনপতি কাকা ছিলেন অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ এবং লেটলতিফদের অপছন্দ করতেন। তখনকার দিনে সায়েবের স্বভাব ছিল নাকি অন্যরকম—প্রায়ই নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে কাকার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। এই লেট হওয়ায় কাকা একবার এতোই বিরক্ত হলেন যে তিনি উইলের পরিবর্তন করে সমস্ত টাকা কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিকে দান করে গেলেন। সেই বিপুল অর্থ থেকেই নাকি রাদারফোর্ড ইত্যাদি পদার্থবিদদের গবেষণাকার্য কিছুটা সুগম হয় এবং ক্যাভেন্ডিশ গবেষণাগারে এঁদের সাধনাই একদা আণবিকযুগের সূচনাকে সুগম করলো। সায়েব শেষ বয়সেও রসিকতা করতেন, আমি যদি তখন কাকার বিরক্তির কারণ না হতাম তা হলে হয়তো এই পৃথিবী আণবিক যুদ্ধের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পেতো!

মাসের শেষে আমার লক্ষ্মীস্বরূপা জননী যে কয়েকটি টাকা বাঁচিয়ে রাখতেন তা কয়েকবার কাজে লেগে যেতো। যেখানে কাজ করি সেখানে কাঁচা টাকার এমনই অভাব যে সায়েবের ট্যাক্সিভাড়া দেওয়ার সঙ্গতি থাকে না। অবশ্য প্রতিবারই ট্যাক্সিভাড়ার আগাম আমি যথাসময়ে ফিরে পেয়েছি। কারও অর্থ অনাদায়ী থাক তা সায়েব বোধহয় মনে মনে সহ্য

করতে পারতেন না।

আর একটি অপ্রীতিকর অভিযোগ ছিল। সেটি হলো বাড়িওয়ালার মাসিক ভাড়া। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ এক পাণ্ডেজী টেম্পল চেম্বার্সের ঘরে ঘরে বিল জমা দিয়ে ভাড়া আদায় করতেন প্রতি মাসে। চমৎকার মানুষ, মুখে হাসিটি লেগেই আছে, লিফটের কাছে দেখা হলেই নমস্কার বিনিময় হতো, কিন্তু এঁকে চেম্বারে দেখলেই আমার বুকের মধ্যে অস্বস্তি শুরু হতো। প্রতি মাসেই এই দারোয়ানজী একখানা ভাড়ার বিল আমার হাতে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে যেতেন। চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করতেন, "হালচাল কেমন?" সায়েব সম্পর্কে এই মানুষটিরও যথেষ্ট ভালবাসা ছিল এবং সম্ভব হলে তাঁকে অর্থের তাগাদা দিতে চাইতেন না। এই না-দেওয়া বিলগুলো একটা আলাদা ফাইলে রাখা হতো এবং সেখানে অনেকগুলো কাগজ জমা হয়ে গিয়েছিল।

আমার মনে আছে, এক-আধবার দারোয়ানজী বলতেন, "সায়েবকে জানাও, আমি এসেছি।"

সুইং ডোর ঠেলে পার্টিশনের অপরদিকে গিয়ে দারোয়ানজীর নির্দেশ পালন করতে খুবই কষ্ট হতো, কিন্তু উপায় নেই। সায়েব কী একটা লিখছিলেন, মুখ তুলে দারোয়ানজীর আগমনবার্তা শুনলেন, তারপর বললেন, "নিয়ে এসো।" সায়েব এবার দারোয়ানজীর মুখের দিকে তাকালেন এবং এমনভাবে বললেন, "পরে এসো", যে আমার মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।

দারোয়ানজী বাইরে বেরিয়ে এসে আমাকে ফিসফিস করে বললেন, "আমি তো ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইনি, আমি শুধু মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।"

আমি বললাম, "ওই ওঁর স্বভাব। যিনি পয়সা পাবেন তাঁকে এড়িয়ে চলতে উনি ভালবাসেন না।"

দারোয়ানজী যে ওঁকে কতটা ভালবাসতেন তার প্রমাণ একদিন পেয়েছিলাম। একদিন একখানা চিঠি নিয়ে এলেন। চিঠিতে একটু কর্কশ ভাষায় দশ মাসের বকেয়া ভাড়া সত্বর পেমেন্টের নোটিস দেওয়া হয়েছে। দারোয়ানজী আমাকে চিঠিটা পড়ালেন। বললেন, "চিঠিটা সায়েবকে দেখাবেন না, কোনো রকমে আমাকে এক মাসের ভাড়া দিয়ে দিন, আমি চিঠিটা ফেরত নিয়ে যাচ্ছি।"

আমার কাছে দু' পাঁচ টাকা থাকে, কিন্তু এক মাসের অফিস ভাড়া

কোথায় পাবো ? দারোয়ানজী বললেন, "আপনি চেষ্টা করে দেখুন, আমি চারদিন পরে আসবো।"

এই চারটে দিন যে কী ভাবে কেটেছিল তা আজও আমার মনে আছে। তৃতীয় দিনের মাথায় ভাগ্য অপ্রত্যাশিতভাবে সুপ্রসন্ন হলো, কোথা থেকে দু' হাজার টাকার একটা চেক এসে গেলো। এবং সেই চেক থেকে এক মাসের জায়গায় তিন মাসের বাড়িভাড়া সায়েব নিজেই দিয়ে দিলেন। দারোয়ানজীও খুশি হলেন। বললেন, "খুব ভাল হলো। না হলে এরা মামলা করে দিতো। মানুষটা কীরকম তা আমার মালিক বুঝবেন কী করে ?"

মাসের গোড়ায় সায়েবের এক নম্বর দায়িত্ব ছিল কর্মচারীদের মাইনে এবং হোটেলের বিল। হোটেলের বিল এক মাসও ফেলে রাখা চলবে না। প্রতি মাসের শেষেই আমার দুশ্চিন্তা শুরু হতো—এবার কী হবে ? কিন্তু এমনই ভাগ্যের খেলা যে শেষ পর্যন্ত কিছু না কিছু ঘটে যেতো। আমরা মাইনেও পেতাম এবং হোটেলের চেকও জমা পড়ে যেতো। এক-আধবার বাড়তি কিছু থেকে যেতো এবং তখনই সায়েবের প্রকৃত রূপ আমরা দেখতে পেতাম। আমার চোখ লাল হয়েছিল, প্রায় জোর করেই আমাকে এক সায়েব ডাক্তারের চেম্বারে পাঠালেন। অনেক টাকা ফি, কিন্তু সায়েব কিছুতেই শুনলেন। না। বললেন, "চোখের চেয়ে মূল্যবান অ্যাসেট কিছু নেই, মাই ডিয়ার বয় !"

সমস্ত কর্মীর দলবল নিয়ে তিনি যেতেন আর এক বিখ্যাত ডাক্তারের চেম্বারে কলেরা-টাইফয়েডের ইঞ্জেকশন দেওয়াতে। প্রতিটি রোগীর জন্যে এই বিখ্যাত বিদেশী ডাক্তার আলাদা-আলাদা ফি নিতেন, কিন্তু সায়েব মোটেই পিছ-পাও নয়। বলতেন, "এই সর্বনাশা রোগকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে কোনো কষ্টই কষ্ট নয়।"

মাঝে-মাঝে সায়েব আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। বেড়ানো মানেই ফারপোতে নিয়ে চা-পান। ফারপোর খাদ্যবিলাস আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। খেতে খুব ভাল, তবু মুখে কেক পুরতে কষ্ট হচ্ছে। চেম্বারে দারোয়ানজীর আনপেড বিলগুলো আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সে কথা কী করে সায়েবকে বলবো ? তাঁকে পয়সা সম্বন্ধে উপদেশ দেবার শক্তি আমার ছিল না। মাসিক অর্থচিন্তার এক পর্বে আসতো বৃহত্তর আর্থিক দুশ্চিন্তা। অনাদায়ী ইনকাম ট্যাক্সের জন্যে আলিপুরের সার্টিফিকেট অফিস

থেকে বেলিফ আসতো। একটি আশ্চর্য জীবিকা এই পদাধিকারীর—লোকের স্থাবর অস্থাবর টেনে হেঁচড়ে বার করে অনাদায়ী টাকা আদায় করাই ছিল তাঁর অপ্রিয় দায়িত্ব। একবার এঁরা ঠেলাগাড়ি সঙ্গে করে এসেছিলেন, চেম্বারে বইপত্তর চেয়ার টেবিল তুলে নিয়ে যাবেন।

এমন খারাপ পরিস্থিতিতে জীবনে পড়িনি। কী করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সায়েব ভিতরে বসে রয়েছেন, তাঁর হাতে একটি হলদে রঙের নোটিস ভিড়িয়ে দিয়েছে আলিপুর সার্টিফিকেট অফিসারের বেলিফ। সেই সময় দারোয়ানজী আমার ঘরে উঁকি মারলেন। পরিস্থিতি যে গুরুতর তা বুঝতে তাঁর এক মিনিট লাগলো। তখন তিনি আমাকে বাইরে ডাকলেন, জানতে চাইলেন কী হয়েছে? ব্যাপারটা শুনে, আমাকে দারোয়ানজী পরামর্শ দিলেন, সায়েবকে কষ্ট দেবেন না। বেলিফের হাতে দশটা টাকা দিয়ে এখনকার মতো বিদায় করুন।

সরকারি দূতকে কী ভাবে আমি সরাসরি অর্থের প্রস্তাব দেবো? এ-বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। দারিদ্র্য কাকে বলে আমি জানি, কিন্তু সার্টিফিকেট অফিসার নামক আরও ভয়ঙ্কর শক্তির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়! দারোয়ানজী বোধহয় আমার অবস্থা বুঝলেন। ফিসফিস করে জানতে চাইলেন আমার কাছে দশ টাকা আছে কি না। পেটি ক্যাশে দশ টাকা ছিল আমার কাছে। আমি সেই দশ টাকা দারোয়ানজীর হাতে তুলে দিলাম।

দারোয়ানজী এবার বেলিফকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। মিনিট দশেক পরে বেলিফ কোনো মালপত্র ক্রোক না করেই নিঃশব্দে বিদায় নিলেন। দারোয়ানজী আমাকে চুপি-চুপি বললেন, "ভাববেন না। এক মাসের মধ্যে ও এদিকে আর পা বাড়াবে না।"

যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে দারোয়ানজী বললেন, "এবার উঠি। আজ কিছু বাকি ভাড়া আদায় করতেই হবে।"

এরপরই দীর্ঘ পূজাবকাশে কোর্ট কাছারি বন্ধ। সায়েব নিজেও যাচ্ছিলেন কুমায়ুন পাহাড়ের রানীক্ষেতে যেখানে মেমসায়েব তখন একাকিনী বসবাস করেন। সেবার মেমসায়েবের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে সার্টিফিকেট অফিসারের পাওনা মেটানো হয়েছিল। মেমসাহেবের হাতে তখন কিছু পারিবারিক অর্থ ছিল—এই টাকা তিনি পেয়েছিলেন এক পিসির কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে। তবে সে-টাকার প্রধান অংশ সায়েবের সরকারি দেনা

মেটানোর কাজেই ব্যয় হয়েছিল।

প্রচণ্ড এই আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও কিন্তু একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম যা আজও আমাকে অভিভূত করে। আইন ব্যবসায়ীর কিছু রোজগার চেক ছাড়াও ক্যাশে হয়। কিন্তু নিজের রোজগারের পাই-পয়সার হিসেব তিনি তাঁর বাৎসরিক আয় ব্যয়ের রিটার্নে দাখিল করতেন। একবার কে যেন বলেছিল, এতোই যখন টাকার টানাটানি তখন রিটার্নটা বুঝেসুঝে দেওয়া হোক। সায়েব ভীষণ রেগে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, "জীবনে কখনও এমন প্রস্তাব আমার কাছে তুলো না। আমি এদেশের অতিথি। এই দেশ আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, এখানে আমি নীতিবিগর্হিত কিছু করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।"

প্রচণ্ড অনটনের মধ্যেও এমন কথা পৃথিবীর ক'জন এইভাবে বলতে পারেন? ব্যাপারটা আমি আজও মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে চিন্তা করি।

শরীর ভেঙে আসছে, ঋণের বোঝা বাড়ছে, মামলার সংখ্যাও কমছে। যা কাজকর্ম আসে তারও কিছুটা বিনামূল্যে সারতে হয়। এই অবস্থায় সায়েব ডুবে রয়েছেন গ্রন্থরচনায়। 'ল অফ মাস্টার্স অ্যান্ড সার্ভেন্টস' নামক সুবিশাল গ্রন্থের পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ লেখা চলেছে চেম্বারে। শুনেছি কাজের অভাবকে এইভাবেই সায়েব ঢেকে রাখতেন। অনেকদিন আগে একবার রচনা করেছিলেন ইনসিওরেন্স আইনের ওপর সুবিশাল বই—প্রকাশক বাটারওয়ার্থ। তারপর একবার সম্পাদনা করেছিলেন "উডরফ অন এভিডেন্স'। সেই বইয়েরও প্রকাশক ছিল বাটারওয়ার্থ।

আইনের বই থেকে অর্থ আসে না। আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করতাম। অজানা আশঙ্কায় আমার এক একদিন রাত্রে ঘুম আসতো না। আমার নিজের অর্থাভাব আছে—কিন্তু আমার লক্ষ্মীস্বরূপা মায়ের আশীর্বাদে সেই বিরাট অভাবটুকুও ছোট্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কী করে তিনি আমাদের সংসার ওই ভাবে পালন করেছিলেন তা আজও আমি ভেবে পাই না। মায়ের কাছে সায়েবের এইসব গল্প করিনি—কারণ অযথা তাঁর চিন্তা বাড়বে। এই বৃদ্ধ মানুষটির ভাগ্যের সঙ্গে আমাদের এই পরিবারের ভাগ্যও তো সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে রয়েছে।

তবু নতুন এক অভিজ্ঞতার আলোতে আমি কিছুটা আত্মবিশ্বাস লাভ করেছি; একটা চাকরি গেলে আইন পাড়ায় আর একটা আশি টাকার চাকরি জোগাড় করে নিতে পারবো এমন মনোবল আমি লাভ করেছি।

আমি নিজের সম্বন্ধে অতটা ভাবি না, আমার সমস্ত চিন্তা তখন সায়েবকে নিয়ে।

আমার প্রথম গোপন চিন্তা তাঁর ক্যালকাটা ক্লাবের বিল নিয়ে। স্পেনসের্স হোটেল থেকে ওইখানেই তিনি উঠে এসেছেন। জায়গাটি সুন্দর এবং মাসিক খরচও কিছুটা কম। ক্যালকাটা ক্লাবের একতলার সুইটে পৃথিবী নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নতুন ডিগ্রি তখন আমি প্রতিদিন সংগ্রহ করছি সায়েবের সান্নিধ্যে। এতো অনিশ্চিত আর্থিক পরিস্থিতি, কিন্তু নাটকের নায়ক প্রসন্ন মনে জগতের আনন্দসুধা পান করছেন। আমাকে পরিচিত করে দিচ্ছেন বিশ্বভুবনের নানা দুর্বোধ্য রহস্যের সঙ্গে।

আমি নতুন আলোতে জগৎসংসারকে দেখতে শিখে উল্লসিত, কিন্তু এই সদানন্দ মানুষটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা না করেও থাকতে পারি না। সায়েব অবশ্য তখনও সুরসিক। তিনি বলতেন, "সত্তর বছর পেরিয়ে আমার এই বয়সে কেউ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করে না। এখন কেবল অতীত। ভবিষ্যৎকে কখনও বিশ্বাস করবে না, আমাদের কবি লংফেলো কতকাল আগে সাবধান করে দিয়েছেন।"

কিন্তু আমার চিন্তার অবসান হয় না। দুশ্চিন্তা আমার স্নায়ুতে মিশে রয়েছে। সায়েব রসিকতা করে বলতেন, যারা বেশি ওয়ারি (দুশ্চিন্তা) করে তারাও ওয়ারিয়র (যোদ্ধা।)।

আমরা ভাবতাম, এই সদাশিব মানুষটির সামাজিক সম্মান কীভাবে রক্ষা পাবে? দীর্ঘদীন ধরে কলকাতার উচ্চ সমাজে তিনি সসম্মানে বসবাস করছেন, এইভাবেই চলবে তো?

আমি স্বপ্ন দেখতাম, সায়েব অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছেন। শরীর ঘেমে উঠতো আমার, কারণ তিনদিনের চিকিৎসার খরচ সংগ্রহের সাধ্য নেই আমাদের। কোথা থেকে অর্থ আসবে? কে চেম্বারের ভাড়া শোধ করবে? কে ক্লাবের বিল দেবে? কে কর্মীদের মাইনে যোগাবে? আর সবচেয়ে ভয়াবহ, আলিপুর সার্টিফিকেট অফিসারের ঐ দূতকে কে সামলাবে?

এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পেতাম না। প্রথম দিকে ভয় বাড়তো। তারপর কেন জানি না ভগবানে বিশ্বাস বেড়ে গেল। মনে হলো, যিনি এমন মানুষ, সমস্ত সংসারকে যিনি এমনভাবে ভালবাসতে পেরেছেন, জগৎসংসারের পিতা তাঁকে নিশ্চয় কোনো গভীর অপমানের মধ্যে ফেলবেন

না।

মনের মধ্যে এই বিশ্বাস রয়েছে, জগৎসংসারের মালিকের ওপর নির্ভর করবার মতো মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে, তবুও কৌতূহল হতো কেমনভাবে এই জটিল অঙ্কের সমাধান হবে? আমি নিজে শত অভাব সত্ত্বেও নিয়মিত লটারির টিকিট কাটতাম—ভাবতাম, একবার ডার্বি সুইপ পেলে সায়েবের অনেক দুঃখ ঘুচিয়ে দেবো।

কী আশ্চর্য এই মানবসংসারের গতিপ্রবাহ যাঁকে নিয়ে অলক্ষ্যে আমার এতো চিন্তা, তাঁর জটিল সমস্যার শেষ পর্যন্ত কেমন সহজ সমাধান হলো, এমন সম্মানজনক সমাধান যা আমার কল্পনাতেও আসেনি কখনও। তখনকার দিনের এক বিখ্যাত স্টিল কোম্পানির রেলওয়ে সংক্রান্ত একটি কেস করতে সায়েব মাদ্রাজে গেলেন। কোম্পানির খরচে সঙ্গে নিয়ে গেলেন প্রিয় ভৃত্য দেওয়ান সিংকে। এমন নিষ্ঠাবান সেবক, এমন সৎ ও শান্তপ্রকৃতির মানুষ আমি কম দেখেছি। কোনো কিছুতেই যেন আসক্তি নেই। দিনরাত শুধু প্রভুর সেবা। কিসে তাঁর মঙ্গল হয় তার চেষ্টা।

রেলওয়ে রেটস ট্রাইবুনালে কয়েকদিন মামলা চলবে। আমরা সন্তুষ্ট। কারণ আগামী মাসের কোনো আর্থিক চিন্তা তাহলে থাকছে না।

এই বড় মামলা আমাদের অনেক নিশ্চিন্ত করে তুলেছে। দেওয়ান সিং নিজেও খুব খুশি। দেওয়ান বলেছে, "চেকগুলো এলে, কিছু ট্যাক্সের দেনা শোধ করে দেবেন, মিস্টার শংকর। দেনার চিন্তা সায়েবকে বড় কষ্ট দেয়—আপনারা তো সায়েবকে হাসিখুশি দেখেন। আপনারা কেউ কাছাকাছি না থাকলে সায়েব এক এক-সময় গম্ভীর হয়ে কী সব ভাবেন।"

মামলা কয়েকদিন ভালভাবেই চলছে মাদ্রাজে। আমাদের সুখের দিন বোধ হয় সমাগত। কারণ আরও একটা বড় মামলা আসবার সম্ভাবনা রয়েছে।

সেই সময় আদালতে আর্গুমেন্ট করতে করতে সায়েব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনেকদিন আগে একবার তাঁর হৃদরোগ হয়েছিল, তখন ডাক্তার তাঁকে প্র্যাকটিসে ইতি দিয়ে কোনো সুন্দর পরিবেশে শান্ত জীবনযাপনের পরামর্শ দিয়েছিল। মেমসায়েব রানীক্ষেতে অবসর জীবনযাপনের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন, কিন্তু সায়েব তা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরাজিতের জীবনযাপন করবার জন্যে তাঁর জন্ম হয়নি! আদালত থেকেই স্টিল কোম্পানির প্রতিনিধিরা সায়েবকে লেডি উইলিংডন নার্সিং হোমে

স্থানান্তরিত করেছিলেন। সে খবর যখন কলকাতায় এলো তখন আমার দুশ্চিন্তার অবধি নেই। কতদিন সেখানে থাকতে হতে পারে? সেখানকার প্রতিদিনের খরচ কত! হে ঈশ্বর কলকাতায় অসুখ হলে তবু ভাবনা-চিন্তার একটা সুযোগ আছে। প্রবাসে কী হবে?

আমাদের অযথা চিন্তার কোনো প্রয়োজন হলো না। একদিন ভোরবেলায় বিভূতিদার বাড়ির ঠিকানায় একটা টেলিগ্রাম চরম দুঃসংবাদ বহন করে আনলো—আগস্টের এক অন্ধকার রাত্রে আমাদের সকলকে ছেড়ে, এই বিশ্বভুবনের মায়া কাটিয়ে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কোথা দিয়ে টাকা আসবে, কী ভাবে বিল মেটানো হবে, নার্সিং হোমের খরচ কত হবে—এইসব ক্ষুদ্র চিন্তা থেকে আমাদের চিরদিনের মতো মুক্তি দিয়ে তিনি অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন।

ভয়, ভক্তি, ভালবাসা

দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কাহিনী এখন কারও অজানা নয়। অত্যধিক দায়িত্ব, দারিদ্র্য ও প্রিয়জনদের অবহেলায় এক মানসিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে চিরকালের মতন সব উচ্চাশাকে বিসর্জন দেবার আগের মুহূর্তে যখন সাহিত্যের অমৃতসাগরে স্নান করবার শেষ চেষ্টা চালাচ্ছিলাম তখন সমান্য পরিচিত শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ মহাশয়ের দয়ায় সম্পাদক সাগরময় ঘোষের মুখোমুখি দাঁড়াবার সৌভাগ্য হলো। বলাবাহুল্য লেখা নির্বাচনে এই ভদ্রলোকের হৃদয়হীনতার সংবাদ তখনই হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। বিশ্বস্তসূত্রের খবর ছিল, লেখকদের এই সুপ্রিম কোর্টে কোনোরকম তদ্বির ভবিষ্যৎকে চিরদিনের মতন অন্ধকার করে দেবে।

শ্রীগৌরকিশোর আমাকে জানিয়েছিলেন সারকাসের ট্রাপিজ খেলার চাকরিতে মালিক যেমন তার আনাড়ি জামাইকেও ভর্তি করতে সাহস পাবেন না তেমন সাহিত্যের সমরাঙ্গণে তদ্বিরের কোনো দাম নেই। আমি তোমাকে মন্দিরের রাস্তাটা দেখিয়ে দেবো তারও একটা কারণ আছে। সম্পাদক সাগরময় বিখ্যাত বিখ্যাত লেখকদের পিছনে জুতোর হিল খুইয়ে দেওয়ার চেয়ে নতুন লেখককে সুযোগ দিতে ভালবাসেন। এরপর আমি গেলাম, উনি লেখা রেখে দিলেন এবং পরে খোঁজ করতে বললেন। তারপরের খবরও কারও অজানা নয়, আমি এযাত্রা তরে গেলাম।

আজ যে ক'জন মানুষকে আমি অন্তর দিয়ে ভালবাসি সাগরময় অবশ্যই তাঁদের একজন। এই ভালবাসার সঙ্গে যে কিছুটা ভক্তি এবং কিছুটা ভয় মিশে রয়েছে তা অস্বীকার করলে মিথ্যাচার হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে ভয় কেন? কারণ, শাসন করতে সাগরময়ের জুড়ি নেই। এই জীবনে কয়েকজন লোককে আমি ভয় করে এসেছি যদিও তাঁদের ভালবাসা সবসময় পেয়েছি। এঁরা হলেন আমার ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য ও আমার জননী অভয়ারানী। হেডমাস্টার মশায়ের অতিপ্রিয় ছাত্রদের আমি ছিলাম একজন, কিন্তু ভালবাসার জন্যে শাস্তির কমতি হতো না। আমার মায়ের ক্ষেত্রেও তাই। বাড়ির সব লোক, এমনকি স্ত্রী এবং সন্তানদের সামনেও আমাকে তিনি নিগৃহীত করতে ছাড়তেন না।

হেডমাস্টারমশাই এবং মা দুজনেই চলে গিয়েছেন। নিজের বয়স বেড়ে যাবার এইটাই বোধহয় সুফল—ভয় পাবার লোক আর থাকে না। কিন্তু ভয় পাবার লোকও যে জীবনধারণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন তা বুঝতে আমার অনেক বছর লাগলো। এখন একমাত্র ভয় পাবার লোক সাগরময় ঘোষ। ইনি কীভাবে শাসন করেন তা এখনই লিখে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু সে সাহসও নেই, নিজের হাঁড়ি অপরের হাটে কে ভাঙতে চায়?

ভয় করবার লোক যেমন বিরল, ভক্তি করার লোক আরও বিরল। যাঁদের জন্যে ভক্তিশ্রদ্ধা তাঁরা প্রায় সবাই স্মৃতির আকাশে সুদূর নক্ষত্রে পর্যবসিত হয়েছেন, মন ব্যাকুল হয়ে উঠলে ফ্রেমে বাঁধানো ছবি দেখতে হয়, পুরনো চিঠি ঘাঁটতে হয়, বইতে অটোগ্রাফ দেখতে হয়, লেখা পড়তে হয়। কিন্তু তাতে তো চোখের তৃপ্তি হয় না। আজকাল যখন মনটা খুব ক্লান্ত হয়ে ওঠে, নানা কর্মের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়া দেহটা পুরনো দিনে কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে যেতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখন

সাগরময়ের কথা মনে পড়ে। আমার জীবনের প্রথম ও শেষ দিকপাল সাহিত্য সম্পাদকের পদধূলি গ্রহণ করে আনন্দ পাই।

কেউ কেউ আজকাল বলেন, সাগরময় এখন সসাগরা সাহিত্যপৃথিবীর অধীশ্বর। আপন শৌর্যে ও বীর্যেই তিনি নিশ্চয় সম্রাটের স্বর্ণসিংহাসন অধিকার করেছেন। আমার আপত্তি থাকবার কথা নয়। কিন্তু আমরা যারা বহুবছর ধরে তাঁকে ভালবেসে এসেছি তারা জানি সম্রাটের সভায় বড় ভিড় থাকে, সেখানে দেহরক্ষীদের প্রবলপ্রতাপ, কে কাছে আসবে অথবা দূরে সরবে তা অমাত্যগণ নির্ধারণ করবে এবং পূর্বনির্ধারিত সময় ছাড়া সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরের দর্শন মেলা কখনই সম্ভব নয়। হয়তো সংসারের এই নিয়ম, কিন্তু অবুঝ বালকের মতন আমি পেতে চাই তাঁকে আমার আপনজন হিসেবে আমার ভালবাসার হৃদয় সিংহাসনে। সেখানে আমি তাঁকে অবিরত অনবরত পেতে চাই একান্তে কোনো রকম আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া।

এই সাগরময়কেই আমি আমার নমস্কার জানাই। করজোড়ে বলি, আর কয়েকটা বছর সম্পাদকীয় কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকুন, তারপর দু'জনে ছুটি নিয়ে গপ্পোগুজব চালাতে চালাতে একসঙ্গে ওপারে চলে যাওয়া যাবে। সেখানে যদি 'দেশ'-এর এয়ারমেল এডিশন পাঠানো একান্তই অসম্ভব হয় তাহলে নতুন সেই দেশে নতুন করে দেশ-এর ('স্বর্গীয়'/অথবা 'নারকীয়' ?) সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগ নেওয়া যাবে।

গত অর্ধশতাব্দীর বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই তাঁদের কাছে সাগরময় ঘোষের পরিচয় করিয়ে দেওয়া খুব শক্ত কাজ। যদি বলা হয় তিনি শ্রেষ্ঠ বাংলা সাপ্তাহিক দেশ-এর সঙ্গে অর্ধশতাব্দী ধরে জড়িত আছেন এবং দেশ-এর বর্তমান সাফল্যের প্রধান স্থপতি তিনিই, তা হলেও কিছুই বলা হয় না। এই সময়ে আমাদের এই ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অনেক সাহিত্যপত্র জন্মলাভ করেছে এবং বিশিষ্টতা অর্জন করেছে—সেই সব সাফল্যের পিছনে নিশ্চয় অনেক বিশিষ্ট সম্পাদকের প্রতিভা ও পরিশ্রম রয়েছে। তবু সাগরময় ঘোষ বোধ হয় সকলের থেকে ভিন্ন এবং বিশিষ্ট।

সাগরময় ঘোষ বাংলার শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয়তম বাংলা সাময়িকপত্রের সম্পাদনা করেন। পৃথিবীর সর্বত্র যখন সার্কুলেসন বনাম শ্রেষ্ঠত্বের দ্বন্দ্ব চলছে, সেরা পত্র-পত্রিকা যখন প্রায়ই সর্বাধিক প্রচারিত থাকার সুযোগ

পাচ্ছে না, তখন সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'দেশ' কী করে এই অসাধ্যসাধন করে চলেছেন তা প্রত্যেক বাঙালি পাঠকের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। নানা অসুবিধার মধ্যেও এক বিষয়ে বাঙলা ভাষার পাঠকরা ভাগ্যবান—সর্বোত্তম রুচির লেখক রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র এখনও বেস্টসেলিং তালিকার তুঙ্গে অবস্থান করছেন, এবং এই জনপ্রিয়তার তালিকায় শুধু গল্প উপন্যাস নয়, গভীর তত্ত্বের কাব্য; দর্শন এবং জীবনীগ্রন্থ বিপুল বিক্রমে নিজেদের আসন অধিকার করে আছে। যা কুরুচিপূর্ণ, বাঙালি পাঠকের কাছে তার কোনো স্থান নেই।

এ-কথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না, যে বতমান বাঙলা ভাষার এই বিশিষ্টতার পিছনে সাগরময় ঘোষের অবিস্মরণীয় দান আছে। কারণ তাঁর সম্পাদিত দেশ পত্রিকা প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সুরুচি ও লোকপ্রিয়তার সেতুবন্ধন ঘটিয়েছে।

এই অঘটন-ঘটন-পটিয়ান মানুষটির দিকে একবার নজর দেওয়া যাক। জন্ম ২২শে জুন ১৯১২। আই-এ পর্যন্ত লেখাপড়া রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। মূল নেশা ছিল সঙ্গীত। সঙ্গীতের রোজগারের ওপর ভরসা করেই কলকাতার সিটি কলেজে এসেছিলেন বি-এ পড়তে। তারপর সে যুগে যা ছিল অবধারিত—স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে ছ'মাস জেলজীবন। অবশেষে বি-এ পাশ এবং রাজ্যসরকারি অফিসে কেরানি জীবনের শুরু। যে একবার কেরানি হয়নি তার পক্ষে বোধ হয় বাঙালি মনের সমস্ত রহস্য আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। শুনেছি, সাগরময় ঘোষ এর পর এক ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছিলেন এবং সেই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার যখন একটি বাংলা দৈনিকপত্র প্রতিষ্ঠা করেন তখন তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন মাসিক ৩০ টাকার রাজকীয় মাইনেয়।

১৯৩৯ সালের ৩০শে নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। তিনবছর আগে যেখানে চাকরির জন্যে চেষ্টা করেও বিফল হয়েছিলেন, বাড়ি বসেই সেই প্রতিষ্ঠানে মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি পেলেন সাগরময় ঘোষ। জীবনে কিছুই বৃথা যায় না—দমদম জেলে গানের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অশোককুমার সরকারের সঙ্গে, যাঁকে পাঁচমাসের বন্দী জীবনে পঞ্চাশখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য সাগরময়। সেই সমবয়সী অশোককুমারই প্রথম পরিচয়ের প্রায় এক দশক পরে নিজে বাড়ি এসে চাকরির প্রস্তাব

দিয়ে গেলেন সাগরময়কে।

১৯৩৯ সালের ১লা ডিসেম্বর আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সঙ্গে যে সম্পর্কের সূচনা হলো তা আজ অর্ধশতাব্দীর সুবর্ণসীমা অতিক্রম করে চলেছে। সময়ের আশীর্বাদ অবশ্যই এই বিশিষ্ট সম্পাদকের কপালে রাজতিলক এঁকে দিয়েছে—সেই উনবিংশতি শতাব্দী থেকে কোনো' বাংলা পত্রপত্রিকার কেউ এত বছর ধরে সম্পাদনা কার্যে লিপ্ত থাকতে পারেন নি। তিনবছর আগে সাগরময় যাঁর রেকর্ড অতিক্রম করেছেন বহুদিন তিনিই ছিলেন বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানিত সম্পাদক—প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

কিন্তু কেবল সময়ের সম্মানই সাগরময় ঘোষকে বাংলার সবচেয়ে সম্মানিত সম্পাদকের বিশিষ্টতা উপহার দেয়নি। যখন সাগরময় দেশ পত্রিকার সঙ্গে জড়িত হলেন তখন প্রবাসীই সবচেয়ে শক্তিশালী সাহিত্য পত্রিকা—লেখক এবং পাঠক উভয়েরই নয়নের মণি। তারপর ধীরে ধীরে সাগরময়ের নীরব সাধনায় এক অঘটন সংঘটিত হলো—দেশ পত্রিকায় বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিচিত্র মহোৎসব শুরু হলো। প্রবীণ ও নবীন সাহিত্য প্রতিভার এমন মিলনমেলা এর আগে এমনভাবে বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি।

গত পাঁচ দশকে যাঁরাই বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রবেশ করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে যদি আপনার কিছু জানা না থাকে তা হলে নিঃসন্দেহে লিখে দিন 'এই খ্যাতিমান লেখক দেশ পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন', কিছু ভুল হবে না। যাঁদের প্রথম লেখা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি তাঁরাও দেশের স্নেহ, প্রশ্রয়ে এমনভাবে বিকশিত হয়ে উঠলেন যার কোনো তুলনা নেই। শরৎপরবর্তী এই কয়েকটি দশক বাংলা সাহিত্যের এক স্মরণীয় সময়—কীর্তিমান লেখকগোষ্ঠী কাব্যে, উপন্যাসে, কথা সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা করলেন। এঁদের অনেকের খ্যাতি আজ বাংলার ক্ষুদ্র সীমানা পেরিয়ে সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত। এ-কথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে গত চল্লিশ বছরে যেকটি বাংলা লেখা সর্বভারতীয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে (যেমন সাহেব বিবি গোলাম) তার সবক'টিই প্রথম দেশ-এ প্রকাশিত হয়েছে।

এসব কাজ খুব সহজে হয়নি। যদি বিমল মিত্রকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি বলবেন সাহেব বিবি গোলাম ধারাবাহিক দেশ পত্রিকায় প্রকাশ কালে

যে নিন্দা ও কুৎসার লিখিত স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল তার থেকে মুক্তি সম্ভব ছিল না সম্পাদক সাগরময়ের সুরক্ষা ছাড়া। এক সময় বিমল মিত্র বিদেশে চাকরি নিয়ে স্বদেশ ত্যাগ করার কথাও ভেবেছিলেন; কিন্তু সাগরময় তাঁকে বলেন, দেশ ছাড়া আপনার হবে না। তা হলে সাহেব-বিবি-গোলামর পরবর্তী অধ্যায় লেখা হবে কী করে? এইভাবেই লেখা হলো বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ক্লাসিক 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'। শুধু বিমল মিত্র কেন, বাংলা সাহিত্যের বহু রথী-মহারথকে জিজ্ঞেস করুন, শুনতে পাবেন সাহিত্যের নানা নেপথ্য সংবাদ ও সাগরময় ঘোষের অবদান যা এই সব বিশিষ্ট লেখকদের খ্যাতির শীর্ষে উঠতে সাহায্য করেছে।

১৯৫৪ সালে আগস্টের এক উত্তেজনাময় অপরাহ্নে সাগরময়ের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল। এর আগে ডাকে পাঠানো আমার এক লেখা পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করে তিনি আমাকে এমন আহত করছিলেন যে লেখাটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম।এবার আমার সঙ্গে ছিল আমার প্রথম বই 'কত অজানারে'র পাণ্ডুলিপির প্রধান অংশ। সাগরময় লেখাটি রেখে দিয়ে কয়েকদিন পরে আসতে বললেন। আমি ঠিক করেছিলাম এবার ব্যর্থ হলে পাণ্ডুলিপিটা গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে, সাহিত্যের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবো। কিন্তু আমার এমনই সৌভাগ্য, নির্ধারিত দিনে দেশে নির্বাচিত হবার সুসংবাদ ও এক কাপ সম্পাদকীয় চা একই সঙ্গে পেলাম। তখন বাংলার সাহিত্যাকাশে অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের উপস্থিতি, তাঁরা প্রবল বেগে লিখে চলেছেন, কিন্তু তবু সাগরময় কারুর কথায় কান না দিয়ে পরিচয়হীন আমাকে তাঁর পত্রিকার এক কোণে স্থান করে দিলেন। সেই বিরল সৌভাগ্য লাভ না করলে আমার সাহিত্যযাত্রা চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যেতো।

সম্পাদকীয় ভালবাসা পেয়েছি অকাতরে—কিন্তু শাসনেও সাগরময়ের তুলনা নেই। সম্পাদকের নির্দেশমতো কাজ না করলে তিনি কী রকম নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারেন তা অনেকেই জানেন। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে (আমার প্রায় সমস্ত বই-ই প্রথম দেশ-এ বেরিয়েছে)। তবু দুবছর আগে তিনি আমাকে এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে নির্ধারিত দিনে আমার প্রতিশ্রুত লেখাটি সম্পাদকের হাতে না-এলে দেশ পত্রিকার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্কের অবসান হবে। আমার দোষ ছিল, আমি তখন অন্য একটি পত্রিকার লেখা আগে শেষ

করবার চেষ্টা করছিলাম। একমাত্র সাগরময় ঘোষই এমন চিঠি আমাকে লিখতে পারেন,—শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো। চিঠিটা পেয়ে অত্যন্ত অভিমানের সঙ্গে দু'রাত জেগে আমার বড় গল্পটি (একজন যাত্রী ও রিকশওয়ালা) শেষ করে লেখাটি পাঠিয়ে দিই নির্ধারিত সময় শেষ হবার কয়েক ঘণ্টা আগে। সম্পর্কটা এইখানেই শেষ হবে ভেবেছিলাম, কিন্তু লেখাটা পড়ে, তিনি আমাকে আদর করতে এসেছিলেন—বলেছিলেন খুব ভাল লেখা হয়েছে, আবার লিখতে হবে।

সাধারণ মানুষের এই সাহিত্য জগতে একজন সম্পাদক কী ভাবে সাগরময়ের মতো অসাধারণ হয়ে ওঠেন? আমি অনেককে এই প্রশ্ন করেছি, কিন্তু সদুত্তর খুঁজে পাইনি। খুব সম্ভবত—বড় লেখকের মতো বড় সম্পাদকও প্রকৃতির খেয়াল। তবু সাগরময় ঘোষই বোধ হয় বিদায়ী এক রেনেসাঁস যুগের শেষ নিদর্শন—যিনি সম্পাদনার কাজে সর্বস্ব নিয়োগের উৎকণ্ঠায় নিজে লেখক হবার স্বপ্ন বিসর্জন দেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর অতি প্রিয় সঙ্গীত সাধনা। চারযুগ ধরে প্রাচীনকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর নবীনের সন্ধান চালিয়েছেন তিনি, তাই নবীনের স্পর্শে বাংলার সারস্বত অঙিনা গত অর্ধশতাব্দীতে বারবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। রসের পসারের সঙ্গে তিনি সুরুচির বিস্তার ঘটিয়েছেন নির্ভয়ে—এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও শান্তিনিকেতনের পরিবেশ তাঁকে উৎসাহ যুগিয়েছে। সাগরময় লাজুক, সভাসমিতিতে তিনি যান না, তবু বারবার তিনি বলেছেন—লেখকরাই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু তাঁদের থেকে আপনজন আমার কেউ নেই। কিন্তু লেখকরা তাঁর থেকে কী পেয়েছেন? সবচেয়ে যা তিনি দিয়েছেন, তা বোধহয় বিজয়ী হবার অনুপ্রেরণা এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। যা ভাল বোঝো তা নির্ভয়ে প্রকাশ করো—সমস্ত অগ্নিপরীক্ষার সময়ে সম্পাদক সাগরময় তোমার পাশে-পাশে রয়েছেন—সে শাসকের রোষদৃষ্টিই হোক, অথবা কোনো বিশেষ পাঠক-শ্রেণীর উষ্মাই হোক।

সাগরময় বলেন, সাহিত্যের প্রতি যাদের সততা আছে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের প্রাপ্য। বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকরা সেই আদি যুগ থেকে এখন পর্যন্ত অর্থ অথবা যশ কোনোটা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত নন। কমার্শিয়ালিজমের বিষবাষ্প থেকে লেখকরা যতদিন মুক্ত থাকবেন ততদিন বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিরাপদ।

সম্পাদকীয় আশ্রয় ও প্রশ্রয়ের পরিবর্তে পাওয়াও গিয়েছে অনেক

কিছু। বাংলা ভাষায় সাগরময় ঘোষই বোধ হয় একমাত্র সম্পাদক যিনি যে কোনো লেখককে লেখার নির্দেশ দিতে পারেন। কোনো লেখক তাঁকে না বলবেন না। অথচ সম্পাদকীয় জগতে কে না জানে সম্পাদকের সবচেয়ে শক্ত কাজ ঠিক সময়ে ঠিক যে লেখা যে-লেখকের কাছ থেকে প্রত্যাশা তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁর কাছ থেকে আদায় করা।

সাধারণ এক যুগের অসাধারণ সম্পাদক পরিণত বয়সেও সমান উৎসাহে লেখক খুঁজে বার করা এবং লেখক তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে আর একবার নমস্কার।

একটি নমস্কারে

যখন সাহিত্যজগতে এলাম তখন বাংলা সাহিত্যের এক আশ্চর্য সময়। পঞ্চাশের দশকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকে, কিন্তু তারাশঙ্কর, মানিক, শরদিন্দু, বনফুল, প্রেমেন্দ্রে মিত্র, বিভূতি মুখোপাধ্যায, বিমল মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, মুজতবা আলী উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো বিরাজ করছেন। সেই সঙ্গে আছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী এবং জরাসন্ধের মতো প্রতিভাবান লেখকেরা। এঁদের আসরে চেয়ার না-পেলেও মাটিতে বসা ছিল চরম সৌভাগ্য এবং চরম কৃতিত্বের কথা।

'কত অজানারে' প্রকাশের পর প্রথম আশীর্বাদ পেয়েছিলাম বিমল মিত্রের কাছ থেকে। তিনি আমাকে প্রকাশক খুঁজে দিয়েছিলেন, মুখবন্ধ রচনায় সাহায্য করেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র উপহার দিয়েছিলেন বইয়ের নাম—তিনি তখনও নামের রাজা। গৌরকিশোর ঘোষ (রূপদর্শী) ধারাবাহিক প্রকাশের কী সুযোগ দিয়েছিলেন তাও তো আপনাদের জানা। বই বেরুবার পরে অন্নদাশঙ্কর রায়কে একখানা কপি পাঠিয়েছিলাম। শান্তিনিকেতন

থেকে আশীর্বাদের সঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, "আপনার প্রথম সাফল্য যেন জীবনের শেষ সাফল্য না হয়।"

এত লোকের আশীর্বাদ রয়েছে, তবু সাহিত্যিক মহলে অনেকে বলতে লাগলেন, উকিলের মুহুরী—একখানা গল্প ভগবান তৈরি করে দিয়েছিলেন, লিখে ফেলেছে। এই সময় দু-একটা গল্প লিখি—কিন্তু বিখ্যাত কাগজের সম্পাদক পূজা সংখ্যায় 'স্থানাভাবে' তা ফিরিয়ে দেন। এদেশে 'ওয়ান বুক' অথরের কোনো সম্মান নেই। সেই সময় জীবনসংগ্রামের যন্ত্রণায় আমি ক্ষতবিক্ষত, কত অজানারে লিখে যে ২৮৫ টাকা পত্রিকা থেকে পেয়েছিলাম তাতে বাড়িতে বিদ্যুৎ ফিরে এলো (কয়েক বছর আগে সহজবোধ্য কারণে লাইনে কাটা যায়)। মনটা যখন বেশ দুর্বল হয়ে উঠেছিল তখন আবার আশা ছেড়ে দিয়ে বসেছিলাম। সেই সময় বিমল মিত্র রক্ষা করলেন—পত্র মাধ্যমে লিখতে অনুরোধ করলেন বসুধারা পত্রিকায়। ওই পত্রিকাতেই পাঠালাম 'রবার্ট সাহেবের গৃহত্যাগ'—বিমল মিত্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভালবাসায় লিখলেন, 'পড়লাম! এখনও পর্যন্ত ফারসট! পরে আবার জানাবো।' বিমল মিত্র তখন রসিকতা করে বলতেন, 'ফারসট হবার নেশা না থাকলে লেখক হওয়া যায় না।'

এর পরেই আমি 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহে নামি। অনেক সময় কেটে গেল, আরও সময় লাগল—সেই সময় আমার শুভানুধ্যায়ী তখনকার বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীনিরপেক্ষ (অমিতাভ চৌধুরী) একদিন বললেন, 'মাতৃজঠরে সন্তান নির্ধারিত সময়ের বেশি থাকলে সন্তান ও জননী দুয়েরই ক্ষতি হয়।' অবশেষে ১৯৬১ সালে চৌরঙ্গীর ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হল। সম্পাদক সাগরময় একটা শর্ত দিয়েছিলেন : লেখার সময় চঞ্চলমতি হওয়া চলবে না। তাই আমার বিয়ে আটকে গেল—যেদিন লেখা শেষ সেদিন বিয়ে করতে চললাম। সম্পাদক যদিও এখনও বলেন, এই উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে তাড়াহুড়োর ইঙ্গিত রয়েছে—আরও তিন সপ্তাহ চলা উচিত ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে পাঁজিতে কোনো বিয়ের দিন থাকতো না।

এর কিছুদিন পরে 'শুভানুধ্যায়ীরা' অভিযোগ করলেন—নিজে যা দেখেছে তাই ও লিখতে পারে, 'আমি' ছড়া ও গল্প বলতে পারে না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বছরখানেক দিবারাত্র পরিশ্রম করে লিখলাম প্রথম সিরিয়াস বিজ্ঞানভিত্তিক বাংলা উপন্যাস 'নিবেদিতা রিসার্চ

ল্যাবরেটরি'। খুব ভয় হয়েছিল। পত্রিকা প্রকাশের সময় আমি ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সেবার একই কাগজে 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' লিখছিলেন) কলকাতা থেকে পালিয়ে আত্মগোপনের পরিকল্পনা করেছিলাম। নিবেদিতাকে উৎসাহ দিয়ে পাঠক-পাঠিকারা আমাকে বাঁচিয়েছিলেন—কোনো কোনো মহলে আমি প্রবেশপত্র পেলাম।

এরপরেই আমি শিল্পজগতের পটভূমিকায় এক ভাস্করের জীবন আখ্যান রচনা করি—একজন বিখ্যাত ভারতীয় শিল্পীর অ্যালবামের ভূমিকা আমাকে 'রূপতাপস' রচনার উৎসাহ যোগায়। এই বইটা আজও আমার প্রিয়। এই পর্যায়ে আমার সবচেয়ে ভালবাসার মানুষ ছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলতেন, 'কখনও ফেনাবে না, উপন্যাসের আকার তিনশ পাতার বেশি হলে, বাড়তি প্রতিটি লাইনের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব লেখকের।' আরও একজন প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতেন—তিনি মুজতবা আলী। তাঁর উৎসাহে কিছু স্যাটায়ার ও রম্যরচনা লিখি—'পাত্রপাত্রী' বইটা ওঁর আশীর্বাদ পেয়েছিল।

১৯৬৭তে-বিদেশে যাবার সুযোগ এল। ফিরে এসে প্রথম লিখলাম পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের কথা 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'—এমন বিপুল উদ্দীপনা আমার কোন লেখা থেকেই সঞ্চারিত হয়নি। একটু পরেই লিখলাম 'বোধোদয়'—আমার বিতর্কিত বই, কেউ বলে খুব ভাল, কেউ বলে খুব খারাপ। এই উপন্যাসে আমি নাকি স্বধর্মচ্যুত হয়েছি—আসলে কী হয়েছে, তা আজও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। এই বইতে উপন্যাস-ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন হয়েছে, আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিমল মিত্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। স্নেহে অন্ধ শরদিন্দু বলেছিলেন, 'ব্রাইট, বোলড, বেপরোয়া—চালিয়ে যাও।"

এরপর আমি নগর কলকাতা, স্বাধীনতা-পরবর্তী শিল্প বিপ্লব এবং জীবন সংগ্রামে পশ্চাদপসরণকারী বাঙালির গল্প লেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠি। এই পর্যায়ে পাঁচখানি উপন্যাস—সীমাবদ্ধ, জন-অরণ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্থানীয় সংবাদ ও সুবর্ণ সুযোগ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নগর কলকাতা ও বাঙালির অন্ন সংস্থানের একটা ইতিবৃত্ত আমার সাধ্যমত রেখে গেলাম। বলাবাহুল্য এই পর্যায়ে আমার অনুপ্রেরণা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাণী ও রচনা—তাঁকেও নমস্কার। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই আমার শ্রদ্ধেয় বাঙালি। দীর্ঘদিন ধরে অপ্রিয় কথা বলে গেছেন বলে বাঙালিরা

তাঁকে এড়িয়ে চলে।

এই পাঁচ উপন্যাসের ফাঁকে-ফাঁকে আমি একটা পারিবারিক দায়িত্ব সেরে ফেলেছিলাম। বাবা ছিলেন নাট্যকার—প্রথমে সফল পরে ব্যর্থ। সাধারণ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কাজ শুরু হয় সম্রাট ও সুন্দরীর। এই বইটা সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা আছে—আমার বাবাকে উপহার দিয়েছি নানা কারণে।

কয়েক বছরের চেষ্টায় আমার দীর্ঘতম উপন্যাস 'ঘরের মধ্যে ঘর' অবশেষে দেশ পত্রিকায় বেরোতে আরম্ভ করে। দু'বছরের ওপর পত্রিকায় বেরোয় চৌরঙ্গী উপন্যাসের এই পরবর্তী অধ্যায়। এই উপন্যাস আমি আর একবার লিখেছি—দেরি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আর একটু কাজ করবার লোভ ছাড়তে পারিনি।

নিজের সম্বন্ধে আর কী বলব ? নিজের যা বলবার থাকে তা তো গল্প-উপন্যাসেই বলে ফেলি—লেখককে তো সেখানে আমি লুকিয়ে রাখি না। আমার মধ্যে দুটি স্বভাব আছে—একটি স্থির, আরেকটি অস্থির। যা ভাল হয়েছে, যা ভাল লেগেছে সেখানেই বাসা বাঁধতে চায় একজন। আর অস্থির বলে পরিবর্তন চাই—সে পরিবর্তন খারাপ হলেও সে মাথা ঘামায় না। বিরাট এই বসুন্ধরার চলমান মানুষের শোভাযাত্রা আমাকে মুগ্ধ করে ; এই মানবতীর্থে মানুষের নানা রূপ আবিষ্কারের সুযোগ পাঠকরা আমাকে দিয়েছেন ভাবলে কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা নত হয়ে আসে।

সেই ছোটবেলায় ঈশ্বরের সংসারে আমার পরীক্ষা শুরু হয়েছিল এবং সুখে-দুঃখে আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে পঞ্চাশের সুবর্ণ সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছি। দীর্ঘ এই পথে কষ্টও যেমন পেয়েছি তেমনি পেয়েছি মানুষের অপ্রত্যাশিত ভালবাসা। আজ এই সাফল্য আমাকে তেমন নাড়া দেয় না। যতটা অভিভূত করে স্নেহ ভালবাসা। বিরাট এই প্রাপ্তিযোগকে হিসেবের কোন বিভাগে ফেলব তা আগে বুঝতাম না, এখন ঠিক হয়ে গিয়েছে—'অনার্জিত আয়', ইংরিজি হিসাবশাস্ত্রবিদরা যাকে বলেন 'unearned income.' অর্জন করিনি, কিন্তু পেলে ভীষণ ভাল লাগে, তাই পাঠক-পাঠিকার প্রতিটি উৎসাহ-বাক্য সঞ্চয়ের ঝুলিতে পুরেছি, যদিও পরবর্তী জন্মে আমাকে বিপুল সুদসহ এই দেনার দায়িত্ব নিতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে গেলে গভীর কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ সজল হয়ে উঠে,—শত জন্ম ধরে বাঙালি পাঠক-পাঠিকার দাসত্ব করলেও আমার ঋণ

শোধ হবে না।

আমার দর্শন? কাঁসি ঘণ্টা বাজিয়ে দর্শন প্রচারে মন চায় না—তবু অনেক কথা থাকে। সেসব চুপি চুপি লাইনের ফাঁকে ফাঁকে আমার রচনার সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছি। অনুসন্ধানী ইচ্ছে করলেই তা খুঁজে পাবেন। শুধু আর একবার বলতে ইচ্ছে হয়—ভালবাসার থেকে বৃহত্তর কোনো শক্তি নেই। এই মানব সংসার ভালবাসাতেই নিমজ্জিত হয়ে হয়েছে। যতদিন ভালোবাসা আছে ততদিন মানবসমাজের কোনো চিন্তা নেই। আর এই ভালবাসার স্ফুলিঙ্গেই মানুষের বুকের প্রদীপটি নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে উঠতে পারে। মনের প্রদীপ জ্বললেই মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তির সম্ভাবনা। মানুষের দুঃসাধ্য কিছু নেই। রসসৃষ্টির পরে লেখকের একটিই কাজ....অন্তত একটি বুকের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া।

একটি মৃত্যু

আমি তাঁর সমকালীন শিল্পী বা নিকটতম বন্ধু নই। তাঁর গুণমুগ্ধ সিনেমা দর্শকদেরও একজন বলে নিজেকে দাবি করতে পারি না। বাংলা চিত্রের নির্বাক যুগ আমার জন্মের পূর্বের ইতিহাস। আর যখন সবাক ধীরাজ ভট্টাচার্য নায়করূপে বাঙালি দর্শক হৃদয়ে পুলক ও বিস্ময়ের সঞ্চার করছেন, তখন আমি ইতিহাস, ভুগোল হস্তলিপি অঙ্ক ইত্যাদি নিয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছি। সিনেমা তখন নিষিদ্ধ ফলের মতো—একমাত্র বড়রাই তার রসাস্বাদনের অধিকারী।

ফলে যে ধীরাজ ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে সমগ্র বাংলাদেশ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন, তার কোনো পরিচয় প্রদান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আর এক ধীরাজ ভট্টাচার্য ছিলেন—লোকচক্ষুর অন্তরালে। নিঃসঙ্গ, ক্লান্ত অবসন্ন ধীরাজ ভট্টাচার্য। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে তাঁকেই আমি শেষ দেখে

এসে এসেছিলাম। ১লা মার্চ রবিবার। পাঁচটার সময় পূর্ণ সিনেমার সামনে জনৈক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অসুস্থ ধীরাজ ভট্টাচার্যর অন্যতম অন্তরঙ্গ তিনি। তাঁর সঙ্গেই দেখতে যাবো মৃত্যুপথযাত্রী প্রতিভাকে। কিন্তু তার আগেরও এক ইতিহাস আছে। আমার বাল্যস্মৃতির সেই অংশটুকু বলে রাখবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

আমাদের পাড়াতে এক নতুন বৌদি এলেন। তাঁকে প্রথমে পাড়ার গৃহিণীরা এমন কিছু খাতির করেননি। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে জানা গেল তাঁর বাপের বাড়ি পাঁজিয়া গ্রামে। যশোর জেলায় পাঁজিয়া গ্রাম সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কৌতূহলী হবার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু যখন বৌদি বললেন, চিত্রতারকা ধীরাজ ভট্টাচার্য তাঁদের গ্রামের লোক, তখন রাতারাতি তাঁর দাম বেড়ে গেলো। পাড়ার গিন্নিরা জিজ্ঞাসা করলেন 'ও টুলুর মা, ধীরাজ ভট্টাচার্যকে দেখেছো তুমি?'

বৌদি কোনোরকম দ্বিধা না করে বললেন, 'কতবার দেখেছি। আমাদের গাঁয়ের ছেলে, দেখবো না তাকে?'

পাড়ার গিন্নিরা নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। একটু শান্তি পাবার জন্য বলেছেন, 'তা তোমাদের বাড়ি থেকে নিশ্চয় কিছুটা দূর আছে।'

বৌদি তাঁদের বুকে আঘাত হেনে জানিয়েছেন, 'একেবারে ঠিক পাশেই ধীরাজ ভট্টাচার্যের বাড়ি।'

সে দিনের বাংলাদেশে ধীরাজ ভট্টাচার্যের অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তার একটা নমুনা পাওয়া গেলো। কারণ পাড়ার সবাই বৌদির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলেন। আমরাও বৌদিকে কেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, অন্য পাড়াতে আমাদের দরও বেড়ে গিয়েছিল।আমরা যা-তা নই, আমাদের বৌদি ধীরাজ ভট্টাচার্যের গাঁয়ের মেয়ে।

এই বৌদির ভাই অধীর একসময় পাঁজিয়া গ্রাম থেকে হাওড়ায় এসে হাজির হলেন। বৌদিদের বাড়িতে স্থানাভাব। কিন্তু তাঁর ভায়ের স্থানাভাব হলো না, পাড়ার অনেকেই তাঁকে রাত্রে থাকবার জায়গা দিতে চেয়েছিলেন। কেন জানি না, বৌদির ভাই আমাদের বাড়িটাই পছন্দ করলেন এবং তাঁর পাশে শুয়ে গল্প শুনতে শুনতে আমি মনে মনে কত দিন পাঁজিয়া গ্রামে চলে গিয়েছি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ধীরাজ ভট্টাচার্যের একখানা ছবিও আমি তখনও দেখিনি। কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। ধীরাজ ভট্টাচার্যের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার গিন্নি এবং কাকা, মেসো, দাদাদের

মুখমণ্ডলের যে বিস্ময়কর পরিবর্তন হতে দেখেছি তাতেই তিনি আমার মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে গিয়েছিলেন। পাড়ার গৃহিণীরা বলেছেন, 'চেহারা, আহা যেন স্বয়ং কন্দর্প।'

কন্দর্পকে আমি দেখিনি। তাই কতদিন রাত্রে বৌদির ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছি, 'ধীরাজ ভট্টাচার্য বুঝি খুব ফরসা?' তিনি বলেছেন, 'সে তোকে কী করে বোঝাবো। খু-উ-ব।' আমি জিজ্ঞাসা করেছি, 'আপনি ওর সঙ্গে কথা বলেছেন?' নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে উনি বলেছেন, 'কতবার। এই যেমন তোর সঙ্গে কথা বলছি, ঠিক তেমনি ভাবে।' আমি জিজ্ঞাসা করেছি, 'আপনার সঙ্গে দেখা হলে চিনতে পারবেন?' বৌদির ভাই এবার একটু রেগে উঠেছিলেন। বললেন, 'দেখা হলে শুধু-চেনা কেন, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়াবেন : বাবা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করবেন। তবে ছাড়বেন।'

অধীরদাকে এরপর আমি যথাসাধ্য সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করেছি। শর্ত ছিল, যদি কোনোদিন ধীরাজ ভট্টাচার্যের বাড়িতে তিনি যান, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

নানা কর্মভারে বৌদির ভাইয়ের আর ধীরাজবাবুর বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। আমার না-দেখা নেপোলিয়নের সঙ্গে কোনোদিনই চাক্ষুষ পরিচয় হবে না, সে কেমন কথা? মনের মধ্যে একটু সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল সত্যই ধীরাজবাবুর সঙ্গে ওঁদের কোনো পরিচয় আছে কি না!

বৌদির ভাই বোধ হয় আমার মনের ভাব আন্দাজ করেছিলেন। তখন পুজোর সময়। সেবার হঠাৎ বললেন, 'চল আমার সঙ্গে পাঁজিয়াতে। নিজের চোখে না দেখলে তো বিশ্বাস করবি না।'

আর্থিক অনটন এবং অন্যান্য অসুবিধা সত্ত্বেও সেই সুযোগ আমি নষ্ট করিনি। হাওড়া থেকে শিয়ালদহ স্টেশন, শিয়ালদহ থেকে যশোর এবং যশোর থেকে বাসে করে একদিন সত্যিই আমি পাঁজিয়াতে এসে হাজির হয়েছিলাম। ধীরাজ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যাবার পথে একটা বাঁশের সাঁকো পড়ে। সেই সাঁকো পেরিয়ে বৌদির ভাই আমাকে বাড়িটা দেখালেন। আমি পরম বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছি। এতো সাধারণ বাড়ি! সাধারণ ইঁট-কাঠের তৈরি। আমার সেদিনের মানসিক অবস্থা স্মরণ হলে আজও লজ্জা লাগে। সাধারণের সংসারেই যে অসাধারণের আবির্ভাব হয় তা

আমার মনে ছিল না।

আমি অবাক হয়ে শুনলাম, এই সাধারণ গ্রামে প্রতি বৎসর পূজায় অসাধারণ ধীরাজ ভট্টাচার্যের আগমন হয়। তিনি আসবেনই। যেখানে যতো কাজ থাক, সব ফেলে গ্রামে ফিরে আসবেন এবং শুধু বেড়াতে আসা নয়, প্রতিদিন স্টেজ বেঁধে অভিনয় হবে। মায়ের পূজার আঙিনাতলে সন্ধ্যার আগে থেকেই দলে দলে লোক জমতে শুরু করবে। হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদাভেদ থাকবে না। গৃহবধূরা বিকেলের মধ্যেই রান্না শেষ করে রাখবেন। অন্য সময়ে তো সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের চোখে ঘুম নেমে আসে। কিন্তু মহাপূজার কয়েকদিন পাঁজিয়া হঠাৎ কলকাতা হয়ে উঠবে। সবাই সারারাত জেগে থাকবে। অভিনয় হবে। এবং গ্রামের ছেলে ধীরাজ, যে ধীরাজ বহু বাঙালির হৃদয় জয় করেছে, সেও অভিনয় করবে।

সেই প্রথম দেখলাম ধীরাজ ভট্টাচার্যকে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে। কলকাতার স্টেজে, কলকাতার সিনেমাতে না দেখে, কলকাতার আমি এক গ্রাম্য পরিবেশে পেট্রোম্যাক্স এবং কারবাইডের আলোয় ধীরাজ ভট্টাচার্যকে প্রথম দেখলাম। সেই আমার প্রথম সম্পূর্ণ রাত্রি জাগরণ। কিন্তু একটুও বুঝতে পারিনি। সমস্ত রাত ধীরাজ ভট্টচার্য যাদুবলে আমাদের যেন মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। কতক্ষণ সেইভাবে ছিলাম জানি না। হঠাৎ মনে হলো পেট্রোম্যাক্সের আলো যেন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। স্টেজ থেকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম পূর্ব আকাশে সূর্যের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়েছে।

সেদিনের সে বিস্ময় ভোলাবার নয়। আমার কল্পনার ধীরাজ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আসল ধীরাজকে মিলিয়ে নিয়েছিলাম। হাওড়া থেকে পাঁজিয়া পর্যন্ত ছুটে আসার শ্রম সার্থক হয়েছিল আমার।

বৌদির ভাই বলেছিলেন, "চল আলাপ করিয়ে দিই।" আমার সাহস হয়নি। এতোদিনের পরিচিত হওয়ার সাধ যেন এক মুহূর্তে উধাও হয়ে গেলো। দূর থেকে দেখেই পরিতৃপ্ত হয়েছি, এর থেকে বেশি সুখ আমার সহ্য হবে না। তাঁর গরবে গরবী পাঁজিয়ার লোকদের দেখেও আমার হিংসে হয়েছে। কোনো সম্পর্কের সূত্র ধরে যদি আমিও তাঁর খ্যাতির অংশীদার হতে পারতাম। একটি সম্পর্ক শীঘ্রই আবিষ্কার করেছিলাম এবং সেদিন আমার সৃজনী প্রতিভার তারিফ না করে থাকতে পারিনি। আমরা দু'জনেই যশোহর জেলার লোক, সুতরাং প্রায় আত্মীয় বলা যেতে পারে!

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সে দাবিও বেশি দিন টিকলো না। র‍্যাডক্লিফ

সায়েবের এক কলমের খোঁচায় আমাদের আত্মীয়তা ছিন্ন হলো।আমার জন্মস্থানকে বিনাদ্বিধায় যশোহর থেকে কেটে নিয়ে তিনি অন্য এক জেলার সঙ্গে জুড়ে দিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে একদিন জানলাম আমি চব্বিশ পরগনার লোক—মাইকেল মধুসূদন ও ধীরাজ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। অনেকদিন পরে ধীরাজ ভট্টাচার্যকে গল্পচ্ছলে এ-কথা বলেছিলাম। আমার এই হাল্কা উক্তিকে তিনি কিন্তু হালকাভাবে নিলেন না। গম্ভীর হয়ে উঠলো তাঁর মুখ। বললেন, "কী সোনার দেশই ছিল আমাদের, ভাই।" বলতে বলতে তাঁর চোখ ছলছল করে উঠেছিল। কী ভালই বাসতেন যশোরকে। র‍্যাডক্লিফ সায়েবের রায়ের পরও তিনি দেশে গিয়েছেন, অভিনয় করেছেন।

আমার সঙ্গে ধীরাজ ভট্টাচার্যের সম্পর্ক র‍্যাডক্লিফ সায়েবর সঙ্গেই শেষ হয়ে যেতো, যদি না দু'জনেই এক ভিন্ন কারণে সাহিত্যের মালঞ্চে অনধিকার প্রবেশ না করতাম। ধীরাজ ভট্টাচার্যের 'যখন পুলিশ ছিলাম' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হলো। লোকে চমকে উঠলো—একি সেই সিনেমা-থিয়েটারের ধীরাজ? মা সরস্বতীর সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক তো আদায় কাঁচকলায়। কিন্তু তবু বিস্মিত বাঙালি পাঠক দেখলেন জীবন-সায়াহ্নে সিনেমার এক কেষ্টঠাকুর অপরূপ ভঙ্গিতে লিখে চলেছেন। গৌড়জনের চিত্ত জয় করলেন লেখক ধীরাজ ভট্টাচার্য।

'যখন পুলিশ ছিলাম', একদিন শেষ হলো। কিছুদিন পরে দেশ পত্রিকার সেই শূন্য স্থানটুকু অধিকার করলো এক ব্যারিস্টারের বাবুর আত্মকথা। তারপর একদিন বর্মণ স্ট্রিটের দেশ পত্রিকার আপিস থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এসেছিলাম জনৈক প্রকাশকের দপ্তরে। প্রকাশক একখানি বই দেখালেন আমাকে। বললেন, "আপনার বইটাও এইভাবে কম্পোজ করতে চাই।" কথা শেষ করে উঠে পড়লাম। বইটা টেবিলে রেখে চলে আসছিলাম। ভদ্রলোক হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—"এ বইটা নিয়ে যান।" জীবনে সেই প্রথম বিনামূল্যে গ্রন্থপ্রাপ্তি—প্রথম প্রেমের মতোই অবিস্মরণীয়। আর সে বই-এর নাম—'যখন পুলিশ ছিলাম।'

বই নিয়ে আবার বেরোতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এবারও বাধা পড়লো। মাথায় মাড়োয়ারি টুপি, আর যতদূর মনে হচ্ছে ফুলপ্যান্ট পরে ঘরে ঢুকলেন, এক তীক্ষ্ননাসা প্রৌঢ়। আমার চিনতে দেরি হয়নি। যাঁর বই বিনামূল্যে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি তিনিই—স্বয়ং ধীরাজ ভট্টাচার্য। একটা চেয়ার

নিয়ে বসে পড়লেন। প্রাণখোলা আত্মভোলা মানুষ। পুরো যশুরে টানে বললেন, "এককাপ চা খেতেই হবে। টালিগঞ্জ থেকে সোজা আসছি।"

প্রকাশক পরিচয় করিয়ে দিলেন। আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আমার হাতটা ধরে বললেন, "আহা কি মিষ্টি হাত তোমার। পরিচয় করে বড্ড খুশি হলাম।" আমার যে তাঁর থেকে শতগুণ আনন্দ হচ্ছিল, তা কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে পারিনি। উনি বুঝতেও চাননি। বললেন, "আমার বইতে নিজেকে যেন বড্ড জাহির করে ফেলেছি। তোমার তা হয়নি। নিজেকে কেমন সুন্দরভাবে একপাশে সরিয়ে রেখেছো।"

একদিনের আলাপ যে এতোদূর গড়াতে পারে, তা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা নিজেদের একান্ত পরিবারিক সংবাদ আদান-প্রাদান আরম্ভ করে দিয়েছি। ওঁর বাবা, ওঁর মায়ের কথা শুনিয়েছেন আমাকে। আমার বাবা, মা, ভাইদের কথাও সব বলে ফেলেছি ওঁকে। কী অপরূপ কথা বলার ভঙ্গি। বৈঠকী গল্পের রাজা। অথচ মনের মধ্যে সামান্য জটিলতা নেই, দম্ভ নেই। বললেন, "ভাই, আমাদের কী হবে বলতে পারো ?" একটি প্রখ্যাত ইংরিজি সংবাদপত্রে জনৈক বাঙালি সমালোচকের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করলেন। বললেন, "উনি লিখছেন, দেশটা গোল্লায় গেলো। সাহিত্যের কমলবনে মত্ত হস্তীরা বিচরণ করছে। সাহিত্যের আভিজাত্য বলে কিছু থাকলো না আর। জেলের প্রহরী, উকিলের মুহুরী, রঙ্গালয়ের নট সবাই ভদ্রলোক সেজে সাহিত্য-মন্দিরে ঢুকছে।" মনে হলো গভীর দুঃখ পেয়েছেন তিনি, লেখকের মন্তব্যে। আমি ওঁকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলাম, তার প্রয়োজন হলো না। উনিই আমাকে বললেন, "আমাদের আঘাত সহ্য হয়ে গিয়েছে। তোমরা যেন ভেঙে পোড়ো না।"

সেই থেকেই আলাপ। যতবার দেখা হয়েছে জড়িয়ে ধরেছেন। বলেছেন, "আমার বাড়িতে এসো একদ্দিন। তুমি আমার ঘরের লোক—যশোর জেলায় বাড়ি—তোমাকে আমি নেমন্তন্ন করতে পারবো না।" তারপর কলেজ স্ট্রিটে বসে বসেই গল্প শুরু হয়ে গিয়েছে। সে কী প্রচণ্ড আড্ডা। কথা যেন শেষ হতে চায় না। তিনি একাই একশ। একাই সকলকে কাঁদিয়ে, হাসিয়ে, চমকিয়ে মাত করে রাখেন। কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা ! কত অদ্ভুত মানুষকে দেখেছেন তিনি। আর অদ্ভুতভাবেই মনে রেখেছেন তাদের। বৈঠকের সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। উনি বলেছেন, "আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সিনেমা-

থিয়েটার করে যারা পেট চালায় তাদের এসব রপ্ত হয়ে যায়।"

সিনেমা-থিয়েটার নিয়ে মাথা ঘামাইনি আমি। বলে ফেলেছিলাম, "সেই এলেন সাহিত্যে, কিন্তু বড্ড দেরিতে।" উনি আবার হা-হা করে হেসে উঠলেন। "যা বলেছো ভাই। যা রসকস ছিল টালিগঞ্জ তা নিঙড়ে বার করে নিয়েছে। লিখতে গেলে কেমন যেন আর্টিফিসিয়েল হয়ে ওঠে। চোখের সামনে দেখি ক্যামেরা 'প্যান' করছে।"

ওর বোধ হয় বিশেষ কাজ ছিল সেদিন। অনিচ্ছার সঙ্গে বিদায় দিতে হলো। আমার জানা ছিল না, সেদিনই শুনলাম এর থেকে বিশগুণ রসিয়ে গল্প বলেন উনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ির আড্ডায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র সবারই প্রেমেনদা। তাঁর এই আড্ডাটিকে বাদ দিয়ে আধুনিক যুগের কোনো সাহিত্য-ইতিহাস লেখা যাবে না। সিনেমা এবং সাহিত্যকে যাঁরা উজ্জ্বল করেছিলেন, করেছেন বা করবেন তাঁদের সবারই পদার্পণে বিচিত্র এক পরিবেশ গড়ে উঠতো ওঁর বাড়িতে। এবং ঐ আড্ডার সঙ্গদোষেই অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যের দেহে একদিন সাহিত্যের ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছিল।

আর একদিন দেখা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে। সেদিন শনিবার। দেখেই বললেন, "কেমন আছ ভাই?" তারপর আমাকে ওঁর সঙ্গে যেতে বললেন। ইউনিভার্সিটি এবং মেডিক্যাল কলেজকে ডানদিকে রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। উনি বললেন, চলো না।" শেষ পর্যন্ত বৌবাজারের এক সোনার দোকানে নিয়ে এসে তুললেন। বললেন, "আমরা সেকেলে হয়ে গিয়েছি। তাই একটা মডার্ন ছোকরা খুঁজছিলাম। দেখি এবার তোমার পছন্দ কী রকম?" এইবার আসল রহস্যটি প্রকাশ করলেন, "প্রেমেনের মেয়ের বিয়ে। আহা বড় ভাল মেয়ে।" অনেকক্ষণ ধরে নানা রকমের অলঙ্কার দেখলেন। আমার মতামত নিলেন। শেষে একটি অলঙ্কার কিনে বেরিয়ে এলাম। বললাম, "এবার চলি।" ধীরাজবাবু ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, "চলো, কলেজ স্ট্রিট ঘুরে আসি। এখন বাড়ি গিয়ে কী হবে?" সুতরাং আবার পদযাত্রা। যেতে যেতে বলেছেন, "প্রেমেন যে আমার কী, সে তোমরা জানো না।" 'যখন নায়ক ছিলাম' তখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। বললেন, "ওতে শুধু নায়ক জীবনের কথা বলেছি। এইবার আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায়ের কথা লিখবো। নাম হবে 'যখন জোয়ার এল'। সে বইতে প্রেমেন সম্বন্ধে অনেক কথা লিখতে হবে।"

কলেজ স্ট্রিটের এক দোকানে বসে, আবার গল্প আরম্ভ করেছেন। সেদিন বেশি লোকজন ছিল না। বললেন, "ভালই হয়েছে। তোমাদের একটা জিনিস পড়িয়ে দিই। 'যখন নায়ক ছিলাম' বইটার ভূমিকাটা লিখে ফেলেছি।" সেইটে পড়ে শোনালেন। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। অমন দরদ দিয়ে আবৃত্তি করতে আমি কখনও কাউকে শুনিনি। আমার শরীরের রোমগুলি পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে শেষ প্যারাটি। বাঁ হাতে কাগজটা ধরে, তিনি একবার আমাদের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর আমাদের সবাইকে ভুলে যেন কোথায় চলে গেলেন। নির্বাক যুগের বোবা নায়ক যেন এ-যুগের নায়কের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বলছেন—"ধীরে, বন্ধু ধীরে, একটু আস্তে—থেমে থমকে চারিদিক দেখে পথ চলো। আজ যে কুসুম বিছানো কংক্রিটের চওড়া রাস্তায় তোমার বেপরোয়া যাত্রা শুরু হয়েছে—একদিন তা ছিল আঁকাবাঁকা, এবড়ো-খেবড়ো—ছিল কাঁটায় ভরতি। আমরা, মানে বোবা যুগের হতভাগ্য নায়কের দল—কাঁটার আঘাত তুচ্ছ করে ক্ষতবিক্ষত হয়েও রোলারের মতো বুকে হেঁটে ঐ রাস্তা করে দিয়েছি সমতল, মসৃণ—কুসুম-বিছানো। কিন্তু বেপরোয়া গতিবেগ বাড়াতে গিয়ে তোমরা ওটাকে করে তুলেছো বড্ড বেশি পিছল। তাই বলছিলাম—ধীরে, বন্ধু ধীরে।"

পড়তে পড়তে হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এবং সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। উপস্থিত ভদ্রলোকদের একজন বলেছিলেন, "অভিনেতার পড়া, সাধারণের থেকে তো ভালো হবেই।" কী জানি, হয়তো তাই। হয়তো আমি কেবল তাঁর বাচনভঙ্গিতেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছিল, কী সত্য ভাষণ। শুধু সিনেমা কেন? সে যুগের সাহিত্যিক, সে যুগের দেশপ্রেমিকও তো ঐ একই কথা বলতে পারেন। আমার মনে হলো, প্রাচীন পৃথিবী যেন নবীন সভ্যতাকে ডেকে বলছে ধীরে, বন্ধু ধীরে।

তারপরও কয়েকবার দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। সব সময়ই হাসিমুখ। সব সময়ই যেন হৈ-হৈ হট্টগোলে ডুবে থাকতে চান। মনে মনে আনন্দ পেয়েছি। এই তো হওয়া চাই। মনের সেই ভাব নিয়েই ১৯৫৯ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত ছিলাম। খবর পেয়েছি ধীরাজবাবু অনেকদিন থেকেই অসুস্থ। লিভারের সিরোসিস। নিজেদের অতিমাত্রায় বিজ্ঞ মনে করেন, এমন কয়েকজন বলেছেন, "অভিনেতা ও সিরোসিস ওতো পেয়ার অফ

ওয়ার্ডস এর মতো। লিভারকে যারা কষ্ট দিচ্ছে, লিভার তাদের ছাড়বে না, প্রতিশোধ নেবেই।"

অতিবিজ্ঞরা চিরকালই পৃথিবীতে থাকবেন। তাঁদের কথাতে কান দিইনি। বিষণ্ণ মন নিয়েই রবিবারের বিকেলে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে ওঁর বাড়িতে হাজির হয়েছি। বাইরের ঘরে বসে থাকতে হলো কিছুক্ষণ। কিন্তু ক্লান্তি লাগেনি। টেবিলের কাচের তলায় অসংখ্য ছবি। যৌবনের ধীরাজ ভট্টাচার্য বিভিন্ন ছবির রূপসজ্জায়। এই প্রথম দেখলাম নায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্যকে। সত্যি এতো সুন্দর দেখতে ছিলেন। কোনো একটি ছবিতে নায়িকার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন ধীরাজ। সত্যই অসাধারণ। 'যখন নায়ক ছিলাম' আমি পড়েছি। তাঁর 'মাকাল ফলের' মতো রাঙা দেহ আর বাবরি চুলের জন্য কত দুঃখ করেছেন। কিন্তু সে দুঃখ কি এই দেহের জন্যে? বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য। অভিনেতার আত্মজীবনীতে অভিনয়ের একটা ছবিও স্থান পায়নি। যা শুধু অবাক হয়ে দেখবার, তার পরিবর্তে শুধু ঝুড়ি ঝুড়ি কথা।

এবার ডাক এলো। ওপরে যেতে পারি আমরা। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু এ কী। খাটের দিকে তাকিয়ে আমার সমস্ত মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো। যে ছবিগুলো এইমাত্র দেখে এলাম, সে কি বিধাতার পরিহাস! কোথায় সেই ধীরাজ ভট্টাচার্য? বিছানায় পড়ে রয়েছে চামড়া দিয়ে ঢাকা একটি কঙ্কাল। কোথায় সেই কাঁচা সোনার মতো রঙ! চামড়ার উপর কে যেন কালো কালি মাখিয়ে দিয়েছে। চামড়ার মধ্য দিয়েও মুখের ভিতরের কঙ্কালটা যেন দেখতে পাচ্ছি। চুলগুলো রুক্ষ। বড় বড় চোখদুটো আজও রয়েছে। কিন্তু কোনো উজ্জ্বলতা নেই, যেন ধোঁয়াতে আচ্ছন্ন রান্নাঘরের পঁচিশ পাওয়ারের বাতি। দেহটা চাদরে ঢাকা—কিন্তু পেটটা যে দশগুণ বড় হয়ে উঠেছে তা বেশ বোঝা যায়।

আমাকে যেন দেখতে পেলেন না ধীরাজ ভট্টাচার্য। একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন, দেয়ালে বাঁধানো তাঁরই একটি ছবির দিকে—নায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্য, সেখানে যৌবনের ভরা জোয়ার। হঠাৎ তিনি ভেঙে পড়লেন। "বিশ্বাস করো না, এই দেহটাকে বিশ্বাস কোরো না। তোমরা বলো, ঐ আমি আর এই আমি কি এক?"

হঠাৎ সামলে নিলেন নিজেকে। দরজার কাছে, কে যেন এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে দেখেই চিনতে পেরেছি। ধীরাজ ভট্টাচার্যের মা ছাড়া তিনি আর কে হতে পারেন? যে ভদ্রলোক ধীরাজবাবুর সেবা করছিলেন,

তিনি, একটা দুধের কাপ নিয়ে এলেন। ধীরাজ ছোটছেলের মতো বললেন, "এতোটা....না, অতোখানি আমি খেতে পারবো না।" লোকটি বললে, "মা বলছেন খেতে।" "ও, মা বলছেন"—আর কোনো আপত্তি করলেন না, ধীরাজবাবু। এক অনাস্বাদিতপূর্ব প্রশান্তিতে আমার মন ভরে উঠেছিল। মা ও ছেলের এমন রূপ, যে দেখে সে ধন্য, যে শোনে, বোধ হয় সেও ধন্য। কৌতূহলী পাঠককে 'যখন নায়ক ছিলাম' গ্রন্থখানি আর একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। মাতা-পিতার প্রতি এমন অকৃত্রিম অনুরাগ ইদানীংকালের আর কোনো রচনাতে লক্ষ্য করেছেন কি?

দুধের কাপটা ফেরত দিয়ে বললেন, "মা আমাকে রোজ তিন সের করে দুধ খাওয়ান। খাই আমি.....মার কষ্ট যে দেখতে পারি না, ভাই।"

আমি তাঁর খবর নেবার জন্যই গিয়েছিলাম। কিন্তু চরম রোগযন্ত্রণার মধ্যে পুরনো ধীরাজ ভট্টাচার্য নষ্ট হয়ে যাননি। আমার বই-এর খবর জিজ্ঞাসা করলেন। সিনেমা কতদূর এগুলো জানতে চাইলেন। লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসছিল আমার। ভাইপোকে ডেকে পাঠালেন। এই ভাইপোটিই নিঃসন্তান ধীরাজবাবুর নয়নের মণি। তীব্র যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন বুঝতে পারছি। তবু আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, "ওদের হাতে-লেখা কাগজে একটা লেখা দিয়ো ভাই। ওর যে কী মুশকিল। সবাই বলে, তোমার জেঠু থাকতে আমাদের পত্রিকায় লেখা পাওয়া যাবে না? অথচ কিছুই করে উঠতে পারি না।"

বাঁচবার সে কি উদগ্র কামনা। আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন, আবার অভিনয় করবেন। অবার যশোর যাবেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যশোরের অবলাকান্ত মজুমদারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। যশোরের ছেলে আমি, শুনলে অবলাবাবু যে কী খুশিই হবেন। যশোর থেকে আমরা সোজা পাঁজিয়ায় চলে যাবো। চারটে রাত পর পর অভিনয় হয়তো করতে পারবেন না। ডাক্তার বারণ করবে, মাও রাগ করবেন। কিন্তু নবমীর রাত্রে আদর্শ হিন্দু হোটেলটা একবার করবেনই।

উৎসাহিত হয়ে লেখার কথা তুললাম। 'যখন জোয়ার এল' কবে লিখবেন? তিনি গম্ভীর হয়ে উঠলেন। "না ভাই, ও বইতে অনেকের সম্বন্ধে অপ্রিয় মন্তব্য করতে হবে। 'লাইনে' থেকে লেখা চলবে না। রিটায়ার করে লিখবো।"

হা ঈশ্বর, এখনও উনি 'লাইনে' রয়েছেন! তারপর উনি রিটায়ার

করবেন। এই তো জীবন!

এতোক্ষণ আমরা দু'জন মাত্র ঘরের মধ্যে ছিলাম। আরও দু'জন ঘরে ঢুকলেন। তাঁদের চিনি না। ভাবে বুঝলাম, ওঁর বিশেষ পরিচিত। নিকটতম আত্মীয় বা বন্ধুদের কেউ হবেন।

ওঁরা বললেন, "বেজায় কাজের চাপ! তাই আসতে পারিনি।"

অভিমানী ধীরাজ ভট্টাচার্য বললেন, "তোমাদের দোষ নেই। নিত্য নেই দেয় কে? নিত্যরোগী দেখে কে?"

ওঁদের দেখেই তিনি যেন কেমন হয়ে পড়লেন। চোখের কোণে জলের ফোঁটা। আমার দিকে তাকিয়ে সকরুণভাবে বললেন, "সারাজীবন শুধু আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হলাম, ভাই। জীবন আমাকে কিছুই দিল না। শুধু বঞ্চনা।" নিজের দুঃখের কথা এই প্রথম শুনলাম তাঁর মুখে। বললেন, "অভিনয়? প্রশংসার বদলে সেখানে পেয়েছি সমালোচনার নিষ্ঠুর কশাঘাত। সাহিত্য? লোকে বলেছে ধীরাজ ভট্টাচার্য লিখবে ঐ বাংলা! নিশ্চয় কেউ লিখে দিয়েছে।"

একটু থামলেন তিনি। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। পেটের উপর হাত রেখে আবার বললেন, "সব সহ্য করতে পারি আমি। কিন্তু বঞ্চনা....নাঃ....বড় কষ্ট পেলাম, ভাই।"

বড় ক্লান্ত মনে হলো ধীরাজ ভট্টাচার্যকে। কত কিছু যেন বলার আছে। জীবনের কাছে কী যেন চেয়েছিলেন, অথচ পাননি। ওঁর আত্মীয়রাও তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝলাম, তাঁরা কিছু বলতে চান ওঁকে। সেই অবস্থায় আমার উপস্থিতি অস্বস্তিকর হতে পারে মনে করেই উঠে পড়লাম।

ধীরাজবাবু বললেন, "আবার আসবে তো ভাই?" বললাম, "নিশ্চয়ই আসবো, এবং খুব শীঘ্রই আসবো।"

মনে হলো, আমাকে তিনি বিশ্বাস করলেন না। মাথার কাছে রাখা টেলিফোনটা দেখিয়ে বললেন, "অন্তত টেলিফোন কোরো। করবে তো, কথা দাও।" নিজেই ওঁর নম্বরটা দিলেন— ৪৮ - ১৩১৩। বললেন, একটা তেরো নয়, দুটো.....doubly inauspicious."

বুধবার বিকেলে, কিংবা বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে টেলিফোন করবো কথা দিয়ে, বেরিয়ে এলাম। আমার তখনকার মানসিক অবস্থার বর্ণনা করা অসম্ভব। ব্যর্থতার আগুনে একটি প্রাণ যেন পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

অথচ সবই তিনি পেয়েছেন। মনে পড়ছিল সেই বিখ্যাত কবিতাটি—

"জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম-শিশু-গৃহ নয় সবখানি।
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে।"

হাওড়ার পথে ট্রামে বসে ভেবেছি, কে তাঁকে ক্লান্ত করেছে? কেন তিনি হঠাৎ ভেঙে পড়লেন? ওখানে জিজ্ঞাসা করা হয়নি, কিন্তু টেলিফোনে জেনে নেবো।

বুধবার ব্যক্তিগত কয়েকটি কাজে ছুটোছুটি করেছি, টেলিফোন করা হয়ে ওঠেনি। বৃহস্পতিবার সকালেই টেলিফোন করেছিলাম। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। তার কিছু আগেই সজ্ঞানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য। আমাদের সকলকে অবজ্ঞা করে জলের পোকা আবার জলে ফিরে গিয়েছে।

অগ্রজ

আমর সাহিত্য জীবনে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে কোনদিন ভোলা সম্ভব হবে না। শুধু আমি কেন? আধুনিক বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত তরুণরা অন্তত একবার বুকে হাত রাখুন—সেখানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্যে একফালি কোমল স্থান কি সুরক্ষিত নেই?

আমার কথা দিয়েই শুরু করি। ১৯৫৪ সালে আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা প্রখ্যাত সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছে। কিছু কিছু পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি ইতিমধ্যেই সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং সে সময়ের একজন প্রখ্যাত প্রকাশকও সাদরে সম্পূর্ণ লেখাটি না পড়েই প্রকাশনার দয়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তখনও একটি প্রধান সমস্যার সমাধান হয়নি। বইটার কোনো নাম ঠিক করা যাচ্ছে না। 'দেশ' পত্রিকায় প্রতিটি পরিচ্ছেদ ভিন্ন নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

নিউ এজ-এর দপ্তরে বসে কথা হচ্ছিল—'তাড়াতাড়ি একটা নাম দেওয়া প্রয়োজন। বই-এর নাম জিনিসটা ছেলেখেলার বিষয় নয়। খারাপ নামের জন্য ভাল বইও দু'একবার তলিয়ে গিয়েছে।'

অভিজ্ঞ জানকীবাবুর মুখে এই কথা শুনে নতুন লেখক আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছি। প্রকাশক তখন আমার অবস্থা দেখে করুণার্দ্র হয়ে বললেন, 'ভয় পাবেন না, তেমন বিপদ দেখলে নামের রাজার শরণাপন্ন হওয়া যাবে।"

'গানের রাজা বলতে আমরা রবীন্দ্রনাথকে জানতাম, কিন্তু নামের রাজাও কেউ আছেন না কি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আছে আছে, সময়মতো সব জানতে পারবেন।' প্রকাশকের কথা তখন শেষ হয়নি, প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন : "আরে আরে, আপনি দেখছি খুবই ভাগ্যবান—কোথায় আপনি রাজদরবারে যাবেন, না রাজা নিজেই এখানে আসছেন।"

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একজন পাঞ্জাবি পরা সুদর্শন ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। এঁর শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। কোথায় যেন একটা সম্মোহনী শক্তি আছে—যা সহজেই আকৃষ্ট করে। এই চেহারার বর্ণনা দেবার মতো দুঃসাহস আমার নেই—তবে মনের মধ্যে সেদিন একটা আধুনিক ডিজাইনের স্ট্রিমলাইনড মোটর গাড়ির ছবি ভেসে উঠেছিল। এই দেহটার মধ্যে স্রষ্টা যেন তাঁর অবিশ্বাস্য এবং দুরূহ ব্যালান্সবোধের পরিচয় দিয়েছেন। আর সেই একই সময়ে যৌবনের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার যেন এক বিশেষ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে—এই চিরহরিৎ বৃক্ষে যৌবন ছাড়া আর সবার স্পর্শ নিষেধ।

আর একটু বর্ণনা দেবার ইচ্ছে হচ্ছে—কিন্তু আন্দাজ করছি, আপনাদের অনেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রর ছবি দেখেছেন। যদিও সাম্প্রতিক ছবি থেকে বহু

বছর আগের যে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আমি প্রথম দেখেছিলাম তাঁকে সম্পূর্ণ খুঁজে পাবেন না।

এইবার ওঁর দিকে তাকালাম—স্রষ্টার ব্যালান্স বোধকে যদি কেউ নষ্ট করে থাকেন সে তিনি নিজেই—হাতে বেশ কয়েকখানা ভারী বই নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র হেলে পড়েছেন। বইগুলো টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে তিনি হাঁপাতে লাগলেন। 'খুব ভ্যালুয়েবেল বই—সহজে পাওয়া যায় না—তাই আজকে চান্স ছাড়িনি'—প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রকাশককে বললেন। চেয়ারে বসেই তিনি দোকানে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন, 'শুনলাম তোমাদের ওপরের দোকানে কয়েকটা ভাল বই বাইরে থেকে এসেছে। আফ্রিকা সম্বন্ধে লেখা—ছাপা হয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়ায়। একবার কাউকে পাঠাবে?'

'সে না হয় পাঠাচ্ছি—কিন্তু বইয়ের ভার আরও বাড়লে নিয়ে যাবেন কী করে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রকাশক।

'সে-সব পরে ভাবা যাবে। আগে বইগুলো যোগাড় করি। ট্যাক্সি করে বাড়ি ফেরার জন্যে এই কটা বই যথেষ্ট যুক্তি নয়।' বললেন প্রেমন্দ্র মিত্র।

এবার প্রকাশক আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র যেন আমার কতদিনের চেনা লোক। বললেন, 'তোমার ধারাবাহিক লেখা দেশ পত্রিকায় পড়ছি। আমি ওকেও বলেছি বইটা নিতে পারো।'

প্রকাশক আমাকে বললেন, 'তরুণদের লেখা উনি সব সময়ে গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়ে থাকেন। এই যাযাবরের লেখা 'দৃষ্টিপাত'-এর কথাই ধরুন না কেন। যুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত এর থেকে জনপ্রিয় বই প্রকাশিত হয়নি। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রই সর্বাগ্রে এই নতুন লেখকের প্রথম বইকে লিখিত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র হাসলেন। বললেন 'নিউ অ্যারাইভ্যালস্-এর ওপর নজর রাখতে হবে না? লোকে না হলে বোকা বলবে যে! সাহিত্যের ইতিহাসে নতুনের কদর চিরকাল থাকবে। ভাল বই তো পৃথিবীতে কম লেখা হয়নি—লাইব্রেরিতে এত ভালো বই আছে যে কোনো লোক নিজের জীবনে পড়ে শেষ করে উঠতে পারবে না। তবু কেন পাঠক নতুন বই চায়? কারণ মানুষের মনের কাছে নতুন ফসলের বিশেষ এক মূল্য আছে।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র চা খেলেন, হাসলেন, গল্প করলেন। তারপর প্রকাশক আমার অসুবিধার কথা উল্লেখ করলেন : 'ইনি বেশ অসুবিধেয় পড়ে গিয়েছেন। নিজের বইটার নামকরণ করতে পারছেন না। আমরা সবাই

মাথা ঘামিয়েছি, আলোচনা করেছি, তর্ক করেছি—অথচ কোন ফল হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত এই নামের অভাবেই না বইটার প্রকাশ দেরি হয়ে যায়।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন, 'সত্যিই তাহলে চিন্তার কথা তো। দেখি আমি কী করতে পারি। আমার বাড়িতে চলে এসো একদিন।'

কালীঘাটের কাছে খালের ধারে হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে যে সাহিত্য বৈঠক বসতো তার কথা বাঙালি লেখক মহলে কে না জানে? হাল আমলের সাহিত্যিকরা এই ধরনের মজলিশী বৈঠকে সময় ব্যয় করতে অভ্যস্ত কিনা জানি না; কিন্তু তাঁদের কয়েকজনও যদি এইভাবে জটলা পাকাবার এক্সপেরিমেন্ট করেন, তবে তাতে সাহিত্যের বাগানে নতুন ফল জন্মাবার সম্ভাবনা থাকবে।

এমন একদিন বাংলা সাহিত্যে ছিল যখন প্রবীণ প্রতিষ্ঠাবানরা এবং প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ লেখকেরা এক আসরে মিলিত হতেন। ভাবের আদানপ্রদান হতো, নতুন লেখা পড়া হতো, সম্প্রতি প্রকাশিত লেখার খুঁটিয়ে সমালোচনা হতো। হায়, এখন এসব প্রায় পুরনো দিনের গল্পের মতো শোনায়। এখনকার লেখকরা অধিকাংশই বড় আত্মকেন্দ্রিক; আধুনিক কলকারখানার মতো তাঁরা উৎপাদনের পরিমাণ, সময়ের যথাযথ ব্যবহার, এমন কি organisation and method সম্বন্ধে শিল্পপতিদের মতোই সচেতন! কোন রকম অপচয়, বিশেষ করে সময়ের অপচয়, তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ।

সময়ের সঙ্গে তাল রেখে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ির বৈঠকও বর্তমানে যে কিছুটা হতশ্রী হয়ে পড়বে তাতে আশ্চর্য কী? কিন্তু সে তো পরের কথা। আগে স্বর্ণযুগেরই একটু পরিচয় দেওয়া যাক।

কেউ কেউ রসিকতা করে এই বৈঠকখানাকে বাংলা সাহিত্যের কনট্রোল রুম বলে বর্ণনা করতেন। বাংলা সাহিত্যের শেয়ার বাজারের প্রাত্যহিক না হলেও সাপ্তাহিক ওঠানামার খবর এখানেই পাওয়া যেতো। এই আড্ডায় কে না আসতেন? ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, কবি, সাংবাদিক, সম্পাদক, প্রকাশক। শুধু তাই কেন—অধ্যাপক, নাট্যকার, নট, চিত্রতারকা, প্রযোজক, পরিচালক, সুরকার, প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি, শিল্পী, প্রচারবিদ, এমনকি পুলিস এবং আয়কর বিশেষজ্ঞও বাদ যেতেন না।

এঁদের সবারই কেন্দ্রবিন্দু প্রেমেন্দ্র মিত্র। রবিবার সকাল থেকে আড্ডা জমতো, কত কাপ চা সেবিত হতো তার হিসেব রাখি না। ভারতীয় চা-

শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সাহিত্য ও চারুকলার বিকাশ হতো।

আমি যেদিন ওখানে প্রথম হাজির হয়েছিলাম, সেদিনও আসর জমজমাট। অনেক দিক্‌পালের দর্শন মিললো। অনেকে আট-দশ মাইল দূর থেকেও এসেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলার এক উদীয়মান জনপ্রিয় তরুণ লেখকের সঙ্গে আলোচনা করছেন: 'তোমার বইটা পড়লাম। খুব ভালো লেগেছে। কয়েকটি চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নতুন বলা যেতে পারে। তবে দু'জায়গায় শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে গুরুতর আপত্তি আছে।' তারপর আলোচনা শুরু হলো। বইয়ের ভিতরের আলোচনা থেকে বাইরের মলাটে এসে পড়লেন শেষ পর্যন্ত। প্রচ্ছদ শিল্পীও বসেছিলেন। তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন, 'তুমি যে হরিণটার ছবি দিয়েছ সে সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে। আফ্রিকার হরিণ ওইরকম হয় কি?' তারপর সেদিন হরিণ সম্বন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিলো তাতে প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। পৃথিবীর কোন্ দেশে কী হরিণ আছে, তাদের কোনটা কুলীন কোনটা ভঙ্গ, সে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

আর একজনকে প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন, 'তোমার সাম্প্রতিক উপন্যাসটা পড়ে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছি।'

'কেন আপনার ভালো লাগেনি?' লেখক ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন।
প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন, 'পাঁচ-ছ'খানা বই লিখে ফেলেছো, অথচ লেখার প্রাথমিক জ্ঞানটা এখনো হলো না।'

'আজ্ঞে, কোন্ জ্ঞানের কথা বলছেন?' বিব্রত লেখক বিবর্ণমুখে জানতে চাইলেন।

'আমি ভাবছি তোমার বইটা পাঠক মহলে না গোলমালের সৃষ্টি করে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলেন তরুণ লেখক।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এবার হেসে ফেললেন। "তোমার বইটা নিখুঁত হয়েছে। ভবিষ্যতে কখনও এই ভুল কোরো না, ইচ্ছে করে কোথাও একটু খুঁত রেখে দেবে। যাতে সমালোচকরা সহজেই সেটা বার করে সমালোচনা করতে পারেন। প্যারিসের এক শিল্পী সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে, বহু পরিশ্রম করে একটা নিঁখুত ছবি আঁকলেন। তারপর ছবিটা তিনি রাস্তায় টাঙিয়ে দিলেন আর তার তলায় একটা কাগজে লিখে দিলেন—দর্শকরা যদি কোথাও খুঁত দেখেন, সেখানে যেন একটু পেন্সিলের দাগ দিয়ে দেন। পরের দিন ফিরে এসে ছবিটার দিকে তাকিয়ে শিল্পীর কেঁদে ফেলবার অবস্থা। সমস্ত

ছবিটার উপর পেন্সিলের দাগের একটা আবরণ পড়ে গেছে। খুঁত ধরতে না পেরে, অথচ প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য আন্দাজে যে যেখানে পেরেছে দাগ দিয়ে দিয়েছে। শিল্পী এবার নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বাড়ি ফিরে তিনরাত ধরে আর একটা নিখুঁত ছবি আঁকলেন। শেষে ইচ্ছে করে এক জায়গায় একটু খুঁত সৃষ্টি করলেন। এবারও ছবিটা রাস্তায় টাঙিয়ে দিলেন। দেখলেন এবার ভুল হয়নি—সবাই ঐ একটি জায়গায় পেন্সিলের দাগ দিয়েছে—মূল ছবিটা অক্ষত রয়ে গেছে। তাই বলছিলাম যদি নিজের শিল্পকে বাঁচাতে চাও তবে কোথাও একটু খুঁত রেখে যাবে।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র কিছুক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে তাকালেন, তারপর আমার মুখের দিকে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, শিশু-সাহিত্য, রহস্য উপন্যাস, সিনেমা, সিনারিও ইত্যাদির প্রাথমিক আড্ডায় প্রায় সাড়ে বারোটা বেজেছে। আমাকে বললেন, 'তুমি তো আবার সেই নদীর ওপারে হাওড়ায় কাঁহা মুলুকে থাকো। ফিরতে তো দেড়টি ঘণ্টা লাগবে। তুমি বরং আমার সঙ্গে পাশের ঘরে চলো।' সবাইকে বললেন, 'তোমরা আলোচনা চালাও, আমি দু-মিনিটে আসছি।'

পাশের ঘরে গিয়ে বললেন, 'তোমার বইয়ের একটা নাম দিতে হবে তাই না ?'

আমি বললাম, 'শুনেছি আপনি নামের রাজা, কত বই-এর অবিস্মরণীয় নাম দিয়েছেন—'শৃঙখল ঝঙ্কার', 'রুদ্ধ কারার দিনগুলি'। নিজের বই-এর তো কথাই নেই—'ফেরারী ফৌজ', 'বেনামী বন্দর', 'বৃষ্টি এল', 'সাগর থেকে ফেরা', 'সাগর সঙ্গমে', 'ভাবীকাল', 'পড়তে মজা'।

ওঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে বললেন, 'নাম দিতে আমার ভালো লাগে। অবশ্য নামে কী এসে যায় ?'

আমি বললাম, 'আপনার ছেলেমেয়ের নামকরণ সম্বন্ধেও গল্প শুনেছি। প্রথম ছেলের নাম ছিল মাধব এবং মেয়ের নাম মৃন্ময়ী। পরে বৌদি নাকি বলেন—নামগুলো একটু সেকেলে হয়ে পড়েছে, তখন আপনি বললেন—এখনই আধুনিক করে দিচ্ছি। একটু পরিবর্তন করে মেয়ের নাম রাখলেন মাধবী আর ছেলের নাম মৃন্ময়।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র এবার হেসে ফেললেন। তারপর কাজের কথায় এলেন, 'এ সপ্তাহে আরো দু'একজনের বইএর নাম দিয়ে দিয়েছি। তোমার নামটা সম্বন্ধে প্রচ্ছদ শিল্পী অজিত গুপ্তের সঙ্গে আলাপও করেছি। তোমার এই

লেখাতে এক অজানা জগতের কথা বলেছো। আর যিনি তোমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন তিনি বিদেশী। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ছে—

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।

তোমার এই বই-এর নাম দাও 'কত অজানারে।'

সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো এই নামটাই যেন গত কয়েক মাস ধরে সর্বত্র খুঁজে মরছিলাম। যা এতদিনে আমি পারিনি, নামের রাজা তা একমুহূর্তেই উপহার দিয়েছেন।

'কত অজানারে'র অভাবনীয় সাফল্য আমাকে খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং জনপ্রিয়তা দিয়েছে। গত চল্লিশ বছরে, বিভিন্ন স্থানে 'কত অজানারে' নামটি বোধ হয় লক্ষবার আমার কানে গিয়েছে ; এবং প্রতিবারই আমি মনে মনে গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই নামের জনক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে স্মরণ করেছি।

এই তো গেল আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা—যা সেই প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে নানা ঘটনার মাধ্যমে নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছে। কিন্তু এইটুকু থেকেই বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা হয়তো মানুষ প্রেমেন্দ্র মিত্রকে (সার্থক তাঁর নিজের নাম) কিছুটা চিনতে পারবেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের গণ্ডীর বাইরে সমগ্র ভারতীয় পাঠক মহলে তাঁর লোকাত্তর প্রতিভার কী পরিচয় দেবো ?

এই স্পেশালাইজেশনের যুগে প্রেমেন্দ্র মিত্রর মতো বহুমুখী প্রতিভাধর আমাদের অন্যতম শেষ বিস্ময়। তাঁর স্থান আমাদের জীবিত কবিদের পুরোভাগে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও সম্ভবত জীবনানন্দ দাশ ছাড়া আর কোনো বাঙালি কবির একটি কাব্যগ্রন্থ পঁয়ত্রিশ হাজার ছাপা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থটি এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়েছে। ছোটগল্প লেখক হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র এককালে যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তা আজও স্তব্ধ হয়নি। আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস আলোচনাকালে তাঁর আঙ্গিক, অভিনব বিষয়বস্তু ও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের কথা বারবার এসে পড়ে। জনপ্রিয় হলেও ছোটগল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র জনতার লেখক নন। কিন্তু তথাকথিত 'বেস্ট-সেলার' ভক্তরা প্রায়ই যে কথাটা ভুলে যান তা হলো প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠতম গল্পগুলির

সৌন্দর্য পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে একটি শিক্ষিত মার্জিত ইনটেলেকচুয়াল মনের প্রয়োজন—এবং এই শ্রেণীর পাঠক কোনো দেশে কোনোকালেই সংখ্যাগরিষ্ঠ নন।

উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রেমেন্দ্র মিত্র কম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি। কিন্তু তিনি আধুনিক সুন্দরীদের মতো স্লিমিং-এ বিশ্বাসী। তাই তাঁর উপন্যাসগুলি তন্বী। প্রাচীনপন্থীদের কেউ কেউ এই শ্রেণীর সুন্দরীদের স্বাস্থ্যহীনা বলে ভুল করে থাকেন।

রহস্য কাহিনীর লেখক ও শিশুসাহিত্যিক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম বিংশ শতাব্দীর শেষ দিন পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

বৈজ্ঞানিক গল্প (সায়ান্স ফিকশন) সম্বন্ধে তাঁর অসীম আগ্রহ—কতদিন তাঁর হাতে এই সব বই দেখেছি—আর যেগুলি তিনি নিজে রচনা করেছেন সেগুলো ছেলে এবং বুড়ো উভয়েরই পরম আনন্দে পড়ে থাকেন। আর রহস্যকাহিনী? সে সম্বন্ধে একটা গল্প বলি। একদিন ট্রামে চড়ে কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে কলেজ স্ট্রিটে যাচ্ছি। প্রেমেন্দ্র মিত্রও সেই গাড়িতে ছিলেন। তেমন ভিড় ছিল না। আমাকে ডেকে তিনি পাশে বসালেন। দেখলাম সামনের সিটে কোট-প্যান্ট-টাই পরা এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের দিকে তিনি প্রায়ই তাকাচ্ছেন। তারপর ফিস্‌ফিস্‌ করে আমাকে বললেন, 'ডিটেক্‌টিভ গল্প পড়ো নিশ্চয়। বলতো ভদ্রলোকের কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে।' আমি অনেকক্ষণ হাঁ করে পর্যবেক্ষণ করেও কিছু বুঝতে পারলাম না। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবার অভিজ্ঞ রহস্যভেদীর মত বললেন, "ভদ্রলোক সব সময় টুপি পরে থাকেন।"

"কেমন করে বুঝলেন?" আমি ওয়াটসনের মতো প্রশ্ন করলাম, উনি বললেন, "ভদ্রলোকের কপালের উপরের দিকে দেখো—একটা গোল দাগ হয়ে গিয়েছে। চশমার মত সর্বক্ষণ টুপি পরলে ওই দাগ হয়।"

এই অনুসন্ধিৎসা, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে এই কৌতূহল প্রেমেন্দ্র মিত্রকে চির-যুবক করে রেখেছে। বার্ধক্য তাই তাঁর মনের দরজায় কড়া নেড়ে বারবার অপমানিত হয়ে ফিরে গিয়েছে।

সাহিত্য সমালোচক ও প্রাবন্ধিক প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করে সময় নষ্ট করবো না। আমাদের এই দুর্ভাগা ভারতবর্ষে সমালোচক এবং প্রাবন্ধিকরা আজও হরিজন হয়ে রয়েছেন।

বুড়োদের ছেড়ে দিয়ে ছেলেদের এবং অতি ছোটদের কথা ধরুন। তাঁর লেখা প্রথম অক্ষর পরিচয়ের বই 'পড়তে মজা'কে অনেকেই একটা বিশেষ

কীর্তি মনে করেন। আর ছেলেদের জন্যে লেখা তাঁর 'ঘনাদা' সত্যি অদ্ভুত সৃষ্টি। লেখার কাজে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন প্রায়ই আমি লুকিয়ে ঘনাদাকে স্মরণ করি—এবং অদ্বিতীয় ঘনাদার কীর্তিকাহিনী পাঠ করি। ঘনাদার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হয়েছে কি না জানি না, যদি না হয়ে থাকে তবে অবিলম্বে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা উচিত।

কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, শিশুসাহিত্যিক, রহস্যকাহিনী লেখক—কোনো দুঃসাহসী হয়তো এখনও বহুমুখী প্রতিভাধর প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার দুর্জয় সাহস রাখতে পারেন। কিন্তু ধীরে, বন্ধু ধীরে ! অনুবাদক হিসেবে তাঁর খ্যাতি বহু বিস্তৃত। সম্পাদক হিসেবেও তিনি একদা সুপরিচিত ছিলেন। আর চলচ্চিত্র সাহিত্য ? শুধু চিত্রনাট্য ও সংলাপ নয়—পরিচালক হিসেবেও তাঁকে বেশ কয়েকবার দেখেছি আমরা। যতদূর মনে হচ্ছে—এই সবাক চলচ্চিত্রযুগে তিনিই সর্বপ্রথম কোনো গান না দিয়ে 'ভাবীকাল' ছবিটি তৈরি করবার সাহস দেখিয়েছিলেন। আমাদের দেশের আর একটি বিভাগ (ভিটামিনের অভাব থেকে যেটি আজন্ম ভুগছে) বেতারকেও তিনি কিছুদিনের জন্যে পরমস্নেহে লালনপালন করেছিলেন।

এই বিচিত্র প্রতিভাধর বিচিত্রতর উৎপাদন সম্বন্ধে যখনই চিন্তা করি তখনই বিস্মিত হই। আরও আশ্চর্য হই, যখন প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেই বলেন, "আমি তেমন কাজ করতে পারি না।"

ভারতীয় সংসারের সর্বত্র আজ বহুমুখী প্রতিভার অভাব। যে মেয়ে রাঁধে, সে চুল বাঁধে না। যে ছাত্র লেখা-পড়া করে, সে খেলে না। যে ক্রিকেটার ব্যাট করে, সে বল করে না। যে বোলার সে ব্যাট ধরতে জানে না। যে ডাক্তার হাঁচির ওষুধ দেয়, বদহজম হলে সে অন্য স্পেশালিস্টের কাছে পাঠায়। হয়ত এমন দিন আসছে যখন 'বহুমুখী' শব্দটি কার্বাঙ্কল ফোড়া ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না। আমাদের সাহিত্যের অন্যতম শেষ অলরাউন্ডার প্রেমেন্দ্র মিত্রের চরণ ছুঁয়ে যাই।

চরণ ছুঁয়ে যাই

"আমি এক কথার লোক—যা কথা দিই, তা রাখি। তোমরা হয়তো সন্দেহ করছো, ভাবছো বুড়ো নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি খেলাপ করবে। কিন্তু আজকের সময় তারিখ, সন তোমার নোট বইতে লিখে রেখে দিও ; তারপর যদি সুযোগ হয়, এই 'বসুধারা' আপিসেই আমার উপর এসে হামলা কোরো। না হলে তুমি একলা একলাই মিলিয়ে নিও।"

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষে করেছেন! ২৬ শে আগস্ট, শনিবার শেষ রাত্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আর ১৯৬১ সালের আগস্ট মাসের শেষদিনে ন্যাশনাল লাইব্রেরির চেয়ারে বসে এই মুহূর্তে আমি লিখছি। বৃহস্পতিবারের এই বারবেলায় বাইরে বেশ প্রবল বেগেই বৃষ্টি পড়ছে। চিড়িয়াখানার সামনে সমর্থ জোয়ান জোয়ান গাছগুলো ঝড়ের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করছে ; মাতালের মতো নিজের দেহতেই নিজের মাথা ঠুকছে। বজ্রের শব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নাচঘরের আলোগুলো যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর আমার সামনে পড়ে রয়েছে আমার নোটবইটা। আমার সুখ দুঃখের সাথী এই নোটবইটারই এক কোণে লেখা রয়েছে—"তোমরা দেখে নিও—এই 'শতবর্ষ পূর্তি'র বছর আমি পেরোতে পারবো না। এর মধ্যেই হেস্তনেস্ত করে ফেলবো।"

নোটবুকে প্রতিদিনের ঘটনাপঞ্জী লিখে রাখার অভ্যাস আমার নেই। তবু কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের উপর হলদে রঙের বাড়িটার দোতলায় বৈশাখের এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায়, বসুধারার চিরযুবা সম্পাদক যখন হঠাৎ অমন কথা বলে উঠলেন, তখন কেন জানি না বুকের মধ্যটা ভয়ে মুচড়ে উঠেছিল। সেইদিন রাত্রিতে বাড়িতে ফিরে এসেই ওঁর কথাগুলো লিখে ফেলেছিলাম। ইচ্ছে হলো ফাঁড়া কাটলেই একদিন 'বসুধারা' আপিসে গিয়ে হামলা করবো।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। আগস্টের এই শেষ সন্ধ্যায় আমি সেদিনের কথাগুলো একা একাই মিলিয়ে নিচ্ছি। 'বসুধারা' সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ঘর কোনো সময়েই সাধারণত খালি থাকে না—কিন্তু কেন জানি না সেদিন, আমার সৌভাগ্যক্রমেই বোধহয়, তখনও কেউ এসে পৌঁছয়নি। লিখে লিখে আমিও যেন ক্রমশ পেশাদার হয়ে উঠছি। অনুগত কলমটা আজকাল যত সহজে অভিভূত হয়ে পড়ে, মনটা তত সহজে হয় না। পেশাদার লেখকের এই নাকি ধর্ম—কোন কিছুতেই সে অভিভূত হয় না, অথচ কলমটা কথায় কথায় কেঁদে ওঠে। সরলপ্রাণ পাঠক সেই লেখা পড়েই কাঁদতে শুরু করেন ; কিন্তু সাবধানী জহুরি ঠিক ধরে ফেলেন কোনটা আসল মুক্তো আর কোন্‌টা ইমিটেশন— এ কথাও কিছু আমার নিজের নয়, জহুরি সম্পাদক চারুচন্দ্রই একদিন আমাকে বলেছিলেন।

কিন্তু আজ আমি কাঁদছি, আজ আমার কলম যেন শুকিয়ে গিয়েছে। কলমের সব কালি যেন কান্না হয়ে চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরির এক কোণে বসে, সবার অলক্ষ্যে, বৃষ্টি বাদলের মধ্যে আলিপুরের চিড়িয়াখানার দিকে তাকিয়ে, আমার মনকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছি। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর এই ঐতিহাসিক নাচঘরে আজ যেন আমি একলাই বসে রয়েছি। এখানে কেউ যেন নেই। পৃথিবীর কিছুই যেন আমার মনে নেই। কিছুই যেন আমার কানে আসছে না। কেবল লাল নোটবইটার একটা পাতা থেকে সেই পরিচিত রসিক কণ্ঠস্বর আবেগ মিশিয়ে যেন বলছেন "কেমন ? কথা রেখেছি তো ?"

'বসুধারার' সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা আমাকে ক্ষমা করবেন, এই কথা রাখার পিছনে একটা সামান্য ইতিহাস আছে। কয়েকমাস আগে আমি একটা গুরুতর অপরাধ করেছিলাম। আমার সেই অপরাধ এই স্বর্গত আত্মা স্নেহবশত মার্জনা করেছিলেন। কিন্তু ইচ্ছে করলেই যে তিনি আমাকে পাঠকের আদালতে সমর্পণ করে আমাকে অপদস্থ করতে পারতেন, তা আজ আমি সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করছি।

বৈশাখের শেষের দিকে সবাইকে এড়িয়ে, চুপি চুপি আমি একদিন অধ্যাপক চারুচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেই দেখা করার পিছনে একটা ব্যক্তিগত কারণ ছিল।

তারও কিছুদিন আগে আপিসে বসে কাজ করছিলাম, এমন সময় একটা ফোন এসেছিল। "হ্যালো শংকর ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমি 'বসুধারার' চারু কথা কইছি। যে চারু তোমার সুধাময়কে দিল্লির পুরস্কার পাবার জন্য ফোনে অভিনন্দন জানিয়েছিল ; এবং বলেছিল—রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে 'যাবার আগে' উপন্যাস পড়ে খুশি হতেন।"

আমার তখন লজ্জায় মাটিতে মিশে যাবার অবস্থা। গতবছরের বৈশাখ মাসে 'বসুধারাতেই' সার্থকনামা এক লেখকের জীবন নিয়ে গল্প লিখেছিলাম। সেই গল্পেরই এক অংশে রসিকতা করে লিখেছিলাম, বসুধারা সম্পাদক চারু ভট্টাচার্য্য নায়ক সুধাময়কে ফোন করে বলেছেন—হ্যালো আমি বসুধারার চারু কথা বলছি। এই অংশটি ছাপাবার সময় প্রুফ রিডারের নজরে পড়ে—এবং সদাসতর্ক দাশরথিবাবু স্বভাবতই সেটি বাদ দেবার জন্য চারুবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চারুবাবু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করেছিলেন—"হ্যালো শংকর, অমি বসুধারার চারু কথা বলছি, ওরা তোমার গল্পের ওই অংশটা পছন্দ করছে না, আমাকে বলছে কেটে দিতে। কিন্তু আমি বলেছি না বাপু ওসব হবে না। এখন কেটে দিই, তারপরে আমি যেদিন মরবো, তার পরের দিনই ছোকরা লিখে দিক চারু ভট্টাচার্যি নিজেকে নিয়ে রসিকতা করতে পারতো না। সেটি হচ্ছে না, শ্রীমান শংকর ! তোমার সে আশায় হানিব বাজ—জিনিব আজিকার রণে, যা লিখেছো তা পাস করি দিব, হৃদয় দিব তারি সনে !"

কিন্তু সেই থেকেই তিনি আমাকে ছাড়তেন না। ফোন তুলেই বলতেন—"আমি 'বসুধারার' চারু কথা বলছি।" ফোনে আমি বললাম "এইভাবে আমাকে আর কতদিন শাস্তি দেবেন ? 'এক দুই তিন'-এর নেক্সট এডিসনে লাইন ক'টা কেটে দেবো।"

ফোনের ওধার থেকে তিনি হো হো করে হেসে উঠতেন। "তাতেই ভেবেছো, নিস্তার পাবে ? মনে রেখো আমি 'বসুধারা' দিয়ে গাইডেড হই—তোমাদের ঐ বইয়ের এডিশন দিয়ে নয়। যা হোক শোনো—আমাদের বৈশাখ সংখ্যাই আমাদের রবীন্দ্র সংখ্যা। আমার ইচ্ছে ছিলো এই সংখ্যায় নাটক নবেল রাখবো না। শুধু রবীন্দ্রালোচনা। কিন্তু রবীন্দ্রালোচনা ভোগ করে করে পাঠক-পাঠিকাদের যেরকম অগ্নিমান্দ্য শুরু হয়েছে, তাতে একটু গল্পের এবং একটু নবেলের চাটনি রাখা প্রয়োজন—না হলে নিশ্চিত পেটের গোলমাল। তা তুমি একটা বড় গল্প—গতবারের বৈশাখ সংখ্যায় যেমন লিখেছিলে—তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও।"

আমি কথা দিয়েছিলাম এবং সেই প্রতিশ্রুতি মতো 'বসুধারাতে' তা ঘোষণাও করা হয়েছিলো।

এরপর মধ্যিখানে 'বসুধারা' আপিসে একদিন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। যেতেই বললেন, "বোসো বোসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম। বেশ দুশ্চিন্তায় ছিলাম, তা শেষ পর্যন্ত বে হলো?"

অমি তো একদিন মাথায় হাত দিয়ে বসেছি। "কার বিয়ে? আমার? এই বয়েসে? রবীন্দ্রনাথ অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিয়ের কথা ভাবতেন কিন্তু সে তো মরণের সঙ্গে না কার সঙ্গে!"

চারুবাবু আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোমার মুখ দেখেই আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল। বুঝেছি বিষ খেয়েছে। মস্তবড় ট্র্যাজেডি!"

"বিষ খেয়ে মরেছে? কে?" ওঁর কথা শুনে আমি সত্যিই তখন ভয় পেয়ে গিয়েছি।

এবার চারুবাবু হেসে ফেললেন। "কেন তোমার গল্পের নায়িকা? তোমাদের তো দুটো অল্টারনেটিভ আছে—হয় বে হবে নয় বিষ খাবে।"

আমাকে হেসে বলতে হলো "এখনও গল্পের শেষ এসে পৌঁছয়নি। আরও কয়েকটা দিন সময় লাগবে।"

চারুবাবু বললেন, "সে কি হে? এখনই তো প্রজননের পক্ষে সবচেয়ে উত্তম সময়! এখনই ত সামার ভেকেশনের টাইম।"

"মানে?" আমরা প্রশ্ন করলাম।

"মানে?" চারুবাবু এবার তাঁর সম্পাদকীয় চেয়ারে একটু নড়ে বসলেন। "মানেটা তা হলে তোমাদের খুলে বলি। আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে মাস্টারি করি। সামার ভেকেশনের পর কলেজ খুলতে, একদিন বিকেলবেলায় বেড়াতে বেড়াতে এক বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকার আপিসে গিয়েছিলাম।"

"কোন মাসিক পত্রিকা?" আমরা প্রশ্ন করলাম।

"সেটি বলতে পারবো না। এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হয়ে আর এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের পিঠে আমি ছুরি মারতে পারবো না। ওটা আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কোডে বাধে। ধরো পত্রিকার নাম ক, সম্পাদকের নাম খ ও গ, দুজনেই বসে ছিলেন। আমাকে দেখেই খ বললেন আসুন আসুন। আচ্ছা বলুন তো মশাদের বংশবৃদ্ধির সময় কোনটা?"

"কেন? বর্ষাকাল।" আমি জোরের সঙ্গে বললাম। ভদ্রলোক তখন

প্রশ্ন করলেন, "লেখার বংশবৃদ্ধি হয় কোন সময়ে?"

"যদি রবীন্দ্রনাথের কথা ওঠে তাহলে বলতে হয় তাঁর লেখার কোন সিজন নেই।"

গ হাঁ-হাঁ করে বললেন, "ওঁকে এর মধ্যে টানছেন কেন? এমনি সাধারণভাবে বলুন।"

খ এবার নিজেই উত্তর দিলেন, "সামার ভেকেশন। কলেজে লম্বা ছুটি দেওয়ার সিস্টেম বন্ধ না করলে আমাদের মারা পড়তে হবে। আপনাদের কলেজের যত ছেলে ছোকরা বাড়ি যায়, আর কবিতা লিখতে আরম্ভ করে। প্রতিবছর, ঠিক সামার ভেকেশনের পরই—আমরা বার শো থেকে দেড় হাজার কবিতা পাই—তাতে প্রকৃতি আছে, গ্রাম আছে, প্রেম আছে, বিরহ আছে, দীর্ঘ বিরহের পর ক্ষণিকের মিলন আছে; এবং ক্ষণেকের মিলনের পর আবার বিচ্ছেদ আছে।"

গ বললেন, "হয়তো লক্ষ্য করেছেন 'নূতন লেখকের প্রতি নির্দেশ' এই শিরোনামায় আমরা প্রতিবার ছাপাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ওটা কেন জানেন?"

আমি বললাম—"না মশায়। কলেজ ফিজিক্সের মাস্টারি করি, সাহিত্যের অত মারপ্যাঁচ বুঝি না।"

গ বললেন, "তাহলে আমার টেবিলের পাশে চেয়ে দেখুন।"

চেয়ে দেখলুম চৌকো চৌকো করে কাটা হাজার দশেক স্লিপ রয়েছে।

গ বললেন, "এই সময়ে আমরা যা কবিতা পাই, তাতে আমার দোকানের, আমার আপিসের, এমনকি আমার আপিসের পুরো বছরের স্লিপ হয়ে যায়। এক পৃষ্ঠায় কবিতা লেখায় ঐ একটাই মাত্র সুবিধে।"

"এবার বুঝলে তো? স্ট্যাটিসস্টিকস্ অনুযায়ী এই সময় নিশ্চয়ই তোমাদের বেশি লেখা উচিত"—চারু ভট্টাচার্য কথা শেষ করলেন।

সেইদিন প্রতজ্ঞাবদ্ধ হয়েও আমি কিন্তু আমার দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারিনি। বসুধারার বৈশাখ সংখ্যায় লেখা দেওয়া হয়নি। সম্পাদকীয় এবং বৈবাহিক জগতে কথা দিয়ে কথা না রাখার মতো গুরুতর অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। উকিলরা এই অপরাধকেই বলেন ব্রিচ অফ প্রমিস।

এরপর ওঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে হয়েছে। বসুধারা আপিসের সামনে পর্যন্ত গিয়েছি; কিন্তু ঢুকতে সাহস হয়নি। মনে মনে ভেবেছি যে লোক রবীন্দ্রনাথের লেখা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন—সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্র রচনাবলীর

পিছনে যাঁর অদৃশ্য হস্ত রয়েছে তাঁর কী দুর্ভাগ্য—রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি বছরে তিনি আমাদের লেখা চাইছেন।

বুদ্ধিমান পাঠক আমার দুর্বলতা ক্ষমা করবেন। এমন ক্ষমাসুন্দর চক্ষে আমার প্রতিটি ভুলকে গ্রহণ করবার সুমধুর দৃষ্টান্ত আমার জীবিতকালে আর পাবো বলে মনে হয় না। অন্তত আমি আশা করি না।

সবার অলক্ষ্যে ক্ষমাভিক্ষার জন্য একদিন বিকেলে চারুবাবুর ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। তখন সৌভাগ্যক্রমে সেখানে কেউ ছিল না। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই তিনি বললেন, "এই যে শ্রীমান এসো এসো।" তারপর নিজেকে সংশোধন করে বললেন, "ওহো তুমি তো আবার শ্রীহীন শংকর। কি যে তোমার রুচি বুঝি না—নিজের ল্যাজা মুড়ো নিজেই বাদ দিলে। আমি যদি তোমার শত্রু হতাম তাহলে বলতাম, এই কারণেই তোমার রচনায় হৃদয় থাকিলেও মস্তিস্ক থাকে না।"

আমাকে ক্ষমা চাইতে হলো না। তার আগে নিজেই তিনি বললেন, "তুমি যে লেখা দাওনি এতে খুশি হয়েছি। তুমি যে লিখছো, এমনকি আপিস থেকে পর্যন্ত ছুটি নিয়েছো, এ খবর আমি পেয়েছি। লেখাটা নিশ্চয়ই তোমার মনের মতো হয়নি। আমাকে ছুঁচো গেলার হাত থেকে রক্ষে করেছো। আগেকার যুগে রীতি ছিল—সম্পাদকরা লেখা পড়ে বিচার করবেন। মনের মতন না হলে, মাঝে মাঝে ডাক পিওনের কাজ বাড়াবেন—সে তিনি যেই হোন না কেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথও গল্প লিখে প্রথমেই কয়েকজন মনের মতো লোককে শোনাতেন। এখনকার বিখ্যাত লেখকদের লেখা প্রথমে যিনি পড়েন—তাঁর নাম কম্পোজিটর এবং শেষ যিনি সংশোধন করেন তাঁর নাম প্রুফ রিডার। এতে সম্পাদকের কাজ কমে বটে, কিন্তু সাহিত্যের উপর অবিচার করা হয়। কারণ খারাপ লেখাটা কিছু অপরাধ নয়, অপরাধ ফলাও করে তা কাগজে ছাপা।"

আমি বলেছিলাম, "আমার সৌভাগ্য আপনি আমাকে ভালবাসেন। আমার লেখা পড়েন। যে চোখ রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি পড়েছে, সেই চোখই আমার লেখা যাচাই করছে।"

চারুবাবু হেসে বললেন, "লেখকরা বেজায় সেন্টিমেন্টাল হয়। তবে ধরা যাক্ তোমার যে লেখাটা প্রকাশ করতে দিলে না, সেটা খারাপ হয়েছিল। কিংবা মডার্ন কায়দায় বলা যেতে পার—স্টিল বর্ন চাইল্ড—অনেক যন্ত্রণার পর মা যে শিশু প্রসব করলেন সে মৃত।"

"বাঃ চমৎকার বলেছেন", আমি বললাম।

"কিন্তু একটা প্রশ্ন করি। সেই সন্তানটি কী? গজক্ষয়? না মূষিক বৃদ্ধি?"

"মানে?" আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

"আধুনিক লেখক হয়ে ঐ সিক্রেটটা জানো না এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করছি না। যদি তুমি কোর্টে এফিডেবিট করো, তা হলেও না। তার জন্যে যদি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় তা হলেও না।"

"আপনি কি কখনও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন?"

"কেন বিখ্যাত লোকদিগের চরিত্রে একটা ডার্কসাইড থাকতে নেই? প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছি, পড়িয়েছি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘুরেছি, নিষ্ঠাবান সৎব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি, জগদীশ বোসের কাছে পড়েছি, মেঘনাদ সাহা সত্যেন বোসকে পড়িয়েছি বলে চরিত্রে একটু কলঙ্ক থাকবে না? তা হলে চারুচন্দ্র কেন? কিন্তু সে কথা পরে। আগে গজক্ষয়ের ঘটনাটা শোনো, সেটাও আমার মতো এক মাস্টারের কীর্তি।"

চারুবাবু বলতে আরম্ভ করলেন—"এক মাস্টারমশায় পাঠশালে পড়াচ্ছেন। ভদ্রলোক চোখে ভাল দেখতে পান না, বোধহয় ছানি ছিল। এমন সময় পাঠশালের পাশ দিয়ে একটা শুয়োর ছুটে গেলো। ছেলেরা বললো, গুরুমশায় ওটা কী গেলো? গুরুমশায় ঠিক ঠাওর করতে পারেননি। কিন্তু ছাত্রদের কাছে ইজ্জৎ যায় আর কি! শেষে ঠেকায় পড়ে বললেন—গজক্ষয় বা মূষিকবৃদ্ধি। অর্থাৎ হয় ক্ষয়ে যাওয়া হাতি, না হয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূষিক।"

একটু থেমে চারুবাবু বললেন, "এই যে তোমরা ইদানিংকালে বাংলা উপন্যাস বলে যেগুলো চালাচ্ছ সেগুলো হয় গজক্ষয় না হয় মূষিকবৃদ্ধি। গজক্ষয়, ভদ্রতা করে বললাম। আসলে প্রায় সবই মূষিকবৃদ্ধি।"

আমি হেসে উঠলাম।

উনি আমার হাতটা চেপে ধরে বললেন, "কি গো, রাগ করলে নাকি?"

আমি বললাম "মোটেই না, আপনাদের সমালোচনা শুনেই তো আমরা নিজেদের সংশোধন করে নেবো।"

উনি আবার হাসলেন। "বুড়ো বয়সের ঐ দোষ, মানুষ গ্যারুলাস হয়ে ওঠে। বকবক না করলে যেন ভাত হজম হয় না।" আমি বললাম, "আপনার ক্রিমিনাল কেসটার কথা এবার বলুন। আপনার কী শাস্তি হয়েছিলো?"

"সেটি এখন বলছি না। শেষে তোমরা বলে বেড়াও, "কন্‌ভিক্‌টেড লোক দিয়ে ত্রিদিবেশ বসু মশায় বসুধারা চলাচ্ছেন !"

"আদালতে কন্‌ভিক্‌টেড বিপিন পাল এবং কনভিকটেড কম্পোজিটরের কথা তো আপনিই কিছুদিন আগে লিখেছেন।" আমি উত্তর দিলাম।

"ওরে বাপু সেসব রাজনৈতিক কন্‌ভিক্‌শন। ওতে নাম আরও বাড়ে। আমার তো তা নয়। আমার অপরাধ যে অত্যন্ত ঘৃণ্য !"

"কী ধরনের ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"তুমি ভেবেছো তুমিই আদালতের সমস্ত খবর জানা। আমি ইন্ডিয়ান পেনাল কোডটা বুঝি না, কিন্তু মিউনিসিপাল অ্যাক্টটা সঞ্চয়িতার মত মুখস্থ আছে। মায় একটু উৎসাহ পেলে মিউনিসিপ্যাল কোর্ট নিয়ে আর একখানা 'কত অজানারে' লিখে ফেলতে পারি !"

"অনেকদিন ওখানে যেতে হয়েছিলো বুঝি ?" আমি প্রশ্ন করি।

"নারে বাপু, মাত্র একদিন। তাতেই ডবল ডিমাই স্মল পাইকা পাঁচশো পাতা। বেশিদিন গেলে তো ভল্যুমের পর ভল্যুম লিখতে হতো, ব্যাপারটা বলি শোনো—

আমাদের বাড়ির সামনে ময়লা ফেলা নিয়ে ব্যাপারটা হয়েছিলো। নিয়ম হচ্ছে কর্পোরেশনের ময়লা গাড়ি এলে তবে বাড়ির ময়লা ডাস্টবিনে ফেলতে হবে। কিন্তু একদিন আদালতের সমন পেলাম কোন এক ধারা মতে আমার বিচার হবে। কারণ কর্পোরেশনের খাতায় যে বাড়ির মালিক বলে আমার নাম লেখা আছে ঠিক তারই সামনের ডাস্টবিনে ময়লা ফেলবার আইন মানা হয়নি।

বোঝো অবস্থা। কোর্টে গিয়ে তো হাজ্‌রে দিলাম। কখন ডাক পড়ে। উকিল বলে দিয়েছেন, "যেমনি আদালতে জিজ্ঞাসা করবেন—দোষী ? অমনি বলবেন, হ্যাঁ ধর্মাবতার দোষী। তাহলে কয়েক টাকার মধ্যে দিয়ে আপদ চুকে যাবে। খবরদার গুঁইগাঁই করবেন না ; তাহলে ট্যাক্সির মিটারের মতো ফাইন বাড়তে আরম্ভ করবে।" কোর্টে বসে বসে ওই গৎটাই মুখস্থ করেছি।

ওদিকে কোর্টে বেজায় ভিড়। গ্র্যান্ড পুজো ক্লিয়ারেন্স চলেছে। ছুটিতে বহু কেস জমা হয়ে গিয়েছিল। তাই পাইকিরি রেটে বিচার হচ্ছে। শ'চারেক আসামী জমা হয়ে আছে। গোটা চল্লিশ পঞ্চাশ-আসামীকে একসঙ্গে কাঠগড়ায় পুরে নাম ডাকা হচ্ছে। দোষীরা সবাই একসঙ্গে বলছে হ্যাঁ হুজুর, আর পাঁচটাকা করে জরিমানা হচ্ছে। কেউ প্রতিবাদ করলেই মুশকিল।

রাম আহির ? তুমি অমুক দিন অমুক সময় মিউনিসিপাল রাস্তার উপর চার গাড়ি চুন সুরকি ঢেলে রেখেছিলে ? তোমার পাঁচটাকা ফাইন।

হুজুর আমার চুনসুরকির দোকান নেই। আমি গয়লা মানুষ। সুরকি দিয়ে কী করবো ? রাম আহিরের প্রতিবাদে পাঁচটাকা দশটাকা হয়ে গেলো। দশ, দশ, দোষী ?

দেরি করলে এখনি পনেরো হয়ে যাবে এই ভয়ে রাম আহির বললে, হ্যাঁ হুজুর দোষী। জরিমানার টাকা দিয়ে সে বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে : আখতার আলী, তুমি অমুক দিন অমুক সময় মিউনিসিপ্যাল রাস্তায় তোমার খাটালের মোষ ধোয়াচ্ছিলে, তোমার পাঁচ টাকা।

হুজুর ! মোষ আমি কোথায় পাবো ? আমি চুনসুরকির ব্যবসা করি।

দোষী ?

হুজুর আমি.....

দশ টাকা।

দোষী ?

আখতার আলীও এবার ফাইন দিয়ে চলে গেলো।

তারপর চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পিতা....ভট্টাচার্য্য, তুমি অমুক তারিখে ডাস্টবিনে জঞ্জাল.....

হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট মুখ তুলে চাইলেন, আমাকে ডেকে দেখেই যেন চমকে উঠলেন, স্যার ? আপনি ? আপনি এই কোর্টে ?

কাঠগড়া থেকে খালাস হয়ে সোজা ম্যাজিস্ট্রেটের খাস দপ্তর। জরিমানা তো দূরের কথা। রাঙতামোড়া সন্দেশ খেয়ে বাড়ি ফিরলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে মাস্টারি করার ঐ একটা সুবিধে !" চারুবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন।

সেদিন আরও অনেক কথা হয়েছিল। আসামের দাঙ্গা-হাঙ্গামা। ভারতের-জাতীয় ঐক্য। উনি বলেছিলেন, বাংলার কাল্‌চারাল কঙ্কোয়েস্ট এর জন্যে দুটি জিনিস দায়ী। একটি রবীন্দ্রনাথ ; অপরটি রসগোল্লা। রসগোল্লার মধ্য দিয়েই বাঙালি ভারতবর্ষকে জয় করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ কোন সূত্রে একত্র হয়ে আছে [illegible] ?

আমি বললাম, "বইতে পড়েছি আগে ছিল ইংরেজ—আর [illegible] হয় ইংরেজি।"

চারুবাবু বললেন, "তোমার মুণ্ডু! ছোটোবেলায় কলেজে পড়বার সময় শুনেছিলাম, শিবলিঙ্গ। ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যেখানেই যাবে সেখানেই শিবলিঙ্গ দেখতে পাবে। কিন্তু ভারত সন্ধানে বেরিয়ে, আমি আবিষ্কার করেছি, না শিবলিঙ্গ নয়—অন্য কিছু।"

"সেই অন্য কিছুটা কী?" অমি অধীর হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"সেই অন্যকিছুটিকে খুঁজে বার করতে গিয়ে জীবনের আটাত্তরটা বছর কেটে গেছে। রবীন্দ্রনাথও যা পারেননি আমি তা পেরেছি। আর তোমাকে এককথায় তা বলে দেবো?"

"আমরা ছোটো। আমাদেরও যদি খুঁজে খুঁজে সব শিখতে হয় তাহলে কোনদিনই তো জানা হবে না।" ওঁর কাছে কাতর আবেদন করলাম।

উনি হেসে বললেন, "তবে জেনে রেখে দাও—কিন্তু ক্লোজলি গার্ডেড সিক্রেট—জিলিপি। ভারতবর্ষের যেখানেই যাও জিলিপি তুমি পাবেই। বাঙালির রসগোল্লা বিজয় গোল্লায় গিয়েছে, শিবলিঙ্গকে আমরা আমাদের জীবন থেকে হটিয়ে দিয়েছি—কারণ আমরা জেনে ফেলেছি আমাদের মধ্যেই শিব বিরাজ করছেন। এখন সবেধন নীলমণি যা রইল তার নাম জিলিপি।"

কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির কথা উঠলো, বললেন, "তুমি দুজনেরই ভক্ত?"

বললাম "আজ্ঞে হ্যাঁ। এঁদের দুজনের কাছেই ভারতবর্ষের মানুষ আমরা চিরকাল ঋণী হয়ে থাকবো।"

"ওঁদের দেখেছো?" চারুবাবু প্রশ্ন করলেন। "না রবীন্দ্রনাথ যখন বিদায় নিলেন তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি; আর গান্ধীজী যখন গড্‌সের গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, তখন আমি ম্যাট্রিকের পড়া মুখস্থ করছি। ভারতের দুজন মহামানবের সমসাময়িক হয়েও কাউকে দেখে যেতে পারলাম না। বুড়ো হয়ে নাতিদের কী বলবো?" আমি বললাম।

উনি একটু ইতস্তত করলেন, তারপর বললেন, "হয়তো আমার ভুল। কিন্তু আমার নাতিকে কী বলি জানো? আমি দুজনকেই দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ হলেন সমুদ্র—আর গান্ধীজী তাজমহল। পুরীর সমুদ্র দেখবার আগে মনে মনে একটা কল্পনা করেছিলাম। কিন্তু মিললো না—দেখলুম সমুদ্র কল্পনা থেকেও অনেক বড়ো। তাজমহলও দেখেছি—কিন্তু কল্পনার থেকে খাটো মনে হয়েছে। কিন্তু কাউকে বলতে পারিনি—পাছে শিল্পরসিক বন্ধুরা হাসলেন।"

হঠাৎ চারুচন্দ্র গম্ভীর হয়ে পড়লেন। বললেন, "কী সব বাজে বকছি। স্বর্গ থেকে বিশ্বাসের ছবি এনে তোমাদের হাতে দিয়ে যেতে চাই। কিন্তু সে আমরা পারিনি। রবীন্দ্রনাথের নিকটতম সান্নিধ্যে এসেও তোমরা যারা তাঁকে দেখোনি—তাদের কিছুই দিয়ে যেতে পারলাম না। বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। রবীন্দ্র শতবর্ষের বছরে তোমাদের মালাগুলো জোর করে আমরা গলায় পরে গেলাম। পরে হয়তো তোমরা সব বুঝবে, কিন্তু তখন যেন আমাদের জোচ্চোর বোলো না, বিশ্বাস করো, আমাদের সামর্থ্য ছিল না।"

আর তা ছাড়া...." চারুবাবু এবার দীর্ঘনিশ্বাস নিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, "একে একে নিবেছে দেউটি। মাইকেলের মৃত্যুদিনে আমি জন্ম নিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তি বছরেই আমার শেষ। এই তোমাকে বলে রাখলাম। বিশ্বাস না হয় তোমার নোট বইতে টুকে রেখে দিও।" হঠাৎ উনি হেসে উঠলেন বললেন, "চলো ওঠা যাক।"

কর্নওয়ালিস্ স্ট্রিটের উপর থেকে তিনি মোটরে চড়লেন। মোটর ছেড়ে দিল। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে তিনি বললেন, "আমি সাহিত্যিক নই যে কথার খেলাপ করবো। কথা যা দিলুম, তা ঠিক রাখবই।"

ডাইরির পাতার মধ্য থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে "কী হে আধুনিক সাহিত্যিক, কথা রাখিনি?"

হ্যাঁ, কথা তিনি রেখেছেন। কিন্তু আবার কথা রাখেনওনি। এইতো কয়েকমাস আগে, এক প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের রৌপ্যজয়ন্তী উৎসবে বক্তৃতা করতে উঠে তিনি বলেছিলেন, "আজ আমার বিশেষ কিছু বলবার সময় নেই। আমার যা কিছু বক্তব্য তা এই প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবে বলবো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, আপনাদের সবাই যেন সুস্থ শরীরে সেদিন এখানে থেকে আমার বক্তৃতা শুনতে পারেন।"

কবে তাঁর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে জানি না। কিন্তু সে দর্শন যতোই বিলম্বে হোক, তাঁকে আমি আর একবার মনে করিয়ে দেবো, তিনি কথার খেলাপ করেছেন।

আর সেই বোঝাপড়ার আগে পর্যন্ত আমাদের সবাইকে চোখের জল ফেলতে হবে। তাঁর কী ছিল? তাঁর বিচিত্র জীবনের প্রায় কোন অভিজ্ঞতাকেই আমাদের অনাগত বংশধরদের জন্যে রক্ষে করা হলো না। তাঁর আত্মজীবনী রচিত হলে, ভারতীয় সাহিত্যে তা এক আশ্চর্য সৃষ্টি হতো।

ছোটবেলায় এক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়েছিলাম। আফ্রিকার গহন অরণ্য থেকে দুষ্ট এবং লোভীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দুজন অসীমসাহসী বাঙালি যুবক রত্নসম্ভার উদ্ধার করে পালতোলা জাহাজে দেশে ফিরছিল। কিন্তু ভারত মহাসাগরের বুকে হঠাৎ সাইক্লোন উঠলো। ঝড়ঝঞ্ঝায় সেই সোনাবোঝাই জাহাজ শেষ পর্যন্ত ডুবে গেলো। কৈশোরের অপরিণত বুদ্ধিতে, সেই সর্বনাশা ক্ষতির জন্য সেদিন চোখের জল ফেলেছিলাম। আর এতোদিন পরে আমাদেরই চোখের সামনে আর এক সোনাবোঝাই জাহাজ মৃত্যুসাগরের অতলে তলিয়ে গেলো। দুঃখ এই, এতো কাছে থেকেও আমরা একতাল সোনাও সেই ডুবন্ত জাহাজ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করলাম না।

তাঁর কোনো কথা, কোনো গল্পই আমরা লিখে রাখলাম না। পৃথিবীতে সক্রেটিস্, খ্রিস্ট এবং শ্রীরামকৃষ্ণরাই বিরল বলে ধারণা ছিল—কিন্তু বস্‌ওয়েল এবং শ্রীম'দেরও যে এত অভাব তা এতোদিনে জানলাম।

কবিগুরুর শতবর্ষ

প্রাণের ভয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পাখিটা ওইখানে ঢুকে পড়েছিল। বুঝেছিল এখানে সে অনধিকার-প্রবেশকারী—সোজা ভাষায় বাঙালিরা যাকে 'ট্রেসপাসার' বলে। তাই রাত্রির নিস্তব্ধতা আর অন্ধকারকে যতোদূর সম্ভব বিরক্ত না করে সে চারিদিকে তাকাচ্ছিল, কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। এখানে অসংখ্য চেয়ারের ভিড়, কিন্তু মানুষ নেই একটাও। আগামীকাল ভোরে এই হলঘরে কোনো সভা হবে। থামগুলোতে রঙিন কাপড় মোড়া হয়েছে, মাথার উপরেও ডেকরেটরদের চাঁদোয়া। আর কোথাও আশ্রয় না পেয়ে ভীরু পাখিটা শেষপর্যন্ত একটা ছবির উপর এসে বসলো। সমস্ত সভামণ্ডপে ঐ একটা ছবিই টাঙানো ছিল।

—কে ?

পাখিটা চমকে উঠলো।—আমাকে মাপ করবেন প্রভু। এখানে যে অন্য কেউ আছেন বুঝতে পারিনি। আমি এখনই চলে যাচ্ছি।

ছবিটা সামান্য নড়ে উঠলো—এতো সঙ্কোচ বোধ করছো কেন পাখি? এই বিশ্বসংসারটা কিছু আমার খাস জমিদারি নয়। এখানে সবার সমান অধিকার, তোমার যেখানে খুশি বিশ্রাম নাও।

—আপনার কোনো কষ্ট হবে না তো প্রভু?

—ছোটোপখি, তোমার সামান্য বোঝাটুকু বইবার মতো ক্ষমতা আজও বোধ হয় আমার আছে।

—আপনার অনুগ্রহের সীমা নেই প্রভু। এর আগে পৃথিবীর অনেক ভারী ভারী বোঝা আপনাকে বইতে হয়েছে বুঝি?

—ছোটপাখি, রাত্রি অনেক হয়েছে এখন ঘুমিয়ে পড়ো। হারানো দিনের হারিয়ে-যাওয়া কথাগুলো আর মনে করিয়ে দিও না।

—রাত্রি এখনও বেশি হয়নি প্রভু। এখনও রাস্তায় ট্রাম বাস রিকশ চলছে, রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে, চা-এর দোকানে গরম চা বিক্রি হচ্ছে, সিনেমা-হলে সিনেমা শেষ হয়নি।

—তাই বুঝি, ছোটপাখি? আমার যেন মনে হচ্ছে, এক অন্তবিহীন অন্ধকারের মধ্যে আমি হেঁটে চলেছি। কখন যে তার শুরু হয়েছে আমি জানি না, কোথায় যে তার শেষ তাও আমি জানি না।

—কে? আপনি কে প্রভু? আপনাকে তো চিনতে পারছি না।

—আমাকে তুমি চিনতে পারবে না, ছোটপাখি। তার থেকে বলো এতোরাত্রে নিজের বাসা ছেড়ে হঠাৎ এখানে এসে ঢুকলে কেন?

—একদল ছেলে আমার বাসাটা ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছে। কতগুলো দেবদারু গাছের ডাল আজ যে ওরা নির্দয়ভাবে কেটে তছনছ করলো।

—কে? হঠাৎ এমন দুর্মতি হলো কেন ওদের?

—আগামীকাল কীসের যেন উৎসব। বহু বছর আগে, কে একজন যেন এই দেশে জন্ম নিয়েছিলেন। সারাজীবন ধরে তিনি নাকি অনেক ভালো ভালো কথা পদ্যকরে লিখে গিয়েছিলেন—মানুষকে ভালবাসো, পৃথিবীকে ভালবাসো, প্রকৃতিকে ভালবাসো। সেই লোকটার মতো এতো সুন্দর করে কেউ নাকি কোনোদিন মনের ভাবপ্রকাশ করতে পারেনি। বেঁচে থাকলে আগামীকাল লোকটার নাকি একশ' বছর বয়স হতো। তাই ওরা উৎসব করবে—দেবদারু গাছের পাতা আর নানা ফুল দিয়ে উৎসব-প্রাঙ্গণ সাজাবে।

বাইরে বৈশাখের ঝড় শুরু হয়েছে। চিত্রমূর্তি হঠাৎ যেন দুলে উঠলো, আর পাখিটা ভয় পেয়ে বললো :

—প্রভু আপনি কি আমার উপর অসন্তুষ্ট হলেন ? না জেনে ওঁকে অবমাননা করেছি নাকি ? ওঁকে আমি চিনি না, জানি না, তাই 'লোকটা' বলেছি—মানুষরা বলে কবি, বিশ্বকবি, কবিগুরু আরও কত কী।

—না, না আমি একটুও অসন্তুষ্ট হইনি, ছোটপাখি। তুমি ভালভাবে আমার ওপর বোসো, তোমার যতোক্ষণ খুশি আমার সামান্য আশ্রয়ে শান্তিতে থাকো। তোমার কথা ভেবে বড় কষ্ট পাচ্ছি, ছোটোপাখি। তোমার ঘর নেই। আশ্রয় নেই। কিন্তু বিশ্বাস করো আমার কোনো অপরাধ নেই।

—একি ? প্রভু,আপনি কাঁদছেন ? এই পৃথিবীতে আপনি তো সুবিধে করতে পারবেন না। আমার সামান্য একটা বাসা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাও একজন মহামানবের নৈবেদ্যরূপে। আর এখানে হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা হচ্ছে, মানুষেরই জন্যে। এক দেশ আর এক দেশকে পছন্দ না করলেই রাত্রের অন্ধকারে আণবিক বোমা ফেলে যায়। এক ভাষার লোক আর এক ভাষার লোককে পছন্দ না করলে কেরোসিন তেল ঢেলে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, মেয়েদের উপর অত্যাচার করে, শিশু হত্যা করে।

—আর তোমাদের কবি, নিশ্চয়ই সে সময় পরম আনন্দে গুনগুন করে গান গেয়ে কাব্য-সরস্বতীর সান্নিধ্য কামনা করছিলেন ? সোনার কলমে লিখছিলেন, পৃথিবী কত সুন্দর, প্রকৃতি কত লাস্যময়ী তাই না ?

—ওঁর উপর আপনি অযথা রাগ করছেন প্রভু। যে-রাত্রে এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে উদিত সূর্যের দেশে আণবিক বোমা পড়েছিল, সে রাত্রে তিনি তো বেঁচে ছিলেন না। আর মানুষের নীচতা, হিংস্রতা ? তার বিরুদ্ধে তিনি তো অনেক লিখেছেন। ঐ তো দেওয়ালের গায়ে ছেলেরা কবির বাণী লাল কালিতে বড়ো বড়ো হরফে উদ্ধৃত করেছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ? হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী.....

—কবির কথা শুনেছিল ওরা ?

—তা তো জানি না প্রভু। এই শহরেই তো তারপর গোটা কয়েক দাঙ্গা রায়ট হয়ে গেলো। রাস্তায় মরা মানুষের পচে যাওয়া দেহ আমি পড়ে থাকতে দেখেছি। এর পিঠে ও ছুরি বসিয়েছে, অথচ দু'জনই সেই ভাষায় কথা বলে যে ভাষায় কবি তাঁর অমর কাব্য ও রচনা রেখে গিয়েছেন।

—ছোটোপাখি, অমর কথাটার মানে কী ?

—আমি তো জানি না, প্রভু। কবির কাব্য সম্বন্ধে এই দেশের লোকেরা প্রায়ই ঐ কথাটা বলে।

—জন্ম হলে তবে তো সে মর অথবা অমর হবে? তুমি যে কবির কথা বলছো, ছোটপাখি, তিনি তো দেখছি শুধু লিখে গিয়েছেন। সে-লেখা হয়তো ছাপা হয়েছে, সেই ছাপা বই হয়তো বিক্রি হয়েছে—কিন্তু সে-লেখা তো এখনও কেউ পড়েনি। যিনি জন্মালেন না, তাঁর মৃত্যু হবে কী করে?

ছোটপাখি যেন চমকে উঠলো। ওর ছোট্টপাখা দুটো ভয়ে কাঁপতে লাগলো। সে বললো,

—প্রভু, আমার ভয় করছে। এ-সব কথা ওদের কানে গেলে সর্বনাশ হবে। ওরা ভাববে ওদের প্রিয় কবিকে আমরা ইচ্ছে করে অপমান করছি।

—ও তুমি বলছো, অমর না হোন, তিনি এ-দেশের প্রিয় কবি।

—আমার বুদ্ধি সামান্য, প্রভু, কিছুই গুছিয়ে বলতে পারি না।

—ছোটপাখি, তোমার পাখা আছে, একবার বাইরে থেকে কিছু প্রমাণ নিয়ে এসো না।

—এখনই যাচ্ছি প্রভু।

—ছোটোপাখি, ছোটোপাখি, তোমার জন্য আমি জেগে বসে আছি।

—হ্যাঁ প্রভু দেখে এলাম। তিনি যে জনপ্রিয় সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। এই-শহরে যতোগুলো ছাপাখানা আছে, তার যেখানেই গেলাম সেখানেই দেখলাম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের কাজ হচ্ছে। নিশীথ-প্রদীপ জ্বালিয়ে কম্পোজিটার লেখা কম্পোজ করছে। ওদেরই একজনকে বলতে শুনলাম, রবি ঠাকুর এবার সরস্বতী এবং দুর্গা ঠাকুরকেও হারিয়ে দিল।পূজোর সময়ও এতো কার্ড আর বিল বই ছাপানো হয় না।

ছবিটা একবার যেন হেসে উঠলো। বললো :

—লোকটা তা হলে সত্যই সর্বজনীন পুজো কমিটির ছেলে-ছোকরাদের প্রিয়।

—ছোটোপাখি, এতোক্ষণ ঘুরে ঘুরে তুমি শুধু এইটুকু দেখে এলে? বারোয়ারি সংস্থারাই কি এখন এই দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে?

—না প্রভু, এখনই আমি আসছি, সব দেখেশুনে।

—আমি ফিরে এসেছি, প্রভু।

—তোমার ঠোঁটে ওটা কী?

—রাত জেগে এই শহরের একজন গুণী জ্ঞানী তাঁর বক্তৃতা লিখছিলেন। লিখতে লিখতে বোধহয় একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, বাইরে বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই সুযোগে ওঁর লেখা একটা পাতা ঠোঁটে করে নিয়ে এসেছি।

—ভালো করনি, ছোটোপাখি। বেচারার কষ্টের লেখা। লিখতে কত কষ্ট হয় তুমি জানো না, ছোটপাখি।

—সে নিয়ে চিন্তা করবেন না প্রভু—ওঁর টেবিলের উপরেই আঠাশ-খণ্ড 'রচনাবলী' সাজানো রয়েছে। ওঁর উক্তি দিয়েই বক্তৃতা ভরিয়ে দিতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো না ঐ ধরনের একটা কথা সে-সময় খুব প্রচলিত ছিল।

—এখনও আছে, প্রভু। আধুনিক রম্য-সাহিত্যিকরা বলেন—মাছের তেলে মাছ ভাজা।

—এ্যাঁ, রম্য-সাহিত্যিক বস্তুটা কী?

—আজ্ঞে, এদেশে সাহিত্যিক এখন দুরকমের—রম্য-সাহিত্যিক এবং নির্ভেজাল সাহিত্যিক। কিন্তু আপনি ভয় পাবেন না প্রভু, যাঁর লেখা আমি নিয়ে এসেছি তিনি অধ্যাপক—একবার পড়ে দেখুন—

—পড়ে দেখার চোখ আমার নেই। তুমিই পড়ো।

—উনি লিখেছেন, 'যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশঃপ্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য। কিন্তু কোনো কবির পক্ষে কতখানি জনপ্রিয় হওয়া সম্ভব? বুদ্ধ, খ্রিস্ট, মহম্মদ যে অর্থে জনপ্রিয়, অশোক, আলেকজান্ডার, সিজার যে অর্থে যশস্বী তাহা কোনো মহাকাব্য রচয়িতার ভাগ্যে ইতিহাসে কখনও জোটে নাই। এমন কি শংকর, কবীর, চৈতন্যের কাছাকাছি কোনো কবি আসিতে পারেন না। কারণ কাব্যের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা যতোই দম্ভ প্রকাশ করি না কেন শিক্ষিত এবং সংবেদনশীল নাগরিকের ১৪৪০ মিনিটের দৈনন্দিন জীবনে কাব্য কতখানি অংশ অধিকার করিয়া থাকে তাহা আমাদের জানিতে বাকি নাই। সেদিকে আমরা ধন্য। পৃথিবীর আর কোনো কবি কোনো দেশে এমনভাবে বন্দিত হন নাই। কাব্য সরস্বতীর একজন পূজারীর জন্য সমগ্র জাতিকে এমন ভাবে মাতিয়া উঠিতে আর কখনও দেখা যায় নাই। ধর্মগুরু এবং রাজনীতিবিদদের

রেকর্ডও তাঁহার কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছে। ধন্য এই দেশ, ধন্য সেই কবি যিনি এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।...'

—ছোটোপাখি, এবার থামো—আর পড়বার প্রয়োজন নেই। বুঝতে পারছি জোড়াসাঁকোর ঐ ভদ্রলোকের নাম এ-দেশের সবাই জানে। বড়ো আনন্দের কথা, ছোটোপাখি।

—হ্যাঁ প্রভু, লোকে বলছে, তিনি দরিদ্রভাষাকে, বাংলাভাষাকে সচ্ছল করেছেন, গোটা জাতটার কথা বলবার ঢং, চিঠি লেখার ভঙ্গি, এমনকি হাতের লেখার প্রকৃতি পর্যন্ত তিনি পালটিয়ে দিয়েছেন।

—তাই নাকি ?

—আপনার কাছে কি আমি মিথ্যে কথা বলবো প্রভু ?

—তুমি তো লোকের মনের মধ্যে ঢুকতে পারো ছোটোপাখি ?

—ছোট্ট জীব আমরা, সবই পারি, প্রভু। কারণ আমাদের সামনে এরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে ভয় পায় না।

—তা হলে, আর একবার ঘুরে আসবে কি, ছোটোপাখি ? এদের মনের ভিতরের কথাটা আমার জানতে ইচ্ছে করছে।

—আমি এখনই যাচ্ছি, প্রভু।

—ছোটোপাখি, রাত্রের অন্ধকারে একটু আশ্রয়ের সন্ধানে তুমি আমার কাছে এসেছিলে। আশ্রয়ের লোভ দেখিয়ে তোমার বিশ্রামের রাত্রিটা আমি নিজের স্বার্থে অপচয় করছি।

—না প্রভু, এতোদিন এই দেশে রয়েছি, এতো দেখেছি, কিন্তু কখনও আজকের মতো উত্তেজনা অনুভব করিনি। আমার খুব ভালো লাগছে। আমার জ্ঞানচক্ষু যেন ধীরে ধীরে উন্মীলিত হচ্ছে।

—তুমিও যে জোড়াসাঁকোর সেই সুখী রাজপুত্রের ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করলে ছোটোপাখি ! ব্যাপার কী ? শুধু তোমার নয়, আমারও জ্ঞানচক্ষু যেন ধীরে ধীরে উন্মীলিত হচ্ছে। এতোদিনেও পৃথিবীর কিছুই যে বুঝতে পারিনি তা এখন বুঝতে পারছি। যাক সে কথা। এতোক্ষণ ধরে কী দেখে এলে ?

—প্রথমে যেখানে গিয়েছিলাম, সেখানে সবাই ধন্য ধন্য করছে। বলছে, ভাগ্যিস মহাকবি অমন সুন্দর সুন্দর লাইন লিখেছিলেন—

—কী লাইন ?

—অদ্ভুত, সুন্দর সব লাইন। সেই সব লাইন ব্যবহার করে অনেকে বড়লোক হয়ে গেল। কবি শুধু যাদের কিছু নেই তাদেরই ভালবাসতেন না, যাদের আছে তাদেরও জন্য চিন্তা করে লিখতেন।

—যেমন...

—'যদি জানতেম আমার কীসের ব্যথা, তবে তোমায় আমি জানাতাম'।—মাথা ধরার ট্যাবলেটের বিজ্ঞাপন।

'কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী'—ঘুমের ওষুধ, কিংবা ঠাণ্ডা মাথার তেলের প্রচার।

'তার জন্ম পরে বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে'। আর একটি বিজ্ঞাপন—'আমার এই দেহখানি তুলে ধরো তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো'।

—ওটা কী ?

—একটা নতুন বৈদ্যুতিক লিফ্‌ট কোম্পানির বিজ্ঞাপনের কপি। ওরা আগে কোলাপসেবল গেট তৈরি করতো। তখন লিখতো—'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয় ? চোর ডাকাতদের সংশয় হইতে বাধ্য। কারণ রবীন্দ্র গেট মজবুত লোহায় তৈরি।'

—বণিকদের কথা ত্যাগ করো, ছোটোপাখি। স্বল্পমূল্যকে দুর্মূল্য করে তোলাতেই ওদের প্রতিভার বিকাশ। আর কোথাও গিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ প্রভু, একটা পাড়ার দুই মোড়ে দুটি জনসভা হচ্ছে। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে। তারপর কিন্তু যে বাক্সে ভোট দিতে বললেন তার মার্কা বিভিন্ন।

—ছোটোপাখি, বিভিন্ন ছবি মার্কা টিনের বাক্সের মধ্যে কাগজ ফেলে কোনো মহাদেশের ইতিহাস সৃষ্টি হয়নি। তুমি অন্য কাউকে দেখেছো ?

—হ্যাঁ প্রভু, প্রেমিক, লেখক, গৃহবধূদেরও তো দেখে এলাম।

—ওরা কি জোড়াসাঁকোর ঐ ভদ্রলোকের জন্য অনুভব করেছে ?

—কবির কোটেশনে প্রেমিকের খুব সুবিধে হয়—যে কথা সোজা ভাবে লিখতে সঙ্কোচ হয়, কোটেশন দিয়ে তা বলতে একটুও দ্বিধা জাগে না।

—লেখক ?

—একজন লেখকের ডাইরি দেখে এলাম। তিনি লিখছেন—

এযুগের আমরা আলালের ঘরে দুলাল। রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী আমরা—রুপোর চামচ মুখে দিয়ে সাহিত্যের সংসারে জন্মেছি। শব্দের দৈন্য

এখন আমাদের কল্পনার অতীত। আর সময়োপযোগী ডায়ালগ? আঁতুড়ঘর থেকে শ্রাদ্ধবাসর পর্যন্ত সর্বপ্রকার অবস্থার জন্যই রবীন্দ্রবাণী মজুত রয়েছে।

—এদেশের লেখকরা তাহলে সত্যই কবিগুরুর অনুগত?

—না প্রভু। ঐখানেই মুশকিল। ওঁরা সবাই রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। ওঁকে অনুসরণ করলেই সাহিত্যের শেয়ার-বাজারে লেখকের দাম নাকি হুড়ুম করে পড়ে যাবে।

—বুঝলাম। তাহলে ভদ্রলোকের আপন বলতে আছে কে?

—আমি ক্ষুদ্র জীব। আমার অতো বোঝবার শক্তি নেই প্রভু। এতো লোক যাঁর চরণে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দেয়, আপনি বলছেন তাঁর কেউ নেই?

—আমরা জানতাম, পায়ের গোড়ায় ফুল ছুঁড়ে মারলেই অঞ্জলি দেওয়া হয় না। এরা সবাই মিলে হৈ হৈ করে, গান গায়, কবিতা লেখে, বক্তৃতা দেয় বাইরের, লোকদের চিৎকার করে বলে বেড়ায় দেখো কত বড় কবি আমাদের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু কবিকে কিছুই দেয় না। সারাজীবন ধরে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন তা বোঝাবার কোনো লক্ষণই তো এদের ভাব ভাষা বা কর্মে ফুটে উঠতে দেখছি না।

—একি, প্রভু, আমার গায়ে যেন একফোঁটা জল পড়ল—আপনি কী কাঁদছেন? কেন? কী হয়েছে প্রভু? কবে কোন্ একটা লোক শুভ্রা-সরস্বতীর আশীর্বাদে ধন্য হয়ে অলৌকিক কাব্য সৃষ্টি করেছিল; গ্রহণ না করে তার দেশের লোকেরা বিধাতার সেই প্রসাদ চামড়ায় বাঁধিয়ে সোনার জলে নাম লিখে আলমারিতে পুরে রাখলো। কিছু পেয়েছে বলে আনন্দে তারা ঢাক বাজালো। অথচ কী পেয়েছে তা বোঝবার চেষ্টা করলো না। কিন্তু তাতে আপনারই কী, আর আমারই কী? আর সত্যি কথা বলতে কি, তাতে পৃথিবীর কী আসে যায়? পণ্ডিতরা তো বলেই গিয়েছেন, মুক্তোর মালা সবার গলায় শোভা পায় না।

ছবিটা যেন এবার দুলে উঠলো। বললে :

—ছোটোপাখি, তুমি কি সত্যিই আমাকে ভালবাসো?

—হ্যাঁ প্রভু, আপনি বিপদে আশ্রয় দিয়েছেন, আপনার জন্য আমি সব করতে রাজি আছি। আজ্ঞা করুন।

—আমাকে কেন যে ওরা থামের উপর তিনটে পেরেক মেরে টাঙিয়ে রেখে গিয়েছে। কবে কখন ওঁদের অনুষ্ঠান হবে, কবে ওঁদের সভাপতি,

প্রধান অতিথি এসে বক্তৃতা করবেন, তার জন্য আমার এই যন্ত্রণা। ছোটোপাখি, ক্রুশবদ্ধ যীশুর মতো আমার কষ্ট হচ্ছে। আমার একটা উপকার করবে ?

—বলুন প্রভু ?

—এই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে আমাকে কোনো সবুজ ঘাসে-ভরা মাঠের উপর, কিংবা কোনো গাছের তলায় ফেলে রেখে আসবে ? পারবে ছোটোপাখি ?

—পারবো, প্রভু। অন্তত আমি চেষ্টা করে দেখবো, প্রভু। ঐতো দেওয়ালে লেখা রয়েছে। আমাদের জন্য কবি লিখেছেন—ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

রাত্রের অন্ধকারে ঠোঁট দিয়ে পাখি আস্তে ছবিটার দড়ির পাকগুলো খুলে ফেললো। পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো :

—আর কষ্ট হবে না, প্রভু। আপনাকে নিয়ে এবার আমি মুক্তির সন্ধানে উড়ে যাবো।

কাঁদতে কাঁদতে ছবিটা বললো :

—এই বোঝা তুমি বইতে পারবে ?

—প্রভু, দেওয়ালের গায়ে, আগামীকালের সভার জন্য লেখা বাণীটা পড়তে পারছেন না ? —'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।' আমি চেষ্টা করবো। পাখির শ্রমে সমস্ত ছবিটা এবার দুলে উঠলো। পাখি কোনোরকমে বললো :

—প্রভু, আপনি নির্ভয়ে থাকুন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতো।

পাখি পারলো না। দড়ির বন্ধন মুক্ত হয়ে ভারী ছবিটা এবার ঝন ঝন করে মেঝেতে ভেঙে পড়লো।

—এটা কী ? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এমন সুন্দর ছবিটাকে কে এমন করে ভাঙলো ?—পরের দিন ভোরে সভা আরম্ভ হবার আগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সম্পাদক সভাকক্ষে ঢুকে চিৎকার করে উঠলেন।

—আঁা ! একটা পাখিও দেখছি—ছবিটার তলায় চাপা পড়ে মরে রয়েছে।—ভদ্রলোক আবার চিৎকার করলেন।—জমাদার জমাদার, ঝাঁটা দিয়ে জঞ্জালগুলো তাড়াতাড়ি সাফ করে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এসো।

জলদি জলদি, জমাদার। সভাপতি এসে পড়েছেন, সভার কাজ এখনি আরম্ভ হবে।

বিবেকানন্দ : শতবর্ষে

সেক্রেটারি—স্যার !

গ্রেটম্যান [বিরক্তভাবে]—আঃ, আবার কী হলো ? আবার কেউ দেখা করতে এসেছে নাকি ? তোমাকে স্ট্যান্ডিং ইন্‌সট্রাকশন দিয়েছি—ও হরি, ওটার পরিভাষা কী যেন হয়েছে বলো তো ?—চুলোর ছাই, সব বেঙ্গলিতে হয়ে গিয়ে যা অসুবিধেয় ফেলছে।

সেক্রেটারি—ইনসট্রাকশন হলো অনুদেশ।

গ্রেটম্যান—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওটা তো জানি, প্রতিদিন গণ্ডায় গণ্ডায় ইসু করছি। স্ট্যান্ডিংটা নিয়েই তো গোলমাল। ইস্কুলে তো বহুবার শুধু স্ট্যান্ড নয়, স্ট্যান্ডআপ আপ অন দি বেঞ্চও হয়েছি। এই ডামাডোলের বাজারে আমার অনুদেশও তোমরা দাঁড় করিয়ে রাখছো নাকি ? কতবার বলেছি, কোন কিছু শুইয়ে রাখবে না—নির্দেশ পাওয়া মাত্রেই কাজ করবে।

সে—স্ট্যান্ডিং অর্থে স্থায়ী।

গ্রে—ঠিক তাই। আমি তো স্থায়ী অনুদেশ দিয়েছি, যার-তার সঙ্গে হুট করে আমার দেখা হবে না। সব বাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আমার হাতে তো চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় নেই। টাইম ইজ্ শর্ট, বাট আর্ট ইজ লং। তোমাদের, অর্থাৎ কিনা আমাদের সংস্কৃতেই বলছে— অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং, স্বল্পায়ুতথা বহবশ্চ বিঘ্না। কান্ট্রির সবাইয়ের গ্যাজর-গ্যাজর শোনবার মতো অঢেল টাইম আমার নেই।

সে—তা তো আগেই নোট করে নিয়েছি স্যার ; এবং সেই অনুযায়ী....

গ্রে—অ্যাঁ ! সেই অনুযায়ী কাউকে হটিয়ে দিয়েছো নাকি ? তোমাদের মোটেই বিশ্বাস নেই। হয়তো সেবারের মতো কোনো ইম্পর্টান্ট লোককে তাড়িয়ে দিয়েছো। ব্যুরোক্রাসি সব সময়ই তো আমাদের এবং জনসাধারণের

মধ্যে একটা দেওয়াল তুলে দেবার যাকে বাংলায় বলে কিনা ওয়াল, তুলে দেবার চেষ্টা করছে।

সে—সেবার যাঁকে ঢুকতে দিইনি, লোকে তাঁকে হারু গুণ্ডা বলে জানে—দু'তিনবার জেলে গিয়েছেন।

গ্রে—জেলে তো মহাত্মা গান্ধীও গিয়েছিলেন, জওহরলাল গিয়েছিলেন, সুভাষ বোসও গিয়েছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম। যাননি শুধু ওই দু'জন—যাঁদের নিয়ে এখন সবাই হৈ হৈ করছে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর স্বামী বিবেকানন্দ। হারুর আসল নাম হারাধন তরফদার—নির্যাতিত দেশকর্মী। পাবলিকের অনেকে তাকে গুণ্ডা বলে বটে, কিন্তু এদের না হলে আমাদের ডেমক্র্যাসি চলে না। গণতন্ত্রের এরা একটা এসেনশিয়াল কন্ডিশন—যেমন বাক্‌স্বাধীনতা—সোজা বাংলায় যাকে বলে কিনা ফ্রিডম অফ স্পিচ ; সংবাদপত্র, শিক্ষা ইত্যাদি। হারুরা না থাকলে, জনসাধারণের উপর আমাদের যে হোল্ড আছে সেটা হোল্ডঅলে পুরে ফেলে, স্টেশনে টিকিট কেটে, কেটে পড়তে হতো। তোমাদের নিয়ে আর পারি না। হারুকে তোমরা আবার ইনসাল্ট করলে নাকি? সেবারে তোমাদের পই পই করে বলেছি স্বয়ং ভগবানও যদি আমার সঙ্গে কনফারেন্সে আলোচনারত থাকেন তাহলেও ওকে আটকাবে না।

সে—না স্যার, উনি আসেননি, ফোন করেছিলেন।

গ্রে—ফোন? তা, আমার ফোন আমাকে না দেবার পাওয়ার-অফ-অ্যাটর্নি তোমাদের কে দিয়েছে?

সে—আপনি তখন ট্রাঙ্ক কলে রাজধানীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। মিস্টার ভোগীলালের ওই লাইসেন্সটা সম্বন্ধে। তিনবার এক্সটেনশন নিয়ে মোট বত্রিশ মিনিট পনেরো সেকেন্ড কল।

গ্রে—যাক, হারু কী বলছিল?

সে—কালকের স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উৎসব সম্বন্ধে মনে করিয়ে দিতে এসেছিলেন। সকালে প্রভাত ফেরি...

গ্রে—প্রভাত ফেরি—স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত অনেক করেছি। এখন আর ওসব পারবো না। লোকে কেন যে ভুলে যায়, উই আর টু বিগ ফর দোজ প্রভাত ফেরিজ। তাছাড়া আমি সাড়ে আটটার আগে আজকাল বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি না।

সে—আমিও সেই কথা বলে দিয়েছি।

গ্রে—অ্যাঁ—আমি যে লেট রাইজার তা তুমি ফাঁস করে দিয়েছো! ওটা না টপ অফিসিয়াল সিক্রেট? সিক্রেসি অ্যাক্ট অনুযায়ী তোমাকে প্রসিকিউট করা যায় জানো? তাছাড়া, সেদিন মাসিক জনচিত্তর বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলা হলো, স্বামীজীর আদর্শ অনুযায়ী আমি অন্ধকার থাকতে উঠে পড়ি। ভোরবেলায় আমার স্তোত্র পাঠের একটা ফটোও কাগজে ছাপানো হয়েছে।

সে—আপনি চিন্তা করবেন না স্যার, আমি ওসব কিছুই বলিনি। আমি বলেছি, প্রভাত ফেরিতে যোগ দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়—ওই সময় আপনার মিটিং আছে।

গ্রে—ভেরি গুড্। সত্যি, খাসা বুদ্ধি তোমার। তা তোমার প্রমোশনের ব্যাপারটা কী হলো? সিলেকশন গ্রেড দেবার জন্যে তো স্ট্রং রেকমেন্ডশন করেছিলাম। যদি দরকার হয়, আর একটা একস্ট্রা স্ট্রং রেকমেন্ডশন পুট আপ কোরো, সই করে দেবো'খন।

সে—আপনার অশেষ করুণা স্যার। মিস্টার তরফদার আপনাকে...

গ্রে—আঃ, কতবার বলবো। মিস্টার নয়, শ্রী। রবিঠাকুর পর্যন্ত কোনদিন মিস্টার ছিলেন না —শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে আবার শ্রীও লিখতেন না, সেদিন সাহিত্যিক নগেন পালের কাছে শুনলাম। যখন দেশ থেকে শ্রীও উঠে যাবে তখন কী যে হবে। সেদিকে বিবেকানন্দর কোন ভয় নেই—স্যারও নয়, মিস্টারও নয়, শ্রীও নয়, রায়বাহাদুর নয়, স্বামী বিবেকানন্দ।

সে—শ্রীতরফদার সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সভায় আপনার সভাপতিত্ব করবার কথাটা মনে করিয়ে দিলেন। ভোগীলালজী প্রধান অতিথি, আর উদ্বোধন করবেন শ্রীতরফদার নিজেই।

গ্রে—অ্যাঁ। তাই তো, বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। ক'দিন আগে একদল ছেলে এসেছিল বটে—'হতে পারি দীন মোরা, নহি কভু হীন' সঙ্ঘ। হারুই রেকমেন্ড করে পাঠিয়েছিল। আমি যে আবার ওদের প্যাটরন তাই জানতাম না। ইস্কুল-কলেজের আদর্শবাদী ছেলে, ওদের দোষ নেই। হারুর কথামতো ওরা প্যাড ছাপিয়েছিল। হারু অথচ আমাকে বলেনি। প্রথমে শুনে একটু রাগ করেছিলুম। কিন্তু হারুর উপর রাগ করে লাভ নেই; ওর হাতে অনেক স্বেচ্ছাসেবক, যাকে সারা জন্ম ধরে আমরা ভলেন্টিয়ার বলে এসেছিলুম।

সে—তা হলে স্যার?

গ্রে—মানে এখন বড়ই বিপদ। ডায়েরিতে লিখতে ভুলে গিয়ে কী সর্বনাশই যে করেছি।

সে—কেন স্যার, বিপদ কী? কত মিটিঙে যাচ্ছেন? অবনীন্দ্র চিত্রকলা ভবনে যাচ্ছেন আজ বিকেলে, তারপর ভাতখণ্ডে সঙ্গীত সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে, তারপর ভারতীয় দার্শনিক সভার ত্রৈমাসিক ডিনারে।

গ্রে—বুঝছো না, ডুবিয়েছে আমার স্পিচ রাইটার দেবিদাস রায়। ওকে যে ছুটি দিয়ে বসে আছি। ছুটিতে যাবার আগে অন্য সব স্পিচগুলোর ড্রাফট পুট আপ করে গিয়েছে। কিন্তু বিবেকানন্দ। এখন উপায়? লাইন নাও—হারুকে যদি পাওয়া যায়।

সে—আচ্ছা স্যার।

গ্রে—হ্যালো, ভাই হারু, তুমি একটু আগে টেলিফোন করেছিলে?...হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতো বটেই...স্বামীজীর জন্মোৎসব বলে কথা, আর তার ওপর 'হতে পারি হীন মোরা' সঙ্ঘের ফাংশন...ওহো ভেরি স্যরি, কিছু মনে কোরো না ভাই, বলতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছি, 'হতে পারি দীন মোরা, নহি কভু হীন' সঙ্ঘের ফাংশন। ওখানে সভাপতিত্ব করবার সুযোগ। তবে কিনা শরীরটা এই কিছুক্ষণ ধরে তেমন ভাল যাচ্ছেনা। অ্যাঁ, কী বলছো ভাই...

[গ্রেটম্যান এবার টেলিফোনের স্পিকারটি হাত দিয়ে চেপে ধরলেন, যাতে ওদিকে কোনো শব্দ না যায়]

[সেক্রেটারিকে] জ্বালিয়ে খেলে। বলে কিনা আজকের ফাংশনগুলো সব ক্যানসেল করে দিতে। বিশেষ করে সঙ্গীত সমিতির উৎসব, অথচ ওইখানেই অ্যাকট্রেস চিত্রা দেবী আসবেন—সোহনলালজী সভাপতি, আমি প্রধান অতিথি, আর চিত্রা দেবী উদ্বোধিকা। চিত্রা দেবীর সঙ্গে সেই সেবারে হোটেলে ব্যাংকোয়েটে দেখা হয়েছিল। টেলিফোন করবেন কথা দিয়েছিলেন, তা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছেন, কিংবা তোমাদের মত কেউ হয়তো আমাকে কনেকশন দেয়নি—কালকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

[টেলিফোনের স্পিকার থেকে হাত ছেড়ে]

হ্যালো, হ্যালো, হারু, লাইনে ডিস্টারবেন্স হচ্ছে অর্থাৎ গোলোযোগ হচ্ছে। কিছু মনে কোরো না ভাই, এখন থেকে সব কাজে আমাদের ভার্নাকুলার ব্যবহার করতে হবে। ... অ্যাঁ কী বলছো তুমি? চিত্রা দেবীকে তুমি নিজে ফোন করে দেবে? আমার হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে নেবে,

বলবে আমি অসুস্থ বলে যেতে পারলাম না ?... না না সেটা ভাল দেখায় না...তাছাড়া ওঁরা আমার নাম অ্যানাউন্স করে দিয়েছেন ...রেডিও থেকে, খবরের কাগজ থেকে লোক আসবে ...কী বললে ? তোমাদেরও ওইসব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে, কাগজে কাল সকালে নামও বেরিয়ে যাচ্ছে, ওখানেও পাবলিসিটির পুরো ব্যবস্থা...কিন্তু ভাই শরীরটা তো প্রায়ই খারাপ হচ্ছে...স্বামীজী বলেছেন বীর হও। অসুস্থ শরীরে তাঁর পুজো করা তিনি কি পছন্দ করবেন ?.... হ্যালো, না না, চিত্রা দেবীকে তোমার ফোন্ করতে হবে না, কথা যখন দিয়েছি তখন মরতে মরতেও যাবো...চিত্রা দেবী তোমাদের ফাংশনেও আসছেন নাকি ?...আসছেন না...কমিটিতে ওঁকে ডাকবার প্রস্তাব উঠেছিল, কিন্তু অনেকে রাজি হননি... না না, এটা তোমাদের অন্যায়। স্বামীজী, ঠাকুর রামকৃষ্ণ এঁরাও তো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। ...হ্যালো হ্যালো, তুমি ওখানে কিছু বোলো না, আমি তোমাদের সভাতেও যাবো, এখনি ডাক্তারকে ডেকে কোনো স্পেশাল ওষুধ আনিয়ে নিচ্ছি। [টেলিফোন নামিয়ে]

অসহ্য, যেতেই হবে। এর নাম গণতন্ত্র। একটা সাধারণ লোক যা বলবে একজন অসাধারণ লোককে তাই মুখ বুজে মানতে হবে। অথচ রাজতন্ত্রে, ডিকটেটরশিপে আমাদের এসব অসুবিধে ছিল না। সেখানে কারুর সাধ্য ছিল না আমাকে মিটিঙে নিয়ে যায়। নগেন পালকে কথাটা এক সময় বলতে হবে। আমার আত্মজীবনী তো উনিই লিখছেন। এই পয়েন্টটাও যেন লিখে নেন। তবে এটা থাকবে দ্বিতীয় খণ্ডে—সেটা এখন সিল করা থাকবে, প্রকাশিত হবে আমার মৃত্যুর দশ বছর পরে।

সে—অতি উত্তম প্রস্তাব স্যার।

গ্রে—বলা যায় না, আমার ওই মন্তব্যটাই আর একটা শতবার্ষিকী চাঞ্চল্যের কারণ হতে পারে। নব্বুই বছর পর্যন্ত যদি বাঁচি (তার বেশি আমি বাঁচতে চাই না) প্লাস টেন, অর্থাৎ কিনা সেনটেনারি ইয়ার—মানে তোমরা যাকে বল কিনা শতবর্ষফুর্তি উৎসব।

সে—ফুর্তি নয়, পূর্তি বোধ হয় স্যার।

গ্রে—ওই হোলো...আমাদের ব্যাকরণে বলে প টা প্রায় ফ হয়ে যায়।

সে—তা হলে স্যার, ডায়েরিতে বিবেকানন্দ উৎসবের কথাটা টুকে রাখি।

গ্রে—আঃ, ডিসটার্ব কোরো না। আমি ভাবছি স্পিচরাইটার দেবিদাস রায়ের কথা। তোর এখনই ছুটি নেবার কী দরকার ?

সে—গত দু'বছর তিনি একদিনও ছুটি নেননি।

গ্রে—কী করে তোমরা আশা করো যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বছরে দেবিদাসবাবু ছুটি পাবেন? আর বলিহারি যাই, এই সব মহাপুরুষদের। ঠিক ওই সময়েই বিবেকানন্দকেও জন্ম নিতে হলো। যত সব...।

সে—এখন ছুটি না নিলে আর কখনই ছুটি পেতেন না।

গ্রে—মানে? সামনে আরও শতবর্ষপূর্তি আছে নাকি?

সে—দেবিদাসবাবু তো তাই বলছিলেন। একই দশকে তিনজন মহাপুরুষ জন্মেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধী। তার ঠিক পরেই আবার আছেন শ্রীঅরবিন্দ।

গ্রে—অ্যাঁ! বলো কী? কেন রে বাপু, একটু রয়ে সয়ে জন্মালে কী মহাভারত অশুদ্ধ হতো? ইন এনি কেস, কালকের বক্তৃতায় এটা একটা ভাল পয়েন্ট হবে। রত্নপ্রসবিনী বাংলা...একই দশকে তিনটি বিশ্ববিজয়ী সন্তান।

সে--বাংলা না ভারত?

গ্রে--তুমি জান না, এটা বাঙালিদের গ্যাদারিং। অন্য সভা হলে ভারত বলতাম, এখানে বাংলা।

সে—কিন্তু গান্ধী স্যার? উনি তো গুজরাটে জন্ম নিয়েছিলেন।

গ্রে--আঃ, সংগঠনমূলক কিছু বলতে পারো না; এইটা আমাদের জাতের দোষ। সাধে কি আর স্বামীজী তোমাদের গালাগালি করেছেন; আর সাউথের লোকদের তুলছেন। এমন একটা সুন্দর আইডিয়া তুমি নষ্ট করে দিলে। শুধু ডেস্ট্রাকটিভ, ধ্বংসাত্মক সমালোচনা।

সে—আই আম স্যরি, স্যার।

গ্রে—স্যরি বলে যেন এখনই সরে পোড়ো না। স্পিচরাইটার নেই, কিছু একটা তো করতেই হয়। দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন? একটা চেয়ার নিয়ে বোসো।... এখন কথা হচ্ছে কি, স্বামী বিবেকানন্দ দেশের জন্যে কী কী রয়েছেন সেটা একটু খুঁজে দেখতে হয়। সবচেয়ে বড় অসুবিধে—উনি জেলে যাননি। রবিঠাকুরের শতবার্ষিকীর বেলায় আমাকে ওই একই ফ্যাসাদে পড়তে হয়েছিল। অথচ এ কথাটা বলবার উপায় নেই। কাগজে এখনি এডিটরিয়াল বেরিয়ে যাবে। নুন মাখিয়ে আমাকে কাঁচা খাবার জন্যে সম্পাদকরা তো উঁচিয়ে বসে আছেন।

সে—যা বলেছেন, স্যার।

গ্রে—এটা বোঝা যাচ্ছে যে তিনি ১৮৬৩ সালে জন্মেছিলেন—না হলে এই ১৯৬৩ সালে নিশ্চয় তাঁর সেনটেনারি হতো না। একেই বলে কমনসেন্স—সোজাসুজি জানি না, কিন্তু অন্য কতকগুলো ঘটনা থেকে আমি যা চাইছিলুম তা খুঁজে বার করে নিলাম। স্বামীজীর নিজের এই অসাধারণ শক্তি ছিল নিশ্চয়, না হলে এতো বড়ো হলেন কীভাবে? আর ওঁর যা খ্যাতি সে তো কেবল দেশি নয়—সে তো ভগবানের দয়ায় আমারও কম হয়নি। কিন্তু বিদেশে? ইয়া ইয়া আচ্ছা আচ্ছা সায়েব দিনরাত সোয়ামি ভাইভেকানন্ড বলতে অজ্ঞান হচ্ছে, এর জন্যে মাথায় সামথিং দরকার, বুঝলে?

সে—তাতো বটেই স্যার।

গ্রে—স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কী বলা যায়? এখন সেইটাই প্রবলেম। দেবিদাস ছোকরা থাকলে ঝপাং করে একটা কিছু খাড়া করে দিত। নিজে নিজে যখন ভাবি—যেমন এই এখন, কী বলা যায় ভাবতে গিয়ে ঘেমে উঠছি। কিন্তু ছোকরার লেখাটা পড়লে মনে হয়, এই কথাগুলোই আমি বলতে চাইছিলাম। অথচ চিন্তাটা এমন কনস্টিপেটেড হয়েছিল, যে বেরোতে চাইছিল না।

সে—হাজার হোক আপনারা ব্যস্ত মানুষ স্যার—

গ্রে—বলো, নিজের চোখে দেখছো তো। কত লোককে অবলাইজ করতে হয়। শুধু জ্যান্ত লোকদের নয়, এই বিবেকানন্দর মতো যাঁরা অনেকদিন আগে মারা গিয়েছেন তাঁদেরও।

সে—আমি তাহলে, স্যার।

গ্রে—তুমি তাহলে জীবনী ফাইলটা একটু ঘেঁটে দেখে, ইমিডিয়েটলি একটা নোট অন স্বামী বিবেকানন্দ পুট আপ করো।

সে—বায়োগ্রাফি ফাইলে তো যাঁদের সঙ্গে আমাদের কাজ কারবার, যাঁরা বেঁচে আছেন কেবল তাঁদের সম্বন্ধেই লেখা রেডি আছে।

গ্রে—[বিরক্ত হয়ে] আমি তোমার ওজর শুনতে চাই না। যেখান থেকে পারো নোট বার করো, না হলে চার্জশিট, হয়তো সাসপেন্ডও হতে পারো। যতোই আইন বোঝো তোমরা, আমাদেরও ভাঁড়ে সামথিং হ্যাজ। এটা জেনে রেখো গ্রেটম্যানরা কখনও মরেন না, তাঁরা চিরকাল বেঁচে থাকেন, সেই জন্যেই তাঁদের অমর বলা হয়। এই সব অমর লোকদের সঙ্গে কাজ কারবার নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যায়নি। এঁদের সম্বন্ধে একটা ফাইল

খুলে রাখা তোমার উচিত ছিল।

সে—ক'দিনের খবরের কাগজ দেখে একটা ছোট্ট জীবনী তৈরি করে দেবো ?

গ্রে—তোমরা যোগ্য নও—সঙ্কটের সময় কেমন করে তোমাদের মতো লোক নিয়ে দেশ চলবে বুঝি না। অর্ডিনারি পাবলিক যারা, তারা খবরের কাগজ থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারে। আমরা তা পারি না, আমরা যা বলবো তাই তো অফিসিয়াল ভিউ বলে লোকে ধরে নেবে। সুতরাং যিনি যতবড়ই হোন না কেন, আমাদের সাবধানে ভেবে মুখ খুলতে হয়। এই মুখের একটি কথা দেশ-বিদেশে চলে যাবে—হয়তো ইন্টারন্যাশনাল কোনো সঙ্কটই বেধে গেল তার থেকে। এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে কোনো গেজেট নোটিফিকেশন আছে ?

সে—না, স্যার।

গ্রে—তাহলে পুলিশকে ফোন করো, বলো আমার এখনই একটা রিপোর্ট চাই।

[সেক্রেটারির প্রস্থান]

[এমন সময় টেলিফোন বাজলো]

হ্যালো.... হ্যাঁ হ্যাঁ কথা বলছি...আর কেন বলো ভাই, এই বিবেকানন্দর ব্যাপারে বড় জড়িয়ে পড়েছি। স্বামী বিবেকানন্দ, নাম শুনেছো নিশ্চয়, খুব বড় সংস্কারক ছিলেন।... হ্যালো, ভূমি বা রাজস্ব সংস্কারের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, তুমি ভুল করছো, উনি প্লেন অ্যান্ড সিম্পল সমাজ সংস্কারক। ... ভোগীলালজীর ঐ ব্যাপারটা নিয়ে সেন্টারে কথা বলেছি, টেলিফোনে ওসব কথা বলা সেফ নয়। পরে বাড়িতে এসো, যা চেয়েছিলে তাই হবে। আমাদের ফান্ডে চাঁদা দেবার কথাটা ওঁকে মনে করিয়ে দিও ...আর নরেন্দ্রনাথ রায়, আমার ছোটশালা, নামটা ডাইরিতে লিখে রাখো, তোমার সঙ্গে বোধ হয় কালকেই দেখা করবে। ভোগীলালজীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও। আচ্ছা ভাই, পরে কথা হবে।

[সেক্রেটারির প্রবেশ]

সে—পেয়েছি ! পেয়েছি স্যার।

গ্রে—কী পেয়েছ ? ইমপোর্ট লাইসেন্স পেলেও তো লোকের এতো আনন্দ হয় না। ভগবানকে পেয়ে বিবেকানন্দরও এতো আনন্দ হয়নি।

সে—বিবেকানন্দর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার লিস্ট দেবিদাসবাবুর

ড্রয়ারে ছিল। ভবিষ্যতে বক্তৃতা লিখতে কাজ লাগবে ভেবে উনি বোধ হয় নোট করে রেখেছিলেন।

গ্রে—আঃ, বাঁচা গেল। এই রাতদুপুরে পুলিশকে ফোন করার হাত থেকেও বাঁচা গেল।

সে—দেবিদাসবাবুর নোট অনুযায়ী দেখছি ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারি জন্ম। ছাত্রাবস্থায় ১৮৮১ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এলেন। রামকৃষ্ণ দেহ রাখলেন ১৮৮৬ সালে, তারপরই রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। এর পরই পরিব্রাজক।

গ্রে—তাহলেই দেখ ট্যুর করা কত প্রয়োজন। ট্যুরের বিরুদ্ধে যারা বলে তারা বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করে না।

সে—দেখছি আমেরিকায় গেলেন ১৮৯৩।

গ্রে—বা বা, ভেরি গুড্।

সে—মাত্র তিরিশ বছর বয়সে ধর্ম মহাসম্মেলনে ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করলেন।

গ্রে—কিন্তু ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজ করলেন কী করে? পয়েন্টটা পরে ইনভেস্টিগেট কোরো।

সে—বিদেশেই আমাদের বিবেকানন্দ বিশ্ববিবেকানন্দ হলেন।

গ্রে—হবেনই তো—ফরেনে না গেলে কেউ কখনও উন্নতি করে না—তুমি রবিঠাকুর দেখো, গান্ধী দেখো, সব একই কেস্। যাক, নাম টাম তো হলো, তা ওঁর গোল্ডেন জুবিলি কোন্‌বার হলো? দেবিদাসবাবু আমার এক বক্তৃতায় রবিঠাকুরের জুবিলির কথা রেফার করেছিলেন।

সে—সেটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছি না।

গ্রে—দেবিদাসবাবু খুব থরো নন—সব পার্টিকুলার্স ঠিক করে লিখে রাখেন না। অথচ উনিও সিলেকশন গ্রেড চান।

সে—দেখছি ওঁর নোট ১৯০২ সালেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

গ্রে—এরপর আর লিখে রাখবার গা করেন নি। বেজায় কুঁড়ে।

সে—এক মিনিট স্যার। দেখছি মাত্র ৩৯ বছর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ দেহ রাখেন।

গ্রে— ওহো, ভেরি স্যাড লস। পরাধীন গভরমেন্ট ছিল তখন তাই—না হলে সেদিন সরকারি, বেসরকারি সব অফিস বন্ধ করে দিতাম।

সে—আমি এখন তা হলে কী করবো স্যার?

গ্রে—মনে হচ্ছে বাড়ি যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছো। অথচ বিবেকানন্দর কথা ভেবে দেখো, কানট্রির জন্যে বাড়ি ঘরদোরই ছেড়ে দিলেন। এঁরা কেন যে অর্ডিনারি পিপ্‌লের জন্যে জীবনটা নয়ছয় করলেন! যাক্ শোনো—তুমি যদি পারো, অর্গানাইজারদের একবার ফোন করে দিও। কিছুদিন আগে শুনেছিলাম, ওরা আমাকে মানপত্র দেবার কথা ভাবছে। সেটা ইচ্ছে করলে, কালকের মিটিঙেই সেরে ফেলতে পারে। ওদেরও কাজের সুবিধে, আর আফটার অল্ বিবেকানন্দ যা করতে চেয়েছিলেন অথচ পারেননি আমরা তাই করছি। বিবেকানন্দ যে কথা বলেছিলেন—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

সে—আজ্ঞে, স্যার...

গ্রে—আজ্ঞে, আবার কী? খুব প্রগ্রেসিভ কথা কিনা, তাই বুঝি পছন্দ করতে পারছো না? এই সব লোক নিয়ে দেশকে আমরা যে কী ভাবে সোসালিস্ট করে তুলবো তা ঠাকুরই জানেন।

সে—তা বলছি না, স্যার।

গ্রে—আর রাখো, 'তা বলছি না।'। আমরা মিড্‌লক্লাস লোকদেরই আমাদের লেভেলে আনতে পারছি না। আর বিবেকানন্দ বলে বসলেন—মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। সত্যি কথা বলতে গেলে, এটা ইরেস্পনসিবল কথা। উনি তো বলে সরে পড়লেন, এখন ঠেলা সামলাও।

সে—আমি বলছিলাম স্যার, সবার উপর মানুষ সত্য ওটা বোধ হয় চণ্ডীদাস বলেছিলেন।

গ্রে—অ্যাঁ! দু'দুটো মিটিঙে ওটা যে আমি বিবেকানন্দর বলে চালিয়ে এসেছি। যাক মফস্বলের মিটিং... কী বলো?

সে—তাছাড়া, গ্রেটম্যানরা সব একই চিন্তা করেন। আপনিও তো ওই একই কথা বলছেন।

গ্রে—যাই হোক, বড় জোর সেভ করেছো তুমি। তোমার অ্যাডভ্যান্স ইনক্রিমেন্ট আমি ব্যবস্থা করবই। তোমার ভাগ্নেটার জন্যেও ভেবো না। আমার ছোটশালার বন্ধুগুলোর একটা হিল্লে হলেই, যা হয় একটা করবো। যা বলছিলাম, এখনই না হয়, যা একটু সময় পাই ঘোড়ার মাঠে কাটিয়ে আসি। ছাত্রাবস্থায় আমাদের ইস্কুলে প্রত্যেক বছর স্বামীজীর জন্মদিবস হতো। তখন যদি বক্তৃতা প্রবন্ধগুলো একটু মন দিয়ে শুনতাম। কিন্তু তখন খাওয়া-দাওয়ার দিকটায় নজরটা বেশি ছিল। যেখানে লেবু, বোঁদে,

সিঙাড়া, গজা এই সব ডিস্ট্রিবিউট হতো, সেইদিকটায় পড়ে থাকতাম। তখন 'ওই সব মিটিং অ্যাটেন্ড করলে এই দেবিদাসবাবুর জন্যে আজ আমাকে হা-পিত্যেশ করতে হতো না। আমি ভাবছিলুম, ওঁর ড্রয়ারটা আর একটু ঘেঁটে দেখো। হয়তো কিছু বাণী পেয়ে যেতে পারো, তা-হলেই আমার চলে যায়।

[সেক্রেটারির প্রস্থান]

[টেলিফোন বাজলো—ক্রিং ক্রিং]

হ্যালো, নগেনবাবু নাকি ?.... না না মোটেই বিরক্ত হচ্ছি না। আপনার মতে সাহিত্যিক প্রতি ঘণ্টায় ফোন করলেও আমাদের রাগ হয় না। আপনার বইগুলো পেয়েছি। খুব ভাল লেখা হয়েছে—যদি কখনও সময় পাই পড়বো। আপনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটা নবেল লিখুন না।.... অসুবিধে আছে বলছেন ? তা হলে পদ্য লিখুন—আমি সমস্ত পাঠ্যপুস্তকে ঢুকিয়ে দেবার নির্দেশ দেবোখন। আর যা বলছিলাম, আমার আত্মজীবনীতে বিবেকানন্দর কথা ভালো করে লিখে দেবেন। ওঁর বক্তৃতা ও রচনাবলী আমার সমস্ত জীবনকে প্রভাবিত করেছে। যদি আমাকে ফাঁসি যেতে হতো তাহলে ওঁর বই হাতে করেই যেতাম।...হ্যালো, ধন্যবাদের কোনো প্রয়োজন নেই। শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকদের উৎসাহ দেওয়া, পথ দেখানোই তো আমাদের কাজ।

[সেক্রেটারির প্রবেশ]

সে—আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার ; দেবিদাসবাবুর ড্রয়ার থেকে বাণী সঞ্চয়ন বেরিয়েছে—উনি যে ইস্কুলের ছাত্র ছিলেন, সেই ইস্কুলের মাস্টারমশায় রাধাকান্তবাবু একটা খাতায় বাণী সঞ্চয় করে রাখতেন।

গ্রে—দুনিয়াতে কত লোকের কত অদ্ভুত খেয়াল হয়। টিচাররা সময়ের মূল্য বোঝে না। ছাত্রদের পড়াশোনার দিকে নজর না দিয়ে, বাণী লিখে সময় নষ্ট করছে। যাক, আমার তো এখন সুবিধে হলো। কী বলছেন ?

সে—অনেক বাণী রয়েছে।

গ্রে—তোমরা যে ইনএফিসিয়েন্ট। প্রত্যেক গ্রেটম্যানদের সম্বন্ধে যদি একটা করে ফাইল খুলে যাও, তা হলে এই শেষ মুহূর্তে বিপদে পড়তে হয় না। যা হোক বল দু' একটা বাণী—পাবলিক মিটিং, দু'একটা লাগদাই কোটেশন না ছাড়লে। মেথর মুর্খ...ওটা আর শুনিয়ো না—ওটা পচে, হেজে, গলে গিয়েছে।

সে—তাহলে অন্য দু'একটা শোনাই?

গ্রে—শোনাও।

সে—স্বামীজী লিখছেন, 'যেখানে struggle সেখানে rebellion, সেখানেই জীবনের চিহ্ন।'

গ্রে—ও-বাবা। এ-সব যে গোলমেলে কথা। না বাপু, ও সব কনট্রোভার্সির মধ্যে আমরা যেতে পারি না।

সে—এর পরেরটায় স্বামীজী বলছেন,—'গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোনো ভরসা রাখিও না।'

গ্রে—ধনীদের সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন। আমরা যা আশা করি তার অর্ধেকও চাঁদা পাওয়া যায় না। কিন্তু গণ্যমান্য? আমাদের উপর ভরসা না রাখলে দেশ চলবে না।

[এমন সময় আবার টেলিফোন বাজলো]

হ্যালো... আরে ঝুনঝুনওয়ালাজী কেয়া খবর, বাতাইয়ে। হ্যাঁ শুনুন, এবার এখানেই নিখিল ভারত দরিদ্র সম্মিলনী করছি। আপনাকে কিন্তু পৃষ্ঠপোষক হতেই হবে। সেন্টারের সব ক'টা রুই-কাতলা এর পিছনে রয়েছে। পঁচিশ হাজার টাকা চাঁদা ... না না, গরিব বললে শুনছি না। আর মনে রাখবেন এটা দরিদ্রদেরই প্রতিষ্ঠান, আপনাদের মতো গরিবরা না দিলে কারা দেবে?

[টেলিফোন নামিয়ে রেখে]

না ওই কোটেশন আমার চলবে না। কাগজে রিপোর্ট বেরোলে মার্চেন্টরা চটে যাবে। ওরা চাঁদা না দিলে কোনো ফাংশনই হবে না।

সে—স্বামীজী আরও বলছেন—'কার্যশক্তি হইতে সহ্যশক্তি অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ।'

গ্রে—উনি তো কোনদিন পলিটিক্স করেননি—অথচ কেমন করে এমন কথা বললেন?

এই যে আমাদের পোস্ট; সহ্য করবার জন্যে রয়েছি আমরা—কার্য করা থেকে ওটা ঢের ইমপর্টান্ট। কিন্তু ওটাও লোকদের বলা চলবে না। ওরা অন্য মানে করে বসবে।

সে—তা হলে স্যার?

গ্রে—দেখো আর কী আছে। স্বামীজীই তো বলেছেন—একবারে না পারিলে দেখো শতবার।

সে—খাতায় লেখা হয়েছে—'ঐ যারা চাষাভূষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য, বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত ছোটজাত তারাই আবহমানকাল থেকে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমের ফলও তারা পাচ্ছে না।...হে ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী—তোমাদের প্রণাম করি।'

গ্রে—তোমরা কি আমার সর্বনাশ করতে চাও? এই সব লেবার-খ্যাপানো কথা ভদ্রলোকের বলবার কী দরকার ছিল? কোথায় প্রোডাকশন বাড়াবার কথা বল, তা নয় চিরপদদলিত। আর দেবিদাসবাবুর উপরও আমার আর ভরসা থাকছে না। আমার কনফিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্ট হয়ে নিজের ডাইরিতে এই সব লিখছে! একটা ফটো তুলিয়ে, আজই পুলিশে পাঠিয়ে দাও। কোথায় যে কি পঞ্চম বাহিনীর কাজ চলছে কে জানে?

সে—তাহলে, আর পড়ব কি স্যার?

গ্রে—পড়তে তো হবেই। কালকের মিটিং তো আর আমাকে ছাড়বে না। ভদ্রলোক এই ধরনের কথা বলেছেন জানলে আমি কিছুতেই ইনভিটেশন অ্যাক্সেপ্ট করতাম না। উনি কি একটাও ভাল কথা বলেননি?

সে—এইটাতে উনি বলছেন—'এই যে চাষাভুষো, মুচি, মুদ্দফরাস—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশি।... তোরা এইসব সহিষ্ণু নীচজাতদের উপর এতকাল অত্যাচার করেছিস—এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে—আর তোরা 'হা চাকরি যো চাকরি' করে করে লোপ পেয়ে যাবি।'

গ্রে—স্টপ...স্টপ। আর শুনতে চাই না আমি। 'তুই', 'তোরা', 'যাবি', এসব কী কথা? আর আমরা এদিকে বাসে ট্রামে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়াচ্ছি—'তুই', 'তুমি' না বলে সবাইকে 'আপনি' বলুন। আর একটা কথা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—শুধুই ধ্বংসাত্মক সমালোচনা, ঠিক যেন বিরোধীদলের নেতা—সংগঠনমূলক কথা একটাও নেই।

সে—'এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোরা অন্ন-বস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথররা কলকাতায় কাজ বন্ধ করলে হাহুতাশ লেগে যায়—তিনদিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে তোদের অন্ন-বস্ত্র জোটে না।'

গ্রে—কোন্ বইতে এ-সব কথা লিখেছেন? পুলিশও কী করছে বুঝি

না—এসব বই বাজেয়াপ্ত হয়নি এখনও ? মেথর খেপাচ্ছেন ভদ্রলোক ! এসেনসিয়াল সার্ভিসের লোকদের কাজ বন্ধ করতে মতলব দিচ্ছেন—এতো আইনে পড়ে যাবার কেস।

সে—তাহলে কী করবো স্যার ? হোম ডিপার্টমেন্টকে একটা নোট দেবো নাকি স্যার ! আমি খাতা আনবো কি ?

গ্রে—আচ্ছা, তার আগে জিগ্যেস করো, এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে ওরা কোনো ফাইল মেনটেন করছে কি না। আমার সন্দেহ হচ্ছে, (একটু ইতস্তত করে) টপ সিক্রেট, কিন্তু তোমাকে বলতে বাধা কী, ইনি কোনো পার্টির লোক নাকি ?

সে—সন্ন্যাসীর জাতই নেই, তো পার্টি।

গ্রে—রাখো রাখো, ওসব কথা আমরা যথেষ্ট শুনেছি। এখন কী প্রসঙ্গে উনি জনতাকে খ্যাপাতে চেয়েছেন, তার কোন ইঙ্গিত পাও কি না দেখতো।

সে—উনি লিখেছেন—'ছোট লোকদের মধ্যে আজকাল ধর্মঘট হচ্ছে, হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা আর ছোট জাতদের দাবাতে পারবে না।.....তাইতো বলি, তোরা এই mass-এর ভিতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয় তাতে লেগে যা।.....তোদের সহানুভূতি পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্যতৎপর হবে।'

গ্রে—আই সি ! একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত, জলের মত স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে।

সে—'সংস্কার করিতে হইলে উপর দেখিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে।'

গ্রে—একেই আজকাল ইনফিলট্রেশন বা অনুপ্রবেশ বলে।

সে—উনি আরও বলছেন, 'মুলদেশে অগ্নিসংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকুক।'

গ্রে—অত সোজা নয়, ফায়ার ব্রিগেড বলে একটা প্রতিষ্ঠান এখনও দেশ থেকে উঠে যায়নি। এই আগুন নেভানোর অন্য মন্তরও আমাদের জানা আছে। তুমি কুলদাবাবুকে টপ সিক্রেট নোট দাও—প্রত্যেকটি কোটেশন সম্বন্ধে যেন ইনসেভটিগেশন করেন। প্রত্যেক বছর এদের পিছনে লাখ লাখ টাকা খরচ করেছি—অথচ কী যে করে এরা।

সে—এই লাইনটা বোধ হয় কাজে লাগবে—'সংস্কারকগণকে আমি বলতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক।'

গ্রে—ছি ছি! ভদ্রলোকের বিনয় বলে কোনো বস্তু ছিল না।আমিও তো জানি আমার থেকে বড় নেতা নেই। কিন্তু সে কথা আমি কখনও বলি? আমার কত স্পিচ তো টাইপ করেছো, কোথাও দেখেছো?

সে—আত্মম্ভরিতা জিনিসিটা আপনার স্যার একদম নেই।

গ্রে—অথচ সেদিন আমার জন্মদিনে কোনো ব্যাটা সম্পাদক এই কথাটা কাগজে লিখলো না।

সে—স্যার, বোধ হয় উনি অহিংসও ছিলেন না।

গ্রে—অ্যাঁ, বল কি?

সে—উনি বলছেন, 'তুমি গেরস্থ, তোমার গালে একচড় যদি কেউ মারে, তাকে দশচড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে।'

গ্রে—খুব সাবধান—এগুলো যেন কনফিডেনসিয়াল থাকে—ভাগ্যে আমাদের জনসাধারণ অত খুঁটিয়ে পড়ে দেখে না। এ-সব প্রচার হলে প্রত্যেক পাড়ায় রোজ খুনোখুনি হবে। পুলিশ খাতে খরচা পাঁচগুণ বাড়িয়ে দিতে হবে।

সে—আগুনের কথাটা আবার বলছেন। 'আগুনে ঝাঁপ দিতে তৈরি হতে হবে—তবে কাজ হয়।'

গ্রে—ফায়ারব্রিগেড ফাইলে কোটেশনটা রেখে দিও। ওদের মিটিঙে গেলে লাগানো যাবে। তাড়াতাড়ি হাত চালাও একটু। এই কাজটা সেরে, মিসেস হাজরা এবং মিসেস স্বামীনাথনের সঙ্গে বসতে হবে আমাকে। নগরসুন্দরী প্রতিযোগিতা সাব কমিটির মিটিং। ওদের আদর্শ হচ্ছে, সুন্দরম, সত্যম, শিবম্। অর্থাৎ কিনা যাহা সুন্দর তাহাই সত্য।

সে—স্যার, সীতা কি খুব সুন্দরী ছিলেন?

গ্রে—অত কাঠখড় পুড়িয়ে, হরধনু ভেঙে রামচন্দ্র যখন বিয়ে করেছিলেন তখন নিশ্চয় সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু ভদ্রমহিলার পার্সনালিটি বলে কিছু ছিল না—রামচন্দ্রের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করলেন। মিসেস হাজরা যা বলেন—আরে পাতাল প্রবেশ করে কী হবে? প্রতিবাদ কর, আওয়াজ তোলো। ডাইভোর্স করতে যদি লজ্জা লাগে অন্তত জুডিশিয়ল সেপারেশন দাবি করো। মিসেস স্বামীনাথনও তাই বলেন।

সে—অথচ স্বামীজী বলছেন—'ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।'

গ্রে—আঃ, বাঁচালে তুমি। চিত্রা দেবীর বিবেকানন্দ সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে

একটু—ওঁকে এই লাইন কটা শুনিয়ে দেবো।

সে—মেয়েদের সম্বন্ধে স্বামীজী অন্য কথাও বলছেন—'কতকগুলো চেলা চাই—বুদ্ধিমান ও সাহসী, যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝল ? শত শত ঐরকম চাই, মেয়ে মদ্দ দুই। মেয়ে মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়ে পুরুষের ভেদ নাই—শক্তির বিকাশ চাই।'

গ্রে—বা ! বা-বা-বা ! কী সর্বনাশা ফন্দি। ঘরের লক্ষ্মীদের উনি যমের মুখে ঠেলে দিতে চান।

সে—মানুষকে কিন্তু সত্যিই 'ভালবাসতেন তিনি। বলছেন—'আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীন দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই ; যিনি বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া.....

গ্রে—অ্যাঁ ! যাক আর পড়তে হবে না। শুনে আমার গা ঘুলোচ্ছে। শেষপর্যন্ত বেশ্যার নিমন্ত্রণ।

সে—নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন।

গ্রে—থাক, থাক—ওসব বড় বড় কথা মুখে অনেকেই বলে থাকে। কালকের মিটিঙে অনেক কম বয়সের ছেলে-ছোকরাও থাকবে। এই নৈতিক অবনতির দিনে আমি তাদের আরও ওসকাতে পারবো না। তাছাড়া আমার স্ত্রী শুনলে রসাতল করবে।

সে—বোধ হয় উনি প্রেমের কথা বলছেন। এইতো এখানে চিঠিতে লিখেছেন—'প্রেমে বাঙাল, বাঙালী, আর্য, ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ভেদ নাই। প্রেম সব এক করিয়া দেয়।'

গ্রে—সে আর বলে ! ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে রোজ ডজন ডজন এক করে দিচ্ছে। আর নিরপরাধ বাপ-মারা বুকচাপড়ে চোখের জল ফেলছে। খাতায় কলমে লিখতে পারি না, কিন্তু জিনিসটা মোটেই ভাল নয়।

সে—উনি যে পরিপ্রেক্ষিতে বলছেন সেটা হলো—'চালাকী দ্বারা কোনো মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়।'

গ্রে—রাখো রাখো, ওসব কথা অনেক শুনেছি। এখন বাড়ি যাও তুমি। দেখি, কী করা যায়।

[সেক্রেটারির প্রস্থান]

ক্রিং ক্রিং.....

হ্যালো....কথা বলছি.....কে চিত্রা দেবী? না আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনি আমাকে ফোন করবেন, এ আমার সৌভাগ্য। শেষবার সেই যে আপনার নতুন ছবির ট্রেড্ শোতে দেখা হলো, তারপর থেকেই ভাবছিলাম আপনাকে ফোনে ডেকে অভিনন্দন জানাবো। এমন অভিনয় আমি অনেকদিন দেখিনি। হ্যালো, কালকে আমার প্রোগ্রাম জানতে চাইছেন? আর বলবেন না। বড্ড ব্যস্ত রয়েছি। পাবলিক ম্যানদের অবস্থা পাবলিক উয়োম্যানদের থেকেও জঘন্য। সকালে গোটাদশেক কমিটি আর সাব-কমিটির মিটিং। তারপর বাণিজ্য সমাজের অ্যানুয়াল মিটিং এবং গ্যাঞ্জেস ক্লাবে লাঞ্চ আর ককটেল। তারপর বিকেলে রেসে যাচ্ছি, সে খবর বোধহয় দেখেছেন। আমাকে উপস্থিত থেকে পুরস্কার দিতে হবে। ওটা আজকাল একটা খেলাধুলোর মধ্যে—আমাদের এনকারেজ করতেই হয়। তাপর ইম্পিরিয়াল হোটেলে নগরসুন্দরী কমপিটিশনের ইমপর্টান্ট মিটিং। তারপরই মুশকিল বাধিয়েছে। বলেন কেন, একটা মিটিং রয়েছে—ওই যে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী—আমি প্রধান বক্তা। ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হয়। হ্যালো, কী বলছেন? আপনারও জন্মদিন কাল? সত্যি? আমি জানতাম না। ককটেল দিচ্ছেন বাড়িতে? তারপর ডিনার? আচ্ছা অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি। কী বললেন? আমাকে যেতেই হবে? কিন্তু মিটিংটাই তো ফ্যাসাদ বাধাচ্ছে।.....হ্যালো, কী বললেন, না গেলে খুব রাগ করবেন? অ্যাঁ! আড়ি করে দেবেন? না না, প্লিজ, চিত্রা দেবী আপনি ওরকম করবেন না। আমি যাবোই। মিটিঙের গোড়াতেই দু'এক মিনিট বক্তৃতা করে আমি সভা ছেড়ে সোজা আপনার ওখানে চলে যাবো।

[বেতারের খবর]

.....এখন খবর পড়ছেন.....আজ বিপুল উৎসাহের সঙ্গে ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। হতে পারি দীন মোরা নহি কভু হীন সঙ্ঘ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় মনীষী.....শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও উপস্থিত ছিলেন। বীর সন্ন্যাসী

বিবেকানন্দের পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার জন্য তিনি দেশের আপামর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে উদাত্ত আহ্বান জানান। দেশের বর্তমান অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে বিবেক-বাণীই যে আমাদের অন্যতম ভরসা একথা তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে বার বার মনে করিয়ে দেন। তিনি বলেন, বিবেকানন্দর বাণী যতদিন আমাদের মধ্যে আছে ততদিন আমাদের মৃত্যু নেই, ততদিন আমরা অমৃতের সন্তান।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মঙ্গলবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০। অফিসে বসে কাজ করছিলাম। সেই সময় দুঃসংবাদটা এল। পিওনের মারফত একটা চিঠিতে দেশ পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক সাগরদা জানিয়েছেন, আজ সকালে ৮টা বাজার কিছুক্ষণ পরই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বোম্বাইতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে অন্ধেরিতে যে বাড়িতে শরদিন্দুবাবুর ছেলেরা থাকেন সেই লছমী নিবাস মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, আর শরদিন্দুবাবুর সেই প্রিয় ঘরটা যেখানে কতদিন তাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গল্প করেছি। আর দেখতে পেলাম সেই পরম স্নেহশীল মুখটাকে, যাকে কেন্দ্র করে আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় গড়ে উঠেছে পুরো একদশক ধরে।

আমার সামনে দুজন আগন্তুক বসেছিলেন। আমার চোখে অকস্মাৎ জল দেখে তাঁরা বিব্রত বোধ করলেন। তারপর আমাকে প্রায় ভেঙে পড়তে দেখে তাঁরা ভাবলেন, হয়তো আমার কোনো নিকটতম আত্মীয় সম্পর্কে কোনো দুঃসংবাদ সবেমাত্র হাজির হয়েছে। শোকের প্রথম আঘাতে তাঁদের সঙ্গে আর ভালভাবে কথা বলতে পারিনি। তাঁর বিদায় নেবার পর, আমি কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে আছি।

হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে একলা বসে বসে সাঁইত্রিশ বছরের আমি নিজেকে

সামলাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি কই ? আমার চোখের জল, সংসারের এতো অভিজ্ঞতা-মরুভূমি পেরিয়ে এসেও আজ বাধা মানতে চাইছে না। আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, এই পৃথিবীতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নামে মানুষটির সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হবে না, তাঁর পায়ে হাতে দিয়ে আর প্রণাম করতে পারবো না। আর শুনবো না—"ওগো, শংকর এসে গিয়েছে, সুতরাং একটু চা লাগাও, না হলে লেখক হিসেবে আর প্রেস্টিজ্ থাকে না !"

আমি হাওড়ার বাড়িতে ফিরে এসেছি। ঘরের জানলা দিয়ে মেঘ-ঢাকা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি, আর ভাবছি তাঁর কথা—যিনি পরম স্নেহে, পরম ভালবাসায় আমাকে নিজের অতি কাছে টেনে নিয়েছিলেন, পরম কৌতুকে লেখনী ধারণ করে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে যিনি গৌড়জনের মনোমন্দিরের আপন আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কী এমন বয়স হয়েছিল তাঁর ? সংসারে আজকাল সত্তর বছরটা তো তেমন বিরল নয়। এইতো মাত্র কয়েক বছর আগে তাঁর মাতৃবিয়োগ হলো। আমি চোখের জল মুছছি, আর সেই সঙ্গে মনে পড়ছে, মাতৃবিয়োগের সংবাদ দিয়ে আমাকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "কষ্ট পাচ্ছি, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে, আর কিছুদিন বাঁচলে তাঁকে হয়তো পুত্রশোক পেতে হতো।"

এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে এক যুগ আগে শরদিন্দুবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যটা ভেসে উঠছে। মতিলাল না শিশিরকুমার পুরস্কার নেওয়া উপলক্ষে সুদূর পুনা থেকে শরদিন্দু অনেকদিন পরে কলকাতায় এসেছেন।আমার শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে শরদিন্দুর পরিচয় ছিল। আর রবীনদা জানতেন আমি ওঁর লেখার বেজায় ভক্ত। রবীনদা আমাকে একদিন বালিগঞ্জে ওঁর ছোটছেলের বাসায় নিয়ে গেলেন।

শাদা ধুতি-পাঞ্জাবি আর চটি পরে একটা সোফায় বসেছিলেন শরদিন্দু। মোটা চশমার আড়াল থেকে তিনি আমার দিকে এমন সস্নেহ দৃষ্টিপাত করলেন যেন আমার সঙেগ অনেকদিনের পরিচয়। তারপর কী যেন একটু হিসেব করে বললেন, "বাবা, তোমার নিশ্চয় কর্কট রাশিতে জন্ম। আর লগ্নটা কী ? কুম্ভ ?"

আমি তো তাজ্জব। কারণ দুটো তথ্যই মিলে গিয়েছে। রবীনদা জিজ্ঞেস করলেন, "কী বুঝছেন ?" আমার কপালের দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে

থেকে শরদিন্দু বললেন, "চিন্তার কোনো কারণ দেখছি না। তবে বাবা, তোমার মাথার এই ঘন চুল থাকবে না, মাথা জুড়ে মস্ত এক টাক পড়বে। আর, যদি পারো, একটি তন্বী শ্যামা গুরুস্তনী বালিকার সান্নিধ্য মাসকয়েক এড়িয়ে চলবে।"

শরদিন্দু হাসতে হাসতে বললেন, "তোমার জন্ম তারিখ ও সময়টা লিখে নিই, পুনা থেকে বিস্তারিত লিখে পাঠাব।" তারপর বললেন "রাগ করলে না তো?"

হেসে বললাম, "রাগের কী আছে?"

শরদিন্দু চোখের চশমাটা কাপড়ে মুছতে মুছতে বললেন, "এই কোষ্ঠীর কথা তুলে সেবারে সাহিত্যিক পরশুরামের হাতে যা নিগ্রহ হলো। এক সাহিত্যবাসরে ওঁর সঙ্গে পরিচয় হলো। বহুদিন বাংলা দেশছাড়া আমি, অনেকের সঙ্গেই তেমন পরিচয় নেই। রাজশেখর বসুর সঙ্গে দেখা হতেই আমার যা-অভ্যাস, কোষ্ঠীর কথা তুললাম। ছকটা দেখতে চাই। এই প্রস্তাবে বেশিরভাগ লোকই খুশি হন। কিন্তু রাজশেখরের বেলায় উল্টো। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এলেন। অত্যন্ত বিরক্তভাবে বললেন, ছক-ফক ওসব হবে না। মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেলো, হাজার হোক আমিও একজন প্রতিষ্ঠিত বাঙালি সাহিত্যিক, এ রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি। সভায় যতক্ষণ রইলাম মনটা খচখচ করতে লাগলো। বেরিয়ে আসবার সময় দেখি রাজশেখরবাবু আমাকে খুঁজছেন। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, "আপনি নিশ্চয় ভাবছেন আমি এরকম ব্যবহার করলাম কেন? তা হলে শুনুন। আমার জন্মের পরেই পিতৃদেব একটি কোষ্ঠী করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল, জাতকের সত্তর বৎসর বয়সে নারী সংসর্গে অধঃপতনের যোগ আছে। কোষ্ঠীর এই গোপন তথ্যটি যথাসময়ে আমার স্ত্রীর কাছে ফাঁস হওয়ায় সারা জীবন বিড়ম্বিত হয়েছি। তারপর মৃতদার অবস্থায় পঁয়ষট্টি বছর থেকে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে আরম্ভ করেছি। খ্যাতির এই শিখরে অবস্থানকালে পদস্খলন হলে কী অবস্থা ভাবুন! তারপর সত্তর এলো। তখন যে কী অবস্থায় দিন কাটিয়েছি কী বলবো। সত্তর গেলো—তবু ভরসা পেলাম না, হাজার হোক ক্যালকুলেশনের ব্যাপার, দু-এক বছর এ-দিক ও-দিক হতে পারে। অবশেষে এই আটাত্তরে এসে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আবার আমি কোষ্ঠী দেখাবো! শেষে আবার আপনারা একটা কিছু বলে বসুন!"

এরপর বেশ গল্প জমে উঠলো। আমাদের চা এবং খাবার জুগিয়ে শরদিন্দু গৃহিণীও আড্ডায় অংশগ্রহণ করলেন। ষাট বছরের শরদিন্দু এবং তাঁর স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক সেদিন আমাকে বিস্মিত করেছিল। শরদিন্দু বললেন, "তোমাদের এই কাকিমা গোগ্রাসে বই গেলেন। এঁকে তোমরা ভাল লিখে সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা কোরো। জানো তো শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত উপদেশের কথা : বাংলায় লিখে যদি টিঁকে থাকতে চাও তাহলে মালক্ষ্মীদের চটিও না।"

"তুমি আর বোলো না, সব সময়ই তো চটিয়ে রেখেছো," শরদিন্দু-গৃহিণী উত্তর দিলেন।

শরদিন্দু হাসতে হাসতে আর এক কাপ চায়ের আবেদন জানিয়ে বললেন, "গিন্নি, আমরা জাত-কেউটের মত জাত-লেখক। গল্পের প্লট পেলে বউকেও ছেড়ে কথা কইবো না!" তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "গিন্নির বড় রাগ বোম্বাইতে সমুদ্রস্নান করতে-গিয়ে একবার ওঁর বস্ত্রবিভ্রাট হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এক প্রায়-বিবসনা বিদেশিনী তাঁর স্নানের তোয়ালেটা ছুড়ে দিয়ে লজ্জা রক্ষা করলেন। সেই নিয়ে সরস গল্প লিখেছিলাম—আরবসাগরের রসিকতা। তাইতে আমার ওপর বেজায় রাগ। তাছাড়া কৈশোরের দু'একটা রোমান্টিক এপিসোড নিয়ে যা লিখেছি—সে সম্বন্ধে নানাপ্রকারের জেরা করেন।"

কাকিমা মোটেই বিরক্ত হলেন না, মুখ টিপে হাসতে হাসতে ওঁর কথা শুনতে লাগলেন।

সেই যে আড্ডা জমলো তার মধ্যে ওঁদের কনিষ্ঠ পুত্রবধূও এসে যোগ দিলেন। শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে পুত্রবধূদের এমন মধুর সম্পর্ক আর কোনো সংসারে আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি। শরদিন্দু বললেন, "আমার তিন ছেলে, মেয়ে নেই। তাই এদের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক। আড্ডা, ইয়ারকি ফচকেমি সবই চলে।" উনি ওদের তুই বলে ডাকেন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "ছেলের বউদের আমি শুধু একটা কথা বলি। সাজগোজ করবে, সিনেমা যাবে, বরের সঙ্গে বেড়াতে বেরোবে, প্রাণ যা চায় তাই করবে, কিন্তু হাতা-খুন্তি ছাড়া চলবে না। বাবুর্চি বা রাঁধুনী যাই বলো, তাদের হাতে খেতে আমি রাজি নই। তোমার গল্পের কোথাও লিখে দিও, নারীর স্নেহের চূড়ান্ত প্রকাশ রন্ধনে!"

প্রথম পরিচয়েই এমন স্নেহের পরিচয় পেয়েছিলাম যে সেবার ওঁর সঙ্গে

বেশ কয়েকবার দেখা করেছিলাম। উনি বলেছিলেন, "কলকাতায় কখনও তো বেশিদিন থাকা হয়নি, তাই এবার খুব ভাল লাগল। তুমি যদি পারো, একবার আমাদের পুনার বাড়িতে এসো। ওখানে অষ্টপ্রহরী আড্ডা জমানো যাবে।"

"অষ্টপ্রহরীটা কী।" জিজ্ঞেস করি।

"খুব সোজা ব্যাপার—সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত ধরে গল্পগুজব চলবে, মাঝে মাঝে গিন্নি শুধু রসনার রসদ জুগিয়ে যাবেন!"

এরপর সত্যিই একবার পুনায় যাবার কাজ পড়লো। হাতে তেমন সময় ছিল না। তাই একটা এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম। যখন পুনায় হাজির হলাম, তখন রাত ন'টা। ওঁর বাড়ির নাম মিথিলা, আর যে অঞ্চলে থাকেন তার নাম বিজয়নগর।

আমাকে দেখে ওঁরা অবাক। জিজ্ঞেস করলাম, "টেলিগ্রাম পাননি?" "কই না তো?" শরদিন্দু এরপর হাসতে হাসতে বললেন, "খোদ তোমাকেই যখন পেয়ে গেলাম তখন আর টেলিগ্রাম নিয়ে কী করবো? তুমি বাবা, বড় মোক্ষম সময়ে এসে গিয়েছো। এক কাপ চা খাবার বেজায় ইচ্ছে করছিল। কিন্তু হেলথ্ ইনসপেকটর এবং রেশনিং অফিসার গিন্নিকে বলতে সাহস হচ্ছিল না। এখন আর কোনো চিন্তা নেই—ওগো শংকরের জন্যে তাড়াতাড়ি একটু চা করো; পথের ক্লান্তিতে বেচারার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে!"

তারপর সে কী আদর-যত্ন এবং হইচই। কে বলবে তাঁর জন্ম ১৮৯৯ সালে এবং আমার ১৯৩৩ সালে? চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "এক গেলাসের মতো, এক কাপের ইয়ার হলেও, বয়সের পার্থক্যের কথা খেয়াল থাকে না। তোমার যখন জন্ম, তখন আমার অনেক লেখা বেরিয়ে গেছে।"

আমি বললাম, "আপনার লেখার গল্প বলুন।'

"সেসব বলবো, আগে তোমার জন্মের সময়কার ব্যাপারটা শোনো। চৌত্রিশ সালে যখন বিহারে ভূমিকম্প হলো, তখন তো তোমার মাত্র মাসখানেক বয়স। সেই সময় বাবার হোটেলেই আছি। বাবা ছিলেন মুঙ্গেরের নামকরা উকিল। বাবার অ্যাকাউন্টেই বে-থা হয়েছে। গিন্নির সঙ্গে একটু রোমান্টিক মন কষাকষি চলছে। কী কারণে দুজনেই বাড়ির ছাদে উঠলাম। ঠিক সেই সময় সেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প আরম্ভ হলো। চোখের সামনে দেখলাম ছাদের আলসেগুলো চৌচির হয়ে ফেটে যাচ্ছে। গিন্নি প্রচণ্ড ভয়

পেয়ে মান-অভিমান সব ভুলে আমাকে এমন জড়িয়ে ধরলেন যে তোমাকে কী বলবো! তারপর ভূমিকম্প যখন থামলো তখন নিচে নামবার সিঁড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বীর হনুমানের মতো শৌর্যের চূড়ান্ত দেখিয়ে সেদিন নিজের গৃহিণীকে উদ্ধার করে ছাদ থেকে মাটিতে নেমেছিলাম, বুঝলে হে।"

সেবার যে-কদিন পুনায় ছিলাম তার স্মৃতি আমার অন্তরে আজও অমলিন হয়ে রয়েছে। কত রকম গল্প হতো। নিজের জীবনের ইতিহাস শোনাতেন শরদিন্দু। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "বাংলা সাহিত্যে বিহারিদের দান অবহেলা করার নয়। আমরা বিহার গ্রুপ যদি দল পাকিয়ে একসঙ্গে স্ট্রাইক করি, তোমরা বিপদে পড়ে যাবে। বনফুল, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, আমি, তার আগে শরৎ চাটুজ্যে এবং বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগলপুর পর্বটার কথাও ভুলো না। আরও রয়েছেন—কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী।"

খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে রসিকতা করলেন ঃ "নিখিল ভারতীয় বাঙালি বলতে যদি কেউ থাকে, সে আমি। জন্ম জৌনপুরে, শৈশব ও কৈশোর মুঙ্গেরে, যৌবনের কিছু অংশ কলকাতায়,তারপর কর্মজীবনের শুরু মুঙ্গেরে, অবশেষে বোম্বাইতে কর্মজীবন—আর এখন তো পুনাতে বানপ্রস্থ অতিবাহিত করছি।"

শুনলাম, কলকাতার সঙ্গে শরদিন্দুর তেমন সম্পর্ক ছিল না। কলেজে পড়ার সময় কেশব সেন স্ট্রিটের ওয়াই-এম-সি-এ হোস্টেলে থাকতেন। বি এ পাশ করেছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। তারপর বাবার ইচ্ছেমত আইন ক্লাসে ঢুকেছিলেন—শুনেছি, ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে একটু-আধটু জড়িয়ে পড়ে বি এল পাশ না করেই মুঙ্গেরে ফিরে আসতে হয়েছিল। বাবা খ্যাতনামা উকিল, তিনি নাছোড়বান্দা। পাটনাতে পাঠালেন আইনের ডিগ্রির জন্যে। সেখান থেকে ডিগ্রি জোগাড় করে, গাউন হাতে বাবার জুনিয়ারি আরম্ভ করলেন মুঙ্গেরে। বাবা বলতেন, "দেখছো তো, আমার হাতে কত কাজ। ঝটপট শিখে নাও, তোমারও প্র্যাকটিশ জমে উঠবে। বিয়ে হয়ে গেলো। আমি শুধু সুড়সুড় করে বিয়ে করে এলাম, খাওয়ানো-পরানোর দায়িত্ব বাবার। রোজ কোর্টে যাই আর আসি। কিন্তু মন বসে না।"

বাবা একদিন বললেন, "তোমার ব্যাপার কী? কাজে-কর্মে ঠিকমতো মন দিচ্ছো না কেন?"

"মন যে বসছে না," সোজাসুজি উত্তর দিয়েছিলেন শরদিন্দু।

"তাহলে কী করতে চাও?" জিজ্ঞেস করেছিলেন পিতৃদেব।

"আমি লেখক হতে চাই। লেখা ছাড়া আর কোনো পেশা আমার চলবে না।"

"তখন কিছু কিছু লেখা আমার চারদিকে বেরোতে আরম্ভ করেছে। কিছুটা নামও হয়েছে। কিন্তু বাবা বললেন, 'এদেশে শুধু লিখে খাওয়া যায় না। তুমি অবুঝের মতো কথা বলছো।' কিন্তু আমি মনস্থির করে ফেলেছি। স্ত্রী-পুত্রদের বাবার কাছে রেখে একদিন ওকালতিকে নমস্কার জানিয়ে কলকাতায় পালিয়ে এলাম ভাগ্যান্বেষণে।"

আমি অবাক হয়ে শরদিন্দুর ইতিহাস শুনে যাচ্ছি। শরদিন্দু ওঁদের বাড়ির সামনের বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে বললেন, "তুমি তো ব্যোমকেশকে নিয়ে লেখা আমার প্রথম গল্প 'সত্যান্বেষী' পড়েছো। ওতে দেখবে, অজিতের মেসে ঘরভাড়া এবং খাওয়া-খরচ বাবদ মাসিক পঁচিশ টাকা লাগত। ওটা আসলে আমারই হিসেব। পঁচিশ টাকা প্লাস হাতখরচ বাবদ আরও পাঁচ টাকা, মোট তিরিশ টাকা হলে আর দেখে কে? পিতার আশ্রয় ত্যাগ করে এসে কলকাতায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলাম। আর এমনই ঈশ্বরের করুণা যে তালেগোলে ঠিক মাসিক তিরিশ টাকা রোজগার হয়ে যেতে লাগলো। ওই যে অজিতের ইচ্ছে সাহিত্যিক হবার, ওটা আসলে আমার মনের কথা।"

বললুম, "তা হলে ওকালতির পিছনে ছুটে ছুটে শুধু শুধু তিনটে বছর নষ্ট করলেন।"

"নষ্ট নয়। আমার সাহিত্য জীবনে আদালতের এই অভিজ্ঞতা খুব কাজে লেগেছে। বিশেষ করে ব্যোমকেশের রহস্য গল্পে ওই ওকালতি অভিজ্ঞতার শোধ তুলে নিয়েছি।"

ব্যোমকেশের সৃষ্টিবৃত্তান্ত জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। কিন্তু উনি বললেন, "তার আগে, তোমার টেলিগ্রামটা নিয়ে বেশ রহস্য ঘনিয়ে উঠেছে। পরশু দিন তুমি যখন এলে টেলিগ্রাম পৌঁছয়নি। রাত একটা নাগাদ টেলিগ্রাম পিওন এসে কড়া নাড়লো, তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছো। গতকাল রাত্রে ঠিক একটার সময় আবার টেলিগ্রাফ পিওনের ডাক। ধড়মড় করে উঠে টেলিগ্রামখানা নিয়ে দেখি তোমার টেলিগ্রামটাই এসেছে। একই টেলিগ্রাম জীবনে কখনও দুবার পাইনি। আজও যদি আবার ভুতুড়ে

টেলিগ্রামটা তৃতীয়বার আসে তাহলে ব্যোমকেশকে খবর পাঠাতে হবে।"

ব্যোমকেশের গোড়ার গল্প অন্য আরেকবার কলকাতার কেয়াতলায় শরদিন্দুর ছোট ছেলের বাড়িতে শুনেছিলাম। শরদিন্দু বলছিলেন, "অন্য অনেকের মত আমিও কবিতা এবং গল্প দুই লিখছি চৌদ্দ বছর বয়স থেকে। যখন কলকাতার হোস্টেলে থাকি তখন এক বন্ধু ছিল—নাম অতুল মিত্র। অতুলই একদিন বললে, 'হ্যাঁরে, বই ছাপাবি?' বললুম, কোন লেখক আর বই ছাপাতে চায় না? অতুল বললে, আমার এক জানাশোনা পার্টি আছে। সব ব্যবস্থা করে দেবে, তুই রাতারাতি 'অথর' হয়ে যাবি। তবে কিছু খরচাপাতি করতে হবে। বললুম, কত টাকা? অতুল বললে, 'পঁচাত্তর টাকা দিলে কাগজ, ছাপা, বাঁধাই, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বুঝলে শ্রীমান শংকর, আঠারো বছর বয়সে আমার প্রথম প্রকাশিত বই 'যৌবন স্মৃতি'র এই হলো ইতিহাস। খুবই গোপনীয় কিন্তু, আমার জীবৎকালে খবরটা প্রকাশ কোরো না।"

"তারপর সেই অতুল যে কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে। আমার সঙ্গে এই দীর্ঘ, অর্ধশতাব্দী ধরে তার কোনো সংযোগ নেই। আমি কিন্তু ওকে স্মরণীয় করে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলাম। ব্যোমকেশের প্রথম গল্পে—সে যখন কোকেন রহস্য উদঘাটনের জন্যে ছদ্মনামে চীনে পাড়ার এক মেসে এসে উঠলো—তখন তার পরিচয় অতুল মিত্র। এই অতুল মিত্র নামেই তার বসওয়েল অজিতের সঙ্গে ব্যোমকেশের আলাপ।"

এর পর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। আমি কেয়াতলা থেকে সেদিন চলে এসেছিলাম। পরের দিন আবার যথারীতি দেখা করতে গিয়েছি। দেখলাম শরদিন্দু বেশ উত্তেজিত। বললেন, "বোসো বোসো, অনেক কথা আছে। তোমরা তো দৈব বিশ্বাস করো না। গতকাল আমরা তো অতুলের কথা আলোচনা করছিলাম, তুমি যেমনি চলে গেলে, অমনি আবার বেল বাজলো। দরজা খুলে দেখি এক বৃদ্ধ। বললাম, কী চাই? বৃদ্ধ বললেন, 'আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি অতুলচন্দ্র মিত্র—তোর প্রথম বই যৌবনস্মৃতি যে প্রকাশ করেছিল।' এতদিন পরে পুরনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে কত আনন্দ হলো তোমায় কী বলবো। অতুল এখনই আসবে, তোমার কথা বলে রেখেছি। তুমি এই আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী রয়ে গেলে।" অতুলবাবু তারপর এলেন, অনেকক্ষণ গল্প-গুজব হলো।

অতুলবাবু বললেন, "তুই আমাকে বিখ্যাত করে রেখে গেলি। বাংলা

সাহিত্যে ব্যোমকেশের মতো রহস্য নায়ক একটাও হয়নি।"

অতুলবাবুকে দেখার পর আমি বাড়ি ফিরে এসে সত্যান্বেষী গল্পটা আবার পড়েছি। অতুল ছদ্মনামী ব্যোমকেশ বোধহয় অতুলবাবুর মতই দেখতে ছিলেন : "তাহার বয়স বোধ করি তেইশ-চব্বিশ হইবে, দেখিলে শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রং ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা—মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে।" আর অজিতের বয়স তখন ওইরকম হয়ত এক-আধ বছর কম। সে "বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি শেষ করিয়া সবেমাত্র বাহির" হয়েছে। অজিত স্থির করেছে, সাহিত্য চর্চায় জীবন অতিবাহিত করবে।

এই কেয়াতলার বাসাতে বসেই শরদিন্দুবাবুর পরবর্তী পরিকল্পনার কথা শুনেছি। উনি বলেছিলেন, "ভাবছি, ব্যোমকেশ এবং অজিতকে আর হ্যারিসন রোডের বাড়িতে রাখবো না। এই কেয়াতলায় এনে হাজির করবো। প্রমথ বিশী এবং অতুল গুপ্ত মশায়কে কনসাল্ট করছি, ওঁদের বিনা অনুমতিতে এত বড় ব্যাপারটা করতে পারি না। তবে মুশকিল হলো, বউমাকে নিয়ে। গিন্নি এবং বউমা দুজনই বলছে, কিন্তু আর ভাড়াটে বাড়িতে নয়। অজিত এবং ব্যোমকেশকে যদি কেয়াতলায় আনতেই হয়, তাহলে নিজের বাড়িতে।"

আমার মতামত জানতে চাইলেন। বললাম, "সারাজীবন ধরে ওঁরা দুজনে অনেক খেটেছেন। আর এই দুর্দিনে যদি কারুর নিজস্ব বাড়ি হয়, তাহলে আমরা আপত্তি করবো কেন?"

হাসতে হাসতে উনি উত্তর দিলেন, বেশ বেশ, বাড়ি হবে। তবে অজিতটাকে আমি বিদেয় করছি। ব্যোমকেশের গল্প ব্যোমকেশ নিজেই বলুক। তাছাড়া কয়েকজন পাঠিকা এসেছিলেন, দরবার করতে, সাধু ভাষায় না লিখে চলতি ভাষায় লেখবার জন্যে।"

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। শরদিন্দু বললেন, "আমাদের সাহিত্য-জীবনে এই একটা মস্ত ক্রাইসিস গিয়েছে। অর্ধেক জীবন ধরে সাধুভাষার লিখে এলুম—হঠাৎ দেখছি সাধুভাষা অচল হবার দাখিল। করিতেছে, খাইতেছে, লোকের আর ভাল লাগে না, সবাই চাইছে করছে, খাচ্ছে। সারাজীবন ধরে এরকমভাবে লিখে, হঠাৎ এই স্টাইল পাল্টানো যে কতটা কঠিন তা তোমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত। এই ট্রানজিসনের ধাক্কায় কয়েকজনের লেখা বেশ খারাপ হয়ে গেলো।"

সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা সম্পর্কে ওঁর মতামত জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, "চলিত ভাষায় লাভ কিছু হয়েছে, সাহিত্য মানুষের আরও কাছে আসতে পেরেছে—কিন্তু লোকসানও কম নয়। সাহিত্যের ভাষা-সম্পদ ও সৌন্দর্য এই সুযোগে দরিদ্র এবং ম্লান হয়ে পড়তে পারে। কয়েকজন সমালোচক তো আমার কাছে এই অভিযোগ করছেন। তাছাড়া সাধুভাষায় কম পরিসরের অনেক বেশি বলা যায়। ইদানীং আমাদের সাহিত্যে ফেনানো দোষটা প্রকট হয়ে উঠেছে—সেকেলে বিধবা পিসিমার মতো বকবক করে বকে চলাটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

একটু থেমে শরদিন্দু বললেন, "বাবা, কিছু মনে করো না, এই সম্বন্ধে খুব সাবধানে থাকবে। যে জিনিস পাঁচ কথায় বলা যায় তার জন্যে পাঁচশ কথা পাড়বে না। লেখা সংশোধন করবার সময় যা বাড়তি মনে হবে, তা নির্মমভাবে কেটে দেবে। আমি যে এই এতো বছর ধরে মোটামুটি পাঠকদের 'গুড বুকে' রয়ে গেলাম, তার প্রধান কারণ আমি ফেনাই না।"

কেয়াতলা, পুনা, বোম্বাই যখন যেখানে দেখা হয়েছে, সেখানেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমরা সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। একবার পুনাতে তিনি বলেছেন, "শংকর, ছোটবেলায় খুব কষ্ট করে মানুষ হয়েছো, তেমন সুযোগ পাওনি। একটু সুবিধে হলেই আমার মতো মাস-মাইনে করে একটা সংস্কৃত পণ্ডিত রাখবে। তাঁর কাছে শর্ট-কাটে সংস্কৃত শিখে নিলে দেখবে এক নতুন সোনার খনির খোঁজ পেয়েছো। আমার ঐতিহাসিক গল্পগুলোর সাফল্যের পিছনে আছে এই ভাষা-সম্পদ।"

বললাম, "সে আপনার সেতু গল্পের ভাষা দেখেই অনেকদিন আগে বুঝেছিলাম। আমাদের এক বন্ধুর মুখস্ত ছিল : 'রল্লা কি কুহক জানে? নারী তো অনেক দেখিয়াছি—তীব্রনয়না গর্বিতা শক-দুহিতা, মদালসনেত্রা স্ফুরিতধরা অবন্তিকা, বিলাসভঙ্গিমগতি রতিকুশলা হাস্যময়ী লাটললনা। কিন্তু রল্লা—রল্লার জাতি নাই। তাহার তাম্রকাঞ্চন দেহে নারীত্ব ছাড়া আর কিছুই নাই।....একবার মাত্র তাহাকে দেখিয়াছি, মদনোৎসবের কুঙ্কুম-অরুণিত সায়াহ্নে.... যৌবনের মহোৎসব, উদ্যানের গাছে গাছে হিন্দোলা দুলিতেছে, গুল্মে গুল্মে চটুলচরণা নাগরিকার মঞ্জীর বাজিতেছে, অসম্বৃত অঞ্চল উড়িতেছে...., আসব-অরুণনেত্র ঢুলু ঢুলু হইয়া নিমীলিত হইয়া আসিতেছে নিভৃত লতানিকুঞ্জে প্রণয়ীমিথুন কানে কানে কথা কহিতেছে! কোনও মৃগনয়না বিভ্রমচ্ছলে নিজে চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিতেছে—তুমি

আমার চক্ষে কুঙ্কুম দিয়াছ ! প্রণয়ী তরুণ সযত্নে তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া অরুণাভ নয়নের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে, তারপর ফুৎকার দিবার ছলে গূঢ়-হাস্য-মুকুলিত রক্তাধর সহসা চুম্বন করিতেছে।"

শরদিন্দু বেশ অবাক হলেন। "আজকাল কলকাতার ছেলেমেয়েরা ভাষার মূল্য দেয় ?"

বললাম "সবাই না দিলেও, কিছু কিছু পাঠক অবশ্যই দেয়"। তারপর আমার মতামত দিলাম, "এক এক সময় মনে হয়, আপনি ডিটেকটিভ গল্প না লিখলেই পারতেন। তাহলে আপনার ইতিহাস-আশ্রিত লেখাগুলোর দিকে লোকের বেশী নজর পড়তো।"

উনি হেসে উত্তর দিলেন, "বেশি লোভ করতে নেই। তোমার কাকিমাকে জিজ্ঞেস করো, উনি বলবেন, অমি একটা আইটেম বেশি খাই না, কিন্তু অনেকগুলো আইটেম ঠুকরে ঠুকরে খেতে ভালবাসি। তাই সব রকম চেষ্টা করেছি—কবিতা, ব্যঙ্গ-কবিতা, ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাস, রহস্য-কাহিনী, অলৌকিক কাহিনী, সরস গল্প।"

"শরদিন্দু নামটা বেঁকিয়ে চন্দ্রহাস ছদ্মনামে শনিবারের চিঠিতে ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছি। একবার লিখেছিলাম :

শিল্পীর শিরে পিলপিল্ করে আইডিয়া।
লেখেন যখন পুস্তক তিনি তাই দিয়া উইপোকা কয়,
চল এইবার খাই গিয়া।"

এই সব আড্ডার মধ্যে কাকীমা এসে বকুনি দিয়েছেন, যথেষ্ট সাহিত্য আলোচনা হয়েছে, এখন আমার ফুলগাছ দেখবে এসো। পুনার বাড়িতে, বাংলাদেশের সব রকম ফুল এবং ফলের গাছ লাগিয়েছেন ওঁরা।

শরদিন্দু হাসতে হাসতে বললেন, "আমার গৃহিণী এইখানেই একটা ছোটখাট বাংলাদেশ বানিয়ে নিয়েছেন। ওঁর একটা স্পেশ্যাল শখ আছে। ছেলে এবং নাতিদের জন্মদিনে এক একজনকে দিয়ে এক একটা গাছ পোঁতান, তাই ওঁর মনে থাকে কোন গাছটার কত বয়স। আর আছে, আমার ফ্রেন্ড চিড়িক দাস। বৈরাগী নয়, একটা কাঠবেড়ালী। ছটফট করে ঘুরে বেড়ায় বলে নাম দিয়েছি চিড়িক দাস।"

পরের বার পুনায় গিয়ে দেখি চিড়িক দাস নেই। ওঁদের দুজনেরই খুব মন খারাপ।গম্ভীরভাবে শরদিন্দু বললেন, "আমাদেরই দোষ। বিয়ে-থার বয়স হয়েছিল। আমরা ঠিকমতো নজর না দিয়ে বন্দী করে রাখলাম।

শেষে একদিন সুযোগ পেয়ে চিড়িক দাস বিবাগী হয়ে চলে গেলো।"

গাছপালা দেখে আমরা রান্নাঘরে গিয়ে বসলাম। চেয়ারে বসে শরদিন্দু বললেন, "বাঙালিদের একটা অপরাধের জন্যে ক্ষমা করা যায় না। সেকেলে বাড়ির রান্নাঘর এবং আঁতুড়-ঘর দেখলে ভয়ে আঁতকে উঠতে হয়। আমার এই বাড়িতে রান্নাঘর শোয়ার ঘরের থেকে ভাল। খেতে পেলে তবে তো লোক শুতে চাইবে ! তাছাড়া মেয়েদের জীবনের বেশিরভাগটাই তো কাটে রান্নাঘরে। তাই এখানে রেডিও দিয়েছি, রেকর্ড-প্লেয়ার রেখেছি, আড্ডার ব্যবস্থা করেছি। আর খাওয়ার ব্যাপারেও আমি ঘরকুনো বাঙালি নই—সব অঞ্চলের এক একটা ডিশ দিয়ে মেনু সাজাবার চেষ্টা করি।"

কাকিমা বললেন, "ওঁর আরেকটা অভ্যাস আছে। যখন লেখেন, তখন মাঝে মাঝে উঠে এসে আপন মনে শিশি, বয়েম, কৌটো খুলে একটু-আধটু হালকা খাবার মুখে পোরেন। আর সেই সঙ্গে চা। ভাল চা না হলে ওঁর মনে ভরে না।"

লালবাজারের বি কে সাহার একটা বিশেষ ব্লেন্ডের চা ওঁর বেজায় প্রিয় ছিল। কলকাতা থেকে যাবার সময় মাঝে মাঝে নিয়ে যেতাম। উনি আমাকে দেখেই বলতেন, "ওগো শংকরের ব্যাগটা খুলে দ্যাখো, নিশ্চয় চা আছে।"

আমাকে বলতেন, "চা বললে সব বলা হয় না, বলতে হয় কালপাতার ছদ্মবেশী অমৃত।"

আমাদের মধ্যে একটা চালু রসিকতা ছিল। আমি বলতাম, দোকানদারকে বলেছি, সাহেবকে ভেট দেবার জন্যে, একটু বুঝে-সুঝে দেবেন। দোকানদার চায়ের ঠোঙা হাতে দিয়ে বলতেন, এই চা খেয়েও সায়েব যদি আপনাকে প্রমোশন না দেন, তাহলে বুঝতে হবে, আপনার কোনো দোষ আছে।

শরদিন্দুবাবু হেসে বলতেন, "ঠিকই বলেছেন ওঁরা। এই চা বার বার ভেট পেয়েও সায়েব যখন প্রমোশন দিচ্ছেন না, তখন কর্মচারী হিসেবে তুমি একেবারেই অপদার্থ !"

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে শরদিন্দুবাবু অতীতে ফিরে যেতেন। বলতেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গল্প লিখে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে ক্রমশ চিন্তিত হয়ে উঠছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক বম্বে টকিজের কর্ণধার হিমাংশু রায়ের ভগ্নীপতি প্রখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে একবার তাঁর দেখা হয়। বোম্বাইয়ে বসে গল্প লেখার চাকরির জন্যে

হিমাংশু রায় তাঁর ভগ্নীপতিকে একজন যোগ্য লেখক নির্বাচন করতে লিখেছিলেন। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ এবং হিমাংশু রায় শেষ পর্যন্ত শরদিন্দুকেই মনোনীত করেছিলেন। শরদিন্দু হাসতে হাসতে বলতেন, "শুনেছো এমন মজার চাকরির কথা ? লোকে অফিসে গিয়ে চিঠি লেখে, মাল বিক্রি করে, হিসেব রাখে। আর আমি সকালবেলা বাড়িতে ভাল খেয়ে অফিসে যাচ্ছি গল্প লেখার জন্যে। মাইনেও অনেক !"

রসিকতা করে শরদিন্দু বলতেন, "এ-বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে আমার জুড়ি নেই, যদিও যা দিনকাল পড়েছে, তাতে স্টাফ রিপোর্টারের মতো কাগজের অফিসে স্টাফ নভেলিস্ট বা স্টাফ স্টোরি-রাইটার রাখার রেওয়াজ হতে দেরি নেই।"

বোম্বাইতে সিনেমার প্রথম যুগে শরদিন্দুর অভিজ্ঞতা উপন্যাসের থেকেও রোমাঞ্চকর। হিমাংশু রায়, দেবিকারানী এবং আরও অনেকের নিকট সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি। বন্ধন, কঙ্গন, ঝুলা ইত্যাদি হিট বইয়ের চিত্রনাট্য লিখেছেন তিনি। এই অভিজ্ঞতার কথা লেখবার জন্যে তাঁকে বহুবার অনুরোধ করেছি। হিমাংশু রায়ের আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে শরদিন্দুরও জীবনে কিছুটা বিপর্যয় এসেছে। নানা প্রচেষ্টায় তিনি পরাজয়ের হাত থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এই সম্পর্কে মাত্র একটা স্মৃতিকাহিনী লিখেছিলেন উল্টোরথ পত্রিকায়।

আবার লেখার কথা তুলতেই বলতেন, "লিখতে গেলে অনেক অপ্রিয় সত্য বলতে হয়। আমার অভিজ্ঞতার নায়ক-নায়িকারা অনেকে জেলে না গিয়ে এখনও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই !"

একটা কথা অবশ্য আলোচনা থেকে বুঝেছি। চিত্রনাট্যকার শরদিন্দুর এই অধ্যায়টি নানা সাফল্যে মণ্ডিত হলেও লেখক শরদিন্দু তাতে পরিতৃপ্তি পাননি। পুনার বাড়িতে বসে একদিন আমাকে বলেছিলেন, "তখন বাবা দেহ রেখেছেন, তিনটে ছেলেপুলের লেখাপড়ার খরচা। বড়ই জড়িয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু পণ করেছিলাম, যেদিন আমার ছোটছেলের লেখাপড়ার পাট চুকবে, সেদিন থেকে আর এই প্রফেশনে থাকবো না। প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করেছি। ছোটছেলে কলেজ থেকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার কাজে ইস্তফা দিয়েছি। অনেকগুলো বছর বাজ বাজে নষ্ট হলো, এই সময়টা আরও মন দিয়ে বঙ্গসরস্বতীর সাধনা করলে উপকার হতো।"

শরদিন্দুর ছেলেরা কৃতী। আর তার থেকেও যা উল্লেখযোগ্য, পারিবারিক দিক থেকে এমন আশ্চর্যভাবে সুখী মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। ছেলে এবং ছেলের বউরা বাবা অন্তপ্রাণ। কিন্তু তবু তিনি বোম্বাই ছেড়ে পুনায় বাড়ি করলেন। পুনার জল-হাওয়া ওঁর খুব ভাল লাগতো, শরীরটাও অনেক ভাল বোধ করতেন। সঙেগ থাকতো এক নাতি। আর বছরে একবার করে 'ব্রাঞ্চ ইনসেপেকশনে' বেরোতেন তিনি—ছেলেদের সঙেগ বেশ কিছুদিন সময় কাটিয়ে যেতেন। পুত্রবধূদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে তাঁর বিশেষ নজর ছিল—বলতেন, স্বাধীনভাবে চলবি-ফিরবি, যা প্রাণ চায় তাই করবি, ভয় কী?

বোম্বাই-এর লছমী এস্টেটের বাড়িতে বসে কতদিন বহুক্ষণ ধরে নানা ধরনের আলাপ-আলোচনায় মশগুল থেকেছি আমরা। এমনও হয়েছে, বেশি রাত্রি হওয়ার জন্যে আর ফিরতে পারিনি। ওইখানেই থেকে গিয়েছি। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলেন, "আমার লেখার বিরুদ্ধে কী কী মত চালু আছে বলতো। তোমরা কলকাতার লোক, কানে নিশ্চয় অনেক কথা আসে।"

বললুম, "আপনার বিরুদ্ধে যারা রটনা করতে চায়, তারা বলে বেড়ায়—হ্যাঁ মিষ্টি হাত, সুখপাঠ্য লেখা, কিন্তু জীবনযন্ত্রণা বা জীবনচিন্তার উপকরণ তেমন নেই।"

শরদিন্দু হেসে ফেললেন। বললেন "কথাটা ভাববার, কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে আমার নিজস্ব একটা মতামত গড়ে ফেলেছি। সাহিত্যে সব সময়েই যে দাঁতের গোড়া ফোলার মত জীবন-যন্ত্রণা রাখতে হবে এমন কোনো কথা নেই। দ্বিতীয়ত, ওকালতি পেশাটা মুঙেগরেই ফেলে রেখে এসেছি—সাহিত্যের মাধ্যমে কোনো বিশেষ ভাবনাচিন্তার জন্যে ওকালতি করতে ইচ্ছে করে না। যদি কিছু বলবার থাকে, তা আকারে-ইঙিগত বলতে পারলেই আমি খুশি। নিজের 'কমিটমেন্ট' বোঝাবার জন্যে সব সময়েই সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করার প্রয়োজন হয় না। যেমন ধরো, প্রেম। কেউ যখন কাউকে হৃদয় দিয়ে ফেলে, নিঃশব্দেই তা দেয়, তার জন্যে মিটিং ডাকে না।"

আমি বললাম, "আমার কথা তো আপনি বিশ্বাস করেন না। বাংলা সাহিত্যের অন্য ধারাগুলোতে তবু আপনার সহযাত্রী আছে কিন্তু যেখানে আপনি অদ্বিতীয় তা হল সরস গল্প। আপনার সরস গল্পের সংকলন 'হসন্তী'

কেমন করে আউট অফ প্রিন্ট রেখেছেন জানি না।" শরদিন্দু বলেছিলেন, "বইটা আবার ছাপছে, তোমার যখন এতই আগ্রহ একটা ভূমিকা লিখো।"

ভূমিকা লেখার প্রিভিলেজ বড়রাই ছোটদের ক্ষেত্রে নিয়ে থাকেন। কিন্তু পরমস্নেহে শরদিন্দু আমাকেই সে সুযোগ দিলেন। বললাম, "ভূমিকাটা লিখে আপনার অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেবো।" উনি বললেন, "সোজা প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দেবে। আমি একেবারে ছাপার অক্ষরে পড়বো।"

রক্তের উচ্চচাপে ওষুধের সঙেগ এক কপি হসন্তীর প্রেসক্রিপশন দিতেন এমন এক ডাক্তারের কাহিনী বর্ণনা করে লিখেছিলাম, একগলা গঙগাজলে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, হসন্তীর জাত আলাদা। হসন্তী ব্যঙ্গ গল্প নয়, নিষ্পাপ হাসির গল্প বলতেও যা বোঝায় ঠিক তা নয়—'হসন্তী' আদি-অকৃত্রিম সরস গল্প, যে-গল্প নিরস পাথরের হৃদয়েও রসসঞ্চার করতে পারে। আরও লিখেছিলাম, যে সামান্য কয়েকখানি বাংলা বই আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং অপার আনন্দ দিয়েছে 'হসন্তী' তাদের অন্যতম। গত তিরিশ বছরের বাংলা সাহিত্যের ফসলের যদি কোনো প্রদর্শনী হয়, তাহলে সেখান 'হসন্তীর' জন্যে একটি বিশেষ স্থান অবশ্যই নির্ধারিত থাকবে।' বাঙালি পাঠকদের কাছে আজও সনির্বন্ধ অনুরোধ, এই বইটি পড়ে দেখুন।

হসন্তীর ভূমিকা প্রকাশের পর অনেকদিন ওঁর সঙেগ দেখা হয়নি। শেষের দিকে আমার পুনায় যাওয়ার সুযোগ কমে গেল, আর ওঁর ছোটছেলেও কলকাতা থেকে বোম্বাই বদলি হয়ে গেলেন। তারপর যা দু'-একবার কলকাতায় এসেছেন উঠেছেন ওঁর স্নেহভাজন দুর্গাপ্রসন্ন চক্রবর্তীর বাড়িতে।

শেষ কয়েকবারের দেখার কয়েকটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। একবার ওকে একটা ধুতি কিনে দিয়েছিলাম।

ধুতিটা কিনে ওঁর হাতে দিতেই তিনি বললেন, "দাঁড়াও, এখনই পরে ফেলা যাক।" ভিতরে গিয়ে ধুতিটা পরে এসে বসলেন। আমাকে খুশি করবার জন্যে বললেন, "নাঃ, জিনিসটা আমাকে ভালই মানিয়েছে, কী বলো ?"

কলকাতা থেকে পুনায় ফিরে যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে। বোধ হয় যা আসন্ন তা বুঝতে পেরেছিলেন। হঠাৎ আমাকে হাওড়ার বাড়িতে চিঠি পাঠালেন, "আমার যাবার দিন নির্ধারিত। তুমি অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

চিঠি পেয়েই ছুটলাম কলকাতার বাড়িতে। দেখলাম, বসে বসে একটা বই পড়ছেন। শরীরটা একটু ক্লান্ত এবং অবসন্ন মনে হচ্ছে। সেদিন কেউ কাছাকাছি ছিল না। জিজ্ঞেস করলেন, "কবে বোম্বাই যাবে?"

বললাম, "জানি না। কবে আবার কাজ পড়বে, তবে তো।"

শরদিন্দু বললেন, "বাবা, তোমাকে দু'-একটা কথা বলার ইচ্ছে হলো। যখনই লিখবে অন্তর থেকে লিখবে, ঠোঁট থেকে নয়। মনে রাখবে, সাহিত্যে অতি চালাক হওয়া থেকে একটু বোকা হওয়া ভাল।" এবার থামলেন শরদিন্দু। তারপর বললেন, "দাঁড়াও একটু।"

বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন তিনি। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন, তাঁর হাতে একটা ফাউন্টেন পেন। আমার কাঁধ দিয়ে বললেন, "এই পেনটা আমার বহুদিনের সঙ্গী। বহু লেখা লিখেছি এই কলমে। এখন এই দেহটা আর কলমটা দুটোই মাঝে মাঝে অবাধ্য হয়ে উঠছে, যন্ত্রণা দিচ্ছে। তুমি তো জানো, আমার ছেলেরা কেউ লেখে না। তাই ঠিক করলাম, এটা তোমাকেই দিয়ে যাই। যত্ন করে রেখে দিও, আর মাঝে মাঝে অন্তত এইটাতে দু'-একটা গল্প-টল্প লিখো।"

আমি কিছু বোঝবার আগেই বৃদ্ধ শরদিন্দু আমাকে পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরলেন। কথা বলবার মত ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। আমি বিস্ময়ে আনন্দে বেদনায় অভিভূত হয়ে ওঁকে প্রণাম করে সেদিন বিদায় নিয়েছিলাম। মনে মনে প্রণাম জানিয়েছিলাম ভাগ্যের দেবতাকে।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০। সেই কলমটা আজও বয়ে বেড়াচ্ছি। কলমটা ধরে লিখতে লিখতে এই মুহূর্তে সৃষ্টির বহু যন্ত্রণার নীরব সাক্ষী কলমটা আমার হাতের মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নেই। তাঁর সোনার ধানকে পিছনে ফেলে রেখে ছোট্ট খেয়াতরী তাঁকে নিয়েই মরণসাগরের ওপারে পাড়ি দিয়েছে।

আমার বাবা ও শরদিন্দু

জুতোর দোকানে

ষাট বছরের এই জীবনে ঘটনা কম ঘটলো না। পরিচয় হলো কতজনের সঙ্গে কিন্তু এখনও পুজোর সময়ে বাবা ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কারও কথা আমি ভাবতে পারি না।

এঁদের দুজনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক। এঁদের পারস্পরিক পরিচয় অথবা যোগাযোগও ছিল না, তবু আমার পুজোর স্মৃতিতে এঁরা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়েছেন সামান্য একজোড়া জুতোকে কেন্দ্র করে।

বাবা ছিলেন রাসভারী গম্ভীর মানুষ— ছেলেদের সঙ্গে তাঁর অদৃশ্য দূরত্ব থেকে যেতো, কাছে আসবার চেষ্টা করেও আমি সফল হতাম না। তাই অপেক্ষা করতাম দুর্গা পুজোর জন্যে। মহলয়ার দিনে সকালে হাওড়ায় পিতৃতর্পণ শেষ করে, বিকেলে সপরিবারে বাবা বেরোতেন আমাদের জন্যে জুতো কিনতে।

পুজো মানে কেবল জুতো নয়। কিন্তু আমাদের জামা-প্যান্টের ব্যাপারটা তার আগেই হাওড়ার রেডিমেড দোকান থেকে মিটে যেতো। তখনও ছোটদের ছোট্ট জগতে ফিতে-গলায় দর্জিদের অনুপ্রবেশ ঘটেনি ; আমাদের নিম্নমধ্যবিত্ত মফস্বল জগতে মেড-ইন-বম্বে ঝকমকে সেলাফোনমোড়া রেডিমেড জামাকাপড়ের আবির্ভাবও হয়নি ; আমরা তখনও নির্লজ্জভাবে হাওড়া হাট ও আগরপাড়ার কুটিরশিল্পের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

জুতোর ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা। এই একটি ব্যাপারে বাবা ব্যক্তিগত আগ্রহ প্রকাশ করতেন এবং চৌধুরী বাগান থেকে আমাদের নিয়ে চলে আসতেন কলকাতার কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে। ওখানে একটি বিশেষ দোকানের প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল। প্রতি বছর একই দোকানে পুজোর জুতো কিনতে

একঘেয়ে লাগতো আমাদের। কিন্তু বাবা বলতেন তাঁর ছোটবেলায় গ্রামের জমিদারবাবুর ছেলেদের পুজোর জুতো যেতো এই দোকান থেকে। পিতৃহীন গ্রাম্য কিশোরের যে ইচ্ছাপূরণ হয়নি তাই সার্থক হতো আমাদের জুতো অভিযানের মাধ্যমে।

জুতো কেনার সময়ে দোকানে বসে বাবা আমাদের সঙ্গে অনেক কথা বলতেন। জুতো পছন্দের ব্যাপারেও আমাদের সাহায্য করতেন।

অনেকগুলি ভাইবোন আমরা। প্রথমে কেনা হতো মেয়েদের জুতো। তারপর শুরু হতো আমার সর্বকনিষ্ঠ ভায়ের জুতো নির্বাচন। ওপরের দিকে উঠতে উঠতে যখন আমার সময় আসতো তখন বাবা মাঝে-মাঝে সেলসম্যানকে জিজ্ঞেস করতেন, "তাহলে এখন পর্যন্ত মোট কত টাকা হলো ?"

এই উদ্বেগের কারণ তখন বুঝতে পারিনি। মফস্বল আদালতের সাধারণ আয়ের উকিল, অনেকগুলি সন্তানের পিতা, পুজোর বিরাট আর্থিক দায়। তার ওপর সামনেই মাসাধিক কাল আদালতের রুজিরোজগার বন্ধ। কোর্ট খুলবে সেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরের দিন, তার আগে উকিলকে কলসির জল গড়িয়ে গড়িয়ে খেতে হবে। যখন সামাজিক খরচ সব চেয়ে বেশি তখন এদেশের আদালতের আইনজীবীদের উপার্জন সব চেয়ে কম।

কলেজ স্ট্রিটের জুতোর দোকানের বিরাট আয়নায় প্রতিফলিত বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হতো বাবা যেন জুতোর দিকে না তাকিয়ে জুতোর পিছনে ছাপানো দামের দিকে বেশি নজর দিচ্ছেন। স্পষ্ট কিছু না বলেও, বাবা চাইছেন আমি যেন একটা কম দামের জুতো পছন্দ করি।

বাবার মুখের এই অবস্থা দেখে দু-এক বছর আমি সব চেয়ে সস্তার জুতোই পছন্দ করেছি। যদিও আয়-ব্যয়ের গভীর রহস্য সুষ্ঠুভাবে বোঝবার মতো বয়স তখনও আমার হয়নি।

বাড়িতে ফিরে এসে দিদি এবং অন্য ভাইরা বলছে, আমি সব চেয়ে খারাপ জুতো পছন্দ করেছি। আমার কোনো রুচি নেই। বার বার এইভাবে হেরে গিয়ে আমিও আমিও হন্যে হয়ে উঠেছি। আমি কাউকে বলতে পারিনি যে আমার মনে হয়েছে এই কমদামের খারাপ জুতোটা পছন্দ করলেই বাবা খুশি হবেন।

সেবারও বাবা আমাদের নিয়ে মহালয়ার দিনে কলেজ স্ট্রিটে এসেছেন। দ্বারিকের বিখ্যাত দোকানে লুচি, ছোলার ডাল ও বোঁদে খেয়ে আমরা আবার জুতোর দোকানে হাজির হয়েছি। এবার কিন্তু আমি আর ঠকতে রাজি

নই। কিন্তু সে বছর বাবার আর্থিক অবস্থা বোধ হয় অন্যবারের চেয়েও খারাপ, কারণ আমার পরের ভাইয়ের জুতো আসবার আগে থেকেই কয়েক মিনিট অন্তর মোট খরচের হিসেব নিতে শুরু করেছেন।

কয়েকটা জুতোর প্রাইস-ট্যাগ খতিয়ে দেখে বাবা শেষ পর্যন্ত একটা কম দামের জুতো আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ চেয়ে বসলাম সব চেয়ে দামি জুতোটা।

কমদামি জুতোটা কয়েকবার দেখে বাবা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, "কেন, এই জুতো বেশ তো।"

বাবার ওপর খুব অভিমান হচ্ছিল আমার। আমি তো কখনও কোনো দামি জিনিস চাইনি। তবু এবার বাবা কেন উৎসাহ দেখাচ্ছেন না।

আমার নীরবতার সুযোগ নিয়ে বাবা কমদামি জুতোটাই প্যাক করবার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। কিন্তু এবার প্রকাশ্যে বিদ্রোহ।

আমি বললাম, "দামি জুতোটা আমাকে নিতে দাও। বড় হয়ে আমি তোমাকে খুব ভাল জুতো কিনে দেবো।"

বাবা বোধ হয় জোর করে কমদামি জুতোটাই কিনতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমার শেষ কথাটা শুনে আর কোনো আপত্তি করলেন না। আর্থিক অসুবিধে হয়েছিল নিশ্চয়, কারণ নিজের ধুতি কিনলেন না। কিন্তু সেদিন আমার কথা শুনে বাবার মুখে অদ্ভুত এক উদাসী হাসি ফুটে উঠেছিল।

বাবার সঙ্গে সেই শেষ পুজোর জুতো কেনা। তার কিছুদিন পরেই তাঁর অকালমৃত্যু আমার জীবনে বিপর্যয় এনেছিল।

তারপর অনেক দুঃখকষ্টের পর দুর্যোগের মেঘ কেটে গিয়েছে, কিন্তু বাবার সেই রহস্যময় হাসিটি ভুলতে পারিনি।

ইতিমধ্যে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেছি। সেবার মহালয়ার আগের দিনে স্বপ্ন দেখলাম, বাবা এখনও আমাদের ছেড়ে চলে যাননি। তাঁকে নিয়ে আমি আবার জুতোর দোকানে এসেছি। বাবাকে শোরুমে বসিয়ে দোকানদারকে বলছি, সব চেয়ে দামি নিউকাট জুতো বার করুন। বাবা যেন আমার কথা শুনে আবার সেই অবিস্মরণীয় উদাসী হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন। এবং তারপরই আমার ঘুম ভেঙে গেলো।

সেদিন আমার মন খুব খারাপ। সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তখন পুনার বাড়ি ছেড়ে কয়েকদিনের জন্যে কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন।

সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করে যে কয়েকজন মানুষের স্নেহ আমার বিশুষ্ক জীবনকে সজীব করেছে শরদিন্দু তাঁদের অন্যতম। এই বিরাট-হৃদয় মানুষটির প্রসন্ন স্মৃতি আজও আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ।

কলকাতার শারদোৎসব. সম্বন্ধে আজন্ম বাংলার বাইরে প্রতিপালিত শরদিন্দুর তেমন কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। পুজোসংখ্যার উপন্যাস প্রকাশিত হবার সময়ে তিনি কখনও "পাঠকদের এই গোলাঘরে" সশরীরে উপস্থিত থাকেননি। এ বিষয়ে তাঁর পুনার বাড়িতে বেশ কয়েকবার হাসিঠাট্টা ও গল্প হয়েছে।

কলকাতার বাড়িতে বসে শরদিন্দু আমাকে বলেছিলেন, "বর্ধমানের ওপারে কোনো অজ পাড়াগাঁয়ে একখানা ঘর ভাড়া করো, ওখানে দুজনে পালাই। পুজোর উপন্যাস সম্বন্ধে ফেভারেব্‌ল রিপোর্ট পাওয়া গেলে ফিরবো, না হলে ওখান থেকে বোম্বাই পালানো যাবে ভায়া এলাহাবাদ।"

আমি তখনও বাবার স্বপ্নটা ভুলতে পারছি না। উপহার কিনে দেবার মতো অর্থ হয়েছে আমার, অথচ যাঁকে কিনে দিতে চাই তিনি নেই।

ভেবেছি, তিনি তো অনেক অনেক দিন আগে চলে গিয়েছেন, কিন্তু তবু এইভাবে আবার কেন স্বপ্নে ফিরে এলেন ?

অবশেষে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। যাঁকে খুব ভালবাসি পিতৃস্থানীয় এমন কাউকে এক জোড়া জুতো কিনে দিয়ে এই মহালয়ার দিনে নিজেকে হাল্কা করবো। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই হাওড়া থেকে সন্ধেবেলায় সোজা কলকাতায় এসেছি শরদিন্দু সকাশে।

আমার প্রস্তাব শুনেই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন পিতৃপ্রতিম শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

"ওগো শুনছো" গৃহিণীকে ডাক দিলেন শরদিন্দু। "এবছর শংকর আমাকে 'জুতোবে' ঠিক করেছে।"

আমি করুণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। "আমি জানি, এটা বেয়াড়া এক প্রস্তাব। নমস্য গুরুজনদের লোকে জুতো দেয় না ; কিন্তু দয়া করে আমাকে এই সুযোগ দিন। আমার খুব প্রয়োজন আপনাকে জুতো দেওয়া।"

শরদিন্দু মুখের হাসি চেপে রেখে বললেন, "আমাকে জুতো দিয়ে সন্তুষ্ট করা খুব কঠিন কাজ, শংকর।"

আমার পকেটে তখন শতাধিক টাকা। সুতরাং শরদিন্দু যত টাকার জুতোই পছন্দ করুন না কেন আমার কিছু এসে যায় না। বললুম, "আপনি

যত দামি জুতো পছন্দ করবেন আমার তত বেশি আনন্দ হবে।"

শরদিন্দুর মুখে তখনও অবিশ্বাসের হাসি। তিনি যেন বলছেন, "যা পারবে না তা নিয়ে অযথা আস্ফালন কেন?"

আমি তবুও নাছোড়বান্দা। বালিগঞ্জে এতো দোকান আছে, পকেটে অনেক টাকা আছে, আমার চিন্তা কী?

অবশেষে শরদিন্দু, বললেন, "ঠিক আছে, তুমি যখন চাইছো, তখন চলো। তবে আগেই তোমাকে ওয়ারনিং দিয়েছি। ইচ্ছাপূরণ না হলে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।"

শরদিন্দুগৃহিণীও সামনে উপস্থিত ছিলেন। দেখলাম, তিনিও মুখ টিপে হাসছেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

কেয়াতলার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথমে বিরাট বাটার দোকানে এলাম। ওখানে পুজোর ভিড় বেশ জমেছে। গম্ভীরভাবে আমি সেলসম্যানকে বললাম, "সবচেয়ে দামি যে জুতো আছে।"

"পা বার করুন।" জুতোর মধ্যে থেকে শ্রীচরণ মুক্ত করে শরদিন্দু টুলের ওপর তুলে দিলেন এবং সেই আকার দেখে সেলসম্যান আঁতকে উঠলেন। এই সাইজের জুতো তাঁদের দোকানে নেই।

মেজাজ খারাপ করে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু শরদিন্দু তখন হাসছেন। হতোদ্যোম না হয়ে আরও কয়েকটা জুতোর দোকানে গেলাম— কিন্তু পায়ের সাইজ দেখে তাঁরা সঙ্গে-সঙ্গে বিদায় দিলেন।

আমারও গোঁ চেপে গিয়েছে। ট্যাক্সি চড়ে কলেজ স্ট্রিটে চলে এলাম। সেই চেনা জুতোর দোকানের বেঞ্চিতে শরদিন্দুকে বসিয়ে আয়নায় তাঁর মুখ দেখলাম যেন করে অনেক বছর আগে বাবাকে দেখেছিলাম। কিন্তু জুতো পাওয়া গেলো না।

রাস্তায় বেরিয়ে শরদিন্দু বললেন, "আমাকে দোষ দিতে পারবে না। আমি তোমাকে ওয়ারনিং দিয়েছিলাম। কিন্তু পাছে তুমি ভুল বোঝো তাই চলে এসেছি। এই কুলো পায়ের জুতো রেডিমেড পাওয়া যায় না।"

রাস্তায় বেরিয়ে কী করবো ভাবছি। শরদিন্দু বললেন, "বাবা শংকর, তোমাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। তুমি বরং আমাকে একটা ছাতা অথবা ধুতি কিনে দাও।"

অগত্যা ধুতি কিনতে হলো। কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না। কোথায় বাবার জন্য পুজোর জুতো আর কোথায় ধুতি।

ট্যাক্সিতে চড়ে দক্ষিণ কলকাতায় ফেরার পথে শরদিন্দুকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি জুতো কেনেন কোথা থেকে?"

শরদিন্দু বললেন, "পুনার এক মুচিকে অর্ডার দিই—সেই তৈরি করে দেয়। ওর কাছে আমার পায়ের সাইজের কাঠের 'লাশ' আছে।"

মনে মনে ভেবেছিলাম, পরের বার যখন পুনায় যাবো তখন আচমকা ওই মুচির দোকানে শরদিন্দুকে নিয়ে গিয়ে আমার অভিলাষ পূর্ণ করবো। কিন্তু অভাগা আমি সেই ইচ্ছা পূরণ করবার সুযোগ পাইনি।

আজও পুজোর সময় এগিয়ে এলেই বাবা ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমার মনে পড়ে যায়।

কোন্ ছোটবেলার পুজোর জুতো কিনতে গিয়ে কী এক অন্যায় করে বসেছিলাম, এতোদিনের এতো চেষ্টাতেও তার অপনোদন হলো না। বাবা এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি পুজোর সময় এখনও আমাকে শাস্তি দিয়ে চলেছেন।

তুলনাহীন মুজতবা আলী

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪। এখন রাত এগারোটা। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে—কেবল আমার চোখে ঘুম নেই। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র হাতে নানা বল্গাহীন চিন্তা গভীর রাতের অন্ধকারে নিঃসঙ্গ আমাকে তাড়া করেছে। কে আমাকে আশ্রয় দেবে? ভরসা দেবে? বল দেবে?

চিরকাল কিন্তু আমি এমন অনাথ ছিলাম না—একদিন আমার সাহিত্যজীবনে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো অভিভাবক ছিলেন। আমাকে ফাঁকি দিয়ে কয়েক বছর আগে শরদিন্দু মরণসাগরের ওপারে পাড়ি দিয়েছেন। এবার আলী সায়েবও বিদায় নিলেন।

বাদামী রঙের ছোট্ট রেডিওটা অ্যানিমিয়াগ্রস্ত রোগীর মত আমার দিকে নিষ্প্রভভাবে তাকিয়ে আছে। ওই রেডিও থেকেই রাত দশটায় শুনেছি প্রখ্যাত ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়

কিছুক্ষণ আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। রেডিওর মাধ্যমে ইথারবাহিত আমার হৃদয় মুহূর্তে ঢাকা পৌঁছবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠছে। আমি মানসনেত্রে অন্তিম শয়ানের দৃশ্য প্রায় স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি—মহীর কোলে মহানিদ্রাবৃত বঙ্গকুলোদ্ভব আর এক কবি মুজতবা আলী।

আলী সায়েবের সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। তিনি নিজেই আমার কানে কানে বলছেন "জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম।" শেষ যেবার কলকাতায় দেখা হয়েছিল সেবার তিনিই গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "আড্ডা মেরে সময় অপচয় না করে, ব্রাদার, মাইকেল মধুসূদনটা ভাল করে পড়ে ফেলো—আখেরে ফল দেবে।"

খুব ছোটবেলায় আমার জন্মভূমি বনগ্রামে দূর থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছিলাম। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার পর প্রথম যে সাহিত্যিককে জলজ্যান্ত দেখি তাঁর নাম সৈয়দ মুজতবা আলী। তখন আমার বয়স উনিশ, সাহিত্যপাঠে লোভ থাকলেও বইলেখা শুরু করিনি। সেই সময় কর্মসূত্রে জীবনে প্রথম দিল্লি যাবার সুযোগ হয়েছিল। থার্ড ক্লাস কামরায় অসংরক্ষিত সিটে সারারাত জেগে থাকবার জন্যে সঙ্গে নিয়েছিলাম একখানি বই—নাম 'দেশে বিদেশে'। রিজার্ভ না-করা কামরায় সমস্ত রাত ধরে যাত্রীদের ধস্তাধস্তি চলতে লাগলো—বসবার জায়গা পর্যন্ত পাইনি। বাথরুমের পাশে একটা কালো ট্রাংকের ওপরে কোনোরকমে একটু জায়গা করে নিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলীর বই খুলে বসেছিলাম। তারপর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। সমস্ত রাতটা হঠাৎ কেমনভাবে কেটে গেলো তা খেয়ালই হয়নি। দেশে বিদেশের মত বই জীবনে বেশি পড়িনি।

দিল্লিতে পৌঁছে দু'দিন থাকবার কথা। অফিসের কাজকর্ম সেরে ঐতিহাসিক দিল্লি শহর দেখবার তোড়জোড় করছি, এমন এময় একজন বাঙালি সহকর্মীর কাছে খবর পেলাম সৈয়দ মজুতবা আলী নাকি দিল্লিতেই থাকেন। আমি হাতে চাঁদ পেলাম। কোনো বই পড়ে তার স্রষ্টাকে এমনভাবে দেখবার আগ্রহ জীবনে হয়নি। খোঁজখবর নিয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে মুজতবা আলীর অফিসে ফোন করলাম। আমার কোনো বিশিষ্ট পরিচয় নেই, অখ্যাত অফিসের নিম্নতম কর্মচারী, সাধারণ বি এ পাস করার সুযোগও পাইনি। ভয় হলো, এই দিকপাল সাহিত্যিক হয়তো আমাকে কোনোরকম পাত্তা দেবেন না। কিন্তু কী আশ্চর্য! সৈয়দ মুজতবা আলী শুধু অন্তরঙ্গগতার সঙ্গে কথা বললেন না, কনস্টিটিউশন হাউসে তাঁর ঘরে আসবার আমন্ত্রণ

জানালেন।

দিল্লি দর্শন আমার মাথায় উঠলো, ছুটলাম মুজতবা আলীকে দেখতে। পরবর্তীকালে আমার এক সাহিত্যিক অগ্রজ আমার এই হিরো ওয়ারশিপকে নিন্দা করেছিলেন—কিন্তু মুজতবা আলী সত্যিই আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম হিরো। তাঁকে পুজো না-করে উপায় কী?

কনস্টিটিউশন হাউসে ওঁর থাকার ঘরে ঢুকে প্রায় দু'মিনিট অবাক হয়ে মুজতবা আলীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাপর বললাম, "আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করবো না—দেশে বিদেশের লেখককে দেখেই চলে যাবো।"

বেশ মনে আছে, আলী সায়েব বললেন, "ছবি 'দেখতে' হয়, গান 'শুনতে' হয়, সন্দেশ 'খেতে' হয়, আঙুল 'চুষতে' হয়, এবং বই 'পড়তে' হয়। বুঝলে ব্রাদার, সাহিত্যিক 'দেখবার' জিনিস নয়। বই পড়া ছাড়া সাহিত্যিকের সঙ্গে আর যা করা যায় তা হলো গপ্পো। আজকে আমরা দু'জনে গপ্পো কোরবো।"

তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হলো, যেন কতদিনের চেনা। আমার পদমর্যাদা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামালেন না মুজতবা আলী—একেবারে সমপর্যায়ের বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। সেদিন প্রায় একঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল এবং বৈঠকী গল্পের রাজাধিরাজ মুজতবা আলীকে আবিষ্কার করে ধন্য হয়েছিলাম।

আড্ডা আরও চলতো, কিন্তু হঠাৎ টেলিফোন এলো। টেলিফোনে কথা শেষ করে মুজতবা আলী বললেন, "এখনই একবার বেরুতে হবে।' তিনি তখন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ কালচারাল অ্যাফেয়ারসে কাজ করেন—ভারতবর্ষে বিদেশী ছাত্রদের সঙ্গে ওঁকে যোগাযাগ রাখতে হয়। দিল্লির পরিবেশে একটি আফ্রিকান ছাত্র হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে বিপদ বাধিয়েছে।

পরের দিন আবার দেখা করতে বলে আলী সায়েব দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় বললেন, "পাগল হওয়া ছাড়া এইসব সরল গ্রাম্য ছেলের আর কী পথ আছে? পথে ঘাটে পার্টিতে যেখানে যাচ্ছে সেখানেই সুসজ্জিতা লাস্যময়ী চোদ্দআনা বুকখোলা সুন্দরীদের দেখতে পাচ্ছে। চোখেমুখে তাঁদের কতরকম খেলা, দেহের কতরকম নাচনকোঁদন—অথচ কালো নিগ্রো দেখলেই যুবতীরা ভয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেবে। আফ্রিকানরা সহজ সমাজের লোক, আধুনিকতার এই মারপ্যাঁচ তেমন বোঝে না। অঙ্গছন্দ দিয়ে

আকর্ষণ করবে অথচ কাছে গেলে দূরে সরিয়ে দেবে, এই জটিল রাসলীলার অর্থ তারা বোঝে না। মনের প্রবৃত্তি চেপে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বেচারা আফ্রিকান ছাত্র পাগল হয়ে যাবে তাতে আশ্চর্য কী?"

পরের দিন সামান্য যে সময়টুকু নিজের হাতে ছিল তা কনস্টিটিউশন হাউসেই খরচ করেছিলাম। মনে পড়লো, হাওড়ার প্যাটারসনদা বলে দিয়েছিলেন, কুতব মিনার, লালকেল্লা এবং জুম্মা মসজিদ অবশ্যই দেখে আসতে। ফিরে আসতেই প্যাটারসনদা সব খবরাখবর জানতে চাইলেন এবং আমি সগর্বে বললুম, কুতব মিনারের বদলে এবারে খোদ মুজতবা আলীকেই দেখে এসেছি।

শেষের দিনে আলী সায়েবকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। বলেছিলেন, "কত লোকের সঙেগ আলাপ হয়, এইটাই তো লেখক-জীবনের বড় লাভ—এত মানুষ কেন যে আমাদের ভালবাসে তা বুঝতে পারি না।"

এরপর যখন আলী সায়েবের সঙেগ দেখা হলো তখন ঘটনাচক্রে আমিও সাহিত্য আসরে প্রবেশপত্র পেয়েছি। আমার 'কত অজানারে' কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছে। আলী সায়েব নিজেই প্রকাশকের ঠিকানায় একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন আমাকে আশীর্বাদ জানিয়ে। আমার সঙেগ ওঁর যে কখনও দেখা হয়েছিল তা তাঁর মনে নেই।

কিছুদিন পরে ওঁর নির্দেশমতো হাজরা রোডের কাছে এক বাড়িতে একদিন ভোরবেলায় দেখা করতে গেলাম। মনে আছে দিনটা কালীপুজোর। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন—বললেন, "একেবারে কচিকাঁচা যে! এই বয়সে এত অভিজ্ঞতা হলো কী করে ভায়া?" বললাম, "জীবনের দেবতা সেই ছোটবেলা থেকেই আমাকে নানা পরীক্ষায় নামিয়েছেন—বেশ কিছুদিন অভাবে-অনটনে অবহেলায়-অপমানে পথে পথে ঘুরেছি। তাই বোধ হয় অকালেই মনটা বুড়ো হয়ে পড়েছে।"

আলী সায়েবের হাতে সুরাপত্র ছিল। হাসতে হাসতে বললেন, "ওসব দুঃখ-শোক অপমানে গুলি মারো। মায়ের নাম করে আমার সঙেগ একপাত্র চড়াও—সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আমি মদ খাই না শুনে বললেন, "হিটলার ও নলিনী সরকারও মদ খেতেন না। মদ না খেলেই ভাল মানুষ হয় এমন যেন ভেবে বোসো না, ভায়া।"

বললাম, "ওই সহজ সত্যটুকু বোঝবার মত কমনসেন্স মা কালী আমাকে দিয়েছেন।"

আলী সায়েব রসিকতা করলেন, "মায়ের নাম করেই তো আজ সূর্যোদয়ের আগে থেকেই কারণ চড়িয়ে যাচ্ছি। মা দেখা না-দিলে কারণ সাগরেই ডুবে মরবো। জানো কালীপুজোর মন্তর?"

মন্ত্র আমার জানা ছিল না। "কী রকম বাউনের ছেলে?" এই বলে হাসতে লাগলেন আলী সায়েব। তারপর উদাত্ত কণ্ঠে নিজেই আবৃত্তি শুরু করলেন—

'ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম।'

আলী সায়েবের ভাবগম্ভীর উচ্চারণ ও স্মরণশক্তির সেই প্রথম পরিচয় পেয়েছিলাম। তারপর কতবার যে তার উদাহরণ দেখেছি মনে নেই। সঞ্চয়িতার সমস্ত কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। স্নেহভাজন এক বন্ধুর মায়ের শ্রাদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। বললেন, "গীতাটা আমি পড়ে দিই।" তারপর একবারও বইয়ের দিকে না তাকিয়ে আদ্যন্ত গীতা আবৃত্তি করলেন।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে আলী সায়েবের এই স্মৃতিশক্তি কমে যাচ্ছিল। এক প্রসঙ্গ বলতে বলতে নিজের অজান্তে স্মৃতিভ্রংশবশত অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছিলেন। শেষ যেবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে আলী সায়েব বললেন, "শংকর, মনে হচ্ছে স্মৃতি লোপ পাচ্ছে। তুমি একবার সঞ্চয়িতাখানা ধরো তো—ব্যাপারটা একটু খুঁটিয়ে দেখি।" ওঁর ক্লান্ত মলিন মুখে হঠাৎ হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলে উঠলো। বললেন, "ওমুক পাতা খোলো তো।" খুললাম। "কর্ণকুন্তি সংবাদ ওই পাতায় রয়েছে তো?" জিজ্ঞেস করলেন আলী সায়েব। তারপর শুরু করলেন আবৃত্তি। কোথাও একবার থামলেন না, একটা ভুলও করলেন না।

হাজরা রোডের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি। আমার লেখার প্রশংসা করে বললেন, "এতাবৎ দুজন লেখককে আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অভিনন্দন পাঠিয়েছি, তার মধ্যে তুমি একজন। দেখো গেঁজে যেও না যেন, আমার মুখ যেন রক্ষে হয়।"

আমি বললাম, "আপনি আমার ঘাড়ে মস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা কোরবো।"

কত তরুণ লেখকই তো আলী সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

"রাগবো কেন? আমার কত বড় সৌভাগ্য আপনার মতো গুরু পেয়েছি।" আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি।

আলী সায়েব এবার গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, "আমরা যে যুগে মানুষ হয়েছিলাম, সে যুগে সাহিত্য ছিল ভদ্দরলোকদের নেশা—পরস্পরের লেখা সম্বন্ধে তখন মন খুলে প্রশংসা এবং সমালোচনা দু-ই করা যেতো। এখন যুগ পাল্টেছে। সাহিত্যের প্রধান অংশ এখন পাট, তেল, কয়লার মতো ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কারুর প্রশংসা করতে চায় না ; আর সমালোচনা করলে ভাবে আমার ব্যবসা নষ্ট করছে।"

একটু থেমে আলী সায়েব বললেন, "তোমার এখন নামটাম হয়েছে—যদি কখনও আমার সমালোচনা খারাপ লাগে বোলো, বন্ধ করে দেবো। একজন জাঁদরেল লেখক তাঁর নবেলে কয়েকটা কাঁচা ভুল লিখেছিলেন—সেই ভুল দেখিয়ে দেওয়ায় ভদ্রলোক আমাকে শত্রু ঠাউরেছেন। পথেঘাটে হাটেবাজারে মুজতবা আলীকে গালাগালি না-করে তিনি জলস্পর্শ করছেন না।"

আমি চুপচাপ বসেছিলাম। মুজতবা আলী বলে চললেন, "এই লেখক বলে বেড়াচ্ছেন, মুজতবা আলী নাকি লেখকই নন। ধাপ্পা মেরে কিছুদিন রম্যরচনার পচামাছে বাজার বোঝাই হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার সৎসাহিত্য ফিরে আসছে। ফলে রম্যরচনার এখন ঘোর দুর্দিন।"

আলী সায়েব ইতিমধ্যে আরও কিছুটা হুইস্কি পান করেছেন। গেলাসে আর এক চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের দেশে মদ্যপান নিরোধের প্রচেষ্টা কেন ব্যর্থ হলো বলো তো?"

আমি বললুম, "বোধ হয় এর পেছনে দেশের নেতাদের আন্তরিকতা ছিল না—কেবল গান্ধীজীর প্রতি লোকদেখানো ভদ্রতা করতে চেয়েছিলেন তাঁরা।"

"প্রহিবিশনের কচু বুঝেছো তুমি", আলী সায়েব বিরক্তভাবে মন্তব্য করলেন। "প্রহিবিশন সাকসেসফুল হতো যদি সরকার ঐ কাজটা পাঁড় মাতালদের ওপর ছেড়ে দিতেন। মদ্য ক্রয়বিক্রয়ের ঘাঁতঘোঁত মাতালদের মতো আর কারা জানবে? ব্যাপারটা একবার ডাক্তার বি সি রায় মশায়কে বলেছিলাম। তিনি অবশ্য হা-হা করে হেসে সমস্যাটাকে ধামাচাপা দিয়েছিলেন।"

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রসঙ্গ আর একবার চিঠিতে উত্থাপন করেছিলেন আলী সায়েব। এই চিঠিটা ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং আলী সায়েব আমাকে লিখিতভাবে অনুরোধ করেছিলেন, "আমার মৃত্যুর আগে এই চিঠির কোনো

অংশ প্রকাশ কোরো না।"

এখন থেকে দশ বছর আগে এই চিঠি লিখেছিলেন আলী সায়েব, আমার 'পাত্র-পাত্রী' বইটি প্রকাশিত হবার কয়েক মাস পরেই। প্রকাশকের অফিসে গিয়ে একদিন শুনলাম আলী সায়েব ভি পি ডাক মারফত পাত্রপাত্রী বইটি চেয়ে পাঠিয়েছেন। বলা বাহুল্য, আমি সঙেগ সঙেগ আমার সই করা একখানা বই তাঁকে ডাকযোগে উপহার পাঠাই। এই সুদীর্ঘ চিঠিটি তার পরের লেখা। পাত্রপাত্রী বইটি ব্যঙগ রচনা—এর বিষয়বস্তু সরকারি হুকুমে গল্প-উপন্যাস জাতীয়করণের পরবর্তী কাল্পনিক ঘটনা। এই কাহিনীর নায়ক সরকারি সাহিত্যের নবনিযুক্ত ডিরেকটর জেনারেল মেজর বিশ্বনাথ বরাট। এই গল্পটি যে কোনো কারণেই হোক আলী সায়েবকে মুগ্ধ করে এবং তিনি লেখেন, আমাদের যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমষ্টির অন্যায় আধিপত্য। এই সমষ্টি কখনও সরকার, কখনও রাজনৈতিক দল, কখনও ট্রেড ইউনিয়ন, কখনও জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, কখনও রাইটার্স ইউনিয়নের রূপ গ্রহণ করে বিভিন্ন দেশে ইনডিভিজুয়ালকে দাসত্ব-শৃঙখলে আবদ্ধ করেছে। আলী সায়েব ভেবেছিলেন, পাত্রপাত্রী বইতে ইনডিভিজুয়ালের এই ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। আলোচনা প্রসঙেগ আলী সায়েব লিখেছিলেন, স্বর্গত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে একবার মধ্যাহ্নভোজে ডেকে পাঠান এবং ভোজনের শেষে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে সরকারের ডিরেকটর অফ পাবলিসিটির পদটি গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। সহজবোধ্য কারণে আলী সায়েব সবিনয়ে এই পদ প্রত্যাখ্যান করেন। দীর্ঘ এই চিঠির শেষে আলী সায়েব লেখেন, এই বয়সে আর শত্রু বৃদ্ধি করবার সাহস ও সামর্থ্য নেই—সুতরাং আমার মৃত্যুর আগে এই চিঠির কথা কাউকে বোলো না।

শত্রু বৃদ্ধির এই ব্যাপারটা যে রসিকতা নয়, সমষ্টির বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি যে বারবার গভীর আঘাত পেয়েছেন, তা পরবর্তীকালে আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল না। অপ্রিয় হলেও এই প্রসঙেগর অবতারণা করা যুক্তিযুক্ত মনে করি এই কারণে যে অনাগতকালের সত্যনিষ্ঠ সাহিত্য গবেষকদের পক্ষে ঘটনাগুলি প্রয়োজনীয় হতে পারে।

ইদানীংকালের বাঙালি লেখকদের মধ্যে জনপ্রিয়তম হওয়া সত্ত্বেও, তিনি নানাভাবে অযৌক্তিক আঘাত লাভ করেছেন। তাঁর সাহিত্যে ধর্মীয় সংকীর্ণতার তিলমাত্র ছিল না একথা কে না জানে? কিন্তু তাঁর এই উদারতার জন্য

গোঁড়া স্বধর্মীয়রা তাঁকে কোনোদিন ক্ষমা করেননি। সেদিনকার পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে এমন কুৎসিত মন্তব্য করতে শুনেছি যে লজ্জায় কানে আঙুল লাগাতে হয়েছে। অথচ, তার পরিবর্তে এপার বাংলায় আমরাও বা কী দিতে পেরেছি তাঁকে? কোনো একজন প্রকাশক প্রায়ই গর্ব প্রকাশ করতেন যে ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙগার সময় 'দেশে বিদেশে' প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি নাকি দুর্দান্ত সাহস দেখিয়েছেন। 'দেশে বিদেশে' কোনো হিন্দুর লেখা হলে কিন্তু এই কথা উঠতো না।

পরবর্তীকালে কয়েকজন স্বার্থপর লোক, এর মধ্যে কয়েকজন লেখকও আছেন, বলে বেড়িয়েছেন, মুজতবা আলীর ধর্মনিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিভঙ্গি একটা 'eye wash', আসলে আলী একজন ধুরন্ধর পাকিস্তানি এজেন্ট। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় তো স্বার্থপর মহলে গুজব রটিয়ে দেওয়া হলো মুজতবা আলীকে গুপ্তচর হিসেবে নজরবন্দী করা হয়েছে। ব্যাপারটা যে ছোটখাট গুজব নয়, তার প্রমাণ একজন প্রভাবশালী মুসলমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কন্যা টেলিফোনে খবরের কাগজের অফিসে এক ভদ্রলোকের কাছে উদ্বিগ্নভাবে জানতে চান খবরটা সত্য কি না। এই টেলিফোন যখন আসে তখন আমি সেখানে সশরীরে উপস্থিত ছিলাম। এই সব নানা অপমান দুই বাংলাতেই আলী সাহেবকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। আবার বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময় অনেকে রটিয়েছে আলী সায়েব নাকি পাকিস্তানের সাপোর্টার।

ব্যাপারটা এতই বেদনাদায়ক যে এ বিষয়ে তাঁর সঙেগ কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেছি। কিন্তু তিনি নিজেই এক দুর্বল মুহূর্তে তাঁর দুঃখ আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, "এক একটা লোক থাকে যে সব জায়গায় ছন্দপতন ঘটায়—আমি বোধ হয় সেইরকম লোক।"

বাংলাদেশে পাকিস্তানি বর্বরতা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা কতখানি তিক্ত ছিল তার প্রমাণ একবার আমি পেয়েছিলাম। 'পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস'-এর ছাপানো লেটারহেডে ওঁর একটা চিঠি আমার কাছে সেবারে এল। চিঠির ছাপানো অংশটুকু পড়ে আমি সত্যিই একটু চিন্তিত হচ্ছিলাম। আলী সায়েব অবশ্য চিঠিতে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছেন। লিখেছেন, 'এই চিঠির কাগজগুলি পাকিস্তানি এক মেজরের কাছে ছিল। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে এই মেজর খুন হওয়ার পর, তার সম্পত্তি লুঠ হয় (এর জন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই)। আমার এক চাকর এই

লুঠতরাজে অংশ নেয়। আমি তার কাছ থেকে লেটারহেডগুলো ভাগ বসাই। এবং কোনোরকম মর্মবেদনা অনুভব না করে এগুলো আমি ব্যবহার করছি।'

এই চিঠি পাবার পরে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি ববললেন, "কী হে? তুমি মুষড়ে পড়লে কেন?"

আমি বললুম, "ওই মৃত পাকিস্তানি মেজরের কথা আমি ভুলতে পারছি না।"

হা-হা করে হেসে আলী সায়েব বললেন, "তোমরা বাউনরা বড় কোমলচিত্ত। প্রতিশোধ-টতিশোধ নেওয়া তোমাদের কম্ম নয়। কিন্তু আমরা অত নরম নই—রক্তের বদলে প্রয়োজন হলে রক্ত নেওয়ার ক্ষমতা আমি রাখি।"

এর পরের বিষয়টি ছিল অত্যন্ত অপ্রিয়—জনৈক প্রকাশকের অসাধুতা ও দুর্ব্যবহার। রাগে অন্ধ আলী সায়েব আবার বললেন, "এই সব দুর্জনকে শায়েস্তা করার ক্ষমতা বাউনদের না থাকলেও, আমার আছে। আমি প্রতিশোধে বিশ্বাস করি। আমি ভাবছি, আমার উইলে লিখে যাবো যে আমার মৃত্যুর পর আমার লেখার রোজগারের টাকায় একটা ট্রাস্ট তৈরি হবে। সেই ট্রাস্টের একমাত্র কাজ হবে অসাধু প্রকাশকদের বিরুদ্ধে তরুণ অসহায় লেখকদের পক্ষে মামলা করা।"

রাগ একটু কমবার পরে আলী সায়েব বললেন, "জানো, প্রকাশক অমুকের ছেলে কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।" এই প্রকাশকের সঙ্গেও আলী সায়েবের যে সদ্ভাব নেই তা আমার জানা। আলী সায়েব বললেন, "তোমায় কী বলবো, পুরনো গোলমাল মেটাবার মতলবে ছেলেটি নির্লজ্জভাবে বাপের নিন্দে আরম্ভ করলো। আমি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বললুম—দেখো আমি মাতাল, আমার মুখ খারাপ, আমার বহু দোষ আছে, কিন্তু আমি এখনও এত নিচে নামিনি যে কয়েক হাজার টাকার জন্যে ছেলের মুখে বাপের নিন্দে শুনে আনন্দ পাবো এবং তাকে আস্কারা দেবো। তুমি বাপু বাড়ি যাও, আমি বরং তোমার বাবার সঙ্গেই বোঝাপড়া করবো।"

এই ছিলেন আলী সায়েব। বলতেন, "মুখের কথার দাম আমার কাছে দলিলের সইয়ের থেকে কম নয়।" মুখের কথা রাখতে গিয়ে অনেক সময় তিনি ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছেন—কিন্তু তবু জবান খেলাপ করেননি।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আবার ফিরছি। বাংলাদেশের রাহুমুক্তির পরে ওপার

বাংলায় তিনি কখনও কখনও দু' দণ্ডের গৃহসুখ ও আশ্রয় পেয়েছেন। এই শান্তি ও সুখ শেষ বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্যে তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য ছিল। এবং তাঁকে তা পেতে দেখে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশেষ আনন্দিত হয়েছি।

বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর গভীর ভালবাসার প্রমাণ পেয়েছিলাম ঢাকা থেকে লেখা একখানা চিঠি থেকে। ঢাকার এক দৈনিক পত্রে বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমার একটি ছোট্ট প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। নাম 'তোমায় ভালবাসি'। এই প্রবন্ধটি পড়েই আলী সায়েবের পত্রাঘাত। (খামের পদবি 'মুখুজ্জে'—আলী সায়েবের মতে এই শব্দের উৎপত্তি 'মুখ্য আর্য' থেকে। তার থেকে আলী সাহেবীয় রসিকতা দ্বিজোত্তম।) আমার রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আলী সায়েব লিখেছেন: অখণ্ড ভারতের জাতীয় সংগীতে কবি সর্বশেষে গেয়েছেন: "রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়-গিরিভালে।" আপনার বক্তব্য "বাংলা সাহিত্যের নতুন সূর্য যে পূর্বের আকাশে উদিত হবেন এমন একটা প্রত্যাশা রয়েছে আমার।" পূর্ব দিকে সূর্য উদয় হন সে তো জানা কথা; কবি বলছেন এবং "পূর্ব উদয়গিরিতে", পূর্বাচলে, পূর্বদেশে।... "উদিল রবিচ্ছবি", সে-রবি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় রবিকাব্যে পূর্ববঙ্গের প্রসাদ প্রচুরতর। আপনার আশা, তাঁর পুনর্জন্ম পূর্বাঞ্চলেই হবে, সেটা যেন আপনি দেখে যেতে পারেন। শঙ্কর তাঁর স্বনামধারীকে শতায়ু সহস্রায়ু করুন!

আমার অশেষ আশীর্বাদ গ্রহণ করো।"

রবীন্দ্রনাথের পর আলী সায়েবের মত অকৃপণ পত্রলেখক আমাদের সাহিত্যে দেখা যায়নি। এই সব পত্রের সাহিত্যগুণ অসাধারণ। অবহেলায় নষ্ট হবার আগে এই সব পত্রাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। শুনেছি, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আলী সায়েব শেষ জীবনে প্রতিটি চিঠির নকল রাখতেন। খবরটা সত্য হলে বিশেষ আনন্দের কারণ।

পঞ্চাশের দশক থেকে প্রায় পঁচিশ বছর যে কয়েকজন বিরল সাহিত্য প্রতিভার সান্নিধ্য ও স্নেহ লাভ করে ধন্য হয়েছি আলী সায়েব নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, বাংলার সারস্বতকুঞ্জে মৃত্যু ব্যাধের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের এই সাহিত্যকুঞ্জেও মৃত্যুর ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। যাঁদের ভালবাসা পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছি, তাঁদের সংখ্যা ক্রমশই কমছে। সে তুলনায় সাহিত্যকুঞ্জে নতুন প্রতিভাধরদের আবির্ভাব নিতান্তই সীমিত।

আলী সায়েবের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ মাত্র কিছুকাল আগে কলকাতার পার্ল রোডের বাড়িতে হয়েছিল। তিনি আমাকে ব্যক্তিগত কারণে গোপনে দেখা করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছামতো একদিন সন্ধ্যায় ওঁর ঘরে হাজির হলাম। অনেক দিন পরে তাঁকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছে, মুখেচোখে প্রতিভার সেই দ্যুতিও নেই—আলী সায়েবকে বড় ক্লান্ত মনে হলো।

আলী সায়েব নিজের ছোট্ট ঘরে বিছানার ওপরে আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। সামনে সেই পরিচিত হুইস্কির বোতল। বললেন, "বোতল কিনিনি; একজন গুরুপ্রণামী দিয়ে গিয়েছে। ঢাকায় গেলে, বড্ড কড়া ডিসিপ্লিনে রাখে, বোতলের কাছে যেতে দেয় না। তাই এখানে শোধ তুলছি।"

আমি ওঁর রোগজর্জর মুখখানির দিকে তাকিয়ে রইলাম। আলী সায়েব বললেন, "কী দেখছো ?"

বললাম, "আপনাকে ?"

"তোমাকে অনেক দিন আগে না বলেছিলাম, লেখককে পড়তে হয় বইয়ের আয়নার।" একটু থামলেন আলী সায়েব। তারপর বললেন, "আমার মুখই যদি দেখবার ইচ্ছে, তা হলে এখানে আসতে এত দেরি করলে কেন ? যাবার ঘণ্টি তো বেজেছে—পোড়া মুখটায় আছে কী ?"

আলী সায়েব এবার বিছানা থেকে উঠে পড়ে হাতড়ে হাতড়ে একটা অনেকদিনের পুরনো ছবি বার করলেন। সে এক আশ্চর্য সুন্দর প্রতিভাদীপ্ত যুবকের ছবি। আলী সায়েব নিজেও ছবিটা দেখলেন। তারপর বললেন, "এর নাম সৈয়দ মুজতবা আলী—বুঝলে বাউন। যে-লোকটাকে চোখের সামনে দেখছো তার নাম মুজতবা আলী নয়। তোমরা যদি আমাকে মনে রাখতেই চাও তাহলে এই 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচাকে' মনে রেখো।"

এবার আলী সায়েব বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, "তুমি এখন কত বড় রাইটার—কত তোমার নামডাক ! তোমার অমূল্য সময় নষ্ট করলাম বলে রাগ করোনি তো ?"

আমার চোখে জল আসছিল। বললাম, "আমার সঙ্গে রসিকতা করবেন না। আপনাকে আমি কতখানি শ্রদ্ধা করি তা তো আপনি জানেন।"

হা-হা করে হাসলেন আলী সায়েব। "একদিন তুমি আমার শিষ্য ছিলে বটে—কিন্তু সে অনেকদিন আগেকার কথা। এখন মুজতবা আলী গলিতনখদন্ত—এখন লোকে তার লেখা দয়া করে পড়ে, তার মাথায় আর

আইডিয়া আসতে চায় না। যে একদিন ভল্যুমের পর ভল্যুম মুখস্ত রাখতে পারতো, সে এখন একটা সেনটেন্স শেষ করতে ঘেমে ওঠে। আর তোমার এখন কত নাম, তোমার লেখার কত সমাদর।"

জীবনে এমন অভিজ্ঞতা আমার বেশি হয়নি। আমি মাথা নিচু করে নীরবে বসে রইলাম। আলী সায়েব এবার গলা চড়িয়ে বললেন, "মাথা নিচু করে বসে থাকলেই ছাড়ছি না। তোমাকে বলতে হবে, আমার সম্বন্ধে তোমার আসল ধারণাটা কী?"

আমি বললাম, "সেটা তো কয়েকদিন আগে আপনাকে যে বই পাঠিয়েছি তার উৎসর্গপত্রে লিখে দিয়েছি।"

প্রায় অপ্রকৃতিস্থ আলী সায়েব বালিশের তলা থেকে আমার সাম্প্রতিক উপন্যাসের কপি বার করলেন। তারপর বললেন, "তুমি লিখেছো— যাঁর অঙ্গুলি হেলনে শত শংকরের সৃষ্টি হতে পারে সেই মুজতবা আলীকে। —এই জন্যই তো তোমাকে ডেকে—পাঠিয়েছি—জানতে চাই।"

উত্তর জানা নেই, তাই চুপ করে রইলাম। আলী সায়েব নিজেই এবার উত্তর দিলেন, "সংস্কৃতে একটা গল্প আছে। এক তৃষ্ণার্ত হাতি সরোবরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সামনে পাঁক থাকায় জলের কাছে যেতে পারছে না। একটা কাক কেমন নির্ভয়ে তরতর করে কাদার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে চলে গেল। আমি হচ্ছি ওই হাতি—আমার পাণ্ডিত্যই আমার শত্রু। সুতরাং ভ্রাতঃ, এর থেকে কী শিক্ষা নেবে? কখনও হাতি হবার চেষ্টা কোরো না।"

আলী সায়েব এবার আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন। বললেন, "লোকে এসব জানলে, ভাববে আমার কী দম্ভ। আমি কী নিষ্ঠুর—তোমাকে বাড়িতে ডেকে এনে যথেচ্ছ অত্যাচার করছি। কিন্তু বিশ্বাস করো ভাই, তোমাকে ভালবাসি বলেই এসব কথা বলছি। হে বালকগণ, আমাকে দেখিয়া শিক্ষালাভ করো।"

বিরাট হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিলেন আলী সায়েব। তারপর বললেন, "তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—অনেক দূর যেতে হবে তোমাকে। কিন্তু মন বলছে, কবে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে। তাই তোমাকে আর একটা কোশ্চেন করি। এই তিরিশ বছর ধরে আমি যা লিখেছি, তা দিয়ে আমি কী করতে চেয়েছি বলো তো?"

আমি বললাম, "অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে, নিরখিয়া

প্রাণে নাহি সয়। তাই আপনি বাংলা সাহিত্যের ড্রইং রুমে সুরুচি ও সুশিক্ষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। বাঙালি মনের বন্ধ দরজা জানালা খুলে দিয়ে সেখানে দেশ-বিদেশের হাওয়া ঢুকিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আপনি কুতবমিনারের মতো তুলনাহীন। আপনার সঙেগ তুলনীয় কোনো লেখক আপনার আগেও নেই পরেও নেই।"

"এসব কথা ঠিক কি না জানি না। তবে ভাষার দিক দিয়ে আমি একটু সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করেছি। গুরু এবং চণ্ডালকে এক পংক্তিভোজনে বসিয়ে দিয়েছি—গুরুচণ্ডালি দোষ যে আসলে গুণ তা গৌড়জনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। সেদিক থেকে আমি স্বামী বিবেকানন্দের চেলা। তোমরা অন্তত আমাকে সেইভাবে মনে রেখো।"

বাইরে তখন অকালবর্ষণ শুরু হয়েছে। আলী সায়েব বললেন, "বৃষ্টিতে ভিজে লাভ নেই। তেমাকে আমার ছাতিটা লোন দিচ্ছি—কিন্তু সাবধান, মেরে দিও না যেন।"

বললুম, "কলমটাই যখন চুরি করতে পারলাম না, তখন ছাতি মেরে কী হবে?"

আলী সায়েব এবার আমাকে আলিঙগন করলেন। বললেন, "এরপর কবে কোথায় কখন তোমার সঙেগ দেখা হবে তা তুমি ঠিক কোরো, কেমন?"

আমি সঙেগ সঙেগ হ্যাঁ বলেছিলাম। কিন্তু তখন কি জানতাম, সেই আমাদের শেষ দেখা। শেষ কথাগুলো কানে বাজছে। এরপর কবে, কোথায়, কখন তাঁর সঙেগ দেখা হবে তা ঠিক করবার জন্যে আমাকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

আজকের এই নিদ্রাহীন রাতে তাঁর কথা বারবার মনে পড়ছে।

আরও মনে পড়ছে তাঁর প্রতি আমাদের নানা অমার্জনীয় অপরাধের কথা। বাঙালি পাঠকের অবিশ্বাস্য ভালবাসা তিনি লাভ করেছিলেন। একথাও সত্য, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পর ইদানীংকালের তিনি সর্বাপেক্ষা উদ্ধৃত (most quoted) লেখক। কিন্তু আকাদমি ও রবীন্দ্র পুরস্কারের সঙ্কীর্ণমনা মালিকগণ তাঁকে অবহেলা করে যে মহাপাপ করেছেন তার কোনো তুলনা নেই। বাংলা সাহিত্যের এই শ্লীলতাহানির জন্যে ভাবীকালের কাঠগড়ায় একদিন এই সব গুণীজ্ঞানী আচার্যগণকে জবাবদিহি করতে হবে।

জরাসন্ধ

"যাবার সময় তো হলো—আমি চললাম"—সোমবার ২৫শে মে ১৯৮১ বিকাল পাঁচটার কিছু পরে স্নেহের পুত্রবধূ ও সহধর্মিণীকে সহজভাবে এই কথাটি বলে, জীবনের লৌহকপাট চিরতরে উন্মুক্ত করে বিদায় নিলেন বাংলা সাহিত্যের সেই নিঃসঙ্গ পথিক যাঁর নাম জরাসন্ধ।

কলকাতার নিউ আলিপুর থেকে এই দুঃসংবাদ যখন গঙ্গা পেরিয়ে হাওড়ায় আমার কাছে পৌঁছলো তখন রাত অনেক। বাইরে বিলম্বিত কালবৈশাখীর তাণ্ডবলীলা চলেছে। প্রবল বর্ষণে পথঘাট যানবাহন সব যখন রুদ্ধ, তখনই শুনলাম চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর মরদেহ তাঁর নিউ আলিপুরভবনে শায়িত রয়েছে। সমস্ত জীবন ধরে শতসহস্র পুরুষ ও নারীকে যিনি প্রথমে শাসনের ও পরে প্রেমের শৃঙখলে বন্দী করে রেখেছিলেন তাঁরই মরদেহ মুক্তি পাবে আগামীকাল সকালে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে।

আগামীকাল তাঁকে শেষবিদায় জানাতে অবশ্যই অনেক ভিড় হবে, প্রভাতী সংবাদপত্রে তাঁর সাহিত্যজীবন সম্বন্ধে অনেক মধুর মন্তব্য বর্ষিত হবে—কিন্তু আমি অবশ্যই শ্মশানে উপস্থিত থাকবো না। পঞ্চাশের এই সীমান্তদেশে ঠেলে এনে, নিষ্ঠুর মৃত্যু ইদানীং নানা অজুহাতে আমাকে নির্লজ্জভাবে লুণ্ঠন করে চলেছে। সাহিত্যজীবনে যাঁরা আমার প্রিয়সঙ্গী ছিলেন, যাঁদের স্নেহ-ভালবাসায় আমি ধন্য হয়েছি—সেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মুজতাবা আলী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য একে একে বিদায় নিলেন। এবার জরাসন্ধের পালা।

জরাসন্ধের সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বহু বছর আগে। তখনও সাহিত্যজগতে প্রবেশের সুযোগ আসেনি, কিন্তু কিছু একটা করবার ইচ্ছা মনের মধ্যে ছটফটানি শুরু করেছে।

ঠিক তখনই দেশ পত্রিকার পাতায় শুরু হলো 'লৌহকপাট'-এর

ধারাবাহিক প্রকাশ। প্রতি সপ্তাহে সে এক অপরূপ অভিজ্ঞতা—যা আমার দূর থেকে কিছুটা চেনা ছিল অথচ তেমন জানা ছিল না তার সুললিত প্রকাশ আমাকে মুগ্ধ করলো। ব্যারিস্টারের বাবু হিসাবে জেলখানার অভ্যন্তরে কয়েকবার প্রবেশ করেছি, নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত দু'-একজন অপরাধীর হাহাকারও আমি মুখ বুজে আলিপুর স্পেশাল জেলে সহ্য করেছি, কিন্তু বন্দীজীবনের এমন সামগ্রিক রূপ আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। আমার জন্যেই যেন জরাসন্ধ লেখনী ধারণ করেছেন ; দেশ পত্রিকার মাধ্যমে কেবলমাত্র আমার সঙ্গেই তিনি কথা বলে চলেছেন।

একদিন 'লৌহকপাট'-এর প্রথম পর্ব শেষ হলো—আমার মনোজগতে কত অজানারের যে-অস্পষ্ট ছবি আঁকা হয়েছিল তা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলো। আমি বুঝলাম, আমাকে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে—আমার অনেক কথা আমি শুরু করবার আগেই বলা হয়ে গিয়েছে।

তারপর লৌহকপাটের অপরিচিত লেখকের কী অভাবনীয় জয়যাত্রা। ট্রামেবাসে, অফিসে আদালতে, এমনকি মন্দিরের পুরোহিতকেও পূজার আসনে বসে আমি লৌহকপাট পড়তে দেখেছি। একমাত্র বাঙালি পাঠকই বোধহয় এমনভাবে কোনো লেখককে ভালবাসতে পারে, ভালবাসায় বাংলা-পাঠকের জুড়ি নেই, ধন্য সেই লেখক যিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার সুযোগ পান।

তারপর একদিন দেশ পত্রিকার পাতায় আমি প্রথম প্রকাশিত হবার সুযোগ পেলাম। কয়েদখানার প্রহরীকে যাঁরা জয়মাল্য দিয়েছিলেন ভালবাসার সঞ্জীবনীসুধায় আদালতের নামহীন পরিচয়হীন বাবুর বিশুষ্ক জীবনও তাঁরা সজীব সরস করে তুললেন।

এ-দেশে শুধু ভালবাসা পাওয়ার সৌভাগ্য কারও কখনও হয়নি—তাই সঙ্গে-সঙ্গে গেলো গেলো রবও উঠলো। একদল উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, "এসব সাহিত্য নয়। উপন্যাস সাহিত্যের পবিত্র অঙ্গনে জেলের পেয়াদা এবং উকিলের মুহুরীদের অনুপ্রবেশ রীতিমত অশাস্ত্রীয়।" কেউ কেউ বললেন, "এইসব 'ওয়ান-বুক অথরদের' মাথায় তুলে অপরিণামদর্শী পাঠকরা সাহিত্যকে কলুষিত করছেন, এর ফল হবে বিষময়।" গভীর দুঃখ ও বেদনা নিয়ে তখন ঘুরে বেড়াই, মাঝে-মাঝে চোখ ফেটে কান্নাও আসে। কিন্তু কোথায় যাবো? কার কাছে নির্ভয়বাণী পাবো?

মনের সেই অবস্থায় অকস্মাৎ একদিন জরাসন্ধের সঙ্গে আমার পরিচয়

হলো। সে এক মধুর অভিজ্ঞতা। জেলখানার একনম্বর অফিসার হিসাবে যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটিকে কল্পনা করেছিলাম তার সঙ্গে কিছুই মিল হলো না।

জরাসন্ধ আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন, বললেন, "হা কপাল! কাকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেছি? আমি যখন চাকরিতে ঢুকে প্রমোশন পেয়ে গিয়েছি তখনও তোমার জন্ম হয়নি।" পরম স্নেহে আমার বয়সের হিসাবপত্তর করে ফেললেন জরাসন্ধ। বললেন, "পাক্কা বত্রিশ বছরের ফারাক অথচ মা সরস্বতী একই সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠালেন!"

জরাসন্ধ বললেন, "আজ থেকে তুমি আমার পুত্রস্থানীয়।" সংসারের সব খবরাখবর নিলেন তিনি, বললেন, "তোমার মাকে একদিন দেখে আসবো। আমার ছোটবেলাটা তোমারই মতো কষ্টে কেটেছে।"

দ্বিতীয় দর্শনে আমার দুঃখের কথাটা ওঁকে না-বলে পারলাম না। জরাসন্ধ মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হয়ে উঠলেন : "বলতে দাও। ও-জ্বালায় আমিও জ্বলেপুড়ে মরছি।" একটু থামলেন তিনি, তারপর বললেন, "জীবনসায়াহ্নে আমি শুরু করেছি, সময় পাবো কি না জানি না। কিন্তু তোমার বয়স কম, তোমাকে এর উত্তর দিতে হবে। মনে রেখো, লেখক ও বৃক্ষ ফলেন পরিচিয়তে।"

সামান্য কিছুক্ষণের পরিচয়, কিন্তু দু'জনে অতিপ্রিয়জন হয়ে উঠলাম।

এরপর দু'জনের আবার দেখা হয়েছে। আমার তখন নিস্ফলা সময় চলেছে। জরাসন্ধ জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো? থমকে দাঁড়ালে কেন? মনে রাখবে কলম হলো হার্টের মতো—এদের ছুটি নেই।"

কথাটা আমার উপকারে লেগেছে। ইতিমধ্যে একের পর এক লৌহকপাটের বিভিন্ন পর্ব প্রকাশিত হয়েছে, জরাসন্ধ তখন খ্যাতির মধ্যগগনে। কার্যোপলক্ষে তখন আমাকে প্রায়ই রাজগীরে যেতে হতো—সেখানে এক বন্ধুপত্নীকে পৌরাণিক স্মৃতিজড়িত পাহাড় দেখিয়ে বললাম, "ঐখানেই ছিল জরাসন্ধের বন্দিশালা।" বন্ধুপত্নী তীব্র আপত্তি জানিয়ে বললেন, "হতেই পারে না—জরাসন্ধের কখনও বিহারে পোস্টিং হয়নি, কলেজে অনিমাদির কাছে শুনেছি উনি বহরমপুর জেলে পোস্টেড ছিলেন!"

গল্পটা ওঁকে যথাসময়ে শুনিয়ে, বলেছি, "মহাভারতের জরাসন্ধের আপনি অনেক ক্ষতি করেছেন!" আমার পাশে আর এক ভদ্রলোক ছিলেন,

তিনি বললেন, "মহাভারতের জরাসন্ধের উপকারও হয়েছে! এখনকার 'লৌহকপাট' প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বিশ্বাসই করবে না, জরাসন্ধের হৃদয় ছিল না।"

সামান্য কয়েকটা কথা বলে সেই ভদ্রলোককে জরাসন্ধ বিদায় করলেন। আমায় বললেন, "তোমার সঙ্গে গোপন দু'একটা কথা ছিল।"

ঘরের এক কোণে নিয়ে গেলেন আমাকে, বললেন, "আইনের জগৎ নিয়ে তুমি আর একটা গল্প লিখেছো দেখলাম।"

"হ্যাঁ লিখেছি। লেখাটা অনেকের ভাল লেগেছে।"

জরাসন্ধ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। "তোমাকে আমি ভালবাসি—শোনো, তুমি খবরদার আর হাইকোর্ট সম্বন্ধে লিখবে না—ওয়ার্লডের বেস্ট লেখা হলেও লিখবে না। তোমাকে বারবার পটভূমি চেঞ্জ করতে হবে—আমার মতো জেলখানায় জড়িয়ে পড়বে না তুমি।"

জীবনের এক চরম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে জরাসন্ধ আমাকে এইভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁর এই উপদেশ না পেলে আমি কী ভুল করে বসতাম কে জানে?

আজ এই বিনিদ্র দুর্যোগরাত্রিতে চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটখাটো কত স্নেহ-ভালবাসার কথা মনে পড়ছে। যখনই কোনো সন্দেহ এসেছে, দুঃখ এসেছে, যন্ত্রণা এসেছে তখনই তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছি। একবার টেলিফোন তুলেই তিনি বললেন, "কী ব্যাপার? গলার স্বর শুনেই বুঝছি, মনে সুখ নেই।"

বললাম, দুঃখের কারণটা। তিনি উত্তর দিলেন, "গালাগালি সহ্য করতে না পারলে লেখার লাইনে এসেছো কেন? এই তো এক মহাপণ্ডিত অধ্যাপক ইংরিজি কাগজে আমাকে ব্যঙ্গ করে 'জেলখানার সাহিত্যিক' শিরোপা দিয়েছেন। আমি তোমাকে একটা নতুন পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছি—আমার মৃত্যুর পরে তুমি লিখো আমি 'তাপ্পিমারা' সাহিত্যিক ছিলাম।"

"তাপ্পিমারা? সেটা কী জিনিস?"

ওদিকে থেকে চাপাগলায় উত্তর এলো, "খুব সিক্রেট ব্যাপার—তুমি শুধু জানলে—আমি হাতের গোড়ায় কাঁচি এবং আঠা রাখি। পাণ্ডুলিপির কোনো জায়গায় সংশোধন প্রয়োজন হলে আমি অন্য একটা কাগজে লিখে সেখানে তাপ্পি লাগাই।"

এমন সুরসিক গল্পবাজ লোক কম দেখেছি—টেলিফোনে আধ ঘণ্টা ধরে কথা বললেও মনে হতে সবেমাত্র কথা শুরু করেছেন। সাহিত্য সভায় তাঁকে

একটানা আশি মিনিট বলতে শুনেছি—কিন্তু কোথাও কোনা টুঁ শব্দ নেই। গল্পের আফিম বক্তৃতায় ঢুকিয়ে দেবার যে বিরল ক্ষমতা তাঁর ছিল, তা এ-যুগে বিমল মিত্র ছাড়া আর কারও মধ্যে দেখিনি।

নানা দুঃখ ছিল তাঁর মনে, কিন্তু না-পাওয়ার বেদনাকে এক কোণে লুকিয়ে রেখে সবাইকে ভালবাসা দেবার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি ছিল না। যাঁরা তাঁকে পছন্দ করতেন না তাঁরা বলতেন, ওটা মুখোশ, জেলখানার প্রহরী অত নরম হয় না। কিন্তু যারা তাঁকে দেখেছে, তারা জানে ভালবাসা দেবার জন্যে এই মানুষটি কেমনভাবে ছটফট করতেন।

জীবন ও সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে তাঁর সঙ্গে কতবার আলোচনা হয়েছে। কিছুদিন আগে নিজের ঘরে বসে তিনি বলেছেন, "বাঙালি পাঠকদের জুড়ি একমাত্র কেরালায় পাওয়া যায়।"

'ওরা তো 'জরাসন্ধন'-কে মালয়ালী লেখক বলে দাবি করে !" আমার প্রশ্ন।

"ক্ষতি কী ? এর থেকে বড় ভালবাসা আর কী হতে পারে বলো ?"

একবার আমি অনুরোধ করেছিলাম, "আপনার প্রথম জীবনের কথা কিছু বলুন।"

জরাসন্ধ বলেছেন, "আমার জন্ম ১৯০২ সালে ২৩শে মার্চ, ফরিদপুরে। আমার যখন তিন মাস বয়স তখন বাবা মারা যান। দরিদ্র ইস্কুল মাস্টার দাদা অনেক কষ্টে আমাকে মানুষ করেন। এই দাদা এবং আমার নিজের ছবি আছে, 'নিঃসঙ্গ পথিক' উপন্যাসে।"

জরাসন্ধ বলে চললেন, "তুমি শুনে রাখো—পাবনার 'সুরাজ' পত্রিকায় আমার প্রথম লেখা বেরোয় চোদ্দ বছর বয়সে, ১৯১৬ সালে। এই লেখা পড়ে দাদা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, 'এই বয়সে থেকে কাব্যিরোগ ধরল, তোর ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"

ক্লাস নাইনে উঠে হেয়ার স্কুলে পড়ব্যর জন্যে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯২০ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অধিকার করেছিলেন। ৬ বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছিলেন— ১৯২৬ সালে অর্থনীতিতে এম-এ।

বি সি এস পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে বসে থাকার সময় আবার সাহিত্যচর্চার শুরু।

বিচিত্রায় প্রকাশিত হলো 'ঘৃণার দান'। "সেসময়ে আমাদের দুটো ফ্রাসট্রেশন—চাকরি না-পাওয়া এবং নারীসঙ্গের সুযোগ না-থাকা ! এই দুই

মশলা গল্পের মধ্যেও ছিল।"

পরপর কয়েকটি গল্প বেরুলো বিচিত্রায়। একই সময় যোগাযোগ হলো রামধনু সম্পাদক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। "জানো হে, ১৯৩১-৩২ সালে ছোটদের জন্যে তিনখানা বই লিখে ফেললাম—'রঙচঙ', 'যমরাজার বিপদ' এবং 'গল্প লেখা হলো না'," বললেন জরাসন্ধ।

"ছেলেদের জন্যে লিখে যা সুখ তা আর কিছুতেই নেই। কর্নেল নাথ বলে আমার এক উপরওয়ালা ছিলেন, তিনি জেলের কয়েদীদের জন্যে ছেলেদের বই কিনতেন, 'দে আর এজে্‌ড চিলড্রেন'।

"কুড়ি বছর ঘুমিয়ে থেকে আবার ফিরে এলাম ১৯৫২-৫৩ সালে, লৌহকপাটের সূচনার কথা তো বইয়ের মুখবন্ধেই লিখে দিয়েছি।"একটু থামলেন জরাসন্ধ, কী যেন ভাবলেন। "তারপর হুড়মুড় করে লিখে ফেললাম তাপসী, ন্যায়দণ্ড, পাড়ি, আশ্রয়, মসীরেখা, উত্তরাধিকার, নিঃসঙ্গ পথিক... খান পঁচিশেক উপন্যাস, আধডজন গপ্পোর বই, খানদুয়েক রম্যরচনা, একটা প্রহসন....."

"জেলখানার বইগুলোতে আপনি বোধহয় বলতে চেয়েছেন ক্রিমিন্যাল বলে কোনো জাত নেই।"

"আরও একটা কথা বোধহয় বলেছি—ক্রিমিন্যাল এই কথাটার মধ্যেই মানুষের পরিচয় শেষ হয়ে যায় না।"

"সবাই আপনার লৌহকপাট নিয়ে হৈ-হৈ করে, কিন্তু ন্যায়দণ্ডের ওপর আরও একটু নজর পড়লে ভাল হতো।"

"তুমি আমার দুর্বলতম স্থানে হাত দিয়েছো। নিজের জজিয়তি নিজে করার স্বাধীনতা থাকলে বলতাম, ন্যায়দণ্ডই আমার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বিষয়টা জটিল—সক্রেটিস থেকে মেটারলিংক পর্যন্ত সবাই বলেছেন, জাস্টিস ইজ আনঅ্যাটেনেবল্‌। বিচার হচ্ছে, বামনের কাছে প্রাংশুলভ্য।"

"আর কিছু বলবেন ?" সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম।

জরাসন্ধ সস্নেহে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন "আর একটা বইয়ের ওপর আমার দুর্বলতা আছে—নিঃসঙ্গ পথিক। এই বইটা যদি লৌহকপাট প্রথম পর্বের পরেই লিখতাম তাহলে বোধহয় জেলখানার বন্দী হতে হতো না। নিঃসঙ্গ পথিক আমি নিজেই—আমি যখন থাকবো না তখন যদি কখনও আমাকে পেতে ইচ্ছে করে তাহলে ওই বইটার মধ্যেই আমাকে খোঁজ কোরো।"

সেদিন আরও কথাবার্তার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার হাতে আর সময় ছিল না। জরাসন্ধ বলেছিলেন, "আরেকদিন আসতে হবে কিন্তু। আগের দিন হলে আমি নিজেই হাজির হতাম তোমার কাছে। এখন বাহন বিদায় হয়েছে, শরীর বিকল, মৃত্যুর নজরবন্দী হয়ে সারাক্ষণ এই বাড়িতে বসে আছি।"

আমি কথা দিয়েছিলাম। জরাসন্ধ বলেছিলেন, "আজ তো হুড়-হুড় করে নিজের কথা বলে গেলাম। পরের দিন তোমাকে নিয়ে পড়া যাবে—তোমার একটা লেখার কয়েকটা ডায়লগ আমার মনে খটকা লাগিয়েছে।"

এই ছিলেন জরাসন্ধ। বয়োকনিষ্ঠকে যেমন ভালবাসতেন, তেমন তার ভুল দেখিয়ে দিতে দ্বিধা করতেন না। এই লোকটি সম্বন্ধেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "একটি পরিশীলিত মন আপনার লেখার মধ্যে কাজ করছে। সুশিক্ষার ঔজ্জ্বল্য চোখে পড়ে।"

নিউ আলিপুরের বাড়ি থেকে সেই যে চলে এসেছিলাম আর যাওয়া হয়নি। মধ্যিখানে একবার টেলিফোনে কথা হয়েছিল। "সেদিন তালেগোলে দুটো প্রশ্ন করা হয়নি। আপনার 'হবি' কী" অমি জানতে চাইলাম।

এক মুহূর্ত না ভেবেই জরাসন্ধ বললেন, 'চিঠি লেখা। অনেক পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে আমার পত্রমিতালি আছে—এইসব চিঠির মধ্যেও আমার কিছুটা পরিচয় ছড়ানো রইল।'

আমার শেষ প্রশ্ন : "আপনি তো পান সিগারেট মদ কিছুই খান না, আপনার কি তাহলে কোনো নেশা নেই?"

ওদিক থেকে উত্তর ভেসে এলো, "হাসবো না, হাসলে বুকে ব্যথা হতে পারে। তবে জেনে রাখো নেশা ছাড়া মানুষ হয় না। ছোটবেলায় বাবা মারা গিয়েছিলেন, তাঁর ভালবাসা পাইনি—শোনো আমার হলো ভালবাসা পাবার নেশা। নেশার আলোচনা কিন্তু মুখোমুখি না-বসলে হয় না। কবে আসছো?"

পাকে-চক্রে যাওয়া হয়নি, কিন্তু যাবার কথাই ভাবছিলাম। এমন সময় খবর এলো তিনি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছেন। তিনি যখন আমার কাছে ভালবাসা পাবার জন্যে অপেক্ষা করেছেন তখন দেওয়া হয়নি, আর এখন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি ভালবাসার নিবেদন করে যাবো, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করছেন কি না জানতে পারবো না।

বাংলার-রবি

বাংলার রবি, রবিশঙ্কর সম্পর্কে আমার কথাগুলো এখানেই বলে রাখি।

রাজধানীর সর্বশক্তিমান রাজনীতিকগণ এবং বোম্বাই-এর সুদর্শন তারকাবৃন্দ যতই অস্বস্তিবোধ করুন, যদি প্রশ্ন করা হয় বিশ্বসভায় এখন সবচেয়ে খ্যাতনামা ভারতীয়শিল্পির নাম কী? তাহলে সকলকে একবাক্যে উত্তর দিতে হবে : রবিশঙ্কর।

এমন একদিন ছিল যেদিন ভারতের বিখ্যাত নেতারা বিদেশেও সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতেন। আমাদের অর্থনৈতিক অ্যানিমিয়া ও নৈতিক অধঃপতন সেই স্বর্ণযুগের অবসান ঘটিয়েছে। ফলে স্বদেশে যেসব পরম শক্তিমানের স্তুতিতে আকাশবাণী মুখরিত হয়ে ওঠে, গড়ে তোপধ্বনি হয় এবং সরকারি শঙখ ঘণ্টা বাজে, বিদেশে তাঁরা কণামাত্র কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন না। বিদেশী সংবাদপত্রে ও টেলিভিশনে তাঁদের অবহেলা ভি-আই-পিদের মর্মবেদনার কারণ হয়, এবং 'মম অপমান ভারতের অপমান' বিড়বিড় করতে করতে তাঁরা স্বদেশে ফিরে আসেন। বিদেশী প্রেস লর্ড, রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ এবং চীনা ও পাকিস্তানি কূটনীতিকদের যতই ষড়যন্ত্র থাকুক, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না—অগ্রসর ও অনগ্রসর সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষের হৃদয়ে আসন পাতবার মতো তেমন কোনো কাজ সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের রাজনীতিক, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, চিত্রতারকা কেউ করে উঠতে পারছেন না। এই আপাত নৈরাশ্যের মধ্যে শিবরাত্রের সলতের মতো একটিমাত্র প্রদীপ দেশের আকাশে জ্বলজ্বল করছে। তাঁর নাম আবার ঘোষণা করছি—রবিশঙ্কর।

এই যে রবিশঙ্কর কাহিনী নিবেদন করতে বসেছি তার কারণ তিনটি। প্রথম—আমার স্থির বিশ্বাস, সাম্প্রতিককালে ভারতের সম্মানবৃদ্ধিতে রবিশঙ্কর এককভাবে যা করেছেন সে সম্পর্কে সরকার যথাযোগ্য স্বীকৃতি

দেননি। বাৎসরিক খেতাব তালিকার নির্বাচকমণ্ডলী এতই দৃষ্টিকৃপণ যে, কয়েক ডজন যদু-মধুর সঙ্গে এই বিশ্ববিজয়ীকে একই লাইনে দাঁড় করিয়ে একটি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর সম্মান-প্রসাদ বিতরণ করেই তাঁরা সন্তুষ্ট।

আমার এক বন্ধু সন্দেহ করেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে 'ভারতরত্ন' বিবেচিত হতেন কি না। বন্ধুর ধারণা মৃতদের সম্পর্কে দিল্লির আমলাদের উৎসাহ জীবিতদের থেকে বেশি—কারণ মৃতরা নিরাপদ।

আমার লিখতে বসার দ্বিতীয় কারণ : শুধু সরকার নয়, দেশের জনগণ, যাঁরা কখনও দেশবাসীর কৃতিত্বে আনন্দপ্রদর্শনে কার্পণ্য করেন না তাঁরাও রবিশঙ্করের অভাবনীয় সাফল্য সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত নন। বিশ্ববিজয় করে বিবেকানন্দ যখন শিয়ালদহ স্টেশনে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তখন উৎসাহী যুবকরা তাঁর গাড়ি নিজেরা টেনেছিল। আজ শিয়ালদহ আছে, ঘোড়ার গাড়িও আছে, কিন্তু যুবশক্তির মনে সব বিষয়ে ঠিক সেই উৎসাহ নেই। তৃতীয় কারণ : কবি সত্যেন্দ্রনাথ আজ জীবিত নেই। কবি বেঁচে থাকলে তাঁর 'আমরা' কবিতায় আরও দুটি লাইন জুড়ে দিয়ে বাঙালি রবির বিশ্বজয়কে অভিনন্দিত করতেন। আমাদের যুগে কবি ও সাহিত্যিকরা নানা কাজে ব্যস্ত—কোথায় কোন বাঙালি সেতারের সুরে নতুন এক দেশের হৃদয় জয় করলেন বলে কবিতা লিখতে বসতে হবে, এ কেমন কথা? আগের যুগের লেখক শিল্পীরা অনেক বোকা ছিলেন, তাই অন্যের সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে লিখে বসতেন :

জগৎ কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব
বাঙালী আজ গানের রাজা বাঙালী নয় খর্ব।

দেশের রাজশক্তিকে কর্তব্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করার মতো শক্তি আমার নেই। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাজও আমার পক্ষে অসম্ভব—কারণ আমি গান বা কবিতা লিখি না। বাংলার সাহিত্যিকদের একজন হিসেবে আমি শুধু আমার আনন্দ প্রকাশ করছি।

রবিশঙ্করই প্রথম ভারতীয় যাঁর সঙ্গে ১৯৬৭ সালে আমেরিকায় আমার দেখা হয়। প্যারিসের অরলি বিমানবন্দর ত্যাগ করে, সাড়ে-সাতঘণ্টা একটানা আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ে ট্রান্সওয়ার্লড এয়ার লাইনস্-এর বোয়িং বিমান আমাদের নিউ ইয়র্কের কেনেডি বিমানবন্দরে নামিয়ে দিল। নিউ ইয়র্ক আমার গন্তব্যস্থল নয়, আমি যাবো মার্কিন

রাজধানী ওয়াশিংটনে। কাস্টমসের ঝামেলা চুকিয়ে কেনেডি এয়ারপোর্টে এক কাপ চায়ের খোঁজখবর করছি, কারণ ওয়াশিংটনের প্লেন ছাড়তে ঘণ্টাখানেক দেরি। ঠিক সেইসময় দেখলাম আমার থেকেও দৈর্ঘ্যে ছোট সুদর্শন এক ভদ্রলোক ভারতীয় বেশে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বিমানবন্দরের অনেক সাহেব তাঁর দিকে আড়চোখে কৌতূহলী দৃষ্টিপাত করে চলে যাচ্ছেন। এদেশে বিখ্যাত কাউকে দেখে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়াটা বিশেষ শোভন নয়—কারণ গুণগ্রাহীরা এমনকিছু করতে চান না যাতে তাঁদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির প্রাইভেসি নষ্ট হয় বা তাঁর কোনো অসুবিধা হয়। যে-দোকান থেকে কফি কিনেছিলাম, সেখানকার মহিলাটি আমার রং ও মুখ চোখের গড়ন দেখেই বুঝতে পারলেন—আমি হয় ভারতীয়, না হয় পাকিস্তানি। ভদ্রমহিলা আমার দিকে কফি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "যদি কিছু মনে না করেন, ওই সুদর্শন ভদ্রলোকই কি আপনাদের উপমহাদেশের গর্ব রবিশঙ্কর ?"

রবিশঙ্কর ছাড়া উনি আর কে হতে পারেন ? কখনও পরিচয় না হলেও দূর থেকে গানের আসরে এক আধবার দেখেছি ওঁকে। মহিলাকে বললাম, "হ্যাঁ, উনিই রবিশঙ্কর।" কফি তৈরি বন্ধ করে ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ রবির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিদেশে বঙ্গসন্তান দেখলে আলাপ করার লোভ সামলানো শক্ত ব্যাপার। বিশেষকরে প্যারিসের অভিজ্ঞতাটা তেমন জমেনি। এগিয়ে গিয়ে তাই রবিশঙ্করের সঙ্গে কথা বললাম। রবিশঙ্কর যে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল তা জানতাম না। দেখলাম আমার লেখার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে।

অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে রবি দেশের খবরাখবর নিলেন। পাশেই শাড়িপরা এক মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। রবিশঙ্কর ইংরেজিতে ওঁকে ডাকলেন, "কমলা, তোমার সঙ্গে একজন লেখকের আলাপ করিয়ে দিই।" আমাকে বললেন, "ইনিই কমলা চক্রবর্তী, আমার দলে আছেন। "কমলা হাতজোড় করে নমস্কার জানালেন, তারপর ভাঙাভাঙা মিষ্টি বাংলায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন। শ্রীমতী চক্রবর্তী দক্ষিণ ভারতের মেয়ে, পরে বিয়ে করেন বোম্বাই-এর এককালের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক স্বর্গীয় অমিয় চক্রবর্তীকে।

রবিশঙ্কর বললেন, 'আমি এখন নিউ ইয়র্কে মাস্টারি করছি। চারদিন

এখানে থাকি, তারপর উইক এন্ডে বেরিয়ে পড়ি—নানা জায়গায় বাজাবার প্রোগ্রাম থাকে।”

কমলা জানালেন, “এখন আমরা চলেছি মন্ট্রিয়েলে।”

“মন্ট্রিয়েল? সে তো কানাডায়!”

“আজ্ঞে। তবে কানাডা আর কতদূর? প্লেনে বেশি সময় লাগে না। আমরা সোমবার ভোরেই ফিরে আসবো। ফিরে এসেই রবি নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজ ক্লাস করতে যাবেন।”

রবি দেখলাম বেশ গল্পবাজ লোক। (যে-বাঙালি আড্ডা দিতে ভালবাসে না আমি তাকে সন্দেহের চোখে দেখি!)

রবি আমার ভ্রমণসূচির খবরাখবর নিলেন। বললাম, “এখনও পর্যন্ত কিছুই জানি না। সব ঠিক হবে ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর। তবে এইটুকু জানি, দু'মাস এই দেশে থাকছি।”

রবি আমার ঠিকানা-বইতে ওঁর বাড়ির নম্বর ও টেলিফোন নম্বর লিখে দিয়ে বললেন, “যেখানেই থাকুন, নিউ ইয়র্কে নিশ্চয় আসবেন। তখন দেখা করার ইচ্ছে রইলো। শুধু যদি টেলিফোনে আপনার প্রোগ্রামটা একটু আগে জানিয়ে দেন। কারণ কোথায় কখন যে আছি নিজেই জানি না।”

রবিশঙ্করের প্লেন ছাড়বার সময় হলো। নিজেদের লাগেজ সামলাবার জন্যে আমরাও স্বস্থানে ফিরে এলাম।

ওয়াশিংটনের মাটিতে পা ফেলেই রবিশঙ্করের জনপ্রিয়তার নজির পেলাম। পররাষ্ট্র দপ্তরের যে-ভদ্রলোক আমাকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন, তিনি আমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবার পথে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, রাভিশঙ্কর আমার কেউ হয় কি না। আমাকে বলতে হলো, আমার নামের সঙ্গে একটি শংকর থাকলেও বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা নেই।

এরপর একদিন ঘুরতে ঘুরতে গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকানে গিয়েছিলাম। এখানকার রেকর্ডের দোকানে খরিদ্দারের অবাধ স্বাধীনতা।

একের পর এক শেলফ রয়েছে, সেখানে আপনার পছন্দমতো রেকর্ড নিজেই বার করে নিন। তারপর যে কোনো রেকর্ড-প্লেয়ারে লাগিয়ে রেকর্ড শুনে পছন্দ করুন। অনেক জায়গায় আবার হেডফোনের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ এই যন্ত্রে কানে লাগিয়ে যত ইচ্ছে গান শুনুন—গান একমাত্র আপনিই শুনতে পাবেন, অন্য কারও অসুবিধা হবে না। এরোপ্লেনে এই কায়দায়

সবাক চলচ্চিত্র দেখানো হয়—যাঁদের ছবি দেখার ইচ্ছে নেই, এতে তাঁদের বিরক্তি উদ্রেক হয় না। রেকর্ডের দোকানে নানা জনপ্রিয় শিল্পীর ছবি সাজানো, তার মধ্যে রবিশঙ্করকে উপস্থিত দেখে খুব আনন্দ হলো। আরও গর্ব হলো যখন দেখলাম একটা শেলফ আলাদা রয়েছে যেখানে কেবল তাঁর রেকর্ড। রবিশঙ্কর-শেলফ থেকে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে অন্তত দুজন বিদেশীকে রেকর্ড টেনে বার করতে দেখলাম।

ওয়াশিংটনের এক পার্কে হিপিদের ভিড় হয়। সেখানে রবিশঙ্কর তো আধা-দেবতা। বীরপূজা ও ব্যক্তিপূজা কোনোটাই মার্কিনদেশে প্রচলিত নয়। কিন্তু এদেশের একশ্রেণীর যুবক-যুবতীর কাছে রবিশঙ্কর পরম পূজনীয়—তাই তাঁর ছবির পোস্টার এদের ঘরে ঘরে শোভা পায়, ওঁর ছবিওয়ালা স্পেশাল বোতাম এরা বুকে এঁটে ঘুরে বেড়ায়। পকেটেও রবিশঙ্করের ছবি। আর মনের ইচ্ছা, কিছু ডলার জমিয়ে একটা সেতার কিনবে।

হিপিদের রবিপ্রীতি দেখেও আমি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি, যতক্ষণ না চ্যাপেল হিলে নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হয়েছি। এইখানেই এক চায়ের দোকানে পনেরো বছরের ইহুদি ছোকরা ডেভিড ফ্রিডম্যানের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলো।

ইউনিভার্সিটির চায়ের দোকানে মাথার ওপর কোনো ছাদ নেই ; কফি সংগ্রহ করে আমি গাছের তলায় একটা টেবিলের সামনে বসেছিলাম। সেই সময় আর এক কাপ কফি হাতে ডেভিড ফ্রিডমান এসে আমার অনুমতি চাইলো চেয়ারে বসবার। একটু পরেই আলাপ জমে উঠলো। ডেভিড ফ্রিডম্যান নিউ ইয়র্ক থেকে মাইল পনেরো দূরে শহরতলিতে থাকে। বাবা কোনো ব্যাংকের কর্তব্যক্তি। দাদা চ্যাপেল হিলে পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র। মা ও সে মাঝে-মাঝে চ্যাপেল হিলে চলে আসে। উঠেছে হোটেলে। ভারি বুদ্ধিমান ছেলেটি।

আমার নাম শুনেই ডেভিড ফ্রিডম্যান প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে উঠলো।

"শংকর ! আমার কতবড়ো সৌভাগ্য, আপনি নিশ্চয় ইন্ডিয়ার গ্রেট রাভিশংকরের কেউ হন !"

আমি জানালাম, "তিনি আমার কেউ হন না।"

ডেভিড ছোকরা কথাটা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারলো না। বললো, "আমরা আরও কয়েকজন ইন্ডিয়ানকে চিনি। কিন্তু শংকর টাইটেল তো বেশি দেখিনি।"

আমি বললাম, "হিন্দুদের তিনজন প্রধান দেবতার একজন শংকর। তিনি ধ্বংসের দেবতা আবার নটরাজও বটে। তাই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ভারতের সর্বত্র শংকর নামটি খুব সাধারণ, যদিও উপাধি হিসাবে এটি মোটেই সাধারণ নয়।"

বয়সে বালক হলে কী হয়, ডেভিড প্রখর বুদ্ধিমান। টানা টানা চোখ দুটো বড় বড় করে সে বললো, "মানে?"

বললুম, "যতদূর জানি, শংকর ওঁদের পারিবারিক উপাধি নয়। তার পরে একটা চৌধুরী ছিল, যেটা ওঁদের পূর্বপুরুষ ত্যাগ করেন।"

ডেভিড ফ্রিডম্যানকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললাম, "রবিশংকর আমার আত্মীয় না হলেও আমি তাঁকে চিনি। এই তো কয়েকদিন আগে নিউইয়র্কে ওঁর সঙ্গে দেখা হলো। উনি নিজের হাতে ওঁর ঠিকানা আমার ডাইরিতে লিখে দিলেন।"

ডেভিড বিশ্বাসই করতে পারছে না। বললো, "উনি নিজের হাতে লিখে দিলেন!"

বললাম, "হ্যাঁ। এতে আর আশ্চর্য কী!"

"তোমার কত বড়ো সৌভাগ্য! আচ্ছা, তুমি ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারো?"

"কেন পারবো না? তিনি নিজেই তো ফোন নম্বর দিয়ে খবর করতে বললেন।" আমি ডেভিডকে বোঝাবার চেষ্টা করি।

ডেভিড বললো, "ওঁর সঙ্গে একবার ফোনে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু এতবড়ো ব্যস্ত শিল্পী উনি কেন আমার মতো একজন সাধারণ ছেলের সঙ্গে কথা বলবেন? আর ফোন নম্বরটা তো গোপন। না হলে, লোকে যে ওঁকে সব সময় জ্বালাতন করবে।"

রবিশঙ্করের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, এতেই আমার দাম বেশ বেড়ে গেলো। ডেভিড বললো, "আপনি যদি খুব ব্যস্ত না থাকেন তাহলে আসুন দু'জনে একটু ঘুরে বেড়াই। আপনার কাছে আমার কত কি শেখবার আছে।"

সঙ্গীতে আমার বিদ্যা যে ঘোড়ার পাতা-পর্যন্ত এগোয়নি, একথা ডেভিডকে বলতে সাহস হচ্ছিল না। ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে ওর মনে এক বিচিত্র রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ডেভিড পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললো, "ভারতীয় সঙ্গীতের রেকর্ড

পেলেই আমি কিনে ফেলি। জানেন, আপনাদের সঙ্গীত আমাদের সামনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।"

আমি গুঁইগাঁই করি। কারণ যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও সঙ্গীতের গভীরে প্রবেশ করে রসগ্রহণের শক্তি অর্জন করিনি। যখন এসব শেখার সময় তখন নিদারুণ দারিদ্র্যে কষ্ট পেয়েছি। অন্নসংস্থানের জন্য প্রতিমুহূর্ত ব্যয় করেছি—শখের অবসর তখন ছিল না। আর এখন মনে হয়, বড়ো দেরি হয়ে গিয়েছে।

ডেভিডকে অবশ্য এসব কথা বলিনি। কিন্তু ডেভিডের কথায় আমি অবাক হয়ে গেলাম। ডেভিডের প্রশ্ন "বোম্বেতে রবির বাড়ি দেখেছেন আপনি? উনি তো বাড়ির নাম দিয়েছেন পাভলোভা।"

আমি জানতাম না। তাই ওর মুখের দিকে তাকালাম। ডেভিড বললো, "বিখ্যাত নর্তকী আনা পাভলোভা, যিনি ওঁর বড়ো ভাই উদয়শঙ্করকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।"

আমার আবার অবাক হবার পালা। বললুম, "এসব জানলে কী করে?"

বেচারা ডেভিড লজ্জা পেলো। বললো, "আমি আর কতটুকু জানি? তবে ওঁর জীবন সম্বন্ধে আমার এবং আমার বোনের খুব আগ্রহ, আমরা সংবাদপত্র থেকে ওঁর সম্বন্ধে খবর কেটে রেখে দিই। একটা সেতার কেনবার ইচ্ছেও আছে।"

"তোমার দেশের গান তোমার ভাল লাগে না?" আমি ডেভিডকে জিজ্ঞেস করি।

"নিশ্চয়ই। আমি সারাদিন বসে বসে পপ মিউজিক শুনতে পারি এবং আপনাদের দেশের সঙ্গীত আমাদের পপ মিউজিকে নতুন প্রাণের স্পর্শ আনবে।"

এইটুকু ছেলের সঙ্গীত সম্পর্কে আগ্রহ আমাকে বিস্মিত করে তোলে। সেতার সম্পর্কে সে অনেক খবরাখবর রেখেছে। "দুদিকে দুটো লাউ-এর খোলা থাকে। তার মধ্যিখানে আছে উনিশটা তার, যার চারটেয় সুর এবং দুটোয় তাল—বাকি তেরোটায় কেবল ঝঙ্কার ওঠে।" একটু থেমে ডেভিড বললে, "আমার দিদি ওদের কলেজের কমপিউটরে হিসেব করে দেখেছে আপনাদের বাহাত্তরটা স্কেলে মোট ৬৪,৮৪৮ রকম রাগ সম্ভব।"

রাগ-রাগিণীর অঙ্ক কষতে কমপিউটারের প্রয়োগ পশ্চিমী বুদ্ধিতেই সম্ভব—৬৪,৮৪৮ রাগের কথা শুনে তাই তাজ্জব বনে গেলাম। এরা আমাদের

সঙ্গীতে আগ্রহী হয়ে উঠলে নিজেদের নিষ্ঠায় একদিন আমাদের পিছিয়ে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে।

ডেভিডকে বললাম, "তোমার যখন এতই সেতার সম্পর্কে আগ্রহ, তখন সেতার শিখছো না কেন?"

ডেভিড এবার বিষণ্ণ হয়ে উঠলো! "আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমার সেতারে ওস্তাদ হবার খুব লোভ ছিল। কিন্তু একদিন টেলিভিশনে রবিশঙ্করকে দেখে আশা ছেড়ে দিয়েছি। রবি বললেন, ১৮ থেকে ২৫, এই সাত বছর গুরুর বাড়িতে তিনি প্রতিদিন বারো থেকে চোদ্দ ঘণ্টা সেতার অভ্যাস করেছেন। গানটা ওঁদের কাছে শখ নয়, জীবনের ধর্ম। এতেও আমি আশা ছাড়িনি। কিন্তু রবির আঙুলটা টিভিতে ক্লোজ আপে দেখানো হলো। আমি দেখলাম, অভ্যাস করে-করে ওঁর ডান হাতের আঙুলে বিরাট কড়া পড়েছে। কত বছর তারের সঙ্গে ঘর্ষণ হলে এটা সম্ভব হয়! বাঁ হাতের আঙুলে মাংসগুলো ক্ষতবিক্ষত—শুনলাম প্রায় সব সময় আয়োডিন লাগিয়ে রাখতে হয়। এরপর ওস্তাদ হবার আশা ছেড়ে দিয়েছি।"

বিদেশের রাস্তায় একটা পনেরো বছরের ছেলে আমাকে স্বদেশের সঙ্গীত সম্পর্কে যে শিক্ষা দিলো তাতে মনে মনে লজ্জা অনুভব করছিলাম। কিন্তু ডেভিডের উৎসাহে ভাটা পড়বার লক্ষণ নেই। সে বললো "আমরা তো একই হোটেলে আছি ; যদি আপনি অসন্তুষ্ট না হন, ডিনারের পরে আপনার ঘরে গিয়ে দেখা করবো।"

আমি রাজি হয়েছিলাম। কারণ এই বয়সের আমেরিকান ছেলেদের সম্পর্কে আমার আরও জানবার আগ্রহ ছিল। আর এরা যে এমন সঙ্গীত পাগল তাও জানা ছিল না।

সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই ডেভিড আমার ঘরে এসে হাজির। সঙ্গে তার দিদিকেও এনেছে। দিদি নমস্কার জানিয়ে বললো, "ডেভিডের কাছে শুনলাম, আপনি রাভিকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন, তাই আলাপ করতে এলাম।"

আমি ওদের বসতে বললাম। দিদির নাম রোজ। রোজ বললো, "রবিশঙ্করের কনসার্ট আমি সাতবার শুনেছি। ওঁর কনসার্টে গেলে মনে হয় যেন কোনো স্বর্গীয় পরিবেশে এসেছি। সবচেয়ে ভাল লাগে আপনাদের দেশের ধূপের গন্ধ। গান শুরু হবার আগে, শাড়ি পরে একটি মহিলা স্টেজের ওপর এসে ধূপ জ্বেলে দেন। কী সুন্দর দেখতে এই মহিলাকে, আর ভারি

মিষ্টি নামটি—কমলা। আচ্ছা কমলা মানে কী? একজন ইন্ডিয়ান বললে, নরম। ওই নরম soft চেহারা বলেই ওঁর নাম কমলা। আর একজন বললেন, অরেঞ্জ রং।"

আমি বললাম, "কমলা হচ্ছেন আমাদের দেবী লক্ষ্মী।"

"সত্যিই ওঁকে স্টেজে দেবীর মতো দেখায়। তাই না?" ডেভিড এবার বলে উঠলো।"

আমি বললাম, "কেবল তোমরাই রবিশঙ্করের সঙ্গীত ভালবাসো, না তোমাদের বাবা-মায়েরও এতে আগ্রহ আছে?"

রোজ হেসে ফেললো। "বাবার একটুও আগ্রহ ছিল না। প্রথমবার যখন ওঁদের জোর করে রবির বাজনা শুনতে নিয়ে গিয়েছিলাম, বাবা বললেন, এ কী বাজনা। ঘণ্টাখানেক ধরে একটা বিড়াল মিউমিউ করে গেলো। আর তাছাড়া, এরা বড়ো সময় নষ্ট করে। রবিশঙ্কর সেতার রেডি করতেই স্টেজের ওপর অনেক সময় নিলেন। সেতার তৈরি করেই স্টেজে এলে হয়, তা হলে শ্রোতাদের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না।"

ডেভিড বললো, "বুঝুন। আমার বাবা এবং মায়ের ইন্ডিয়ান মিউজিক সম্বন্ধে কী রকম জ্ঞান ছিল। এখন কিন্তু আমার এবং দিদির পাল্লায় পড়ে ওঁদের কান তৈরি হয়েছে। হাজার হোক সাতশো বছর যে-যন্ত্রটা আপনাদের দেশে ব্যবহার হচ্ছে, এবং যার পিছনে আরও তেরশো বছরের সঙ্গীত ঐতিহ্য রয়েছে, আমরা তাকে কেমন করে রাতারাতি আয়ত্ত করে ফেলবো?"

রোজ এবার মুখ খুললো। "আপনার সঙ্গে দেখা করবার একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার ভাই আপনাকে বলতে সঙ্কোচ করছে। রবিশঙ্করের একটা সই সংগ্রহ করার ইচ্ছে বহুদিনের। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আপনার ডাইরিতে রবিশঙ্করের যে হাতের লেখা রয়েছে ওটা কেটে দিলে আপনার কাছে ডেভিড বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকবে।

ডেভিড ও তার দিদির আগ্রহ দেখে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছিল। বললাম, "মোটেই আপত্তি নেই। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সইটা তোমাদের দিচ্ছি।"

সইটা কেটে ডেভিডের হাতে দিতেই আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এবার ওর দিদি যা করে বসলো, তার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। রোজ বললো, "শংকর, আপনি আমাদের যে ভালবাসা দেখালেন তার জন্যে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের ভালবাসার

সামান্য নিদর্শন হিসেবে, আপনার জন্যে একখানা লংপ্লেয়িং রেকর্ড এনেছি—ইহুদি মেনহুইন এবং রবিশঙ্করের East Meets the West—পূর্ব ও পশ্চিমের সাক্ষাৎ।"

আমি বেশ বিব্রত হয়ে পড়লাম, "আমাদের দেশে একটা নিয়ম আছে—বড়োরা ছোটদের দেয়, প্রতিদানে কিছু নেয় না। ছোটরা কিছু দিতে গেলে বড়োরা রেগে যায়। আমিও তোমাদের ওপর রেগে যাচ্ছি। তোমাদের রেকর্ডটা আমি নিচ্ছি না। তবে আমি রেকর্ডটা একবার শুনতে চাই।"

রোজ লজ্জা পেয়ে গেলো, কিছু বললো না। ডেভিড তড়াক করে বেরিয়ে গেলো। যাবার আগে বলে গেলো, "আমার পোর্টেবল রেকর্ড-প্লেয়ারটা এখনই নিয়ে আসছি।"

রোজ বললো, "আমার ভাই এতোই গানপাগল যে সঙ্গে রেকর্ড-প্লেয়ার রাখে। লেক বা বনের মধ্যে গিয়ে মাঝে-মাঝে গান শোনে।"

"মেনহুইন রবিকে খুব শ্রদ্ধা করেন," রোজ বললো। "জানেন, এই রেকর্ড তৈরি করবার আগে মেনহুইন দু'দিন রবির কাছে তালিম নিয়েছিলেন, আমি নিজে টাইম ম্যাগাজিনে পড়েছি।"

বললাম, "মেনহুইনের কাছে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। ভারতীয় সঙ্গীতকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার পিছনে এই বিশ্ববিদিত বেহালা-বাদকের যে-দান রয়েছে তা আমরা কোনোদিন ভুলতে পারবো না।"

রোজ সঙ্গীতের ইতিহাস পড়ছে। ওকে বললাম, "ইদানীংকালের ভারতবর্ষে একটা আশ্চর্য জিনিস ঘটেছে। সাহিত্য, শিল্প, দর্শনের বাণী নিয়ে আমাদের কোনো মনীষী যখনই পশ্চিমের দ্বারপ্রান্তে এসেছেন তখনই তিনি একজন পশ্চিমী বন্ধু লাভ করেছেন এবং তিনি নিঃস্বার্থভাবে তার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। পশ্চিমী সভ্যতার এই উদারতা আমাকে মুগ্ধ করে। ধরুন, আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গুণগ্রাহী শিল্পী রোদেনস্টাইনের কথা। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর শিষ্যা মিস মার্গারেট নোবলের কথা, পরে যিনি ভগিনী নিবেদিতা নামে আমাদের হৃদয় জয় করেছিলেন। এবং এই কিছুদিন আগের উদয়শঙ্কর ও নর্তকী পাভলোভার কথা।"

রোজ আমার চেয়ে অনেক বেশি খবরাখবর রাখে। সে বললো, "রবির দাদা উদয় সম্পর্কে কয়েকদিন আগেই একটা প্রবন্ধ পড়লাম। অনেকেই জানেন না, উদয়শঙ্কর চিত্রশিল্পী হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। তিনিই

প্রথম ভারতীয় যিনি লন্ডনের রয়াল কলেজ অফ আর্টসের পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি যখন ব্রিটিশ মিউজিয়মে পড়াশোনা করছেন সেই সময় একদিন পাভলোভার নাচ দেখলেন। দুই শিল্পীর সেই সাক্ষাৎ দু'জনের গভীর পরিবর্তন নিয়ে এলো।"

রোজ বললো, "রবিশঙ্করের জীবন সম্পর্কে তাঁর পশ্চিমী ভক্তদের বিশেষ আগ্রহ। আজকাল কাগজে নানা খবরাখবর বেরোয়। যেমন সেদিন পড়লাম, রবিশঙ্কর জীবন শুরু করেছিলেন নাচিয়ে হিসেবে। ১৯২০ সালে ওঁর জন্ম। দশবছর বয়স থেকে দাদার সঙ্গে নাচের দলে ইউরোপে ভ্রমণ করছেন। প্যারিসে রবিশঙ্কর ফরাসি ভাষা শেখেন। রবিশঙ্কর তখন বেজায় শৌখিন বাবু। একেবারে চোস্ত সায়েবদের মতো স্যুট পরেন, গলার এক-একটা টাইয়ের দাম পাঁচ ডলার।"

বললুম, "বিশ্বাস করো রোজ, শঙ্কর পরিবার সম্পর্কে তুমি আমার থেকে অনেক বেশি জানো।"

হেসে ফেললো রোজ। "আমার বিদ্যে ম্যাগাজিন পর্যন্ত। তবে পত্রপত্রিকা পড়ে জ্ঞান আহরণ করা যায় না যারা বলে আমি তাদের দলে নই। এই ম্যাগাজিনেই পড়লাম, ১৯৩৬ সালে উদয়শঙ্কর তাঁর দলে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে আমন্ত্রণ জানালেন—পশ্চিমে প্রাচ্য-সঙ্গীতের পরিচয় দেবার জন্যে। ইউরোপে খাঁ সাহেবের এক সঙ্গীতের আসরেই হঠাৎ রবিশঙ্করের বোধোদয় হলো। তিনি ঠিক করলেন, নৃত্য নয়, সঙ্গীতের মধ্যেই তিনি জীবনের সত্যকে খুঁজে বার করবেন। বারাণসী ফিরে এলেন রবি, প্যারিতে তৈরি স্যুট ছেড়ে খাদি ধরলেন, মাথার অমন মনোমোহন চুল কামিয়ে ফেলে মুণ্ডিতমস্তক হলেন এবং গুরুর আশ্রম মাইহারে চললেন সাতবছরের একাগ্র সাধনায় মগ্ন হতে।"

ডেভিড ইতিমধ্যে মেনহুইন ও রবিশঙ্করের দ্বৈত সঙ্গীত শোনাবার জন্যে তার পোর্টেবেল রেকর্ড-প্লেয়ার নিয়ে এসেছে। রোজ বললো, "মেনহুইনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ—ভারতীয় সঙ্গীতের রত্নশালার সংবাদ তিনি পশ্চিমের কাছে নিয়ে এলেন। ভাগ্যে তিনি ১৯৫২ সালে ভারতবর্ষে বাজাতে গিয়েছিলেন এবং রবিশঙ্করের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল! মেনহুইনের চেষ্টায় রবি বাথ ফেস্টিভ্যালে আমন্ত্রিত হন এবং সেখানেই দু'জনে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে সঙ্গীতের সেতুবন্ধনের প্রথম চেষ্টা করলেন। সেই চেষ্টার অভাবনীয় ফল তো দেখতেই পাচ্ছেন।"

ডেভিডের প্লেয়ার এবার বেজে উঠলো। পূর্ব-পশ্চিমের দুই দিক্‌পাল তাঁদের সেতার ও ভায়োলিনের মিলন-গীতি শুরু করলেন। রোজ ফিস ফিস করে বললো, "আপনাদের কাছে এর কোনো দাম আছে কি না জানি না, কিন্তু আমাদের কাছে এঁরা সুরজগতের কলম্বাস, নতুন দিগন্তের সন্ধানে বেরিয়েছেন এঁরা।"

নিউ ইয়র্কে ফিরে এসে পরিচিত ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা সবাই একমত, সাম্প্রতিককালে রবিশঙ্কর ভারতবর্ষের জন্যে যা করেছেন, তার কোনো তুলনা নেই! রবিশঙ্করের নামে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। যেখানেই তিনি বাজান, কয়েকঘণ্টার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। কখনও কখনও এমন অবস্থা হয় স্টেজের ওপর অনেককে বসতে হয়। তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে শুধু হিপিরাই থাকেন না—অনেক কেষ্ট-বিষ্টুকেও দেখা যায়। যেখানে রবি সেখানেই টিভি ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফারের হুড়োহুড়ি। আর বাইরে ঝড়-বৃষ্টি-বরফ উপেক্ষা করে হাজারখানেক যুবক দাঁড়িয়ে থাকে যারা ভিতরে যাবার টিকিট সংগ্রহ করতে পারেনি। তাদের অনেকে ফুল ছোড়ে, ঘণ্টা বাজায় এবং রব তোলে হরে কৃষ্ণ। হিপিদের গালাগালি করাটা শিক্ষিত ভারতীয় সমাজে একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমার নিবেদন, এই উল্টোপুরাণের সবটাই পাগলামি নয়। এর পিছনে অনেক কিছু ভাববার আছে। পশ্চিমের এই যুবক-যুবতীদের প্রতি আমার যথেষ্ট স্নেহ ও সহানুভূতি আছে।

রবিবারের এক ভোরবেলায় রবিশঙ্করের নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে বসে গল্প হচ্ছিল। ঘরে ছিলেন রবি, কমলা চক্রবর্তী, ওঁদের হাউসকিপার এক বর্ষিয়সী মার্কিন মহিলা এবং রবির সেক্রেটারি। আমার সঙ্গে ছিলেন নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবতত্ত্বের খ্যাতনামা ভারতীয় অধ্যাপক ডক্টর জ্যোতির্ময় মিত্র। তার আগের দিনে জ্যোতির্ময়বাবুর অ্যাপার্টমেন্টে গল্প করতে-করতে কখন আমরা সারারাত কাটিয়ে দিয়েছি। ভাগ্যে জ্যোতির্ময়বাবু তখনও বিয়ে করেননি। না হলে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হতো।

রবিশঙ্করের মধ্যে যে জিনিসটা লক্ষ্য করা যায় সেটা হলো বিশ্বব্যাপী সাফল্য ওঁর মাথা ঘুরিয়ে দেয়নি। আর নিউ ইয়র্কের বিশাল বৈভবের মধ্যে বসে থেকেও তিনি স্বদেশকে ভুলে যাননি। অথচ দেশে কত লোকের ধারণা, ডলার ও পাউন্ডের লোভেই তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জাত নষ্ট করছেন।

বললাম, "এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। জানেন তো, কালাপানি

পেরোবার জন্যে রামমোহন রায়কে কত নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল। ভারতের সঙ্গীত-সরস্বতীকে আপনিই তো সপ্তসমুদ্রের এপারে নিয়ে এলেন।"

রবিশঙ্কর মৃদু হাসলেন। না, কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই তাঁর। বললেন, "আমার একটা গোঁ ছিল। এখনও বোধ হয় সেই গোঁ-এর জোরে এগিয়ে চলেছি।"

রবির তখন বছর পঁচিশ বয়স, ইউরোপ-প্রবাসী রবি তখনই শপথ নিয়েছিলেন পশ্চিমের কাছে প্রাচ্যের সঙ্গীতকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তরুণ বয়সে পশ্চিমের অনেক দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ—তোসচানিনি, সেগোভিয়া, ক্যাসেলস—এবং আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। সবার অভিযোগ ভারতীয় সঙ্গীত বড্ড একঘেয়ে, শুধুই পুনরাবৃত্তি।

"আমি বুঝতাম ওঁদের কথা, আমাদের সঙ্গীতে key চেঞ্জ হয় না, পশ্চিমী সঙ্গীতের মতো আমাদের সঙ্গীতে স্টাকাটো নোট নেই—তবে মনে দুঃখ হতো, ভাবতাম কেমন করে আমাদের অপার সঙ্গীত-ঐশ্বর্য ওদের বোধগম্য করা যায়?"

রবি বললে, "পশ্চিমীদের মনোরঞ্জনের জন্যে ভারতীয় সঙ্গীতকে আমরা অবশ্যই অধঃপতনে নিয়ে যাবো না, কিন্তু ওঁদের সুবিধার জন্যে সিঁড়ি করে দিতে দোষ কী?"

"মেনহুইন প্রথম সুযোগ করে দিলেন। তারপর বহুদিন ধরে পশ্চিমের দরজা খুলবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি। এগরোবছর ধরে সুযোগ পেলেই ছুটে এসেছি ইউরোপ-আমেরিকায়। তখন ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে কারও আগ্রহ ছিল না, বাজনা শোনাবার সুযোগও পাওয়া যেতো না। ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে বছরের পর বছর বাজিয়ে অবশেষে লোকের উৎসাহ সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তখনও অনেকের ধারণা, সেতারের সুর ও অসুস্থ বেড়ালের মিউ মিউ-এর মধ্যে তফাত নেই।"

"তারপর একদিন অসম্ভব সম্ভব হলো। পশ্চিমের যৌবন একদিন পূর্বদেশের সঙ্গীতের জন্যে তাদের দ্বার খুলে দিলো। এই আশ্চর্য ঘটনা সম্ভব হলো পপ মিউজিকের রাজকুমার বিট্‌লদের জর্জ হ্যারিসনের জন্যে। জর্জ হ্যারিসনের কোটি কোটি ভক্ত। যেখানে তিনি যান সেখানে জনসমুদ্র ভেঙে পড়ে। সেই বিট্‌ল হ্যারিসন পৃথিবীতে এতো জিনিস থাকতে আকৃষ্ট হলেন ভারতীয় সেতারে। সেতার শেখার আগ্রহে তিনি রবিশঙ্করকে গুরু মনোনিত

করলেন। প্রথমে ভেবেছিলাম সবটাই একটা স্টান্ট। ওকে সেতার শেখানো সম্পর্কে আমার তেমন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু পরিচয় করে দেখলাম হ্যারিসনের নিষ্ঠায় কোনো ফাঁকি নেই। তখন ওকে শেখাতে আরম্ভ করলাম।" রবি বললেন।

যা করতে হয়তো একশ বছর লাগতো তা রাতারাতি সম্ভব হলো। পপ সঙ্গীতের ভক্ত ইংলন্ড-আমেরিকার তরুণ সমাজ গ্রহণ করলেন রবিশঙ্করকে। ভারতের রবি অকস্মাৎ বিশ্বের রাভি হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে মাথায় তুলে নিলেন হিপির দল।

"এরা সবাই যে আমাদের সঙ্গীত বোঝে তা মোটেই নয়—এদের অনেক ঘাটতি আছে—কিন্তু দরজা যখন খুলেছে তখন ঢুকে পড়টাই যুক্তিযুক্ত মনে হলো। এর থেকেই একদিন আমরা আরও অনেক বড়ো সুযোগ পাবো।"

"নিশ্চয়ই।" আমি রবিশঙ্করের কথায় সায় দিই।

"হিপিরা যে আমাকে হঠাৎ গুরু করে তুললো তার পিছনে আমার কোনো হাত নেই। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ব্যাপারটা ঘটেছে। ফলে এ-দেশে অনেকে ভুল বুঝতে আরম্ভ করলেন। অনেকের ধারণা, গাঁজা এবং এল-এস-ডির সাইকেডেলিক আনন্দের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।"

রবিশঙ্কর কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "এর জন্যেই আরও কিছু দিন এদেশে আমার থাকার প্রয়োজন। আমাদের সঙ্গীত সম্পর্কে বিদগ্ধ ইংরেজ ও আমেরিকানদের কৌতূহল বাড়াতে হবে—সেই উদ্দেশ্যেই লস এসেঞ্জলসে কিন্নর ইস্কুল খুলেছি। সেই উদ্দেশ্যেই নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে এসেছি। এখানে আমার চল্লিশজন ছাত্র, কিন্তু আরও শ'দুয়েক ছেলেমেয়ে, যারা অন্য বিষয়ে পড়াশুনা করে, তারাও ক্লাস শুনতে আসে। এদের নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা যদি দেখেন! আমি ওদের ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের কথা বলি, ভারত ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের ওতপ্রোত সম্পর্কের কথা শোনাই। আমার সঙ্গে ওরাও ক্লাস শুরু হবার আগে গুরু বন্দনা করে।"

রবিশঙ্কর বললেন, "হিপিদের নিয়েই আমার বিপদ। আমার বাজনার আসরে ওরা দলে দলে আসে। ওদের আমি ভালবাসি আবার ওদের বিপথগামিতার জন্যে দুঃখও হয়। যখনই সুযোগ পাই, আমি প্রকাশ্যে জানিয়ে দিই, ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে মদ ভাঙ গাঁজা আফিমের কোনো

সম্পর্ক নেই। শুদ্ধ দেহ ও মনে আমরা সুরসরস্বতীর আরাধনা করি এবং সুরের পবিত্র স্রোতে অবগাহন করে আমরা যে নির্মল আনন্দ পাই তার সঙ্গে রাসায়নিক সাইকেডেলিক আনন্দের অনেক তফাত। আমি বার বার ঘোষণা করি, আপনারা যেমন কোনো মাতালকে সিমফনি অর্কেস্ট্রায় স্বাগত জানান না, আমার সঙ্গীতের আসরেও তেমনি ম্যারিজুয়ানা বা এল-এস-ডি প্রেমিকেরা অভিপ্রেত নয়।"

রবির বড়ো বড়ো চোখ দুটো এবার গভীর বিশ্বাসে জ্বলে উঠলো। "আমি জানি, আমার পক্ষেই এসব অপ্রিয় কাজ করা সম্ভব। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ বলে এদেশে কিছু থাকবে না। একটা সাময়িক উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে, তা আবার উধাও হয়ে যাবে।"

কথাবার্তায় বোঝা গেলো, এই ভুল বোঝাবুঝি দূর করবার জন্যে আমাদের দূতাবাসের কেষ্টবিষ্টু সাংস্কৃতিক এটাসিরা কিছুই করেন না। রবিশঙ্কর মস্কো ও লেনিনগ্রাদে বাজাতে গেলেন। সেখানে সঙ্গীতের আগে ঘোষণা করা হলো : ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ—ভারতের প্রখ্যাত লোকসঙ্গীতজ্ঞ রবিশঙ্করের সঙ্গে পরিচিত হোন। অনিল বিশ্বাস এবং শংকর-জয়কিষনের মতো ইনিও ভারতীয় জনগণের হৃদয় জয় করেছেন.....

বোম্বাই-এর ফিল্মি সুরসম্রাটদের সঙ্গে একাসনে বসানোর জন্যে অভিযোগ নয়—দুঃখ, আমাদের দূতরা ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীত সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অবহিত করতে পারেন না। ফলে রবিকে বাজনা শুরু করবার আগে বলতে হলো, তিনি লোকসঙ্গীতজ্ঞ নন, তিনি ক্লাসিকাল সঙ্গীতের সাধক। এই সঙ্গীতের ধারা আমাদের দেশে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে চলে আসছে।

বহুজনের মুখে রবির সঙ্গীত সম্পর্কে ভূমিকার উচ্ছসিত প্রশংসা শুনেছি। উপস্থাপনের এই প্রতিভা তিনি সম্ভবত তাঁর দাদা উদয়শঙ্করের কাছে পেয়েছিলেন। বাজনা শুরু করবার আগে তিনি প্রায়ই ছোট্ট বক্তৃতা দেন। বুঝিয়ে দেন, ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য কী, পশ্চিমী সঙ্গীতের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়, কেমন করে এর রসগ্রহণ করতে হবে।

রবি বললেন, "স্বীকার করি, আমাদের সঙ্গীতের রসগ্রহণ করতে হলে কিছুটা সঙ্গীত শিক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে দরজা বন্ধ করে বসে থাকাটাও আমার ভাল লাগে না। শ্রোতাদের সঙ্গে যতখানি সম্ভব ভাবের আদান-প্রদান প্রয়োজন।"

রবির কাছে শুনলাম, এই উদ্দেশ্যে তিনি একখানি বই লিখেছেন, নাম 'My Music My Life'—আমার সঙ্গীত আমার জীবন। রবির আত্মজীবনী ছাড়াও এতে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে অনেক কথা রয়েছে যা অভারতীয়দের সাহায্য করবে।

বললাম, "অভারতীয় কেন, আমার মতো অনেক ভারতীয় এ-বিষয়ে জানতে আগ্রহী। অহেতুক পণ্ডিত সেজে থেকে নিজের অজ্ঞতাকে চেপে রাখার প্রয়োজন কী?"

কোথা দিয়ে সময় কেটে গেলো বুঝতে পারলাম না। রবি ও আমি নানা বিষয়ে কথা বলে চলেছি। শ্রীমতী কমলা চক্রবর্তী শান্তভাবে শুনে যাচ্ছেন—আমাদের বাংলা উনি বেশ বুঝতে পারছেন মনে হলো।

রবি বললেন, "আমার বড়ো আনন্দ যে পশ্চিমের বন্ধ দরজা খুলতে পেরেছি। এবার আমাদের দেশের সঙ্গীত-সাধকদের কাজ হবে আমাদের যা শ্রেষ্ঠ তা এঁদের কাছে হাজির করা। কয়েকজন গুণী সেই কাজ করছেন, আবার কিছু বাজে লোকও এই সুযোগে ঢুকে পড়ছেন। এইটাই দুশ্চিন্তার কারণ। ভেজালে ঠকলে এরা আমাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে।"

ওঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ভারতবর্ষের মস্ত বড়ো কাজ করছেন—যে কাজ একদিন রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ করবার চেষ্টা করেছিলেন। দু'চারজন পরশ্রীকাতর লোক যা-ই গুজব রটাক, দেশের সাধারণ মানুষের শুভেচ্ছা রয়েছে আপনার পিছনে। আপনি জয়যুক্ত হয়ে বিজয়রথে দেশে ফিরুন।"

রবি আবার স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন।

আমি বললাম, "দেশের লোকদের আপনি কিছু জানাতে চান?"

রবি বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, "বিদেশে বসে প্রায় রোজই দেশের কথা ভাবি। একটা কথা আমাকে বড়ো বেদনা দেয়, আপনি তো বিদেশ দেখছেন, আপনাকেও দুঃখ দেবে। আমি যা বলছি আপনারও যদি তাই মনে হয়, তাহলে দেশের মানুষদের বলবেন, যে-ভারতবর্ষকে এখন পৃথিবীর মানুষেরা শ্রদ্ধার চোখে দেখে, সে অতীতের ভারতবর্ষ। আমাদের যুগ আমরা যে-ভারতবর্ষ সৃষ্টি করেছি সে সম্বন্ধে পৃথিবীর মানুষের কোনো উৎসাহ নেই। বিশ্ববাসীর সম্মান পেতে হলে আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে।"

প্রবেশ ও প্রস্থান

১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩। বিকেল ৫-২০ থেকেই আমরা আনন্দবাজার সম্পাদক অশোককুমার সরকারের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। যাযাবর অমনিবাস-এর প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে কলিকাতা পুস্তকমেলা প্রাঙ্গণে যে অনুষ্ঠান সেখানে তিনি প্রধান অতিথি এবং আমি সভাপতি। দিল্লি থেকে ট্রেনযোগে কিছুক্ষণ আগেই দৃষ্টিপাতের অমর লেখক বিনয় মুখোপাধ্যায় ওরফে যাযাবর এসে গিয়েছেন। মেলা প্রাঙ্গণে এসেই তিনি খোঁজ করছেন অশোকবাবু কোথায় ?

শুনেছি, এই অনুষ্ঠানের খবর শুনেই দিল্লি থেকে ট্রাঙ্ককলে যাযাবর ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন অশোকবাবু যেন সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। সে খবর আনন্দবাজার অফিসে অশোকবাবুকে জানানোও হয়েছিল। আসবার তেমন ইচ্ছে ছিল না, অনেক কাজের চাপ—কিন্তু সাহিত্যিকের প্রকৃত বন্ধু যেমনি শুনলেন লেখকের ইচ্ছা তিনি আসেন, তেমনি রাজি হয়ে গেলেন।

যাযাবরকে পুস্তক মেলা প্রাঙ্গণে জিজ্ঞেস করলাম, "অশোকবাবুকে চাইলেন কেন ?" উনি বললেন, "এমন সমঝদার পাঠক কোথায় পাবো ? তাছাড়া তিনি আমার অনেকদিনের বন্ধু। পাঠক ও বন্ধুকে একাসনে পেতে মন চায় না ? বলুন।"

পাঁচটা পঁয়ত্রিশ—অশোকবাবু এখনও এলেন না। মেলাপ্রাঙ্গণের এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক হল-এ বেজায় ভিড়, স্থানাভাবে অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। সময়ানুবর্তিতায় যিনি সায়েবদেরও লজ্জা দিতে পারেন সেই অশোককুমার টেলিফোনে খবর পাঠিয়েছেন তিনি আসছেন। সভা আরম্ভ হলো না। অদূরে 'দেশ' সম্পাদক সাগরময় ঘোষ বসেছিলেন। তাঁর পরামর্শ নিলাম। ঠিক হলো সভার কাজ শুরু হোক, প্রধান অতিথি উপস্থিত হওয়া মাত্রই

দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

কয়েক মিনিট পরে আবার খবর এলো মেলা অফিস থেকে—অশোকবাবু রাস্তায়, এলেন বলে।

আমরা সভা শুরু করলাম—সাঁইত্রিশ বছর পরে দিল্লি প্রবাসী যাযাবর কলকাতায় প্রকাশ্যে পাঠকের মুখোমুখি হচ্ছেন। একটি মালা লেখকের গলায় চড়ানো। একটি মালা পড়ে রইলো—আমি শ্রোতাদের বললাম, এ মালা যাঁর জন্যে তিনি এলেন বলে।

মাত্র মিনিট দশেক সভা চলেছে—এমন সময় তিনি এলেন—মুখে সেই বিখ্যাত হাসি যা ছাড়া আমি এই মানুষটিকে গত তিরিশ বছরে একবারও দেখিনি।

তরতর করে তিনি মঞ্চে উঠে এলেন। যাযাবরের পাশে চেয়ার গ্রহণ করলেন। আমাকে বললেন, "আমি কিন্তু লেট নই। আমি উদ্যোক্তাদের আগাম বলেছিলাম, আমি বোধহয় ছ'টার আগে আসতে পারবো না। যা বলেছি তা কিন্তু রেখেছি।"

আমার বক্তৃতা বন্ধ। বেশ মজা করেই গলায় মালা নিলেন তিনি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এবার আমার কী কাজ বলুন?"

"কাজ আপনার অনেক। প্রথম বইটি কিনতে হবে। তারপর লেখকের হাতে প্রীতি উপহার তুলে দেওয়া।"

"কিছু বলতেও হবে নিশ্চয়ই?" উনি রসিকতা করলেন।

"কখন বলবেন?" আমি জানতে চাই।"

"বলতে যদি হয়, এখনই বলতে পারি," একটু রসিকতার মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন অশোককুমার সরকার।

"তা হলে মাইক আপনার। আপনার দাঁড়াবার দরকার নেই। বসে বলুন।"

আমি নিজেও চেয়ারে বসে বলছি। একটা আড্ডার পরিবেশ গড়ে তুলতে চাইছি, এখানে কোনো গুরুগম্ভীর কার্যসূচী নেই। অশোকবাবু নিজের দিকে মাইক সরিয়ে নিলেন।

তাঁর সেই স্বাভাবিক ভদ্রতা, যার তুলনা আজকাল বিশিষ্ট বাঙালিদের মধ্যে বিরল হতে চলেছে, আবার ফুটে ওঠে উঠলো ওঁর কথায়। বললেন, "এই সাহিত্য-সভায় আমি কেন? আমি লেখক নই, আমি সমালোচকও নই। সুতরাং ভাবতে পারেন কোন অধিকারে আমি এখানে এসেছি? আমি

এখানে এসেছি একজন সাংবাদিক হিসেবে। আপনাদের অনেকেই হয়তো জানেন না যাযাবর এক সময় সাংবাদিকতার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।"

বাইরে থেকে অন্য একটা বেখাপ্পা মাইকের স্বর সেই সময় হলের ভিতরে ঢুকে পড়ছিল, পরিবেশ কলুষিত হচ্ছিল, অশোকবাবুর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ—আমি ভাবলাম বাইরের গোলমাল বন্ধ হবার অপেক্ষায় তিনি কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন।

কিন্তু হঠাৎ তিনি টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তারপর তিনি অকস্মাৎ ঢলে পড়লেন। মাত্র কয়েক মুহূর্তে কী যেন হয়ে গেলো। মাত্র দু'-তিন মিনিটের মধ্যে স্ট্রেচার এলো। তাঁকে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাওয়া হলো। সভায় অশোকবাবুর শ্রোতাদের মধ্যেও একজন বিশিষ্ট চিকিৎসকও ছিলেন। তিনিও ছুটে এসেছিলেন।

সভা সেই মুহূর্তেই শেষ। সভা চলমান অবস্থাতেই তিনি সহাস্যে প্রধান অতিথিরূপে প্রবেশ করেছিলেন, সভার চলমান মুহূর্তে প্রধান অতিথি রাজার মতোই চিরবিদায় নিলেন। সংসারের চলমান নাটকে নাট্যকার বিধাতা একমাত্র তাঁর অতিপ্রিয় প্রধান চরিত্রদেরই এমনভাবে বিলম্বে প্রবেশ ও অগ্রিম প্রস্থানের সুযোগ করে দেন।

শ্রীচিন্ময়

সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় প্রবাসী বাঙালির নাম কী? এ-বিষয়ে আমার মনে যত জিজ্ঞাসা ছিল তার অবসান ঘটলো ১৯৮৬ সালে আচমকা নিউইয়র্কে ইউনাইটেড নেশনস ভবনে এসে।

না, এই শ্রদ্ধেয় জন কলকাতার লোক নন, যদিও কলেজ স্ট্রিটের চক্রবর্তী চ্যাটার্জির দোকানে তিনি এক-আধবার বই কিনতে এসেছেন। আমাদের বইপাড়া তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যময়ী নগরীতে যিনি পরম সম্মানের সঙ্গে তাঁর প্রিয় সাধনায় নিমগ্ন রয়েছেন

সেই মানুষটির সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তম জনপদের প্রায় কোনোরকম যোগাযোগ নেই বলতে একটু সংকোচ বোধ করছি।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মেছিলেন খাস কলকাতা শহরে। বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণ আন্দোলনের হোতা প্রভুপাদ এ সি ভক্তিবেদান্ত ওরফে অভয়চরণ দে জন্মেছিলেন কলকাতার শহরতলিতে। বিরাট এক নগরীতে গড়ে-ওঠার মানসিকতা নিয়েই ভারতবর্ষের জন্যে পশ্চিমের সিংহদ্বার খুলতে তাঁরা সাগরপারে পাড়ি দিয়েছিলেন এবং অভাবনীয় সাফল্যও অর্জন করেছিলেন।

এবার অবশেষে নিউইয়র্কে আমি যাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার সৌভাগ্য অর্জন করলাম তাঁর জন্ম চট্টগ্রামে বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত এক গণ্ডগ্রামে। গ্রামের নামটা জানা হয়নি, কারণ এই ধরনের মানুষ নিজের অতীত সম্পর্কে বিশেষ কথা বলতে আগ্রহ দেখালো না। কিন্তু নদীর নাম জানা হয়ে গিয়েছে—কর্ণফুলী। এই নদীই দীর্ঘ দ্বাদশ বছর ধরে একটি দুরন্ত বঙ্গীয় বালকের সংখ্যাহীন খেয়ালিপনার অংশীদার ছিল। সেই নদীর প্রাণশক্তিই এই ১৯৮৬-তে প্রাণবন্ত রয়েছে পঞ্চান্ন বছরের বিনম্র মানুষটির মধ্যে, যিনি এখনও পাতলা টেরিকটসের শাদা পাঞ্জাবি, শাদা ধুতি এবং পাম্পশু পরে আমাদের প্রজন্মের টিপিক্যাল বাঙালির ভাবমূর্তি বিদেশে অক্ষত রেখেছেন। আর মানুষটি এমন সব অসম্ভব কাজ করে চলেছেন যার মুগ্ধ স্বীকৃতি রয়েছে জানা অজানা নানা দেশের কীর্তিমান নরনারীর সশ্রদ্ধ নমস্কারে।

অথচ কী আশ্চর্য! আমাদের এই দেশে শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের নাম প্রায় অজানা বললেই হয়। ১৯৬৭ সালের প্রায় বিশ বছর বাদে সাতদিনের নোটিসে আবার যখন মার্কিন দেশ পুনঃভ্রমণের সুযোগ যখন এলো তখনই ঠিক করেছিলাম এবার এমন কিছু ভারতীয়র সন্ধান করবো যাঁরা নিজেদের প্রতিভায় ও সাধনায় বিদেশে মানুষের শ্রদ্ধার আসনটি সংগ্রহ করেছেন।

যাবার আগেই আনন্দবাজার অফিসের উদ্যোগী সম্পাদক অভীককুমার সরকারের ঘরে বসে কিছু নামধাম সংগ্রহ হলো। কেউ বললেন—অমুকবাবু জীব-বিজ্ঞানে বিদেশে খুব নাম করেছেন, অমুক এখন শল্যচিকিৎসায় বিশ্ববিদিত, অমুক এখন অর্থনীতিতে প্রায় একনম্বর, অমুকবাবু এমন এক সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্র তৈরি করে ব্যবসায় নেমেছেন যার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। খুব ভাল লেগেছিল এই তালিকা সংগ্রহ করতে। আরও

ভাল লেগেছিল সেই তালিকার মধ্যে কয়েকজন বোস, চক্রবর্তী, সেন, গুপ্ত ইত্যাদির সন্ধান পেয়ে। কিন্তু অস্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেই তালিকার তলার দিকেও কোনো ঘোষের উল্লেখ ছিল না।

আমার এই হঠাৎ দ্বিতীয়বার বিদেশে পাড়ি দেওয়ার ভিতরের কাহিনীটা অন্যত্র সবিস্তারে পাঠকের কাছে নিবেদন করেছি। স্বদেশ অথবা বিদেশ কোনো ভ্রমণই যে আমার ধাতে সয় না তা অনেকেরই অজানা নয়। আমি হচ্ছি সেই ধাতের ঘরকুনো যে শুতে পেলে বসতে চায় না, বসতে পেলে দাঁড়াতে চায় না, দাঁড়াতে পেলে যার হাঁটার কথাই ওঠে না! যে নামহীন মনীষী বহু বছর আগে বাঙালির কানে-কানে অঋণী, অপ্রবাসী হয়ে ঘরের দুধ-ভাত খেয়ে নিজের চেনা পল্লী-বটছায়ায় জীবনযাপনের মহামূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনিই আমার নমস্য। সেই দুরদর্শী পুরুষও আমার শ্রদ্ধাভাজন যিনি হুজুগে বাঙালিকে হুঁশিয়ার করেছিলেন—ঘরের খাও,কিন্তু বনের মোষ তাড়িও না। রক্তের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার নেশা চাগাড় দিলে যত খুশি ভ্রমণসাহিত্য পড়ো, তাতে মন না ভরলে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের গ্রাহক হও, কিন্তু কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে বুক পকেটে পাসপোর্ট নিয়ে কিছুতেই বিদেশ-বিভুঁইয়ে রওনা দিও না।

ট্র্যাভেল এজেন্সির বড় মেমসায়েব, ট্যুরিজম কর্পোরেশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানকে তামা-তুলসী স্পর্শ করে স্বীকারোক্তি করতে বলুন, তাঁরাও চুপি চুপি মেনে নেবেন, নিজের ঘরের কোণের মতন জায়গা বিশ্বভুবনে নেই—নাথিং লাইক হোম। নাথিং লাইক নিজের চৌকি— সে যতই নড়বড়ে হোক।

এই সব অকাট্য যুক্তির পরেও যদি জাম্বোজেটের বিমানবালাদের মোহিনী হাসি রঙিন ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপন-পাতা থেকে বেরিয়ে এসে কাউকে নীতিভ্রষ্ট হবার অবকাশ দেয়, তাহলে অগতির গতি রবি ঠাকুরের শরণ নিতে হবে। তিনিও অতি চমৎকার ভাষায় অযথা বহুদেশ ঘুরে ঘরের কাছে শিশিরবিন্দুকে অবহেলা না-করার স্ট্রং অ্যাডভাইস দিয়েছেন।

আমাদের ঘরকুনো সোসাইটি এখনও রেজিস্ট্রিকৃত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেনি। কিন্তু আমরা কয়েকজন সমভাবাপন্ন বঙ্গপুঙ্গব প্রায়ই জনসাধারণকে বলে আসছি, যদি কিছু দেখতেই হয় ঘরের কাছে কলকাতা দেখুন। এক নয়, পর পর সেভেন জেনারেশন ধরে এ-শহরের লীলাখেলা অবলোকন করলেও সিকিভাগ দেখা হবে না। জেনুইন বাঙালি হয়ে জন্মে

আপনার কিসের দুঃখ যে আচমকা বিবাগী সেজে বিদেশে যাবেন?

শুনুন, বিদেশ যাবার হাজার হাঙ্গামা। পাসপোর্ট অফিসে সিভিলিয়ান ড্রেসে চোরাগোপ্তা পুলিশ সব বসে আছেন। তাঁদের চাপা হুঙ্কার—তুমি কে বট হে? সুখে থাকতে কেন বিদেশে যাবার ভূত তোমায় কিলোচ্ছে? তাঁরা গোপনে-গোপনে মোটা মোটা খাতাপত্তর মেলাবেন—কবে আপনি কী গর্হিত কম্মো করেছেন। কোন অভিযোগে স্বনামে অথবা বেনামে আপনি জেল হাজতে বসবাস করেছেন? আপনার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মামলা ঝুলছে কি না? রাষ্ট্রবিরোধী কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী কোন কোন অপকর্মের সঙ্গে আপনার প্রকাশ্য অথবা গোপন যোগসাজশ রয়েছে? কিংবা কিঞ্চিৎ বিদেশী মুদ্রার লোভে আপনি দেশের শত্রুদের সঙ্গে সিক্রেট যোগাযোগ রেখে ভারতমাতাকে আবার গভীর গাড্ডায় ফেলবার তালে আছেন কি না, ছা-পোষা লোক হিসেবে বিখ্যাত কফি-পোষা আইনের খপ্পরে পড়বার চান্স আছে কি না তা-ও বাজিয়ে দেখা হবে—অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রায় বিদেশী বাণিজ্যে টু-পাইস করে আপনি গরিব ভারতমাতাকে কাঁচকলা ঠেকাচ্ছেন কি না তা-ও অতি সাবধানে বিচার-বিবেচনা করা হবে।

সাব-ইনেসপেক্টর বাবুর দরবারে এই সব প্রশ্নের আশানুরূপ সমাধান হলেও আপনার হাঙ্গামা শেষ হচ্ছে না। বিদেশের সরকার থেকে যদি আপনাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেয় তাহলে আপনাকে জননী-জন্মভূমির নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনার খরচাপাতি কীভাবে মেটানো হবে তার আগাম হিসেবও আপনাকে দাখিল করতে হবে।

নিজের দেশে জন্মে একই চৌহদ্দির মধ্যে সারাজীবন চরে বেড়ানোর একটা মস্ত সুবিধে, কারও পিতৃদেবের সাহস হবে না আপনাকে এই সব আজেবাজে প্রশ্ন করে ঘাঁটাবার।

স্বদেশের মাটিতে দিশীভায়ের খোঁচামারা কোশ্চেন তবু তো সহ্য হয়! কিন্তু অজানা দেশের এয়ারপোর্টে পাসপোর্ট ও ভিসা থাকা সত্ত্বেও ভিনদেশের ইমিগ্রেশন-রমণী আপনার দিকে বরফ-ঠাণ্ডা চোখে এমনভাবে দৃষ্টি হানবেন যেন আপনি কোনো মহা অপকর্ম করবার জন্যেই নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে ভিনদেশের দরজায় হাজির হয়েছেন।

মিষ্টি-মিষ্টি কণ্ঠে হাড়জ্বালানো প্রশ্ন : কেন আসা হয়েছে? কী কী কাজে এখন মন দেওয়া হবে? পরের দেশে ঢুকে পড়ে পাকাপাকি গেঁড়ে

বসবার কোনো কুমতলব নেই তো ? টক-ঝাল প্রশ্ন শুরু হলে আর থামতে চাইবে না।

ইমিগ্রেশন-দিদিমণিকে আপনি হয়তো অনেক কষ্টে সন্তুষ্ট করলেন। কিন্তু তাতেও মুক্তি নেই। তিনি কমপিউটারের সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা বলে আপনাকে আর-এক কদম এগোতে দিলেন। অমনি ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার—অর্থাৎ আপনি কাস্টমসের খপ্পরে পড়লেন।

কাস্টমস বলতে ছোটবেলায় ইংরিজিতে পড়েছিলাম আচার-ব্যবহার—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ইউনিফর্ম-পরা একদল সন্দেহবাজ লোক, যাঁদের ধারণা আপনি স্পেশাল কায়দাকাকুন করে গাঁজা-সিদ্ধি-চরস অথবা সোনা-রুপোর বাট নিয়ে নিরীহ একটি দেশের নৈতিক চরিত্র এবং অর্থনীতি ডোবাতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন, কিন্তু সদাসতর্ক 'কাস্টমসদা' তা কিছুতেই হতে দেবেন না।

এ ছাড়াও তৃতীয় এক ভাবনা সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ভ্রমণ-হাঙ্গামায়। বেশ, আপনি পরের দেশে ঘরজামাই থাকতে কিংবা গাঁজা বেচতে আসেননি ভাল কথা, কিন্তু আপনি যে বিমান অথবা বিমানবন্দর বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার প্যাঁচপয়জার কষছেন না তার গ্যারান্টি কোথায় ?

আপনি বলবেন, রাইস ইটিং ভেতো বাঙালি আমি। মুখের ভাব দেখে মানুষ চিনলেন না, এতোদিন আরক্ষা লাইনে থেকেও ! তাহলে শুনবেন, তথাকথিত নিরীহ, ফ্রায়েড ফিশ যারা উল্টে খেতে পারে মনে হচ্ছে না, তাদের মাসতুতো ভাইরাই মহাশূন্যে বিরাট-বিরাট প্লেন হাইজ্যাক করেছে। চান্স পেয়ে পাঁচ টাকার চোর কোটি-কোটি ডলার পণ দাবি করেছে। আগে বাঙালি পুত্রের ভাগ্যবান বাপই মেয়ের বাপের কাছ থেকে বরপণ দাবি করতো। এখন মওকা পেলেই দুনিয়ার যে-কোনো লোক মুক্তিপণ চেয়ে বসে। অথচ পণপ্রথার কালিমা কেবলমাত্র ইন্ডিয়ান জাতের ওপরেই থেকে গেলো !

যাই হোক, এই সব দুঃখেই কুড়ি বছর আগে পাওয়া নিজের পাসপোর্টকে চিরকালের জন্যে অকেজো করে মনের সুখে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছিলাম। কিন্তু কপালে দুঃখ লেখা ছিল, কুড়ি বছরের পুরনো বিষ আবার শরীরে ফুটে বেরুলো, আমি পাকেচক্রে সাতদিনের নোটিশে আবার আমেরিকায় হাজির হলাম।

কোথায় কী অঘটন ঘটলো ? কে যাতায়াতের ব্যবস্থা করলো ?

ইমিগ্রেশন রমণী আমাকে কীভাবে একাধিকবার হাতের লেখা প্রাকটিস করতে বললেন, জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্ট দেখে আমার দিশেহারা অবস্থার কী পরিণতি ঘটলো এবং কীভাবে হাতে-বাঁধা তাবিজের কল্যাণে সব বাধাবিপত্তি ডোন্টকেয়ার করে আমি ওহায়ো রাজ্যের ক্লিভল্যান্ড শহরে ধুতি-চাদর পরা প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজের খপ্পরে পড়লাম সে-সব সংবাদ অন্যত্র যথাসময়ে নিবেদন করেছি। আপাতত ধরে নিন আমি নিউইয়র্কে।

আমি আছি ম্যানহাটান দ্বীপপুঞ্জে ইউ-এন বিলডিংসের খুব কাছে। যিনি আমাকে পরমানন্দে সাময়িক আশ্রয় দিয়েছেন, বয়সে তরুণ হলেও তিনি এক কেষ্ট-বিষ্টু ব্যক্তি—ইউ-এন অফিসের তাবড়-তাবড় স্থায়ী প্রতিনিধি তাঁকে কথায়-কথায় হিজ এক্সেলেন্সি বলে সম্মান প্রদর্শন করেন। নাম জনাব আনোয়ার-উল করিম চৌধুরী, আমাদের 'জয়'। ইউ-এন-ও-তে বাংলাদেশ সরকারের দু'নম্বর স্থায়ী প্রতিনিধি। এক নম্বর পদ খালি, সুতরাং অস্থায়ী চার্জ দ্য মিশন।

এতো সায়েবসুবো টেলিফোনে এবং সামনাসামনি আমার স্নেহভাজন এই বঙ্গসন্তানটিকে 'ইওর এক্সেলেন্সি' বলছে শুনে কান জুড়িয়ে গেলো। মনে হলো বঙ্গজনম সার্থক হলো। জিন্দা রহো বাংলাদেশ। জয় বাংলা বলতে লোভ হচ্ছিল, কিন্তু সম্প্রতি-ছড়ানো চোখের রোগটির ডাকনাম স্মরণ করে চুপচাপ থাকাই প্রশস্ত মনে হলো।

ম্যানহাটানে আনোয়ারের বাড়িতে বসেই বিদেশে বিখ্যাত বাঙালিদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। সম্পাদক অভীক সরকার নিজের ঠাণ্ডাঘরে বসিয়ে পই-পই করে বলে দিয়েছেন, নতুন-নতুন জিনিস দেখে আসতে হবে। "মনে রাখবেন, সাতষট্টি সালের বিদেশ-ভ্রমণ থেকে 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' লিখে খালি মাঠে গোল করেছিলেন। এখন আমেরিকা সবার অত্যন্ত জানা দেশ, ওদেশ সম্বন্ধে যত লেখার বিষয় ছিল তা এই ক'বছরে প্রায় সব লেখা হয়ে গিয়েছে—সুতরাং অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে অজানা দৃষ্টিকোণ খুঁজে বার করতে হবে।"*

সম্পাদকের এই সাবধানবাণী বিদেশে আমার সব সুখ কেড়ে নিয়েছে, কিছুই প্রাণভরে উপভোগ করতে পারছি না। হাজার-হাজার শিক্ষিত.

* এই লেখকের জানা দেশ অজানা কথা

বাঙালি ঘন-ঘন আমেরিকায় আসছেন-যাচ্ছেন। তাঁদের সবারই চোখ দুটো ভগবান একই জায়গায় এঁকেছেন—সুতরাং দৃষ্টিকোণ নতুন হবে কী করে? ক'দিনে বিদেশে ঘুরে-বেড়িয়ে অজানা এমন কী দেখা যাবে যার সম্বন্ধে এখনও লেখা হয়নি? ঘরে ফিরে গিয়েই লিখতে বসতে হবে এই দুশ্চিন্তা নিয়ে যে-মানুষ ভ্রমণে বের হয় তার মতো অভাগা এই পৃথিবীতে কে আছে?

বিখ্যাত বাঙালি বলতে নিউইয়র্কে বিশ বছর আগে রবিশঙ্করকে দেখেছিলাম। তখন প্রচণ্ড নাম-ডাক তাঁর। আমার নামের পাশেও একটা শংকর থাকায় কিছুটা সুবিধেও হয়েছিল। দু'একটি কিশোরী শ্বেতাঙ্গিনী জানতে চেয়েছিলেন আমি ও রবি আত্মীয় কি না। রবিশঙ্কর ইতিমধ্যে দেশে ফিরে গিয়েছেন। চোখের সামনে সারাক্ষণ না থাকলে এদেশের মানুষ কাউকেই মনে রাখতে চায় না, একমাত্র যীশুখ্রিস্ট ছাড়া। আর একজন কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অন্য রেকর্ড করবেন—বাংলাদেশের হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, ইউ-এন জেনারেল অ্যাসেমব্লির প্রথম (আমাদের জীবনের শেষ) বাঙালি সভাপতি হবেন। একশ পঁচিশ বছরের মধ্যে এ সুযোগ আর আসবে না। কিন্তু হুমায়ুন চৌধুরী জেনারেল অ্যাসেমব্লির গদিতে বসবার আগেই আমি নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

বিদেশে বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, ব্যবসায় ও পেশায় কৃতী ভারতীয়দের তালিকা আমার নোটবইয়ে ইতিমধ্যেই কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আনোয়ার-উল করিম চৌধুরী হঠাৎ শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের কথা তুললো। আমি ওঁর সম্বন্ধে কোনো খোঁজখবর রাখি না শুনেও সে কিছুটা অবাক হলো। "শ্রীচিন্ময়ের নাম সত্যিই কলকাতায় আপনারা শোনেননি?"

অপরাধ নতমস্তকে স্বীকার করে নিতে হলো। আনোয়ার স্বভাবে অতি শান্ত ও বিনয়ী। কিন্তু হাবেভাবে সে যা বললো—গেঁয়োযোগী নিজের গাঁয়ে ভিখ পায় না, কিন্তু অন্য গাঁয়ে পূজা পেলে সে-খবর তার নিজের গাঁয়েও অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বাঙালিদের চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা—কোনো মানুষের সামান্য মঙ্গলও পরশ্রীকাতরের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

আনোয়ার বললো, "চলুন আপনাকে ইউ-এন ঘুরিয়ে আনি।"

যন্ত্রবৎ বিশাল ভবনটির একের পর এক তলা ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেই সব জায়গা দেখছি, যা প্রায়ই সংবাদপত্রের শিরোনামায় উপস্থিত

হয়। সেই সব সভাকক্ষ, যেখানকার আলাপ-আলোচনায় বিশ্বের কোটিকোটি অসহায় মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

বেশ কয়েকটি তলা ঘোরার পর কফিশপে এসে আমার প্রদর্শক জিজ্ঞেস করলো, "স্পেশাল কিছু নজরে পড়লো?"

"নজরে পড়েছে, কিন্তু তুমি বয়োকনিষ্ঠ, বলতে সংকোচ বোধ করছি। মহিলাদের বেশবাস লক্ষ্য করে একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠছি—শাড়ি ব্লাউজ এতো বেশি দেখবো আশা করিনি। শাড়ি কি শেষ পর্যন্ত ইউ-এন বিজয় করবে? মেমসায়েবদের বেশ দেখায় কিন্তু এই শাড়িতে।"

"এই তো পয়েন্টে এসে গিয়েছেন!" বললেন আমাদের আর একজন বাংলাদেশি সঙ্গী, যিনি ইউনিসেফে কাজ করেন। তাঁর কাছে জানা গেলো, "পৃথিবীর পাঁচ মহাদেশের শত শত মহিলাকে এখানে শাড়ি পরতে দেখবেন। শাড়ির নমনীয়তা ও সহজাত সৌন্দর্য এঁদের আকৃষ্ট করেছে ভেবে ভুল করবেন না। এর পিছনে রয়েছেন একজনই—তিনি শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ।"

আমি আরও সজাগ হয়ে উঠলাম। শ্বেতাঙ্গিনী, কৃষ্ণাঙ্গিনী, চীনা, জাপানি সব রকমের শাড়ি পরিহিতা মহিলাই নজরে পড়লো। ইন্ডিয়ান সিল্কের প্রচারকরা নিজের চোখে এই দৃশ্য দেখলে উর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করতেন।

হাঁটতে-হাঁটতে এবার আরও বিস্ময়! শুনলাম, এইসব মহিলা নাকি শুধু শাড়িই পরেন না, সবাই বাংলা গান জানেন। এক আধটা নয়, কয়েক শত। আনোয়ার বললো, "কিছুদিন আগে কার্নেগি হল-এ এক অনুষ্ঠানে এরা আমাকে অবাক করেছিল। কয়েক শ সায়েব-মেম শ্রীচিন্ময়ের নির্দেশে কয়েক ডজন বাংলা গান শোনালো, এমন কি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতও!"

সেই সভায় ইউ-এন-ও-র অসংখ্য দেশের জাঁদরেল সব প্রতিনিধি দল বেঁধে গিয়েছিলেন। সভাগৃহ একেবারে বোঝাই। ইউ-এন সেক্রেটারি জেনারেল তো বিশেষ ভক্ত, হুট বলতেই চলে আসেন শ্রীচিন্ময়ের ডাকে। এবং এ-ব্যাপারটা আজকের নয়—শুরু হয়েছিল উ-থান্টের সময়ে। তারপর যিনিই এ-পদে বসেছেন তিনিই শ্রীচিন্ময়কে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন—কুর্ট ভেল্ডহাইম, দ্য কুয়েলার পর্যন্ত। কিছুদিন আগে জেনারেল অ্যাসেমব্লির সভাপতি ছিলেন Jorge Illueca (বাংলা উচ্চারণ জর্জ ইউয়েকা)—এখান

থেকেই পানামার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। ইনিও চিন্ময়ভক্ত।

এবার আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। খবরাখবর নেওয়া শুরু করলাম। সরকারি ব্যাপারে এই ইউ-এন-ও—নিজের দেশের সরকারি তকমা পরে এখানে সবাই আসেন। এর মধ্যে অদ্ভুত এক ব্যতিক্রম এই শ্রীচিন্ময় ঘোষ। সেক্রেটারি জেনারেলের আমন্ত্রণে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইউ-এন মেডিটেশন সেন্টার—প্রতি সপ্তাহে দু'দিন দুপুরে লাঞ্চ ব্রেকের সময় শ্রীচিন্ময় এখানে আসেন। তখন বেসমেন্টের সভাঘরে প্রবল উদ্দীপনা দেখা যায়। হয়তো দেখবেন কানাডার রাষ্ট্রদূতের পাশেই হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছেন সুইডেনের স্থায়ী প্রতিনিধি, তাঁর পিছনেই হয়তো জাপানের সহকারী রাষ্ট্রদূত এবং কোরিয়ার প্রবীণ প্রধান। একটু পরেই হয়তো হাজির হলেন ইউ-এন-ওর এক নম্বর দু'নম্বর কর্ণধাররা। তার পাশের আসনটিতেই হয়তো একজন সাধারণ মহিলাকর্মী।

সপ্তাহে দু'দিন এঁরা এখানে আসবেনই—হয়তো একশ পঁচিশটা দেশেই রয়েছে কিছু শ্রীচিন্ময়-অনুরাগী।

এই দু'দিন ছাড়াও প্রতি মাসে ইউ-এন-ও-র নিমন্ত্রণে শ্রীচিন্ময় ড্যাগ হ্যামারশিল্ড স্মৃতি-বক্তৃতা করেন। নানা বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যেও ড্যাগ হ্যামারশিল্ড এখানে একটি অতি শ্রদ্ধেয় নাম। তাঁর একটি কথা শ্রীচিন্ময়ের খুব প্রিয়—'যে শান্তি সবাইকে শান্তি দিতে পারে না তা শান্তি নয়।' স্মৃতি-বক্তৃতা চলেছে বছরের পর বছর ধরে, কিন্তু শ্রোতার এবং ভক্তের অভাব হয় না, প্রায়ই বসবার সব আসন বোঝাই হয়ে যায়।

যেখানে পদে-পদে এক দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে আর-এক দেশের প্রতিনিধির মতভেদ সেখানে শ্রীচিন্ময়ের ব্যাপারে অনেকের একমত হওয়া বেশ আশ্চর্য ব্যাপার। এই তো কিছুদিন আগে ইউ-এন-ও-র চল্লিশতম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপিত হলো, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনো অফিসিয়াল বাণী দেওয়া সম্ভব হলো না, এ বাণীর বয়ান নিয়ে দু'দলের মধ্যে প্রবল মতভেদ হলো। কিন্তু বেসরকারিভাবে অনেকেই এলেন শ্রীচিন্ময়ের মেডিটেশন সেন্টারে। কর্তাব্যক্তিরা তাঁকে শুভদিন উপলক্ষে অভিনন্দিন জানালেন। সেই ১৯৭০ সাল থেকে তিনি এখানে অসংখ্য মানুষের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনা জাগ্রত করেছেন—ধর্মমত বিভিন্ন, কিন্তু তাতে কোনো বাধা সৃষ্টি হচ্ছে না।

আমার প্রদর্শকদের জরুরি কাজকর্ম ছিল। তারা একটি শ্বেতাঙ্গিনী

শাড়ি পরিহিতার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় নিলো। মেয়েটি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, "আমাকে ডেকো 'ঋজুতা' বলে।" এটা যে আমাদের দিশি নাম তা বুঝতে একটু সময় লাগলো। মিষ্টি হেসে মেয়েটি বললো, "পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আমরা এসেছি এখানে। আমাদের সেতু হচ্ছেন শ্রীচিন্ময়।"

"মিস্টার চিন্ময় ঘোষ বলো না কেন?"

"বাঃ রে, শ্রী কথাটা কি কম মিষ্টি? দেখো, উনি আমাদের কোনো বন্ধনের মধ্যে ফেলেন না। কিন্তু আমরা যখন ওঁর খুব কাছে আসতে চেষ্টা করি তখন ভাবি উনি কবে খুশি হয়ে আমাদের একটা বাংলা নাম দেবেন। বাংলা নাম পাবার জন্যে কত লোক পাগল! আমাদের মধ্যে এখানে পাবেন 'নয়না', 'নীলিমা,' 'রঞ্জনা'।"

"তোমরা এই সব নামের অর্থ বোঝো?"

"বাংলা তো জানি না, কিন্তু ওঁর কাছে মানে জেনে নিই—আমার নামের অর্থ স্ট্রেট, কোনো আঁকা-বাঁকা নেই। শ্রীচিন্ময় কখনও-কখনও আবার মজার নাম রাখেন ইচ্ছে করে—আমার এক বান্ধবীর নাম রেখেছেন 'লোভনীয়া'। হাউ সুইট!'

"এই মেয়েটির কি একটু-আধটু খাবারের লোভটোভ আছে?'

"ও নো। না না! শী ইজ অ্যাট্রাকটিভ! পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিই যে অ্যাট্রাকটিভ এই দুর্লভ শিক্ষা আমরা শ্রীচিন্ময়ের কাছে পেয়েছি।"

শুধু মেয়েদের নয়, পুরুষ সায়েবদের মধ্যেও বাংলা নাম পাবার জন্যে হুড়োহুড়ি। পৃথিবীর সেরা শহরের সেরা দরজির তৈরি সর্বাধুনিক সুট পরিহিত সুদর্শন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, তার নাম 'কাঙাল'। ওই কাঙাল আসছে—কিন্তু নিজের চোখে ইউ-এন ভবনে তাকে রাজকীয়ভাবে না দেখলে মনে হতো স্বপ্নে উলটোপুরাণের দেশ দেখছি।

কাঙাল শব্দটির ইংরিজি অর্থ যে 'বেগার' তা আমার নতুন পরিচিতাকে বিব্রত করলো না। বললো, "কাঙাল নিজেই বলেন উনি হলেন 'ডিভাইন বেগার'।"

আর একটি শাড়ি পরিহিতা শ্বেতাঙ্গিনী আমাদের দলে যোগদান করলেন। তরুণী, তন্বী ও সুন্দরী। আমার পরিচয় পেয়ে বললেন, "তুমি কত ভাগ্যবান! তুমি বাংলায় জন্মেছো, তুমি বাংলা জানো। আমরা বাংলা জানি না, শ্রীচিন্ময় অনেক সময় বাংলায় কথা বলেন, আমরা আন্দাজে

বুঝে নিই। তোমার মতন বাংলা জানা থাকলেও ওঁর আরও কাছে আসতে পারতাম।"

এঁদের প্রায় কেউই ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে আসেননি। কিন্তু বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মা হয়ে যাবার জন্যে কী আন্তরিক চেষ্টা!

"কে তোমাদের শাড়ি পরতে বলেছে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"কেউ না! শ্রীচিন্ময় খুশি হলেও হতে পারেন এই ভেবে নিয়ে আমরা শাড়ি পরে অফিসে আসি। উনি তো আমাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। মনে রেখো, অনেকেই ওঁর সভায় আসেন, নিজের-নিজের পোশাক পরে। ও-নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই কারুর।"

ইতিমধ্যে আমরা আবার একটা কফিকেন্দ্রে ঢুকে পরেছি। শাড়ি পরিহিতা নবাগতা যে একজন ফরাসি তা বোঝা গেলো। ফরাসিনীকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী এমন শিক্ষা তোমরা ওঁর কাছে পাও যা তোমাদের এমনভাবে বিস্মিত করে?"

"একদিন আমাদের দুপুরবেলা মেডিটেশনে এসো নিজের কানেই শুনবে। আজকাল বেশিরভাগ সময় অবশ্য নিস্তব্ধতা—কোনো কথাই হয় না, কিন্তু এমন একটা পরিবেশ গড়ে ওঠে যে আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই খুঁজে পাই। তারপর কিছু কিছু গান হয়, আমরা যে যা পারি গাই—বেশিরভাগ বাংলা গান। এতো বিভিন্ন ভাষার মানুষ উপস্থিত থাকেন, কিন্তু অসুবিধা হয় না—বাংলার সুর ওঁদের হৃদয়ে পৌঁছে যায়।"

আমি শিক্ষা সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করি। ফরাসি যুবতী কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললো, "উনি আমাদের বলেন মানুষকে দেখলেই প্রথমে তার কী নেই তা মনে আনবে না—প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তো সীমাহীন সম্ভাবনা রয়েছে।"

আমি বললাম, "এই কথা আমাদের দেশে যুগযুগান্ত ধরে বলা হচ্ছে।"

"হাউ লাকি ইউ আর!" ফরাসি সুন্দরী এবার যেন আমাকে হিংসে করতে আরম্ভ করলো। "তোমরা, পূর্বদেশের লোকরা, মানুষের অমূল্য চিন্তার মণিমাণিক্য হাজার-হাজার বছর ধরে লুকিয়ে রেখেছো। এবার আমরা শ্রীচিন্ময়কে পেয়েছি, আস্তে-আস্তে কুড়িয়ে নেবো আমরা, তোমাদের মতো সব বুঝে নিতে একটু সময় লাগবে এই যা।"

আমাদের টেবিলে আর এক মহিলা এসে যোগ দিলেন। বললেন,

"আমি নতুন এসেছি—সবাইকে চিনি না—কিন্তু ধ্যানসভায় গিয়ে খুব শক্তি পাই। ওই দু'দিন আমি লাঞ্চ খাই না, সোজা ওখানে চলে যাই। সব বুঝি না, কিন্তু ভাল লাগে।"

ফরাসিনীর কাছে আমার এখনও কিছু জানবার আছে—জীবনযাত্রা সম্বন্ধে শ্রীচিন্ময়ের কোনো বিশেষ নির্দেশ আছে কি না?

"অনেকদিন ধরে যোগাযোগ রেখেছি। কখনও কিছু নির্দেশ দেন না। খুব ধরাধরি করলে বলেন, দিনে একবার ধ্যানে বোসো। যারা আরও এগোতে চায় তারা দিনে দু'বার। তবে আমরা সারাক্ষণ চেষ্টা করি খুঁজে বার করতে কিসে চিন্ময় খুশি হন। যেমন ধরো আমি স্মোক করতাম—ছেড়ে দিয়েছি। নিজের মন থেকেই যেন নির্দেশ পেলাম। ড্রাগের নেশা আমার ছিল না—দু' একজন নিজের অন্তরের তাগিদেই ড্রাগকে গুডবাই করেছে। মাংস আমি অফিসিয়ালি ছাড়িনি—কিন্তু মাংস আমার আর ভাল লাগে না, আমি এখন ওঁর মতন ভেজিটেরিয়ান হতে চাই।"

আমি সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে আছি। সে হেসে বললো, "আমি একবার ওঁকে একান্তে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি সরল শিশুর মতন হেসে বললেন 'যা নিজে ভাল মনে করবে তাই করবে'—ডুইং দ্য রাইট থিং—তাই চেষ্টা করি, মনে অনেক শান্তি পেয়েছি।"

উল্টোপুরাণের দেশে গভীরে ঢুকে যাচ্ছি আমি! এই সব যোগাযোগ, তন্ত্রমন্ত্র-তপস্যায় আমার তেমন বিশ্বাস নেই। যদিও ছোটবেলা থেকে মঠে-মিশনে আমার যাতায়াতের সুযোগের অভাব হয়নি। পশ্চিমের বিজ্ঞানী মন এখনও খুব বিচক্ষণ এবং যুক্তির ছাঁকনিতে যাচাই না করে কোনো কিছুই তারা গ্রহণ করে না, এই খবর আমার জানা ছিল। কিন্তু আমার অবস্থা বুঝুন। খোদ নিউ ইয়র্ক শহরে, ইউ-এন ভবনের কফি টেবিলে বসে আমি অতীত ভারতবর্ষের আকর্ষণে সম্মোহিত যুবক-যুবতীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। তারা বিশ্বাস ক'রে সুখী হতে চায়।

মেয়েরা আমার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে এবার নিচু গলায় গান ধরলো। মেমরা গাইছে বাংলায় :

"নামিছে আজ আনন্দ প্লাবন
মৃদুল পবন প্রাণে করে আনন্দ বহন
ভাঙিছে মোর সকল বন্ধন
খুলিছে সব দ্বার

মিলি গেছে ব্যথাভার
যত অন্ধকার।"

মার্কিন, ফরাসি এবং ব্রিটিশ উচ্চারণের ঐকতান ! বাংলা কথাগুলো কিছু বুঝছি, কিছু হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। কিন্তু বিপুল উদ্দীপনা বোধ করছি। মনে হচ্ছে এবার নিউইয়র্কে না এলে আমার ভারতসন্ধান অপূর্ণ থেকে যেতো।

মেয়েটি খুব লজ্জা পাচ্ছে—উচ্চারণে দীনতার জন্য ক্ষমা চাইছে বার-বার। আর আমার লজ্জা ততই বাড়ছে। গানটি আমি বাংলায় লিখে নেবার চেষ্টা করে সফল হচ্ছি না দেখে একজন সুন্দরী বলে উঠলো, "আমি বাংলা অক্ষর জানি না। কিন্তু যদি তুমি কিছু মনে না করো, রোমান অক্ষরে লিখে দিতে পারি।"

অবাক কাণ্ড। অতি দ্রুত ছ'টা লাইন ইংরিজ অক্ষরে লেখা হয়ে আমার হাতে চলে এলো। মার্কিন সুন্দরী বললো, "গান শেখবার আগে আমি এইভাবে লিখে নিই—দরকার হলে কমপিউটারে জমা করে রাখি।"

"কত গান জানা আছে?"

আবার অবাক হবার পালা। দু'শ-তিনশ বাংলা গান এদের কাছে কিছুই নয়। ওরা ততক্ষণে আমাকে নিজের নামে ডাকতে আরম্ভ করেছে। "তুমি জানো শংকর, ওঁর যখন মুড আসে তখন শত-শত গান লিখে ফেলেন। তারপর নিজেই সুর দেন। আমরাও অভ্যেস করে নিই।"

"কিন্তু তোমরা কি অন্ধের মতো অনুকরণ করো? না কিছু বুঝতে পারো?"

হাসলো ফরাসিনী। "আনন্দ প্লাবন আমরা বুঝতে পারি—ফ্লাড অফ ডিলাইট। কিন্তু তেমন বুঝতে পারি না—মৃদুলপবন প্রাণে করে আনন্দ বহন। 'লম্বু'র কাছে একবার বুঝতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও বলেছিল ইণ্ডিয়ান ওয়েদার এবং মেটিরিওলজি সম্বন্ধে ক্লিয়ারকাট আইডিয়া না থাকলে টোটাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং সম্ভব নয়।"

আমার ভাল লাগছে, আবার ভয়ও লাগছে। পূর্বদেশীয় গুরুদের সম্বন্ধে এখন সমস্ত মার্কিন দেশের জনসাধারণের যথেষ্ট সন্দেহ। এঁদের কয়েকজনের কীর্তিকাহিনী ফলাও করে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে—খুন জখম গুণ্ডামি।

স্বেচ্ছাচার কোনো কিছুই এই সব কাহিনী থেকে বাদ থাকেনি।

অধ্যাত্মবাদীদের সম্পর্কে জনগণের এই সন্দেহের কথা আমি ইচ্ছে করেই তুললাম। মার্কিন যুবতী হাসলো। "ঠিক একই প্রশ্ন শ্রীচিন্ময়কে করেছিলাম একজন স্থানীয় সাংবাদিক। উনি কোনো রকম বিরক্তি না দেখিয়েই চমৎকার উত্তর দিলেন। বললেন, 'একই পরিবারের একজন ভাই হয়তো ভাল, আরেক ভাই হয়তো, খুব খারাপ। কিন্তু এই খবর থেকে সেই পরিবারের অন্য লোকরা ভাল কি মন্দ আন্দাজ করাটা কি যুক্তিযুক্ত হবে?' কাগজটা আমার বাড়িতে আছে, তোমাকে দিতে পারি—এখানকার কাগজওয়ালারা কাউকে অন্ধভাবে স্তুতি করে না, লেখার আগে অনেক কিছু বাজিয়ে দেখে।"

মহিলারা অতিমাত্রায় অতিথি-বৎসলা। আমাকে একবারও কফির দাম দেবার সুযোগ দিলো না। শ্রীচিন্ময়ের দেশের লোক পেয়ে মৃদুল পবন কেমন করে প্রাণে আনন্দ বহন করে নিয়ে যায় তা জানবার চেষ্টা করতে লাগলো পূজারিণীর প্রসন্নতায়।

ইতিমধ্যে আমার স্থানীয় গার্জেন নিজেদের কাজকর্ম সেরে কফিশপে ফিরে এলো আমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে। আনোয়ার বললো, "সুখবর আছে। আগামীকাল দুপুরে আপনি ইচ্ছে করলে ইউ-এন মেডিটেশন সেন্টারে উপস্থিত থকতে পারেন। তার থেকেও সুখবর, শ্রীচিন্ময়ের সঙ্গে আপনার একান্তে দেখা হবার এবং কথাবার্তা বলার সম্ভাবনা রয়েছে। কোথায় দেখা হবে, কখন দেখা হবে তা আজ রাত্রেই জানা যাবে। আপনি একজন বিখ্যাত বাঙালির সঙ্গে পরিচয়ের জন্যে তৈরি হয়ে থাকুন।"

মেয়েরা বললো, "কাল আবার দেখা হচ্ছে প্রার্থনাসভায়।"

আমি বললাম, "আরও বাংলা গান গাইবে তো?"

ওরা বললো, "সেটা নির্ভর করবে শ্রীচিন্ময়ের নির্দেশের ওপর। উনি যা চাইবেন আমরা তা করবো।'"

"সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই তীর্থক্ষেত্রে এসে শেষ পর্যন্ত গুরু-ফুরুর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন!" শ্রীচিন্ময়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আমি প্রস্তুতি হচ্ছি জেনে নিউ ইয়র্কের এক বাঙালি শুভানুধ্যায়ী মিস্টার সেন আমার সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

এই ভদ্রলোক সন্ধেবেলায় বললেন, "জ্ঞানকে কিভাবে মানুষের ভোগে

নিয়োগ করা যায় তার জন্যে পৃথিবীর বৃহত্তম কর্মযজ্ঞ চলছে নবীন এই মার্কিন মহাদেশে। জাপান-টাপান যাই বলুন, কেউ এখনও এর নখের যোগ্য নয়। সমস্ত কিছু মন দিয়ে লক্ষ্য করে দেশে ফিরে গিয়ে মানুষকে কোথায় বলবেন—হচ্ছে হচ্ছে হবে-হবে মনোবৃত্তি ত্যাগ করে বিজ্ঞানের সাধনায় ঝাঁপিয়ে পড়ো, তা নয় এই বিদেশেও সাধু-সন্ন্যাসীর দিকে মন দিলেন !" আমার বিজ্ঞানীবন্ধু সেনসায়েবের কণ্ঠে কিছুটা উদ্বেগ, কিছুটা সমালোচনার সুর।

বললাম, "যতটা খবর পেয়েছি, এই শ্রীচিন্ময় সাধুও নন, সন্ন্যাসীও নন। ভারতের যুগ যুগান্তের চিন্তাধারার একজন বিশ্লেষক ও প্রচারক মাত্র।"

আরও বললাম, "আমাকে ক্ষমা করুন, এই আধ্যাত্মিক মানুষদের সম্পর্কেই তো সায়েবদের যত আগ্রহ—রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, বিজ্ঞানে আমরা যতটুকু করছি তা পশ্চিমের মনে এখনও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। স্রেফ জাপানের মতন স্বীকৃতিটুকু পেতেই বহু যুগ কেটে যাবে। অথচ অধ্যাত্মবাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে এদেশে এখনও সুবিপুল কৌতূহল।"

সেনসায়েব বললেন, "শুনুন শংকরবাবু, গুরুর ভেক ধরে কত লোক যে এদের ঠকাচ্ছে। এক-একজন এক-একটা 'কাল্ট'-এর সৃষ্টি করছে—তারপর রঙিন ফানুস ফেটে যাচ্ছে, ভারতবর্ষের বদনাম হচ্ছে। একটা কথা জেনে রাখবেন, এই দেশ ঠকতে রাজি নয়—ঠকালে এদের মেজাজ ঠিক থাকে না।"

"স্বামী বিবেকানন্দ, প্রভুপাদ এ সি ভক্তিবেদান্ত—কেউ তো এঁদের ঠকাননি। বাঙালি প্রভুপাদ সত্তর বছর বয়সে দুর্জয় মনোবল নিয়ে এই তো সেদিন নিউইয়র্ক সেন্ট্রাল পার্কে খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন শুরু করে যে অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করলেন তা ভারতের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু নিজের ঘরে বিবেকানন্দের মতন স্বীকৃতি তিনি আজও পেলেন না।"

সেনসায়েব সুরসিক, এককালে প্রচুর বাংলা চর্চা করতেন তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। মিষ্টি হেসে তিনি উদ্ধৃতি দিলেন, "একদিন প্রভুপাদের শেষজীবন খুবই ড্রামাটিক।"

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম/সর্বত্র হইবে প্রচার মোর নাম।

দেশে থাকতে ছোটবেলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবমঠে আমিও শুনেছিলাম। শ্রীচৈতন্যের এই বাণী যে এমনভাবে কারও সাধনায় সত্য হবে তা কল্পনার অতীত ছিল। আমেরিকায় খোল করতাম বাজিয়ে কৃষ্ণনাম প্রচার করে ভক্তিবেদান্ত তা সার্থক করলেন ১৯৬৫ সালে জীবনের সায়াহ্নবেলায়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে কী হচ্ছে দেখুন!"

বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে সেবারেই ইসকন সম্পর্কে কিছু দুশ্চিন্তা করার মতন খবর বেরিয়েছে—এঁদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থাকছে না।

সেনসায়েব এবার একটি ছোটখাট বিস্ফোরণ ঘটালেন। "প্রভুপাদকে আমি শ্রদ্ধা করি, মাত্র বারো বছর বয়সে কার্তিক বোস ল্যাবরেটরির প্রাক্তন কর্মচারী বিদেশে যা করেছেন তা তুলনাহীন, কিন্তু সায়েবদের বোধহয় তিনি পুরোপুরি চিনতে পারেননি।"

"কী বলছেন, মিস্টার সেন।"

"আমি ঠিকই বলছি। ভারতীয় গুরুর সায়েব-ভক্ত দেখলে আমরা খুব আনন্দ করি। আমার কথা হচ্ছে, ভক্ত হিসেবে এদের সম্মান দেখান, কিন্তু ভুল করেও সায়েবদের কখনও গুরুর পদে বসাবেন না"।

আমার মুখের দিকে তাকালেন মিস্টার সেন। "অভয়চরণ দে ওরফে ভক্তিবেদান্তের প্রথম ভুল হলো—তিনি ওভার-এস্টিমেটেড দ্য অ্যামরিকানস্। আমেরিকানরা কোনোদিন গুরু হতে পারবে না, এর জন্য ভারতীয়রা শত শত গুণ উপযুক্ত। যতই বলনু, এরা কৌতূহল দেখাতে পারে, ভক্তি করতে পারে, কিন্তু এদেশে সন্ন্যাস নেওয়া অসম্ভব ব্যাপার—নেকসট টু ইমপসিবল্। অপ্রিয় কথাটা হলো, এদেশের ডিসিপ্লিন অফ লাইফ নেই যা ভারতবর্ষে অঢেল রয়েছে। সায়েব যদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়, তাহলে সে-প্রতিষ্ঠানও কোম্পানির মতন হয়ে যাবে। সন্ন্যাসী আমেরিকান অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতন।"

"আপনি কি ভক্তিবেদান্তর কোনো গুণ দেখতে পান না।"

সসম্ভ্রমে জিভ কাটলেন মিস্টার সেন। "একটা কথা ইতিহাসে থেকে যাবে—এতো অল্পসময়ে প্রভুপাদের মতন কেউ কখনও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে বিশ্বজয় করতে পারেননি।"

আমরা এবার আগামী দিনের প্রোগ্রামে ফিরে এলাম। জানালাম, শ্রীচিন্ময়ের ধ্যানকেন্দ্রে আমি যাচ্ছি এবং তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হবে আমার।

ইতিমধ্যে কী করছি জানতে চাইলেন আমার বিজ্ঞানীবন্ধু। বললাম, "একটু লেখা-টেখা পড়ে নিচ্ছি। ভদ্রলোকের জন্ম ১৯৩১ সালে চট্টগ্রামে। বারো বছর বয়সে কোনো আশ্রমে চলে যান।"

"আশ্রমটা হলো পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, আমি জানি।"

"একুশ-বাইশ বছর ওখানে ছিলেন। তারপর অভয়চরণ দে'র মতন কী ইচ্ছা জাগলো, সাগরপারে পাড়ি দিলেন। বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার একটা মস্ত অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি নিশ্চয় আছে তাঁর।"

সেন বললেন, "এই অ্যাডভেঞ্চার স্টোরিগুলোই আসল গল্প—ভারতীয়দের এসব জানা দরকার। আমরা এমনিতে বড্ড নরম, কিন্তু বাঙালি যখন বেঁকে বসে কিংবা একটা কিছু করবে বলে গোঁ ধরে তখন সে দুনিয়ার নমস্য! এই গোঁয়ার বাঙালির সংখ্যা যাতে কমে না যায় তা দেখবার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের। গোঁয়ার বাঙালি পারে না এমন কাজ নেই। চাটগাঁয়ের ইংরিজি উচ্চারণ নিয়ে আপনারা কলকাতায় এখনও হাসিঠাট্টা করেন, কিন্তু সেই চাটগাঁইয়া এখানে হাজার-হাজার সায়েবের নাকে দড়ি পরিয়ে ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে।"

"যে শক্তিতে তা সম্ভব হচ্ছে তা বোধহয় অধ্যাত্মশক্তি। এই অধ্যাত্মশক্তির সামনে পশ্চিমের একটা অংশ শ্রদ্ধায় মাথা নত করে, অথচ বৈজ্ঞানিক শক্তিতে আমরা যে নতুন ভারতবর্ষ গড়বার চেষ্টা করছি তার সম্বন্ধে অনুকম্পা ছাড়া আর কিছু নেই।"

আমি আরও বললাম, "শুনুন সেনসায়েব, শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ যা লিখছেন বা বলছেন ভারতবর্ষের পক্ষে হয়তো তা নতুন কোনো কথা নয়। তিনি বিদেশীর জন্যে সরলভাবে প্রাচীন কথা বিশ্লেষণ করেছেন—'যেখানে আনন্দ অনুপস্থিত সেখানে ভালবাসাও অনুপস্থিত। যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে কোনো কিছুই নেই। যেখানে সত্য রয়েছে সেখানেই তো পূর্ণতা, যেখানে পূর্ণতা সেখানেই তো ঈশ্বরের উপস্থিতি'।"

সেনসায়েব আবার তাঁর প্রিয় বিষয় অ্যাডভেঞ্চারে ফিরে গেলেন। বললেন, "শোনা যায়, শ্রীচিন্ময়কে এদেশে থাকবার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। এখানকার দূতাবাসে কেরানির কাজও করেছেন বেশ কিছুদিন। সুযোগটা করে নিয়েছিলেন তাই ভাল, কারণ এদেশের ইমিগ্রেশন অফিসাররা বড়ই বেরসিক। গ্রিনকার্ড না থাকলে স্বয়ং যীশুখ্রিস্টকেও এরা নির্দ্বিধায় দেশছাড়া করে দেবে। একমাত্র রক্ষাকর্তা

এই সব দূতাবাস—ডিপ্লোম্যাটরা যাকে খুশি টেমপোরারি নিয়োগপত্র দিতে পারে, নিরীহ আশ্রয়প্রার্থীকে নগর কোটালের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। তাই দেখবেন, এম-এ, পি-এইচ-ডি ডিগ্রি নিয়েও বাইরের লোক বিদেশী দূতাবাসে ড্রাইভারের চাকরি করছে—এইভাবে কয়েকটা বছর চালালে যদি আসল সবুজপত্র মিলে যায়।"

যে-ভদ্রমহিলা দয়াপরবশ হয়ে চিন্ময়কুমার ঘোষকে ভারতীয় দূতাবাসে একটা কেরানির চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে মনে মনে নমস্কার জানালাম। ঐটুকু সাহায্য না পেলে, যিনি এক বিশ্বজোড়া অধ্যাত্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যিনি হার্ভার্ড, ইয়েল, কেমব্রিজ, অক্সফোর্ডের মতো শত শত বিশ্ববিদ্যালয় চষে বেড়াচ্ছেন তিনি পুনর্মূষিক হয়ে আমাদের দেশের কোনো মফস্বল শহরে জীবনের শেষ অধ্যায় রচনা করতেন। যে-মানুষ একদিন গ্রিনকার্ডের জন্য কনিষ্ঠ কেরানি হয়েছিলেন আজ সমস্ত বিশ্বে তাঁকে নিয়ে টানাটানি—রবিবার তিনি নিউইয়র্কে তো *সোমবার তিনি ওয়াশিংটনে, পরের দিন লন্ডন, তার পরের দিন প্যারিস কিংবা স্টকহোমে। জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন সর্বত্র তাঁর মেডিটেশন সেন্টার রয়েছে। সম্প্রতি আফ্রিকাতেও পা বাড়িয়েছেন—জামবিয়াতে* একটি কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। জাপানেও কেন্দ্র রয়েছে।

সেনসায়েবকে বললাম, "ভদ্রলোক নিশ্চয় একটি হিউম্যান ডাইনামো বিশেষ। লোকমুখে শুনলাম, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নেন, বাকি সময় হাজার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। ইউ-এন-ওর এক জাঁদরেল অফিসার বললেন, শত শত বই লিখেছেন ইংরিজিতে।"

সেনসাহেবের মন্তব্য, "গেঁয়ো বাঙালিরা হঠাৎ আমেরিকায় এসে কিভাবে ইংরিজিতে তুখড় হয়ে যায় বুঝতে পারি না! আপনি বিবেকানন্দের আসাধারণ ইংরিজি বাকপটুতার কথা ভাবুন—এখনকার নর্থ ক্যালকাটা সিমুলিয়ার ছেলেরা তো ইংরিজির নাম শুনলে ভয় পায়। স্বামী অভেদানন্দও চমৎকার ইংরিজি লিখতেন। ভক্তিবেদান্ত তো ইংরিজি ভাষার মাস্টার—ঐ সামান্য ক' বছরে তিনিও চল্লিশ খণ্ড বই লিখে ফেলেছেন। আর শ্রীচিন্ময় তো শুনেছি ছ'-সাতশ বই ইতিমধ্যেই প্রকাশ করে ফেলেছেন।"

"এঁর ইংরিজি পড়লাম। পূর্বদেশের সরলতা এঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। বাংলাভাষার দু-একটি বিশিষ্টতা ইংরিজিতেও চালু করার ইচ্ছে

রয়েছে মনে মনে। কিন্তু আজ সকালে একজন ইউ-এন কর্তার সঙ্গে দেখা হলো, তিনি নিজে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজি সাহিত্যচর্চা করেছেন, তিনি তো খুব প্রশংসা করলেন ওঁর ইংরিজি লেখার।"

"আর আপনি গদগদ হয়ে সায়েবের সব কথা হজম করে ফেললেন !"

"মোটেই না। আমি বরং মার্কিনি সাংবাদিক স্টাইলে গম্ভীরভাবে শুনিয়ে দিলাম, মহাশয়, এই পৃথিবীতে সব মানুষেরই কিছু-কিছু দুর্বলতা থাকে। ভগবান এখনও নিখুঁত কোনো মডেল তৈরি করেননি। সুতরাং এক-আধটা দোষ খুঁজে দিন। ভদ্রলোক খুব হাসলেন, তারপর বললেন, 'ওঁর হাতের লেখা আমি দেখেছি, এক-আধবার বানান সম্বন্ধে পিছলে পড়েছেন !' সাহেবের কথা শুনে ভরসা পেলাম।"

বিজ্ঞানী মিস্টার সেন বললেন, "ওঁর লেখা থেকে আপনি কী পেলেন ?"

"এই ক'ঘণ্টায় আর কতটা আন্দাজ করবো বলুন ? যেটা দেখছি, *এদেশে বসবাস করলে অগোছালো বাঙালির চিন্তাতেও একটা গোছালো ভাব এসে যায়—যাকে অনেকে বলেন, মানসিক পরিচ্ছন্নতা। ওঁর লেখা থেকেই নোটবইতে কপি করেছি—'ঈশ্বরের একজন স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট* প্রয়োজন। ভাবছি, মাথা নত করে আমি ঐ পদের জন্য আবেদন করবো'।

"আর একটি কথা লিখে নিয়েছি—'তোমার জীবনপথে অসংখ্য ট্রাফিক লাইটের লাল চোখরাঙানি, তার কারণে তোমার হৃদয় কোনোদিন প্রাণভরে সবুজ আলোর সংকেত চায়নি।' অথবা, 'একবার কোনোরকমে নিজেকে বিশ্বাস করাও, তুমি অপরিহার্য নও। তোমার মন শান্তিতে প্লাবিত হবে।' অথবা, 'আমি সোজাসুজি জ্ঞানের আলোক চাই। অপরের ব্যাখ্যা মানেই তো বাধা।"

"আরও একটি লাইন মন্দ লাগলো না—'ব্যক্তিমানুষ পার্থিব সম্পদের মধ্যে, সুখের মধ্যে এবং কখনও-কখনও ত্যাগের মধ্যেও শান্তি চায়। এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আলাপ-আলোচনা, ডিপ্লোম্যাসি অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে শান্তি সুনিশ্চিত করতে চায়। এই সব প্রাইভেট অথবা পাবলিক কৌশল দীর্ঘ সময়ের স্থায়িত্ব আনে না। বাইরের জগৎ থেকে শান্তি আসে না, তার উৎপত্তি মানুষের হৃদয়ে'।"

মিস্টার সেনের বাড়ি থেকে ফিরে এসে চুপি-চুপি অনেক রাত পর্যন্ত

পড়াশোনা করলাম। আমার অবিশ্বাসী মন বেশ সজাগ হয়ে রয়েছে—বিশ্বাস করে-করে আমার দেশের অভাগা মানুষ যে বারবার ঠকেছে। কিন্তু এ কথাও তো সত্য, বাজিয়ে না দেখে সব কিছু ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করলেও মানুষের অগ্রগতি হতে পারে না। পশ্চিমের বিজ্ঞানী-মন তাই সারা পৃথিবীর প্রাচীনতম ঐতিহ্যগুলি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখছে কোথায় সত্য লুকিয়ে রয়েছে। গত কয়েক হাজার বছর ধরে নানা দেশে নানা সময়ে মানুষ কী ভেবেছে তার পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে। এই অনুসন্ধিৎসু পশ্চিমী-মনের কাছে ভারতবর্ষ অবশ্যই একটি স্বর্ণখনি, যদিও আমরা ভারতীয়রা নিজেরা কোনো খোঁজখবর না নিয়ে সায়েবরা কি করে তা দেখবার জন্যে উঁচিয়ে বসে আছি।

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ি বলতে একসময় এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং বোঝাতো। এখন নয়। নিউইয়র্কের সবচেয়ে উঁচু জায়গা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার দেখতে যাবার কথা ছিল সকালে, কিন্তু আমি তার বদলে শ্রীচিন্ময় ঘোষের সঙ্গেই দেখা করতে চাই।

অবশেষে শ্রীচিন্ময়ের সঙ্গে দেখা হলো। ইউ-এন মেডিটেশন সেন্টারে যাবার আগে টার্কিশ সেন্টারে বাংলাদেশ মিশনের একটি ঘরে তিনি নিজেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

খোদ সাহেবের দেশে সন্ন্যাসী নয়, সাধু নয়, হানড্রেড পার্সেন্ট বাঙালিবাবু—শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ। বয়স পঞ্চান্ন, রঙ কালো, সুশাসিত শরীর, ওজন একশ ষাট পাউন্ড (সাহেব ভক্তদের মহৎ গুণ সব বিবরণ অনুসন্ধিৎসুদের জন্য রেডি !)। শ্রীচিন্ময় সাদা পাঞ্জাবি পরেছেন, সেই সঙ্গে ধুতি এবং পাম্পসু—যে ধরনের মানুষকে একসময় হাওড়ার বাজারে এবং শিয়ালদহ রেল স্টেশনে শত শত দেখা যেতো। এখন অবশ্য টেরিলিনের কল্যাণে সব বাঙালি পুরুষই সাহেব—খাঁটি বাঙালি বেশবাস দেখতে হলে আপনাকে এখন বিয়ের লগনসার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, অথবা পাসপোর্ট-ভিসা করে এই নিউইয়র্কে হাজির হতে হবে।

মানুষটির সবই সাধারণ, শুধু চোখ দুটি ছাড়া। ফিলিপস্ কোম্পানির বিজ্ঞাপনী ভাষায়—একজোড়া আর্জেন্টা ল্যাম্প—যেখানে শুভ্র আলোর স্নিগ্ধতা আছে কিন্তু ক্ষতিকারক উত্তাপ নেই। আলো দিচ্ছে, কিন্তু জ্বলে-পুড়ে মরতে হচ্ছে না। এই প্রসন্ন আলোই অতিমাত্রায় সফিসটিকেটেড

পশ্চিমকে টানছে অজ চট্টগ্রামের বোয়ালখালি থানার দিকে। হাডসন রিভার হার মানছে কর্ণফুলির কাছে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। অতি সাধারণ সব বাঙালি কথাবার্তা—দেশ কোথায়, কবে দেশ ছাড়লেন। দেশে যান না কেন? শ্রীচিন্ময় পরিচয় দিলেন নিজের বাংলা সাহিত্যপ্রীতির। একসময় রবি ঠাকুর, নজরুলে বুঁদ হয়ে থাকতেন। কুড়ি বছর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। একসময় নলিনীকান্ত গুপ্তর সেক্রেটারির কাজ করেছেন—এই নলিনীকান্তর জন্মশতবার্ষিকী ১৯৮৮তে। বললেন, "নলিনীকান্তর কিছু লেখা অনুবাদ করেছিলাম, অরবিন্দর একটা জীবনীও লিখেছিলাম। তারপর কী ছিল বিধাতার মনে, চলে এলাম সাত সাগরের পারে।"

ওঁর সঙ্গে রয়েছেন লম্বা-চওড়া এক সাহেবভক্ত—ডাক নাম লম্বু, ভাল নাম অধীরতা।

না, এরা নিজেদের ঘরসংসার কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে গুরুসেবার জন্যে আশ্রমে ঢুকে পড়েনি। ইউ-এন অফিসে ভাল কাজ করেন লম্বু। টুক করে একবার ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে এলেন গত বছরে, এবারেও ঐ ধরনের কিছু একটা করবেন। শরীর-স্বাস্থ্য ভাল রাখায় বিশ্বাস করেন শ্রীচিন্ময়—সকালবেলায় পেট ভুটভাট করলে, নাভিদেশে মোচড় মারলে, মাথা ধরলে, দন্তশূল হলে মানুষ ঈশ্বর উপলব্ধির চেষ্টা চালাবে কী করে? শরীরকে নিজের কন্ট্রোল রাখতে হবে সবসময়। এই তো আজ সকালে শ্রীচিন্ময় নিজেই একশ ষাট পাউন্ডের দেহ নিয়ে পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনশ ত্রিশ পাউন্ড ওয়েট লিফটিং করে এলেন।

আমাদের কথা যেন শেষ হতে চায় না। এরপর আমরা চললাম ইউ-এন মেডিটেশন সেন্টারে। বিরাট একটি ঘর ততক্ষণে নানা বেশের পুরুষ ও রমণীতে ভরে উঠেছে। পুরুষদের সবাই কোটপ্যান্ট পরেন ডিপ্লোম্যাসির এই সুরসভায়। এতো নিখুঁতভাবে ড্রেস করা পুরুষ একসঙ্গে পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাবেন না। মেয়েরা অনেকেই নিজেদের ড্রেস পরেছে, আবার কেউ-কেউ শাড়ি পরিহিতা।

আমি চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি এদের শাড়ি পরতে নির্দেশ দিয়েছেন?"

শ্রীচিন্ময় বললেন, "মোটেই না। আমি ধুতি পরি তো, তাই ওরা ভেবে নিয়েছে ওরা শাড়ি পড়লে আমি সন্তুষ্ট হবো।"

হল ঘর ভরে উঠলো। চেয়ার না পেয়ে অনেকেই কার্পেটের ওপর হাঁটুমুড়ে বসে পড়লেন পরম আনন্দে। অনেক মহিলা জুতো খুলে চেয়ারের উপর পা মুড়ে নিলেন।

মহাশক্তিমান রাজপুরুষ ও রমণীদের এই সভায় আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। জুতো খোলা আমার ধাতে নেই।

সর্বত্র এক আশ্চর্য শৃঙ্খলা। কেউ-কেউ নীরবে একটু-আধটু সভার কাজ করে দিচ্ছে। স্বদেশে আমাদের প্রার্থনাসভায় যে অব্যবস্থা, অনিশ্চয়তা এবং হৈ চৈ থাকে তার কিছুই নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বধর্মমহাসভা দেখেছিলেন, আমি দেখলাম বিশ্বধর্মের মিলনসভা। আশ্চর্য এই সভা। কোনো বক্তৃতা নয়, কোনো শাস্ত্রপাঠ নয়, কোনো মন্ত্র উচ্চারণ পর্যন্ত নয়—শ্রীচিন্ময় এঁদের মুখোমুখি বসে ক্রমশ ধ্যাননিমগ্ন হলেন। শতাধিক অপরিচিত বিশ্ববাসীও তাঁকে অনুসরণের চেষ্টা করলেন ঐকান্তিকভাবে। কেউ ধীরে-ধীরে চোখ বন্ধ করলেন, কেউ নতমস্তকে পাথরের মতন স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

এইভাবে চললো অনেকক্ষণের নীরবতা। আমার মনে পড়লো, ইউ-এন-ও'র কক্ষে চলেছে মানুষের দলবদ্ধ ঘৃণার দ্বন্দ্ব, কোথাও চলেছে গোপন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, কোথাও সৃষ্টি হচ্ছে অবিশ্বাসের অসহ্য জ্বালা। আর এখানে হঠাৎ কিসের আকর্ষণে মানুষ স্বেচ্ছায় মাথা নত করছে বোয়ালখালি থানার এক কৃষ্ণাঙ্গ বঙ্গসন্তানের কাছে? কী সে দিতে পেরেছে, যা এই বিশাল বিশ্বসভার আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়?

দীর্ঘ নীরবতার শেষে সুবেশী নরনারীর ধ্যান ভঙ্গ হলো। শ্রীচিন্ময় এবার সঙ্গীতের ইঙ্গিত দিলেন এবং এবার আমার চোখ ও কানের বিস্ময় শুরু হলো! সাদা কালো মঙ্গোলীয় ককেশীয় সবাই একসঙ্গে বাংলা গান শুরু করলেন। এঁরা কেউ বাংলা ভাষা জানেন না, কিন্তু হৃদয়ের গভীর থেকে এমন পবিত্র নিবেদনের গান আমি বাংলাতে কখনও শুনিনি :

হিয়াপাখি এগিয়ে চলো
দেখো না আর ফিরে
বিশ্ব যাহা দিতে পারে
তা যে তুচ্ছ মিছে।"

ও বার্ড অফ মাই হার্ট ফ্লাই অন, ফ্লাই অন—আমি নিজেই তখন ইংরিজিতে চিন্তার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছি।

গানের পর গান। পৃথিবীর মানুষের কণ্ঠে গভীর আকুতি :

ভুলিতে দিও না প্রভু
যদি আমি ভুলে যাই কভু।
তীব্র বেদনে জাগাবে আমায়
ভুলিতে দিও না কভু
বেদনার তাপে যদি ভুলে যাই
মরণের ঘুম যদি কভু পাই
অমর পরশে জাগাবে আমায়
ভুলিতে দিও না কভু....”

একের পর এক বাংলা গানের আসর চলেছে। ভক্তের হৃদয়ে তার মূর্ছনা:

“জাগে না জাগে না পরাণ জাগে না
ঘুমঘোর আর ভাঙে না.....”

আজ ইউ-এন-ও'র বড় মিটিং আছে। শক্তিমান রাষ্ট্রদূতরা প্রত্যেকে একটি রাঙতায় জড়ানো ‘কুকি’ শ্রীচিন্ময়ের হাত থেকে নতমস্তকে গ্রহণ করে একে-একে বিদায় নিলেন। তিনি কারও সঙ্গে কোনো কথা বললেন না সেদিন।

পুরুষ ভক্তদের বাংলা নামগুলি এই সুযোগে শুনিয়ে দিই। স্টিভেন হাইন হয়েছেন ‘ধ্রুব’। কেভিন কীফ-এর নাম হয়েছে ‘অধীরতা’। কীথ ফারম্যান নাম পেয়েছেন ‘আশ্রিত’। দুই প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়-ভ্রাতা ম্যাথু ও ল্যারি হোগান হয়েছেন ‘ভীম’ ও ‘তেজিয়ান’। শুনছি এক জ্যাজ গায়ক মাইকেল ওয়লছেন হয়েছেন ‘নারদ’। এবং এক ওলিম্পিক ট্র্যাক চ্যাম্পিয়ান কার্ল লুইস ‘সুদেহী’। কার্লো সানতাতা নাম পেয়েছেন ‘দেবদীপ’।

অধীরতা ও ধ্রুব দুই বিশিষ্ট ইউ-এন কর্মীর সঙ্গে শ্রীচিন্ময় আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দুপুরের খাবার খেয়ে আসতে। ভারি স্নেহপ্রবণ মানুষ। কে খেলো কে খেলো না সব দিকে নজর রাখেন।

আমার এক প্রশ্নের উত্তরে স্টিভেন হাইন বললেন, “একজন ইউরোপীয় ওঁকে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি যা প্রচার করেছেন, তা কি ধর্মমত?’ উনি বললেন, ‘না আমি ধর্মপ্রচার করি না, কেবল পথের ইঙ্গিত দিচ্ছি। যে-কোনো ধর্মে বিশ্বাস রেখেই এই পথ ধরে চলা যায়’।”

কেভিন কীফ বললেন, "ওঁর শিক্ষা অনুযায়ী আমরা সমাজে কোনো বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছি না। সমাজকে মেনে নিয়েই আমরা সমাজের পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটাতে উৎসাহী। সকলেরই একাজে সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।"

স্টিভেন হাইন বললেন, "ইউ-এন ছাড়াও অন্যত্র শ্রীচিন্ময়ের ধ্যানসভা বসে। অনেকে নানা প্রশ্ন করেন, শ্রীচিন্ময় উত্তর দেন।"

পশ্চিমীদের মনে কী ধরনের প্রশ্ন জাগে তা জানবার আগ্রহ চেপে রাখতে পারলাম না। শুনলাম, নানা ধরনের প্রশ্ন ওঠে। কেউ জিজ্ঞেস করেন—কীভাবে ধ্যান করতে হয়? কেউ প্রশ্ন করেন—ধানের সময় যাতে ঘুমিয়ে না পড়ি তার জন্যে কী করতে হবে? কেউ বলেন—ধ্যান করতে বসে এই মনে হয় কিছু হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হয় না, এর কারণ কী? কেউ জানতে চান—ধ্যান থেকে কী পাওয়া যেতে পারে? কেউ বলেন—নাভিচক্রে মনঃসংযোগ করছি, কিন্তু তেমন কিছু হচ্ছে না!

আমি বুঝছি, ভক্তিযোগের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় প্রচারক বলতে যাঁদের বোঝায় শ্রীচিন্ময় তাঁদের একজন।

অন্য ধরনের প্রশ্নও আছে। কিছু কিছু নোটবইতে লিখে নিয়েছি। কিছু নমুনা না দিয়ে পারছি না :

প্রশ্ন : চারদিকে সংঘাত, চারদিকে সংঘর্ষ, এই কি ঈশ্বরের ইচ্ছা?

শ্রীচিন্ময় : কখনও-কখনও ঈশ্বরেরই এই লীলা। ভাল এবং মন্দ দুই-ই প্রকাশমান হয়, অবশেষে ন্যায়ের জয় হয়। বর্তমান পৃথিবীর সংঘাত ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে মনে হয় না, মানুষের দুর্বলতা থেকেই সংঘাতের উদ্ভব। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ দেখাতে চান, আমি যা বলি তাই ঠিক, তুমি যা বল সব ভুল। আমি দেখাতে চাই আমি একজন কেউকেটা, তোমার ওপর প্রভুত্ব করার মতন শক্তি আমার আছে, আমার চরণতলে তোমাকে পতিত হতে হবে। আমরা সবাই আমাদের অন্ধ অথরিটির প্রসার সুনিশ্চিত করতে ব্যস্ত।

অনেকগুলি প্রশ্নের মধ্যে পশ্চিমী মানসিকতার গতিপ্রবাহ কিছুটা ধারণা করা যায়। বিজ্ঞানের হিমালয়শিখরে আরোহণ করেও মানুষ এখন নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে কী পরিমাণ উদ্‌গ্রীব তা বোঝা যায়।

প্রশ্ন : চিন্তা এবং ধ্যান কি এক জিনিস?

শ্রীচিন্ময় : মোটেই এক জিনিস নয়—বরং উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ

মেরুর মতন। যখন আমরা ধ্যান করি তখন আমাদের লক্ষ্য সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত। চিন্তা হলো ব্ল্যাকবোর্ডে একটা ফুটকির মতন। ধ্যানের সময় ওটা মুছে ফেলার চেষ্টা করতে হয়। ধ্যানের প্রথম স্তরে কিছু চিন্তা এসে যায়, কিন্তু গভীরতম পর্যায়ে চিন্তার কোনো স্থান নেই।

প্রশ্ন : যে-লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে কি ধ্যানের চেষ্টা চালাতে পারে ?

শ্রীচিন্ময় : যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে ধ্যান করতে পারে, কিন্তু তার কিছু লাভ হবে না। ধ্যানের পথ আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। যদি আপনার ঈশ্বর বিশ্বাস না থাকে তা হলে আপনি ঐ পথ ধরবেন না এটাই স্বাভাবিক। ধরুন, আপনি অফিসে রয়েছেন। যদি আমি বলি আপনার অফিসের অস্তিত্ব নেই, অথবা আপনার নিজের অস্তিত্ব নেই, তা হলে কি আমি আপনার অফিসটা কোথায় তা জানবার চেষ্টা করবো ?

প্রশ্ন : যে-লোক কিছুই জানে না সে কীভাবে ধ্যানের 'একসারসাইজ' শুরু করতে পারে ?

শ্রীচিন্ময় : যারা অধ্যাত্মপথে প্রবেশ করতে চায় তাদের সবচেয়ে প্রয়োজন সরলতা, নিষ্ঠা এবং পবিত্রতা। ধ্যানে বসে প্রথমে আপনার মাথার কথা ভাবুন এবং 'সরলতা' কথাটি নিঃশব্দে সাতবার চিন্তা করুন। এবার আসুন হৃদয়ে এবং সাতবার 'নিষ্ঠা' শব্দটি ভাবুন। তারপর নাভিতে মনঃসংযোগ করে 'পবিত্রতার' কথা ভাবুন সাতবার। এবার আপনার দুই ভ্রূর সংযোগস্থলের একটু ওপরে তৃতীয় নয়ন সম্বন্ধে সচেতন হোন এবং চিন্তা করুন যে আপনি দ্বিধাহীন। এবার হাতটি মাথার ওপর দিন এবং নিঃশব্দে তিনবার বলুন আমি সরল, আমি সরল, আমি সরল। এবার বুকে হাত দিয়ে তিনবার বলুন আমার হৃদয়ে নিষ্ঠা রয়েছে। এবার নাভি স্পর্শ করে তিনবার বলুন, আমি পবিত্র। এবার তৃতীয় নয়ন স্পর্শ করে বলুন, আমি দ্বিধাহীন।

ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে এবার সজাগ হোন। যদি আপনার প্রেমময় ঈশ্বরকে পছন্দ হয়ত তাহলে মনের মধ্যে সাতবার বলুন—প্রেম, প্রেম। যদি আপনার শান্তি পছন্দ হয়, তাহলে এইভাবে সাতবার শান্তি আবৃত্তি করুন। যদি আপনার আলো ইচ্ছা হয়, তাহলে বলুন আলো—শুধু প্রাণহীন আবৃত্তি নয়, আপনার সমস্ত সত্তা দিয়ে এমন গভীরে প্রবেশের চেষ্টা

করুন যেন আপনি ভালবাসা, শান্তি ও আলোর ঝরনাধারায় অবগাহন করছেন।

আর একটি অনুশীলন চাই। অনুভব করার চেষ্টা করুন যেন আপনি নিজের হৃদয়ের দ্বারপ্রান্তে আপনার কয়েকজন স্বর্গীয় বন্ধুকে স্বাগত জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছেন। এঁদের আপনি নিমন্ত্রণ করেছেন—ভালবাসা, শান্তি, আলো, আনন্দ। এঁদের আপনি এক একটি মানুষ হিসাবে কল্পনায় আনবার চেষ্টা করুন, যাতে আপনি মানসচক্ষে এঁদের দেখতে পান। যদি সব বন্ধুকে একই দিনে হৃদয়ে না আনতে পারেন—এক-একদিন এক-একজনকে নিমন্ত্রণ করুন।

এরপর আর একটি অনুশীলন। শ্বাস নিয়ে কয়েক মুহূর্ত ধরে থাকুন এবং অনুভব করুন আপনি এই প্রাণশক্তি ধরে রাখছেন তৃতীয় নয়নে।এতে আপনার মনঃসংযোগ বাড়বে। দ্বিতীয়বার শ্বাস নিয়ে হৃদয়কেন্দ্রের কথা অনুভব করুন। তৃতীয়বার নাভিকেন্দ্রের কথা ভাবুন। এতেও আপনার কিছুটা সুবিধে হবে।

প্রশ্ন : ধ্যানের শ্রেষ্ঠ সময় কোনটি?

শ্রীচিন্ময় : শ্রেষ্ঠ সময় সকাল তিনটে থেকে চারটে, যাকে আমরা ব্রাহ্মমুহূর্ত বলি। বৈদিক ঋষিরা এই সময়টিই সবচেয়ে পছন্দ করতেন। কিন্তু পশ্চিমে যাঁরা রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত জেগে থাকেন তাঁদের ঐ সময়ে শয্যাত্যাগ করতে বললে উল্টো ফল হতে পারে। কারণ যাঁরা অধ্যাত্মপথের নতুন যাত্রী তাঁদের সাত-আট ঘণ্টার ঘুম প্রয়োজন। আমি বলবো, সকাল সাড়ে-চারটে অথবা পাঁচটায় ধ্যান আরম্ভ করুন। অধ্যাত্মপথে কিছুটা অগ্রগতি হলে আপনি ঘুমের মাত্রা কমিয়ে আনতে পারবেন। আমার জানাশোনা অনেকে সাড়ে-পাঁচটা এবং ছ'টার মধ্যে ধ্যান করেন।

প্রশ্ন : আমি শান্তি খুঁজছি। আমার পক্ষে কখনও ধ্যান করা যুক্তিযুক্ত হবে?

শ্রীচিন্ময় : যদি শান্তির প্রয়োজন থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠ সময় সন্ধ্যা ছ'টা এবং সাতটার মধ্যে।—প্রকৃতি এই সময় জীবকে সান্ত্বনা দেয়।

যদি আপনি শক্তির পূজারী হন, তাহলে শ্রেষ্ঠ সময় দুপুর বারোটা।—দিনের মধ্যে এইটাই সবচেয়ে কাজের সময়।

যদি আপনার আনন্দ প্রয়োজন থাকে তাহলে সকাল পাঁচটা-ছ'টায়

ধ্যান করুন। জননী বসুন্ধরা আপনাকে সাহায্য করবেন।

যদি আপনার ধৈর্যের প্রয়োজন থাকে তাহলে সুযোগমতো একটি গাছের তলায় বসে সন্ধ্যার শেষে ধ্যান করুন।

যদি ভালবাসাই আপনার লক্ষ্য হয় তাহলে মধ্যরাত্রই শ্রেষ্ঠ সময়। নিজের ছবি সামনে রাখুন—আপনার হৃদয়-মাঝিই আপনাকে সাহায্য করবে।

যদি আপনার পবিত্রতার প্রয়োজন থাকে তাহলে ভোরে বিছানা ছাড়বার আগে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে ধ্যান করুন। আপনার আত্মা আপনাকে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন : যদি আমি এই সময়-শৃঙ্খলা মানতে না পারি?

শ্রীচিন্ময় : প্রত্যেক প্রচেষ্টার একটা শ্রেষ্ঠ সময় আছে, কিন্তু তা বলে ঈশ্বরের দ্বার অন্য সময় বন্ধ থাকে না। ধরুন ব্রেকফাস্ট—সকালে খাওয়াটাই রীতি। কিন্তু ঐ খাবারগুলো যদি আপনি সন্ধ্যায় খেতে চান—খেতে পারেন, পুষ্টির অভাব হবে না—খাবারগুলো তো খারাপ নয়।

প্রশ্ন : অধ্যাত্মপথে এগোবার জন্যে কি নিরামিষ খাওয়া প্রয়োজন?

শ্রীচিন্ময় : নিরামিষ আহার অধ্যাত্মজীবনে একটা বড় ভূমিকা নেয়। এই আহার আমাদের পবিত্র হতে সাহায্য করে। আমরা যখন মাংস খাই তখন কিছু পশুপ্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে। মাছ তো আরও খারাপ। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আলস্য, সঙ্কীর্ণতা এবং বিবেকহীনতা। শাকসবজি, ফল আমাদের নম্রতা দেয়, মিষ্টতা দেয় এবং পবিত্রতা দেয়। সুতরাং নিরামিষাশী হলে ভাল। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক ঠাণ্ডা দেশ আছে যেখানে কেবল শাকাহার করে জীবনধারণ করা শক্ত। সেখানে অবশ্যই মাংসাহার করতে হবে। কারণ, তা না হলে মন চাইলেও শরীর বিদ্রোহ করবে। শাকাহারী না হলে ঈশ্বর-অনুভূতি হবে না এ কথা ঠিক নয়। যীশুখ্রিস্ট, বিবেকানন্দ এবং আরো অনেক মহাপুরুষ মাংস খেতেন।

অধ্যাত্মপথ ছাড়াও শত-শত অন্য প্রশ্ন আছে। এই সব প্রশ্ন করেন এমন সব মানুষ যাঁরা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে কৃতী, কারও কারও বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

একজনের প্রশ্ন : দুনিয়ার সবাইকে সন্দেহ করার প্রবৃত্তি আমি কীভাবে ত্যাগ করতে পারি?

শ্রীচিন্ময় : প্রথমে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে এই সন্দেহপ্রবৃত্তি থেকে আমার কোনো উপকার হয়েছে কি না। দেখবেন, কিছুই হয়নি। সন্দেহ-বশবর্তী হয়ে আপনি আরও নিচে নেমে গিয়েছেন। তারপর নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে, আমি কি বোকা? না বুদ্ধিমান? আপনি নিশ্চয় বোকা নন, সুতরাং আপনাকে বুদ্ধিমানের মতন কাজ করতে হবে।

তারপর খুঁজতে হবে, সন্দেহটা কোথায়? মনে না শরীরে? মনের সন্দেহ পর্বতের মতো অনড়। মনের এই সন্দেহকে বলুন—আপনার কাছ থেকে জ্বালাযন্ত্রণা ছাড়া আমি কিছুই পাইনি, অথচ এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আপনি আমার বন্ধু। এখন বুঝছি, আপনি আমার শত্রু, সতরাং সত্বর আমার এই গৃহ ত্যাগ করুন। আমার এই স্বল্পপরিসরে আপনার জন্য কোনো স্থান নেই।

আরও মনে রাখতে হবে, চিরকাল কেউ শত্রু থাকে না। আপনার অন্তর যখন প্রকৃত আলোকে ভরে উঠবে তখন সন্দেহ আপনার মনে প্রবেশ করলেও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, বরং নিজেই আলোকিত হয়ে উঠবে।

অবশেষে নানা বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল শ্রীচিন্ময় ঘোষের সঙ্গে। সায়েব-মেমরা সামনে বসে রয়েছেন, কিন্তু তিনি সস্নেহে আমার সঙ্গে বাংলা কথায় মশগুল হয়ে উঠলেন। সায়েবরা কিছু মনে করলেন না—বাংলাকে এঁরা এমনভাবে শ্রদ্ধার আসনে বসালেন কেন কে জানে!

মানুষের অন্তরের শান্তি, পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্ক, মানবসমাজের অনন্ত জিজ্ঞাসা থেকে শুরু করে সুদূর বাংলাদেশ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নলিনীকান্ত গুপ্ত অনেক কথাই উঠলো। ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে শৈশব ও বাল্যকাল কাটিয়েও আমি যে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে উঠিনি তা হয়তো শ্রীচিন্ময় আন্দাজ করলেন। আমি বললাম, "আমার মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পেনডুলাম সারাক্ষণ দুলছে। আমি এই ভাবনাকে বাধা দিইনি, কারণ পরিপূর্ণ সমর্পণ করলে গল্প-লেখকের 'অপ্রত্যাশিত' হবার শক্তি শেষ হয়ে যায়।"

শ্রীচিন্ময় মৃদু হেসে এমারসন থেকে উদ্ধৃতি দিলেন, "তুমি নিজে ছাড়া কেউ তোমার মধ্যে শান্তি আনতে পারবে না।"

আমি ভাবছি, আমার সমস্ত বিস্ময়ের পর্ব চুকিয়ে একবার জিজ্ঞেস

করবো, "আপনি কোন শক্তিতে বিদেশে এই বিপুল শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন? এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েও, অন্য অনেকের মতো সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন না, অথবা বিপুল বৈভবের মধ্যে ডুবে রইলেন না—যা এদেশে করা খুবই সহজ ছিল।" (আমার কাছে খবর আছে, তাঁর নিজের একটা গাড়িও নেই—ইউ-এন অফিসের কোনো কোনো স্বেচ্ছাসেবী তাঁকে পালা করে বাসস্থান জামাইকা থেকে মেডিটেশন সেন্টারে নিয়ে আসেন এবং পৌঁছে দেন।)

কিন্তু ঐ সব ব্যক্তিগত প্রশ্নের সময় পাওয়া গেলো না। শ্রীচিন্ময় তখন কলকাতার কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় তাঁর ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। চক্রবর্তী চ্যাটার্জির দোকানে বই কিনেছেন। কিছুদিন আগে জন্মভূমি বাংলাদেশ ঘুরে এসেছেন—সে-সব গল্পও চলতে লাগলো। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শিশির ঘোষের কথাও উঠলো।

বুঝলাম, শ্রীচিন্ময় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ডুবে আছেন। সুদূর প্রবাসে নিজের লেখা গানের মধ্যে বারেবারে ওঁর ছায়া এসে যায়।

কথা বলতে-বলতে আমরা দু'জনে সুবিশাল রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের পিছনে ইউ-এন ভবন গগন স্পর্শ করছে। সামনেই পরম পরাক্রান্ত মার্কিনীদের ইউ-এন সংক্রান্ত দপ্তর এবং তারই পাশে টার্কিশ সেন্টার, আমার পরবর্তী গন্তব্যস্থল।

আমার খুব আশ্চর্য লাগলো, ধুতি-পাঞ্জাবি ও পাম্পশু পরে, নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রেখে, শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের মতন বিশ্ববিজয় করা আজও তাহলে সম্ভব!

শ্রীচিন্ময় ঐসব ব্যাপারে মোটেই ব্যস্ত বলে মনে হলো না।

"দেশের জন্যে চিন্তা হয় না?" আমি জানতে চাইলাম।

"যাদের রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ রয়েছে তাদের আবার চিন্তা কী?" এই বলে উদাসী শ্রীচিন্ময়কুমার নিউইয়র্কের রাজপথ ধরে আপন মনে হাঁটতে লাগলেন।

মৃত্যুঞ্জয়ী হেমন্ত

সাহিত্যে শরৎচন্দ্র, চলচ্চিত্রে উত্তমকুমার, চিত্রকলায় যামিনী রায়, রঙ্গমঞ্চে শিশির ভাদুড়ী বলতে বাঙালির কাছে যা বোঝায় সঙ্গীতে হেমন্তকুমারও ছিলেন ঠিক তাই। যাঁদের নাম করলাম তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ও যামিনী রায় ছাড়া একমাত্র হেমন্তকুমারই বাংলার সীমান্ত পেরিয়ে সর্বভারতীয় মানুষের হৃদয়ে পৌঁছতে পেরেছিলেন, যদিও বাঙালির হৃদয়মনে তাঁর স্থানটুকু ছিল চিরদিনের জন্য।

হেমন্তর মৃত্যুদিনে (১৯৮৯) বসে ভাবছি তাঁর যতটুকু সম্মান দেশের কাছে প্রাপ্য ছিল তা তিনি পেলেন কি না? জীবিতকালে অবহেলা করে মরার পরে চিতায় মঠ তৈরির ব্যাপারে আমরা বাঙালিরা দীর্ঘদিন ধরে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছি। যে-দেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে গীতাঞ্জলির লেখককে দেবেন ঠাকুরের ব্যাটা বলে অভিহিত করেছে, যে-দেশের জমিদার ঠাকুর রামকৃষ্ণের পাঁচটাকা মাইনের চাকরিও নিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যে-দেশের জনগণ বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দর ব্যক্তিচরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা রটিয়েছেন তাঁরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখক বলেই স্বীকৃতি দিতে চাইবেন না তাতে আশ্চর্য কী?

হিন্দির বিখ্যাত লেখক জয়নেন্দ্রকুমারের সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন, যৌবনে একবার কলকাতায় গিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য তাঁর দেশের লোকেরা, সব ক'জন পণ্ডিত আমাকে বললেন ওঁর সঙ্গে দেখা করে মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন কেন? শরৎচন্দ্রের অশেষ ভাগ্য, তথাকথিত পণ্ডিতজনের স্বীকৃতি না-পেলেও তিরোধানের অর্ধশতাব্দী পরে তিনি আধুনিক ভারতের একমাত্র জন-গণ-মন-লেখকরূপে বন্দিত হয়েছেন। পণ্ডিতরা অবস্থা সুবিধের নয় বুঝে এখন গোলে হরিবোল দেওয়া শুরু করেছেন।

লেখক ও শিল্পীরা হয় পাগল না-হয় ছাগল এই কথা বলেছেন সম্প্রতি এক বিশ্ববিখ্যাত প্রবাসী বাঙালি। তাঁর ধারণা পাগলরাই একমাত্র জাত শিল্পী, কারণ তাঁরা নিজের সুখের তোয়াক্কা করেন না।

পাগলদের মধ্যে কিছু পাগল আবার শেয়ানা পাগল। কিন্তু পাগল শিল্পীরাও জীবৎকালে যার জন্যে মাঝে-মাঝে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন তা হলো সম্মান ও স্বীকৃতি। অবশ্য এ-দুয়েরই উর্ধ্বে হলো পাঠক, দর্শক অথবা শ্রোতার ভালবাসা। এই অভাগা দেশে ভালবাসা পাওয়ার অপরাধেই পণ্ডিতরা অনেককে সম্মানের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। আধুনিককালে এর ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রবিশঙ্কর ও সত্যজিৎ রায়। এঁরা সম্মান ও ভালবাসা একইসঙ্গে জীবিতকালে পাবার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

তার কারণটি অবশ্য একটু ভাবলেই লক্ষ্য করতে পারবেন। এই চারজন পুরুষই কোনো অঘটনে অকস্মাৎ পশ্চিমী জগতের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন। স্মরণ করুন সেই কাহিনী, একটি আধুনিক যুবক যে প্রায়ই হিন্দুদের সমালোচনা করতো সে একদিন গীতার প্রশংসা আরম্ভ করলো। ঠাকুর রামকৃষ্ণ উদ্বিগ্ন হয়ে আশঙ্কা করলেন কোনো সাহেব নিশ্চয় গীতার প্রশংসা করেছে এবং তা এই যুবকের কর্ণগোচর হয়েছে।

আমাদের এই যুগেই শরৎচন্দ্র, উত্তমকুমার ও হেমন্তকুমার জনগণের হৃদয়ের ধন হয়ে উঠেছেন, কিন্তু যেহেতু সাহেবরা এঁদের শিরোপা দেবার সুযোগ পাননি সেহেতু এঁরা জীবনকালে আমাদের সম্মানিত পুরুষ হয়ে উঠতে পারেননি। আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ লেখক কথায়-কথায় নিন্দা কুড়িয়েছেন (পড়ুন সেই বিখ্যাত রচনা 'এই শরৎ গু মাড়িয়েছে'!), উত্তমকুমার মানে তো সুচিত্রা সেনের 'অপোজিট' ফিল্ম অ্যাক্টর। আর হেমন্ত মুখুজ্যে কী যেন একটা ফিলমের সুর চুরি করে রাস্টিকেটেড হয়েছিলেন ?

বেশ বাবা বেশ, ওই সব কুকথা সত্ত্বেও গাইয়েটা পঞ্চাশ বছর ফাংশনে রাত জেগে গান শুনিয়েছে, তা বলে একটা পদ্মশ্রী পছন্দ হলো না ! নটো-পটো জাতটাই বে-আক্কেলে, ওই শিশির ভাদুড়ীও সরকারি খেতাব ফিরিয়ে দেবার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন।

তা এরা ভেবেছে কী ? এরা কি ভারতরত্ন হবার খোওয়াব দেখছে ?

আমাদের বিনীত নিবেদন, ধীরে প্রভু ধীরে ! চোখ বোজার পর অন্তত

দশটা বছর যেতে দাও, তারপর কালের আসরে প্রশ্ন করো কারা ভারতরত্ন ? দেখবে উত্তমকুমার, শিশির ভাদুড়ী, হেমন্তকুমারই সেই সম্মান পাবেন, সরকারি আমলার নির্বাচনে যাঁরা ওই মেডাল পেয়েছেন তাঁদের অনেককে ভাবীকাল হয়তো চিনতেও পারবে না।

হেমন্তকুমারের তিরোধান দিবসে এসব অপ্রিয় কথা স্মরণের কোনো মানে হয় না। তিনি তো সমস্ত তুচ্ছতার জ্বালা অতিক্রম করে মরণ সাগরের ওপারে পাড়ি দিয়েছেন, তিনি তো এখন আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে। তবু যখনই ভাবছি, মৃত্যুর কিছুদিন আগে মানুষটাকে যেভাবে পদ্মশ্রী দিয়ে বিপদে ফেলা হলো তখনই প্রশ্ন জাগছে সম্মান দিয়ে অসম্মান করার এমন ঘটনা আমাদের দেশে ঘটে কেন ? তুলনাহীন আমাদের এই জন্মভূমি—এমন উজাড় করে ভালবাসা দিতে সক্ষম কোনো দেশ বিশ্বসংসারে নেই। কিন্তু যে জাতির কর্তাব্যক্তিরা সম্মানিতকে সম্মান জানাতে পারে না সে-জাতির অধোগমনও অনিবার্য।

এখন প্রশ্ন হলো, ভালবাসা বড় না সম্মান বড় ? হেমন্তকুমার বারবার আমাকে বলেছেন, ভালবাসার কোনো বদলি নেই। কথাটা অবশ্যই সত্য। কিন্তু শক্তিমানদের কাছে করজোড়ে নিবেদন, যে ভালবাসা পেয়েছে তার আর সম্মান প্রাপ্য নয় এই ভুল বার বার করলে দেশ হিসেবে আমরা ছোট হয়ে যাবো। এবং কালের আসরে কেমনে দেখাবো মুখ ?

না, আর অভিযোগ, অভিমান নয়, হেমন্তের সোনার ফসলে ভরা বাঙালির হৃদয়মন্দিরে পূজার সময় আগত। আমার সমস্ত জীবনকালটাই হেমন্ত যুগ বলা চলতে পারে। বাঙালির ইতিহাসে কোনো সঙ্গীতজ্ঞ অর্ধশতাব্দী ধরে এমন প্রবল প্রতাপে সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত থাকেননি। আমাদের এই যুগ বাঙালির অবক্ষয় ও অধঃপতনের যুগ, কিন্তু এমন যুগেই হেমন্ত ছিলেন, শিশির ভাদুড়ী ছিলেন, যামিনী রায় ছিলেন, উত্তমকুমার ছিলেন, সত্যজিৎ রায় ছিলেন, বিমল মিত্র ছিলেন তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

তা হলে কি আমরা এখনও নিঃশেষ হইনি ? মরণোত্তর প্রশস্তিতে যদি কোনো আন্তর্জাতিক পুরস্কার থাকতো তাহলে বছরের পর বছর আমরা সেই সম্মান লাভ করতাম। জীবনকালে অপরের প্রাপ্য দিতে আমাদের যত সঙ্কীর্ণতা মরার পরে তত উদারতা। প্রত্যেকটি মৃত্যুই আমাদের সরকারি বক্তব্য অনুযায়ী "অপূরণীয় ক্ষতি।"

হেমন্তকুমারের মৃত্যুর পরেই কেষ্টবিষ্টুরা আত্মপ্রচারের সেই সুযোগ অবশ্যই হাতছাড়া করছেন না। তাঁরা যা যা বলছেন তা অনেকটা এই রকম : "এমন সঙ্গীতজ্ঞ হয় না। বাঙালি হয়েও তিনি সসাগরা ভারত জয় করেছিলেন। হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস থেকে ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিটের পেয়াদা পর্যন্ত সবাইকে তিনি আনন্দ দিয়েছেন। অত্যন্ত অমায়িক এবং অজাতশত্রু মানুষ। পরব্রহ্ম থেকে পালকিওয়ালা পর্যন্ত সবাইকে একই সুরে বন্দী করে ফেলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা অপূরণীয়।"

সেই সঙ্গে থাকবে, "হেমন্তদার সঙ্গে আমার খুব দোস্তি ছিল। কত আসরে একসঙ্গে উপস্থিত থেকেছি, কত প্রাণের কথা হয়েছে, কারও বিরুদ্ধে তাঁর কোনো বিদ্বেষ-বিষ ছিল না। তাঁর তিরোধানে আমরা অভিভাবকহীন হলাম, যদিও মৃত্যুর পরেও তিনি বেঁচে থাকবেন।"

যা উল্লিখিত হবে না তা হলো মানুষটির সংগ্রামের কাহিনী, তাঁকে উঁচু থেকে নিচুতে টেনে আনবার নানা নির্লজ্জ প্রচেষ্টার বিবরণ, শারীরিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁর দুর্জয় বিদ্রোহের দুঃসাহসিকতা এবং জীবন-সায়াহ্নে আগের যুগের হেমন্ত-ভক্তদের হাতে প্রবীণ হেমন্তর নিগ্রহ।

হেমন্তর ভ্রাতা তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায় কয়েক বৎসর ফিলিপ্‌স্‌ কোম্পানিতে আমার সহকর্মী ছিলেন। তারাজ্যোতি নিজে একজন অসাধারণ গল্পলেখক, কিন্তু ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি তেমন সুপ্রসন্না হননি। ওঁর মুখেই দাদার সাহিত্য অনুরাগের কথা শুনেছি। এক সময় যে তিনি কথা-সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা-ও শুনেছি। এ-বিষয়ে কোথাও নাকি তাঁর একটু দুঃখও ছিল।

সেবার দিল্লিতে শুনলাম হেমন্ত সংবর্ধনা ও গানের আসর। একটা টিকিট জোগাড় করতে গিয়ে শুনলাম সমস্ত আসন পূর্ণ। ব্যর্থ হয়ে যখন ফিরে যাচ্ছি তখন এক প্রবাসী বাঙালি আমাকে আবিষ্কার করলেন। সেইদিন রাত্রে আমার হোটেলে এসে বললেন, সকালের অনুষ্ঠানে আপনি অবশ্যই আসছেন। তবে টিকিট কাটা শ্রোতা হিসেবে নয়—হেমন্তকুমারের ইচ্ছা আপনি প্রধান অতিথি হোন। উদ্যোক্তারা প্রবাসে আমার ধুতি-পাঞ্জাবি ও শালের ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই সভায় আমি বললাম, যে-সভায় স্বয়ং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সেখানে বক্তৃতার কোনো স্থান নেই। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় মানুষ বুঝেছে, গদ্য অপেক্ষা কবিতা শ্রেষ্ঠ, আবার কবিতা অপেক্ষা সঙ্গীত মহোত্তর। কোনো উপন্যাস বড়জোর দশবার পড়া

যায়, কিন্তু কবিতা শতবার পাঠেও পুরনো হয় না। কিন্তু সঙ্গীতের জগতে ল অফ ডিমিনিশিং রিটার্নের কোনো স্থান নেই—পুনরাবৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গে তার মূল্যবৃদ্ধি পায়। যে-কোনো গদ্যলেখকই তাই গায়কের কাছে হীনম্মন্যতায় ভোগেন। এই অবিশ্বাসের যুগে গদ্য তার আদিম শক্তি ও সামর্থ্য হারিয়েছে ; কিন্তু আজও শব্দের সঙ্গে সুরের সংযোজন ঘটলে এক অবিস্মরণীয় মহিমার সৃষ্টি হয়। যা গদ্যে অবিশ্বাস্য, সুরের সান্নিধ্যে তা আজও সকল মানুষের বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। সুর ছাড়া মানবহৃদয়ের অন্ধকার অভ্যন্তরে প্রবেশের আর কোনো পথ এযুগে খোলা নেই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাই আমার নমস্য। বক্তৃতা শেষ হলো, তারপর শুরু হলো হেমন্তের গান— সে এক অসামান্য অভিজ্ঞতা—হেমন্ত সেদিন নিজেকে উজাড় করে দিলেন রাজধানীর বিশিষ্ট অভ্যাগতদের সামনে।

অনুষ্ঠানের শেষে হোটেলে ফিরে যাচ্ছিলাম। হেমন্ত পাকড়াও করলেন। নিয়ে গেলেন আকাশবাণীর নীলিমা সান্যালের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য। তারপর একলা দেখা করলেন আমার সঙ্গে হোটেল ঘরের নিভৃতে। বললেন, "আজ আমার চোখ খুলে গেলো। গল্পলেখক হতে পারিনি বলে আমার কোনো দুঃখ রইলো না, শংকরবাবু। কলিকালে একমাত্র সুরই যে শক্তিময় তা আগে অনুভব করলেও স্পষ্ট বুঝতে পারিনি।"

একজন সামান্য ভ্রাতৃবন্ধুকে হেমন্তকুমার যে অভূতপূর্ব স্বীকৃতি ও সম্মান দিয়েছিলেন তা ভাবলে আজও গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করি। হেমন্ত আমার কাছে মৃত্যুঞ্জয়ী— আমার সুখে, আমার দুঃখে, আমার আনন্দে, আমার বিপদে, আমার বিষাদে, আমার বিজয়ে, আমার পরাজয়ে, আমার সাফল্যে, আমার ব্যর্থতায়, তাঁর সঙ্গীত আমার নিত্যসঙ্গী রূপে বিরাজ করবে, আমার অন্ধকার জীবনকে আলোকিত করবে এবং স্বর্গীয় সুষমায় ভরে তুলবে।

পুলিশের বড় সায়েব

আই-পি-এস চাকরি পেয়ে একজন গুড়ি-গুড়ি তরুণ তখনকার দিনে দিল্লির এক জাঁদরেল হোম ডিপার্টমেন্ট অফিসারের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। "স্যর, পুলিশ ছাড়া অন্য যে কোনো ডিপার্টমেন্টে আমাকে দিন, পুলিস বোধহয় আমাকে সুট করবে না।"

তরুণটি সাইজে ছোট, লোকের সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলতেও অভ্যস্ত নন। এতোদিন ইকনমিক্‌স নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। স্বপ্ন একটাই—কোনোক্রমে দিল্লিতে থেকে গিয়ে রাজধানীর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা ডক্টরেট জোগাড় করা। "পুলিশে আমার কিছু হবে না, স্যার"—করুণ আবেদন জানিয়েছিলেন পদ্মাপারের এই তরুণ।

তদ্বিরে ফল হয়নি। নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে যাঁকে মাউন্ট আবু পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্পে রিপোর্ট করতে হলো এবং প্রশিক্ষণের শেষে রানাঘাটের সাবডিভিশনাল পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব নিতে হলো, একত্রিশ বছর পরে তিনিই হলেন পশ্চিমে বাংলার আই-জি, অর্থাৎ সাড়ে তিনশ থানা, একান্ন হাজার পুলিস, হাজার হাজার বন্দুক, রাইফেল এবং লক্ষ লক্ষ গোলাগুলির মালিক। এর সঙ্গে কলকাতা পুলিসের হিসেবটা জুড়লে দাঁড়ায় ৩৮৯টা থানা ও ৭১,০০০ কর্মী এবং অফিসার, যাঁদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাৎসরিক খরচ কোটি কোটি টাকা।

বহিঃশত্রু তাড়াতে বাৎসরিক মাথাপিছু খরচ যেখানে সত্তর টাকা সেখানে চোর-ডাকাতের ওপর নজর রাখার জন্যে মাথাপিছু খরচ পনেরো টাকা।

"এই টাকাটা মোটেই বেশি নয়," বললেন সত্যব্রত বসু। "টাকার জন্যে কত ভাল ভাল কাজ আমাদের আটকে রয়েছে। খুব ইচ্ছে ছিল থানাগুলোকে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে ভদ্রস্থ করি, মান্ধাতার আমলের লক-আপগুলোকে আধুনিক করি, কিন্তু হলো না।"

একজন প্রথম শ্রেণীর অমায়িক ভদ্রলোক অথচ সুদক্ষ পুলিশ অফিসারকে যাঁরা সোনার পাথরবাটির মতোই অসম্ভব বলে মনে করেন তাঁদের আনন্দের দিন আসছে। কারণ তাঁর তিন দশকের পুলিসী জীবন সাঙ্গ করে আজ সত্যব্রত বসু আই-জি পদ থেকে অবসর নিলেন।

সংবাদের লুকোচুরি খেলায় যাঁরা ঝানু ডিপ্লোম্যাটদের লজ্জা দিতে পারেন তাঁরা হলেন উঁচু পর্যায়ের পুলিশ অফিসার। এ-দেশের কোটালদের সঙ্গে এদেশের সংবাদ সংগ্রাহকদের বিচিত্র এক ভালবাসা-ঘৃণার সম্পর্ক। সরকারী অফিসারদের অধঃপতন নিজের চোখে দেখেছি। অর্থের অভাবে, পেটের জ্বালায় এবং অনাগত বিপদের আশঙ্কায় কীভাবে মানুষের নৈতিক অধঃপতন হয় তাও দেখতে শুরু করেছি।

"মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং নৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে ক্রাইমের সম্পর্ক আছে কী?" সত্যব্রত বসুকে জিজ্ঞেস করেছি রাইটার্স বিলডিংস-এ তাঁর ঘরে বসে।

—"অবশ্যই আছে। যে লোক কিছুদিন পুলিশে কাজ করেছে সে-ই ব্যাপারটা পরিষ্কার দেখতে পায়। সমাজটা তো দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বেচ্ছায় আইন মেনে নেবার মানসিকতার ওপর। জানেনই তো লর্ড অ্যাকটনের সেই বিখ্যাত উক্তি : 'সমস্ত আইনই শেষ পর্যন্ত জনগণের সম্মতির ওপর নির্ভর করে'। নৈতিক মূল্যবোধ কিছুটা নিম্নগামী না-হলে শিক্ষিত সচ্ছল পরিবারে হোয়াইট-কালার অপরাধ ক্রমশ বাড়ছে কেন? যাকে আজকাল 'পারমিসিভ' সোসাইটি বলে সেই ফুর্তিবাজ সমাজের মানসিকতাও বিভিন্ন দেশে পুলিশি কাজের ওপর ছায়াপাত করছে।"

"পুলিশকে আগে সবাই ভয় পেতো। অনেকের অভিযোগ, এখন ভয় পায় না বলেই পুলিশ তত এফেকটিভ নয়।"

—"পুলিশের লোকেদের পরাধীন আমলে মানুষ যেভাবে দেখতো এখনও সেইভাবে দেখবে এটা আমাদের কাম্য নয়। আর ওই ভয় না-থাকলেই যে পুলিশ অকর্মণ্য হয়ে পড়বে তা কেন? লোকে যদি দেখে মুখে ভদ্র হয়েও পুলিশ নিয়মানুবর্তিতায় কঠোর, যদি বারবার প্রমাণিত হয় অন্যায় কাজ করে সব সময় শাস্তিকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, যদি মানুষ দেখে দেশের নিয়মকানুন এক একজনের জন্যে এক একরকম নয়, তা হলে জনমানসে পুলিশের অন্য এক ভাবমূর্তি সৃষ্টি হতে বাধ্য। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে পুলিশ যে আগ্রহী এই ছবিটাই বড় কথা।"

"আইন অমান্য করবার প্রবণতা?"

—"প্রবণতা বেড়ে চলেছে তা আমার মনে হয় না। তবে পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশেই কিছু মানুষ যে কোনো কর্তৃত্বের বিরুদ্ধেই আগের থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন তুলছেন, পুলিশের কাজকর্ম আপাতদৃষ্টিতে তাতে কিছুটা কঠিনও হচ্ছে। কিন্তু প্রচারের মাধ্যমে, আলোচনার মাধ্যমে মানুষের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিলে অনেক বেশি জন-সহযোগিতা পাওয়াও সম্ভব।"

"তাহলে তো আই-জি হিসেবে আপনার কোনো দুঃখই নেই!"

—"আছে বৈকি। সবচেয়ে বড় চিন্তা বিলম্ব। পুলিশের কাজ আইনের প্রয়োগ। কিন্তু এই কিছু পা এগিয়ে আমরা প্রত্যেক থানায় ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বক্স দিয়েছি। এতে আঙুলের ছাপ নেওয়া ইত্যাদির বিশেষ সুযোগ আছে। এ-সবের ব্যবহার কিছুটা নির্ভর করে স্থানীয় অনুসন্ধানকারী অফিসারের মানসিকতার ওপরে।"

"ভাল ছেলেরা কি আগের মতো পুলিসের চাকরিতে আসতে চাইছে?"

—"প্রতি বছর বেশ কিছু ভাল ছেলে পুলিশের সাব-ইনেসপেক্টর পদে আসছে বলেই তো মনে হয়।আগে পুলিশ থেকে আলাদা রিক্রুটমেন্ট হতো, এখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে খবর দেওয়া হয়, তাঁরা লিস্টি পাঠান।"

"অনেকে ভাবছেন, এইভাবে সেরা ছেলে পাওয়া যায় না। সৈন্যবাহিনী, বিমান বাহিনী, কীভাবে সেরা ছেলেদের আকর্ষণ করেছেন তা কি আপনারা লক্ষ্য করছেন না?"

—"ভেবে দেখার কথা। যেভাবে ডেপুটি পুলিশ সুপার নিয়োগ করা হয় সেইভাবে কোনো বাৎসরিক পরীক্ষার মাধ্যমে সাব-ইনসপেকটর নিলে হয়তো আরও ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।"

"ঢাকা থেকে এম-এ পাশ করে আপনার মতো একশ পনেরো টাকা মাইনের কোনো সহায়সম্বলহীন মাস্টারমশায় ছিন্নমূল হয়ে এদেশে এসে যদি পুলিশের সবচেয়ে শক্তিমান অফিসার হবার স্বপ্ন দেখে তাহলে তাকে কী করতে হবে?"

—মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে পড়লেন সত্যব্রত বসু। কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "তাকে ধৈর্য ধরে আই-পি-এস পরীক্ষায় বসতে হবে এবং অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সব রকম প্যাঁচোয়া মনোবৃত্তি ত্যাগ করে বছরের পর বছর নীরবে কাজ করে যেতে হবে। টেনশন, একসাইটমেন্ট

এবং প্রোভোকেশনের মধ্যে যে লোক মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে না পুলিশ লাইনে তার অনেক দুঃখ।"

"আইন যেভাবে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে তাতে আইনে বিশেষ জ্ঞান না-থাকলে কি শেষ পর্যন্ত থানায় কাজ করা চলবে? শুনেছি, নরওয়েতে আইনের ডিগ্রি না-থাকলে পুলিশ অফিসার হওয়া চলে না।"

—"আগে ছিল দুটি মাত্র আইন। পেনাল কোড এবং ক্রিমিন্যাল প্রোসিজিওর কোড। এখন অসংখ্য আইন এবং প্রতিবছর আইনের সংখ্যা আরও বাড়ছে। এবং যেখানেই 'কগনিজিবল' অপরাধের ইঙ্গিত রয়েছে সেখানেই পুলিশের দায়িত্বভার বাড়ছে। আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে আইনের শিক্ষা মোটামুটি ভালভাবেই দিই।"

সমস্ত উত্তর প্রকাশ্যে দেওয়া যায় না, প্রকাশ্যে প্রশ্ন করাও হয়তো সমীচীন নয়—তবুও তাই ঘটে এবং লুকোচুরি খেলার উত্তাপও বেড়ে যায়। কিন্তু আসন্ন অবসরের অপরাহ্ণ আলোয় বহুবিতর্কিত রাজ্যের বিদায়ী কোটালের কাছে নানা খবর জানতে ইচ্ছা হয়—সেই সব খবর যা একমাত্র কোটালের পক্ষেই জানা সম্ভব।

লোকের ধারণা সেকালের আই-পি এবং একালের আই-পি-এস এর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। আমার কাছে এই কথা শুনে সত্যব্রত বসু বললেন, "ইংরেজ আমলে বড় পুলিশ অফিসারদের জীবনধারাই ছিল অন্য। জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কই ছিল না। কোনো কোনো জায়গায় জেলার এস-পিকে বলা হতো 'কাপ্তান সাব'। এস-পি থানায় পৌঁছলে সিংহাসনের স্টাইলে দরবার সাজানো হতো। স্বভাবতই তাঁদের চারদিক ঘিরে রহস্যময় জ্যোতি সৃষ্টি হয়েছিল, ইংরিজিতে যাকে বলে 'অরা'। এখন আই-পি-এসরা সহজলভ্য, অসংখ্য মানুষ নানা কাজে যখন খুশি তাঁদের সঙ্গে দেখা করছেন এবং দৈনন্দিন কাজের শেষেও আই-পি-এসরা অন্য পাঁচজনের মতো সামাজিক আসরে যাচ্ছেন। গ্ল্যামারটা কম হওয়াই স্বাভাবিক। সত্যি কথাটা হলো : "সেকালেও যেমন দক্ষ অফিসার ছিলেন, এখনও তেমন আছেন। সার্ভিসের স্ট্যানডার্ড খারাপ হয়েছে বলে মনে করি না। অনেক কৃতী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা, বিজ্ঞানাগারের গবেষণা, বেসরকারি চাকরির সুযোগ-সুবিধা ছেড়েই পুলিশে আসছেন।"

"শিক্ষাদীক্ষার মান?"

—"লেখাপড়ার কথা যখন তুললেনই, তখন শুনুন। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত

ইংরেজরা ম্যাট্রিক পাশ করেই আই-পি হতেন, ডিগ্রির কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। ১৮৬৩ সালে আই-পি-এর-এর দরজা ভারতীয়দের কাছে খুললেও, আই-পিতে প্রথম ভারতীয় নেওয়া হয় ১৯২১ সালে। ছ'জনের ওই ব্যাচে দু'জন বাঙালি ছিলেন। বাংলার সুকুমার গুপ্ত এবং ইউ পির বিশ্বনাথ লাহিড়ি।"

"অনেকের ধারণা, পুলিশে চাকরি করলে মানুষ সম্পর্কে বিশ্বাস কমে যায়। মনে হয়, চোর-ডাকাত, ঠগ-জোচ্চোর এবং ইনফর্মার ছাড়া বিশ্বসংসারে আর কিছু নেই।"

—"তাই নাকি?" মৃদু হাসলেন একদা অর্থনীতির অধ্যাপক সত্যব্রত বসু। "পুলিশের চাকরিতে মোটামুটি সহজ জীবনযাপন করেছি বলেই তো ধারণা। কর্মজীবনে নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, যতটা পেরেছি মানুষকে সাহায্য করেছি। আবার অনেকে তলে তলে অন্যায় মতলব সিদ্ধির জন্যে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে একটু কঠোর হয়েছি, এই পর্যন্ত।"

কী ভেবে আই-জি আবার মুখ খুললেন। "ওই যে রানাঘাটে প্রথম পোস্টিং বললাম, ওখানে দেখলাম অভাবে-অনটনে দেশছাড়া মানুষের পুর্নবাসনে যত দেরি হবে আইন-শৃঙখলা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস তত কমে যাবে। আপনি দেখলেন একটা লোক ডাকাতি করলো, ধরাও পড়লো, কিন্তু কৃতকর্মের শাস্তি পেতে পেতে মাসের পর মাস বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে। তা হলে পুলিশ সম্পর্কে আপনার ভক্তি-শ্রদ্ধা কমবেই। এইটুকু পশ্চিমবাংলায় একলাখ তিপ্পান্ন হাজার ক্রিমিন্যাল মামলার বিচার বাকি রয়েছে ; আর থানা পর্যায়ে তদন্তসাপেক্ষ কেস রয়েছে বত্রিশ হাজার। অন্যায় যে করেছে তার শাস্তি হয়েছে এর থেকে বড় সার্টিফিকেট পুলিশের পক্ষে হয় না। কিন্তু পদে পদে বাধা।"

"কীসের বাধা?"

—"সামর্থ্যের বাধা, অজস্র কাজের চাপের বাধা এবং আইনের বাধা। কত জায়গায় আইন-নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ হচ্ছে না বলে আসামী ছাড়া পাচ্ছে। বেশ কিছুদিন থেকে ভাবা হচ্ছে, মামলার দেরি কমাবার জন্যে অনুসন্ধানকারী অফিসার এবং ল'-অ্যানড-অর্ডার অফিসার আলাদা করে দেওয়া হবে। এতে অনুসন্ধানকারী অফিসাররা সমস্ত শক্তি দিয়ে ঐ দিকটা দেখতে পারবেন। এই পৃথকীকরণের ভাল এবং মন্দ দুটো

দিকই আছে। দুটোর কো-অর্ডিনেশনেরও ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে। এ-নিয়ে আমার উত্তরসূরিরা নিশ্চয় আরও মাথা ঘামাবেন।"

"আপনি বিচারের কথা বলছেন, কিন্তু অনেকের ধারণা আপরাধী ধরাই পড়ে না!"

—[মৃদু হেসে] "ধরা পড়ে বই কি! না-হলে থানা হাজতে জেলে এত লোক গিজ গিজ করছে কী করে? ডাকাতি কেসে ৩০% অপরাধী ধরা পড়ে। খুনের ক্ষেত্রে ৫০%—৬০% কেসে চার্জশিট ইসু হয়।"

"চুরির ক্ষেত্রে?"

—"ওখানে ডিটেকশন একটু কম। শতকরা ১৫—১৮-র বেশি নয়।"

"চার্জশিটের কথা তো বললেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাস্তি ক'জনের হয়?"

—"যত মামলা দায়ের হয় তার ৫০%—৬০% ক্ষেত্রেই শাস্তি হয়। যে কোনো দেশের পক্ষেই এটা ভাল রেকর্ড, যদিও প্রত্যেক আই-জি চাইবেন ১০০% অপরাধীই শাস্তিভোগ করুক।"

"শাস্তির আগে রয়েছে তদন্ত। রহস্য উপন্যাসে তদন্ত বিজ্ঞানের যে অভূতপূর্ব অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় সে তুলনায় আমাদের পুলিশ অনেক পিছিয়ে নেই কী?"

—"আবার সেই রিসোর্সের কথা ওঠে, ট্রেনিং-এর কথা ওঠে, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের কথা ওঠে। ইংরিজি রহস্য উপন্যাসে যেমন পড়েন তেমন না-হলেও আমরা এগোচ্ছি। একেবারে এক শতাব্দী আগের অজ্ঞান তিমিরান্ধকারে পড়ে নেই আমরা। অনেকেই জানেন না, নতুন যুগের সঙ্গে তাল রেখে পুলিশ বিজ্ঞান জানে না এটা ভাববেন না।"

"প্রতিটি দক্ষ পুলিশের পিছনে এক-আধজন দক্ষ ইনফর্মার থাকেন শোনা যায়। আপনি কী বলেন?"

—"অপরাধের রহস্য উন্মোচনে দীর্ঘদিন ধরে সমস্ত দেশে ইনফর্মার ব্যবহার হয়।"

"টাকার মূল্য হ্রাসে এঁরা নাকি খুবই কষ্ট পাচ্ছেন শোনা যায়। পুরোনো হারে পেমেন্টের জন্য আজকাল নাকি তেমন খবরাখবর ইনফর্মারদের কাছ থেকে আসে না?"

—"চিন্তা করবেন না। যেখানে যা প্রয়োজন পুলিশ তা করে যাবে।"

"প্যারিসে এক সময় প্রতি চারজন ঝি-চাকরের মধ্যে একজন নাকি ইনফর্মারের ভূমিকায় প্রভুর ওপর নজর রাখতো। একজন ফরাসি পুলিশ প্রধান তো তাঁর অন্নদাতাকে গর্ব করে বলেছিলেন, যখনই তিনটি লোক একত্রিত হয়ে এই রাজ্যে কথাবার্তা বলে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তাদের একজন অন্তত আমাদের ইনফর্মার। কিছু বলবেন ?"

—"আমরা ফরাসি-সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বে বসবাস করছি না, শংকরবাবু।"

"চাকরি জীবনের কোনো ছোট্ট স্মৃতি ?'

—"পুলিশের চাকরিতে ঢুকে একত্রিশটা বছরে কত কিছুই তো দেখলাম। তেমন কারও হাতে পড়লে নিশ্চয় সুন্দর একটা আত্মজীবনী হয়ে যেতো। শুনেছি, প্রথম আই-পি বিশ্বনাথ লাহিড়ি তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন।.... আমার মনে পড়ে প্রথম যুগের ছোট্ট দুটি ঘটনার কথা। রানাঘাটে কাজ করার সময় পুলিশের গাড়ি না পেয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে আসামী পাকড়াও করতে গিয়েছিলাম। লোকটা রক্ষিতার বাড়ি থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি নিজে গিয়েই তাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। একটা পিস্তল উদ্ধার হয়েছিল। রানাঘাটের কাছে এক গ্রামে অতি দরিদ্র মহিলা সম্বন্ধে রুটিন এনকোয়ারিতে গিয়েছিলাম। কী জন্যে এসেছি খোঁজখবর না-করেই ভদ্রমহিলা পুলিশি ড্রেস দেখে প্রথমেই আমার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন, 'পান খাবেন', খুব মনোকষ্ট হয়েছিল।"

"তা হলে পুলিশের মনের আনন্দ কীসে হয় ?"

বিচক্ষণ কোটাল কিছুক্ষণের জন্যে অন্যরকম হয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, "অপরাধী ধরা পড়লে আনন্দ হয়। সেই অপরাধীর সাজা হলে বেশি আনন্দ হয়। আরও বেশি আনন্দ হয় অভাব-অনটনের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাওয়া কোনো দাগী আসামী যখন চাকরি-বাকরি পেয়ে ঘরসংসারী হবার জন্যে ও-লাইন ছেড়ে চলে যায়।"

পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে, ব্যাঙ্ক ডাকাতি সম্পর্কিত এক কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্যে ডজনখানেক ফাইল হাতে বেরিয়ে পড়লেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রবীণ আই-জি সত্যব্রত বসু।

মনে-প্রাণে নার্স

"ওয়ান্স এ নার্স অলওয়েজ এ নার্স। রোগীর পাশে রাতদিন ডিউটি ছেড়ে এখন নার্সিং প্রশিক্ষণের কাজে জড়িয়ে পড়লেও মনে-প্রাণে নার্সই থেকে গিয়েছি", বললেন রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিতা নার্স কুমারী শুভা দাশগুপ্ত।

নার্সিং-এর সর্বোচ্চ সম্মান ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড নিয়ে শুভা দাশগুপ্ত যেদিন দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন তার পরেই পাকড়াও করেছিলাম ওঁকে। আমাদের এই অভাগা বাংলায় এখনও তাহলে নার্সিং এবং চিকিৎসা আছে! খবরের কাগজে যা-সব রিপোর্ট পড়ি! আমার জানাশোনা এক ভদ্রলোক তো রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, "যেন পড়ি আর মরি, কলকাতার হাসপাতালে না যেতে হয়।"

শুভা দাশগুপ্তর দেশ ঢাকা বিক্রমপুর। জন্ম কলকাতা, শিক্ষা প্রথমে কলকাতায়, তারপর দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে। পঞ্চাশের প্রবীণতা এখনও নার্সিং কলেজের কৃতী প্রিন্সিপ্যালকে তেমনভাবে স্পর্শ করেনি। তিন দশকের রোগী পরিচর্যা ওঁর মুখে এখনও এক আশ্চর্য সরলতা ও ঔজ্জ্বল্য রেখে দিয়েছে, যাকে আমার এক বন্ধু 'বৈদ্য-ব্রাইটনেস' বলে থাকেন।

শুভা দাশগুপ্তর ধারণা "ডাক্তারি এবং নার্সিং—এ দুটোই বাঙালির রক্তে রয়েছে। এখানে আমাদের এতো বদনাম, খবরের কাগজ খোলা যায় না, রোজ কিছু না কিছু অভিযোগ—কিন্তু বিশ্বের যেখানে যাবেন সেখানেই বাঙালি ডাক্তার-নার্সের আদর দেখবেন।"

"বাঙালিরা অনেকটা ধানগাছের মতন—উৎপাটিত হয়ে পুনরোপিত না হলে বিকশিত হয় না"! আমার এই কথা শুনে স্বল্পভাষিণী শুভা দাশগুপ্তর চোখদুটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—"যারা বলে বাঙালিরা নার্সিং জানে না, তাদের বলবেন এই বেড়ালই বনে গেলে বনবেড়াল হয়। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বিখ্যাত নার্সিং কলেজের (রাজকুমারী অমৃত কাউর কলেজ, দিল্লি)

প্রধানার নাম অর্চনা ভাদুড়ি।" মানসিক রোগ নার্সিং-এ বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত নাম পূর্ণিমা সেন—এখন নিউফাউন্ডল্যান্ড সেন্ট জনস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর। দিল্লি কলেজে আমার থেকে এক বছর সিনিয়র ছিলেন অনীতা বসু—তিনি কানাডার জাঁদরেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নার্সিং-এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। সমস্ত বিশ্বের ছাত্রীরা নার্সিং-এর শেষ কথা শিখতে এদের কাছে আসে ভাবতে মন্দ লাগে না।"

১৯৫১ সালে কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন থেকে আই এস-সি পাশ করে শুভা দাশগুপ্ত যে-সময় নার্সিং শেখার কথা ভেবেছিলেন তখনও নার্সিং রক্ষণশীল বাঙালি সমাজে জাতে ওঠেনি। কিন্তু তাঁরা বাবা এবং ডাক্তার কাকার উৎসাহেই শুভা দাশগুপ্ত দিল্লি চলে গেলেন। "জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রোগীর বিছানার পাশ থেকে বাইরের দিকে তাকালে বিশ্বভুবনের অন্য এক রূপ ধরা দেয়, শংকরবাবু। দিল্লির হাসপাতালের বিনিদ্র রজনীগুলো আমার চোখ খুলে দিলো। নার্স হয়েছি বলে আমার কোনো দ্বিধা রইলো না, বরং গর্ব হলো।"

নার্সিং-এ বি এস-সি অনার্স, তারপর এম এস-সি, তারপর একসময় নার্সিং-এর পীঠস্থান আমেরিকায় আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানেও আরও একটা মূল্যবান ডিগ্রি। অনেকে আর ফেরেনি, বিদেশেই থেকে গিয়েছে—কে পছন্দ করে স্বদেশের শত শত দরিদ্র রোগীতে ঠাসা অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর হাসপাতালে কাজ করতে? "আমি ফিরে এলাম।" দেশের দারিদ্র্য ও দুঃখ এখনও তাহলে অনেক মানুষকে টানে। শুধু দুঃখ হয় তখনই যখন ডাক্তারি ও নার্সিং-এ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা হাসপাতাল চালাতে পারি না। যখন কৃতী ছাত্রছাত্রীরা স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিবর্তনের আশা ছেড়ে দিয়ে গতানুগতিকতার গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় এবং তারপরেই শুরু হয় পরস্পরকে দোষারোপের প্রতিযোগিতা।

"আপনার বাঙালি প্রীতি কিছুক্ষণের জন্য ত্যাগ করুন। সত্যি করে বলুন কেরলি নার্সদের সঙ্গে আমাদের সিস্টার সেন, বসু, মিত্রদের তুলনা করা যায় কি না?"

শুভা দাশগুপ্ত এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করলেন না। "যে সব গুণ থাকলে সেরা নার্স হওয়া যায়, তার সবগুলিই বাঙালি মেয়েদের মধ্যে ঈশ্বর অকৃপণভাবে ঢেলে দিয়েছেন। সহানুভূতি, ধৈর্য, মায়া, মমতা, সুসঙ্গত ব্যবহার এবং আন্তরিকতায় বাঙালি মেয়েরা কার থেকে কম বলুন?"

"বাঙালি সিস্টারদের কোনো দোষই তা হলে আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না !"

"বাঙালি মেয়েদের দোষ আছে। ওরা তেজ দেখিয়ে গোঁ দেখিয়ে কাজ করিয়ে নিতে জানে না, অনেকের সেই গুণের অভাব ইংরিজিতে যাকে বলে ট্যাক্ট।"

বাঙালি মেয়েরা নার্সিং-এ খারাপ করেছে তার একটি কারণ ইংরিজি এবং হিন্দি বলার অনভ্যাস। মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে এবং অনেক ভাল জায়গায় চাকরি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার এবং নার্সদের মধ্যে কারা ইঞ্জেকশন ভাল দেয় এই প্রশ্নের উত্তরে শুভা দাশগুপ্ত মৃদু হেসে নার্সদের পক্ষেই ভোট দিলেন।

আমার মনে পড়লো এক পাঞ্জাবি বন্ধুর মন্তব্য : "বাঙালি মেয়েদের থেকে ভাল ইঞ্জেকশন পৃথিবীতে কেউ দিতে পারে না !"

ডাক্তার-নার্স সম্পর্কের আলোচনায় ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গলের মন্তব্য উঠলো। সেই কতদিন আগে অন্য এক শতাব্দীতে তিনি বলেছিলেন, ডাক্তার-নার্সের সম্পর্কটা প্রফেশনাল হওয়া প্রয়োজন।

এর অর্থ কী জানতে চাইলে শুভা দাশগুপ্ত বললেন, "সম্পর্কটা প্রভু ও দাসীর নয়—ডাক্তারিটাও একটা বৃত্তি এবং নার্সিংও আর একটা বৃত্তি, রোগীর মঙ্গলের ব্যাপারে আমাদের দুজনেরই বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ডাক্তারের কাজ রোগের ডায়গনোসিস করা এবং ট্রিটমেন্টের প্রেসক্রিপশন করা। আর ক্লাসিক নার্সিং-এর দায়িত্ব অনেকগুলো—রোগীর অসুখ সম্বন্ধে নজর রাখা, রোগীর ভূমিকা মানুষটি যাতে মেনে নিতে পারেন সে-বিষয়ে সাহায্য করা, তাঁকে সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করা, তাঁর নার্সিং করা, প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী চিকিৎসা করা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে রোগীকে পরামর্শ দেওয়া এবং রোগীর আত্মীয়স্বজনদের ভরসা দেওয়া।"

ডাক্তার-নার্স দুজনেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কে প্রধান এবং কে গৌণ তা নির্ধারণ করা যায় না। যে-জন্য সমস্ত পৃথিবীতে নার্সিং প্রশিক্ষণে ডাক্তারদের তেমন ভূমিকা নেই—এই সব কলেজের প্রধান নার্সরাই হন এবং প্রয়োজনবোধে তাঁরা কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য ডাক্তারদের মাইনে করে রাখেন।

আমার এক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক বন্ধুর কথা তুললাম। ডাক্তার সুব্রত সেন প্রায়ই বলে থাকেন, সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বিদায় নেবার সময় রোগীরা প্রায়ই কেবল ডাক্তারবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যান, নার্সদের নিঃশব্দ দানের

কথা সব সময় তাঁদের মনে থাকে না।

শুভা দাশগুপ্ত বললেন, "এদেশে ডাক্তারের তুলনায় নার্সরা অবশ্যই অনেক কম সামাজিক সম্মান পান। তবে আসল সত্যটি একবার সারদা মিশনের সন্ন্যাসিনী বলেছিলেন—ডাক্তাররা যদি হাসপাতালের হার্ট হন, নার্সরা তবে লাং। দুটোর একটা ছাড়াই প্রতিষ্ঠান অচল।"

জেলখানায় যেমন কয়েদিদের টিকিট নম্বর, হাসপাতালে তেমন রোগীদের বেড নম্বর—এই নম্বরের আড়ালেই মানুষের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়।

শুভা দাশগুপ্ত বললেন, "দিল্লিতে যখন নার্সিং করতাম, তখন ওরকম ছিল না—ওখানে রোগীদের নাম ধরেই আমরা জিজ্ঞেস করতাম,কেমন আছেন ? যন্ত্রণা কমলো ? একটা ছোট্ট মেয়ের কথা মনে আছে। সে আমাকে বলেছিল, খুব মজা, তুমি নিজের নাম বলবে না, শুধু আমাদের নাম জানবে !"

জন্ম এবং মৃত্যু—মানবজীবনের দুটো প্রধান ঘটনাই যখন হাসপাতালে ঘটে তখন অসংখ্য স্মৃতি যে প্রত্যেক সেবিকার বুকের মধ্যে চিরদিনের জন্য খোদাই হয়ে থাকবে তা বলাই বাহুল্য। শুভা দাশগুপ্তের জীবণে তেমনি অসংখ্য ঘটনা আছে। কর্মস্থলের পরিবেশ সেবিকাদের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে দুর্বল করে তুলছে বলে তাঁর দুঃখের শেষ নেই। তবু অনেক ভেবেচিন্তে শুভা দাশগুপ্তর অভিমত, হাসপাতালে এখন নার্সরাই সবচেয়ে ডিসিপ্লিনড প্রফেশন।

প্রতি বছরে এখন কয়েক হাজার বাঙালি মেয়ে নার্সিং পাশ করছেন এবং পাশের সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি পাচ্ছেন। নার্স বলতে যে নাক সিঁটকানো ব্যাপারটা ছিল, তা অনেকটা কেটে গিয়েছে, যদিও তাঁরা এখনও এয়ারহোস্টেসদের মতো গ্ল্যামারাস হয়ে ওঠেননি। বিদেশে কিন্তু তা নয়, সেখানে বড় বড় পরিবারের মেয়েরা নার্স হন, বিরাট বিরাট কৃতী ব্যক্তির স্ত্রীরা একসময় নার্স ছিলেন বলে গর্ব করেন। "আমাদের জানাশোনা একটি বাঙালি মেয়ে বিদেশে বিয়ে করলো। খবরটা রটতেই হবু স্বামীর অফিসকর্তা বললেন, মনে রেখো তুমি বি এস-সি (এন) বিয়ে করছো ! এখন থেকে সারাজীবন তোমাকে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগতে হবে।"

শুভা দাশগুপ্ত বললেন, "নিজে ঘরণী হইনি, কিন্তু খোঁজ করলে দেখবেন নিজের বৃত্তির বাইরে নার্সরা সুগৃহিণী হয়, জীবনের দুঃখময় মুহূর্তগুলোর সঙ্গে পরিচয় থাকার ফলে ওদের মানিয়ে নেবার ক্ষমতা বেড়ে যায়, অনেক

জিনিস আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারে, তৎপরতা বাড়ে, ছেলে মানুষ করার ব্যাপারে ওদের জুড়ি থাকে না।"

নার্সিং পাশ করার পর যে ২৭টি বছর কেটেছে তার অনেকটাই নার্সিং শিক্ষার ব্যাপারে নিয়োগ করেছেন শুভা দাশগুপ্ত।

"শিক্ষার ব্যাপারে ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গলের কথা প্রতি মুহূর্তে অবশ্যই মনে পড়ে, কিন্তু ছাত্রীদের আমি বলি, কখনও ভুলো না আড়াই হাজার বছর আগের সম্রাট অশোকের কন্যা সংঘমিত্রার কথা। কখনও ভুলো না যে এখন যাকে হাসপাতাল বলে তার সূচনা ইওরোপে নয় ভারতবর্ষেই এর পত্তন হয়েছিল। সম্রাট অশোকের সময় অন্তত আঠারোটা হাসপাতাল ছিল যেখানে রোগীর সেবা, পথ্য এবং পরিচ্ছন্নতার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো।"

কথায়-কথায় মেল-নার্সের প্রসঙ্গ উঠলো। পুরুষরা কি সেবাধর্মের অযোগ্য? রুগ্‌ণ মানুষের দুঃখ অপনোদনে তাঁদের কি কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না?

আমার প্রশ্নের উত্তরে শুভা দাশগুপ্ত বললেন, "অন্য রাজ্যে এখনও ব্রাদার নার্স রয়েছেন—তাঁদেরই একজন মাদ্রাজের জি সনদানস্বামী এবার রাষ্ট্রীয় সম্মান পেলেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কামরাজ যখন একবার মোটর দুর্ঘটনায় আহত হন, তখন সনদানস্বামীকেই স্পেশ্যাল নার্স হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। বিজু পট্টনায়েকের যখন শিরদাঁড়ায় অস্ত্রোপচার হয়, তখনও নার্সিং-এর দায়িত্ব পড়েছিল ব্রাদার সনদানস্বামীর ওপর।" অন্য অনেকের সঙ্গে শুভা দাশগুপ্তর মতের মিল হয় না, তাঁর ধারণা মেল-নার্স থাকা ভাল।

"তা হলে আপনার কলেজে কি বি এস-সি নার্সিং-এ আপনি পুরুষদের নেবেন?"

"নেবার উপায় নেই, এই কলেজের দরজা একমাত্র মেয়েদের জন্য খোলা।"

পি জি হাসপাতালের চত্বরে কলেজ অফ নার্সিংকে শুভা দাশগুপ্ত তিলে-তিলে যত্নের সঙ্গে অনেক দিন ধরে গড়ে তুলেছেন। প্রতি বছর ছাত্রীসংখ্যা কুড়ি, সামনের বছর থেকে বেড়ে পঁচিশ হচ্ছে। উচ্চমাধ্যমিকে যারা বিজ্ঞান নিয়ে পাশ করেছে, তারাই এখানে প্রবেশের যোগ্য। চার বছরের কোর্সের শেষে বি. এস-সি (নার্সিং) ডিগ্রি। এখানে মাইনে মাসিক কুড়ি টাকা, তাছাড়া গেম ফি সাত টাকা। আছে বইপত্তর কেনার খরচ। হোস্টেলে থাকা আবশ্যিক—মাসিক খরচ প্রায় ১৩০ টাকা।

এঁদের হোস্টেল আমি দেখেছি। এমন সুপরিচ্ছন্ন হোস্টেল আমি ভারতবর্ষের কোথাও দেখিনি। শুভা দাশগুপ্ত গর্বের সঙ্গে বললেন, "এখান থেকে পাশ করে কেউ বসে থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে মাসিক হাজার টাকার বেশি মাইনের চাকরি।"

প্রতি ক্লাসে মাত্র কুড়িটি ছাত্রী—কিন্তু এইসব মেয়েদের পৃথিবীর সেরা সেবিকায় পরিণত করবার স্বপ্ন শুভা দাশগুপ্তকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখে। প্রথমেই যা চোখে পড়ে, এই নার্সিংশিক্ষার্থীরা শ্বেতবস্ত্র আচ্ছাদিত নন—এঁদের আছে বাসন্তী রঙের শাড়ি, জামা এবং শীর্ষপরিচ্ছেদ। সরস্বতীর সাধনা তো—তাই প্রথম বছর যখন কলেজ শুরু হলো তখন মেয়েদের ওপর শাড়ির রঙ নির্বাচনের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। "ওরাই ভেবেচিন্তে বাসন্তী রঙটা পছন্দ করলো—এক সময় এদেশের সব ইস্কুলে মেয়েরা তো শুক্লাপঞ্চমীতে ওই রঙের জামাকাপড় পরতো।"

চার বছর ধরে মেয়েদের ওপর পড়াশোনার চাপ প্রচণ্ড। শুধু তো বই পড়া নয়—ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ডিউটি, কখনও অপারেশন থিয়েটার, কখনও লেবার রুম, কখনও আই সি ইউ। মেয়েরা শুধু সেবা করেই ফিরে আসে না, প্রতিদিন কী দেখলো তার রিপোর্ট লিখতে বসে—সেইসব রিপোর্ট আবার শুভা দাশগুপ্ত এখনও খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়তে ভালবাসেন।

দিল্লীর রাজকুমারী অমৃত কাউর নার্সিং কলেজের সুনাম এখন সর্বত্র—"দেখবেন একদিন আমাদের এই কলেজের সুনামও সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়বে।" নার্সিং সংক্রান্ত যে শ' দেড়েক গবেষণা দিল্লি কলেজে হয়েছে তার গোটা তিরিশেক কৃতিত্ব বাঙালি নার্সদের।

শুভা দাশগুপ্তর বিশ্বাস একদিন তাঁর কলেজের ছাত্রীরাও বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারিণী হবে। পশ্চিমের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আমাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের মিলন ঘটাবার নীরব সাধনা চলেছে পি জি হাসপাতালের চত্বরে কলেজ অফ নার্সিং-এ। ওখানে যেমন আছে ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের মূর্তি তেমন আছেন দেবী সরস্বতী। ওখানে প্রথম দিনে র‍্যাগিং হয় না, তার বদলে কুড়িটি মেয়ে উপনিষদের বাণী পাঠ করে শুদ্ধ সংস্কৃতে। শীর্ষণ্য ধারণানুষ্ঠানে জীবন সংরক্ষণ, আর্তি নিবারণ ও স্বাস্থ্য সংবর্ধনের ব্রত গ্রহণ করে।

একটি জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে নিয়ে ওরা নতমস্তকে প্রার্থনা জানায়—"পরমেশ্বরঃ। সেবাব্রতসঙ্কল্প দশকং যদ অদ্য ময়া গৃহিতং তৎপালনার্থ ময়ি শক্তি নিধেহি।"

হীরা জহরৎ

বাঙালিকে কর্মবিমুখ এবং ব্যবসায় বুদ্ধিহীন বলে প্রচার করে যাঁরা আনন্দ পান তাঁদের পক্ষে দুঃসংবাদ। ৩০শে এপ্রিল ১৯৮৩, শনিবার সকাল দশটায় দিল্লিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বণিক সমিতি এবং বাঘা বাঘা শিল্পপতিদের এক সভায় অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি হিসেবে যিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি কলকাতার জহর সেনগুপ্ত। বিংশ শতাব্দীর স্বদেশী এবং বিদেশী শিল্পপতিদের দুর্ভেদ্য দুর্গ 'অ্যাসোচ্যাম'-এ মাত্র আর একজন বাঙালি এযাবৎ সভাপতিত্বের দুর্লভ সম্মান পেয়েছিলেন—তাঁর নাম ভাস্কর মিত্র (ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের এককালীন চেয়ারম্যান)।

বণিকের মানদণ্ডই যেহেতু একদিন এদেশে রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছিল সেহেতু ইংরেজ আমলে বণিকসভার ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। প্রতি বছর স্বয়ং বড়লাট দিল্লি থেকে ছুটে আসতেন কলকাতায় অ্যাসোচ্যাম বার্ষিক সভায় বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বিবৃতি দেবার জন্যে। অ্যাসোচ্যাম প্রেসিডেন্টের পরের বছরই জুটতো আকাঙ্ক্ষিত 'স্যার' উপাধি।

তারপর অবশ্য হুগলি নদীর জল অনেক ঘোলা হয়েছে। সর্বভারতীয় সংস্থা হিসেবে অ্যাসোচ্যামের দপ্তর কলকাতা থেকে দিল্লি চলে গিয়েছে, কিন্তু স্বাধীন ভারতে তার গুরুত্ব কমেনি। এ-দেশের শিল্প পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে সরকার 'ফিকি' এবং অ্যাসোচ্যামের সঙ্গে ঘন ঘন পরামর্শ করেন। এ-দেশের বেসরকারি শিল্পোদ্যোগের তাপমাত্রা জানবার নির্ভরযোগ্য থার্মোমিটার এই দুই প্রতিষ্ঠানের দুই কর্ণধার। এদেশের নামকরা শিল্পগোষ্ঠী—যেমন টাটা, মফতলাল, মাহিন্দ্র, সমস্ত বহুজাতিক কোম্পানি, যাঁদের মোট বিক্রি কয়েক হাজার কোটি টাকা, যাঁরা এদেশের

শ্রমিকদের একটা বড় অংশের নিয়োগকর্তা, তাঁরা এই অ্যাসোচ্যামের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত এবং স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এঁদের মুখ্য মুখপাত্র।

রাজধানীর মহাশক্তিমানদের অলিন্দে অ্যাসোচ্যাম কর্ণধারের নিত্য আনাগোনা এবং ভাবতে মন্দ লাগে না ফরিদপুরের অখ্যাত পণ্ডিতসার গ্রামের বাংলা মিডিয়ম ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করা এক সেনগুপ্ত নন্দন, যিনি ঢাকা মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ থেকে আই-এ পাশ করে সতেরো বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় পদার্পণ করেছিলেন, যথাসময়ে সমস্ত ভারতবর্ষের শিল্পপতিদের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব লাভ করেছেন।

বছরে চার-পাঁচশ কোটি টাকা বিক্রি করেন এমন অনেক দিশি-বিলিতি কোম্পানির কর্ণধার থাকাতে জহর সেনগুপ্তর নির্বাচন এ দেশের শিল্পজগতে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ তিনি যে-কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটর সেই ক্লোরাইড ইন্ডিয়ার বার্ষিক বিক্রি মাত্র ৬৬ কোটি টাকা। এই কোম্পানির অন্য ছ'জন সারাক্ষণের ডিরেকটরদের মধ্যে পাঁচ জন হলেন ঘোষ, দাশগুপ্ত, সেন ও বসুরা। এঁদের হেড অফিস কলকাতা। না, এঁরা লুকিয়ে চুকিয়ে অন্য কোথাও পালাবার মতলব আঁটছেন না। এঁরা কলকাতার কাছে দমদমে অভিনব এক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করেছেন এবং হলদিয়ায় কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন কারখানা স্থাপন করবার দূরদর্শিতা দেখিয়েছেন। সব চেয়ে যা আশ্চর্য, এঁরা কখনও পশ্চিমবঙ্গ-নিন্দার অষ্টপ্রহরী পালাকীর্তনে অংশগ্রহণ করেন না, গর্বের সঙ্গে স্বীকার করেন যে তাঁদের শ্রমিকরা সব মিলিয়ে মাসে মোটা টাকা রোজগার করেন, স্ট্রাইক, লক-আউট নেই এবং বিদ্যুৎ ঘাটতি সত্ত্বেও বাৎসরিক লাভের পরিমাণ ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

এখন থেকে ছ' দশক আগে ফরিদপুরের যে ভদ্রলোক ছেলের নাম জহরলাল এবং মেয়ের নাম ইন্দিরা রেখেছিলেন তিনি শিক্ষাবিভাগে সাধারণ কাজ করতেন। পড়াশোনায় ছেলের তেমন মন ছিল না, তাই খগেনবাবু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'তুই তোর দিদির গাড়ির কোচোয়ান হবি।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন বি-কম পড়বার জন্যে সতেরো বছর বয়সের জহর কলকাতায় এলেন। বি-কম পাশ তো হলো, কিন্তু তারপর কী করা যায়? অ্যাকাউনটেন্সি পড়া? তখনকার এক দূরদর্শী অ্যাকাউনটেন্ট পরামর্শ দিলেন, "ফুলকপি নতুন উঠলে দাম বেশি হয়—তুমি কস্টিং পড়ো,

এদেশে সবে ঐ বিদ্যা শেখানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।"

কস্টিং পরীক্ষার মধ্যবর্তী পর্ব পাশ হওয়ার পরেই কলকাতার ৬ নম্বর এসপ্ল্যানেড ইসটে সরকারি ডিফেন্স অ্যাকাউন্টে অতি সাধারণ সরকারি চাকরি পাওয়া গেলো—মাস মাইনে ৩৮৪ টাকা। এই কাজে বেশিদিন জহরবাবুর মন বসলো না—তারপর কপাল ঠুকে ১৯৫১-তে বিলেত যাত্রা। বিলেতেও তখন বাজার ভাল নয়—কিন্তু পড়াশোনার সুযোগ যথেষ্ট। ১৯৫২-তে জহরবাবুর ভগ্নিপতি লন্ডন টাইমস থেকে শ্যালককে একখানা কর্মখালির কাটিং কেটে পাঠালেন, ভারতবর্ষে কারখানা আছে এমন এক কোম্পানি ফ্যাক্টরি অ্যাকাউনটেন্ট খুঁজছেন। লন্ডনে ইন্টারভিউ।

"সেই আমার ক্লোরাইড সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ হলো। চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে এলাম তিপান্ন সালে"— বলছিলেন জহর সেনগুপ্ত আমার সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাতে।

"আমাদের শ্যামনগর ব্যাটারি কারখানায় তখন দুশো-আড়াইশ লোক কাজ করে, কিন্তু ওপরতলায় সবই সায়েব, এমন কি পার্সোনেল ম্যানেজার পর্যন্ত। এঁরা যখন হোম লিভে যেতেন তখনও আবার বিলেত থেকে সায়েব আসতো।"

সেই অবস্থা থেকে নানা পিচ্ছিল পদ ও পথ অতিক্রম করে সালে ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যাটারি কোম্পানির প্রথম ভারতীয় ম্যানেজিং ডিরেকটর হওয়া—সে এক দীর্ঘ কাহিনী।

"না, আপনার 'সীমাবদ্ধ' উপন্যাসের পরাজিত নায়ক শ্যামলেন্দুর কথা স্মরণ করে আমার দিকে তাকাবেন না। বিবেক-বিরুদ্ধ কোনো কাজ কর্মক্ষেত্রে আমাকে করতে হয়নি, কোনো শ্রমিকের প্রাণ আমার উচ্চাভিলাষের বলি হয়নি। আমি ছিলাম নিতান্ত গেরস্ত—বেঁকানো ইংরেজি, অষ্টপ্রহরী ককটেল, ডিনার, ক্যাবারে, বলডান্স কোনো কিছুই আমাকে উন্নতির সোপানে তুলে দেয়নি। বরং একবার গোঁয়ার্তুমি দেখিয়ে, আমার এক সহকর্মী কানাই পালকে প্রমোশন দেওয়া হয়নি বলে কোম্পানিতে নিজের পদোন্নতি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। ছ'বছর আমার উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু অগ্নিপরীক্ষয় উত্তীর্ণ হবার পরে একদিন বিলেতের কর্ম কর্তারা আমার ওপরেই ইন্ডিয়ান কোম্পানির সব দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন।"

"আপনি তো লন্ডনের ক্লোরাইড ইনটারন্যাশনালের ডিরেকটর?'

"পাকে-চক্রে হয়ে গিয়েছি—এসব কিছুই জীবনের হিসেবের মধ্যে ছিল না।" বললেন জহর সেনগুপ্ত।

কিন্তু সবাই জানে এই ক'বছরে জহর সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ক্লোরাইড কোম্পানির বিক্রি ১৬ কোটি টাকা থেকে ৬৬ কোটিতে উঠেছে, লাভের মাত্রা তিন কোটি থেকে দশ কোটির সীমানা পেরিয়েছে।

লাভের মাত্রা হুড়মুড় করে কার খরচে বেড়ে ওঠে এই প্রশ্নের উত্তরে জহর সেনগুপ্ত বললেন, "লোক ঠকিয়ে ব্যবসার ফন্দিতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। খরিদ্দারকে ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা সুখ না-দিলে এই প্রতিযোগিতার বাজারে বাঁচা যাবে না এই বিশ্বাস আমি করি। যখন মালের খুব চাহিদা তখন ঝপ করে কোয়ালিটি খারাপ করে লাভ বাড়িয়ে নেবার ফাঁদে আমি পা দিই না। যাঁরা আমাদের মাল বিক্রি করেন তাঁদের সুখ-দুঃখের কথাও আমরা মনে রাখি। যাঁরা আমাদের কর্মী তাঁদের শোষণ করি না—ক্লোরাইডের মতো মাইনে দেন এমন কোম্পানির সংখ্যা এদেশে হাতে গোনা যায়।"

"কিন্তু লাভের পরিমাণটা তো-অনেক", আমার এই প্রশ্নের উত্তরে জহর সেনগুপ্ত একখানা কাগজে ঘস ঘস করে কয়েকটা সংখ্যা লিখে আমার হাতে দিলেন। "বিজনেস মানেই স্বার্থপর দৈত্যের ছবি অনেকের মনে জেগে ওঠে। কিন্তু আমাদের কেসটা দেখুন। বছরে আয় ছেষট্টি কোটি টাকা—এর থেকে ৩০ কোটি টাকার কাঁচামাল কেনা হয়েছে, কর্মীদের মাইনে বাবদ ৬ কোটি টাকা। বিভিন্ন ট্যাক্স বাবদ সরকার নিয়েছেন ১৮ কোটি টাকা। আয়কর দেবার পরে আমাদের লাভ ৪ কোটি পঁচাত্তর লাখ—এর থেকে তিন কোটি টাকা কারখানার উন্নতির জন্যে খরচ হয়েছে এবং দু' কোটি টাকা শেয়ারহোল্ডারদের। বিলেতে লভ্যাংশ গিয়েছে মাত্র পঁচাত্তর লাখ টাকা অথচ রপ্তানি থেকে আমরা এনেছি ১০ কোটি টাকা।"

জহর সেনগুপ্ত বললেন, "যখন সব জিনিসের দাম বাড়ছিল, তখন ব্যাটারির দাম দু'বার কমেছিল।

জহর সেনগুপ্ত আমাকে অবাক করে দিলেন। মূল্যবোধ বিসর্জন না-দিয়ে ব্যবসা করা যায় না, জহরবাবু বিশ্বাস করেন না। "কাউকে না-

ঠকিয়ে, কাউকে ঘুষ না-দিয়েই আমার মতো অনেক কোম্পানি এদেশে টিকে আছে।"

বাঙালির অন্নসমস্যার সেই পুরনো কথা উঠলো। জহরবাবু আশার কথা শোনালেন। "সবাই মিলে উঠেপড়ে লাগলে পূর্বভারতকে সোনার দেশ করা যায় না, তা আমি বিশ্বাস করি না। পূর্বভারত প্রচণ্ড পিছিয়ে পড়লে সমস্ত ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি ব্যাহত হবে বলেই আমার আশঙ্কা।" এমন কথা বলার এক্তিয়ার তাঁর আছে। কারণ, মহাপরাক্রমশালী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তিনি একজন ডিরেক্টর।

একটু ভেবে জহরবাবু বললেন, "আমার ছেলেপুলে নেই, সংসার শূন্য, কাজের মধ্যে ডুবে থাকি। মাঝে-মাঝে দুর্ভাগা মানুষদের কথা ভাবি, শংকরবাবু। মুক্তির পথ বোধহয় একটাই—জীবন সংগ্রামে আমাদের আর একটু কর্মশক্তি দিতে হবে। আমরা কর্মমুখী হলে কেউ আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে না। মূল্যবোধ বিসর্জন না দিয়েই বাণিজ্যে এবং শিল্পে নামতে হবে। নতুন যুগের অনেক ব্রাইট শিক্ষিত ছেলে ছোট ছোট উদ্যোগে নামছে—এরা বেশ ভাল করছে। ওয়েট অ্যান্ড সি।"

শিল্প-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জহরবাবুর মন্তব্য : "শিল্পের উন্নতি ছাড়া যেমন দেশের উন্নতি সম্ভব নয়, তেমন দেশের মানুষদের উন্নতি ছাড়া শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই সরকারের যেসব উন্নয়ন পরিকল্পনা রয়েছে তার পিছনে আমাদের পরিপূর্ণ সমর্থন আছে। আমরা এও জানি এসব কাজে টাকা দরকার হবে এবং সেই টাকা কর হিসেবে আমাদের জোগাতে হবে। তবে আমরা সরকারকে বলি, বাজে খরচা যতটা সম্ভব কম করুন, উন্নয়নের কাজে টাকা ঢালুন এবং করের হার এমন করবেন না যে সৎ লোকেরাও চোর-জোচ্চোর হয়ে যায়।"

করের অদৃশ্য বোঝা সম্পর্কে জহরবাবুর মতামত "এক সময় আমাদের ছিল সস্তাগণ্ডার দেশ—এখন দামে আমরা অনেককে টেক্কা দিচ্ছি। আমাদের এখানে বিদেশী যন্ত্র বসালে করের কল্যাণে তার দাম পড়ে যায় দেড়া। বড় কোম্পানিতে মাইনে এখন বেশ বাড়তির দিকে, অথচ উৎপাদকতা তেমন নেই। এই অবস্থায় আমরা কীভাবে বিশ্বের বাজারে লড়বো? কীভাবে দেশের সাধারণ মানুষকে সস্তায় জিনিসপত্র দিয়ে তাদের দুঃখ কিছুটা দূর করবো? মস্ত বড় দেশ এই ভারতবর্ষ, এখানে মাত্র কুড়ি কোটি টাকায়

কোম্পানির ওপর এম-আর-টি-পির স্ট্যাম্প মেরে দেওয়া হয়। কুড়ি কোটি টাকা আজকাল টাকা নাকি?"

জহরবাবু বলে চললেন, "দুনিয়ার এক-পঞ্চমাংশ লোক আমাদের অথচ বিশ্বের রপ্তানি বাণিজ্যের একশ টাকার চল্লিশ পয়সাও আমাদের নয়। কোথায় যেন পড়লাম—আমাদের কোটি কোটি লোকের এই দেশের মোট রোজগার পাঁচ লাখ লোকের জেনেভা শহরের আয়ের থেকে মাত্র সাত গুণ বেশি। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবার মত সুযোগ ও সঙ্গতি ভারতবর্ষের আছে বলেই আমার বিশ্বাস।"

"কিসের সঙ্গতি? আমাদের তো অর্থ নেই।"

"সবচেয়ে বড় সঙ্গতি হলো মানুষ নিজে। আমরা কারও থেকে কম পরিশ্রমী বা কষ্টসহিষ্ণু নই। নতুন যুগের যে সব ম্যানেজার এদেশে তৈরি হচ্ছে—তারা দুনিয়ার কারও থেকে যে কম নয় তা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি।"

"বাঙালি ম্যানেজারদের কেমন দেখছেন?"

"গত কয়েক বছরে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানেও অতি উচ্চশ্রেণীর আদর্শবাদী লোক রয়েছেন, কিন্তু নিয়মকানুনের অভিমন্যুব্যূহ থেকে বার করে এনে ওদের সৃষ্টির স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু ওখানেও পালা বদলের পালা শুরু হয়েছে—শ্রমিক, সরকার ও শিল্পের সহযোগিতা যদি একবার শুরু হয় তাহলে এদেশকে দাবিয়ে রাখা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না।"

"বড় ব্যবসা কি এদেশের পক্ষে ভাল?" আমার প্রশ্নের উত্তরে জহরবাবু বললেন, "ছোট মানেই ধোয়া তুলসিপাতা এবং বড় মানেই খারাপ তা মোটেই ভাববেন না। সব সাইজের শিল্পই এদেশে গড়ে উঠুক, কাউকেই বেড়ি পরিয়ে ঘানিতে জুতে দেবার প্রয়োজন নেই। শিল্পের আকার মাঝারি কিংবা বড় হলে কর্মীদের পক্ষে ভাল—তাঁরা মাইনেটা ভাল পান।

"কর্মী সম্পর্কে আমাদের প্রধান অন্তরায় কী জানেন? উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে বড় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সহজাত সন্দেহ ও ভীতি রয়েছে। যে হারে রোজগার বাড়ছে সে হারে উৎপাদন না বাড়লে কোম্পানিগুলো একদিন অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং দেশের সাধারণ মানুষ যারা বড় জায়গায় কাজ পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি তাদের দুঃখ

কোনোদিন ঘুচবে না। বড় শিল্প এবং ছোট ছোট উদ্যোগের কর্মীদের রোজগারের ফারাক ক্রমেই বেড়ে চলেছে।"

৫৮ বছরের জহর সেনগুপ্তর সঙ্গে আরও অনেক কথা হলো, সেসব লিখতে গেলে অনেক জায়গা লেগে যাবে। বললাম, "আগামী এক বছর এদেশের ধনপতি এবং রাজনৈতিক শক্তিমানদের সঙ্গে আপনার নিয়ত যোগাযোগ হবে, এই সময় এদেশের দরিদ্র মানুষদের কথা একেবারে ভুলে যাবেন না।"

জহর সেনগুপ্ত হাসলেন। "আমি সামান্য লোক—পাকেচক্রে ফরিদপুরের পণ্ডিতসার গ্রাম থেকে ভাগ্যসন্ধানে বেরিয়ে নিজের অজান্তেই কখন শিল্পের এই কর্মতীর্থে হাজির হয়েছি, যত বড় লোকের সঙ্গেই মেলামেশা করি, কেমন করে নিজের শিকড়ের কথা ভুলে যাবো ?"

জহর সেনগুপ্ত যা বললেন তার প্রমাণ রয়েছে অনেক। ছুটির দিনে তাঁকে থলি হাতে গড়িয়াহাট বাজারে মাছ কিনতে দেখা যায়। সুযোগ পেলেই বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে তিনি আড্ডা জমান। কর্মজীবনের বিরাট সাফল্যও তাঁর ক্ষুদ্র গৃহকোণের শূন্যতা ঢাকতে পারেনি। তাই অন্তহীন কর্মের মাঝে ক্লান্তি আসে তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন। রবীন্দ্রনাথের গান এবং কয়েকটি প্রিয় গজলই ক্লোরাইড সংস্থার শক্তিমান কর্ণধার এবং বণিকসভার নবনির্বাচিত প্রধানকে সমস্ত ক্লান্তি থেকে মুক্তি দিয়ে প্রাণবন্ত করে তোলে।

২২ এপ্রিল, ১৯৮৪—বাণিজ্যবিমুখ বাঙালির পক্ষে স্মরণীয় সংবাদ—সোমবার সকালে দিল্লির ওবেরয় হোটেলে ভারতবর্ষের মহাশক্তিমান শিল্পপতিদের যে বার্ষিক কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হলো সেখানে বাঙালিদের জয়জয়কার। আসমুদ্র হিমাচলের বিত্তবান শ্রেষ্ঠীরা সমবেতভাবে যাঁর কাছে তাঁদের আবেদন-নিবেদন পেশ করলেন তিনি একদা হাওড়া কদমতলা নিবাসী, তাঁর নাম প্রণব মুখার্জি। শিল্পপতিদের যিনি নেতৃত্ব করলেন তিনি পদ্মাপার থেকে আগত অধুনা কলিকাতা নিবাসী শ্রীজহরলাল সেনগুপ্ত। লক্ষ্মীর কৃপাবঞ্চিত বাঙালিদের ইতিহাসে এমন ব্যবসায়ী চূড়ামণিযোগ এর আগে কখনো ঘটেনি।

একবছর আগে ক্লোরাইড ইণ্ডিয়ার প্রধান শ্রী সেনগুপ্ত অ্যাসোসিয়েট

চেম্বার অফ কর্মাসের সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রায় ২৮০০টি বিখ্যাত কোম্পানি। এঁদের বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা, চাকুরি সূত্রে জড়িয়ে আছেন বেশ কয়েক লাখ কর্মী। এহেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার যে একদা এসপ্ল্যানেড ইস্টের এক অখ্যাত সরকারি অফিসার অতি সামান্যপদে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন তা এখন কারো অজ্ঞাত নয়।

নিজের কোম্পানি ক্লোরাইড ইন্ডিয়াকে ভারতবর্ষের অন্যতম সফল শিল্প প্রতিষ্ঠান রূপে চালু রেখে অ্যাসোচ্যাম-এর দায়িত্ব বহন করতে গিয়ে গত একবছরে জহরবাবু ৩ লাখ কিলোমিটারের বেশি ঘুরে বেড়িয়েছেন—দিনে ১৬ ঘণ্টা কাজ করলেও শরীরের যে কোনো ক্ষতি হয় না তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে।

জহরবাবুর মতে দেশের অর্থনৈতিক হালচাল প্রচণ্ড ভালো না হলেও নিরাশ হওয়ার মতো নয়। স্বাধীনতার পরে এই প্রথম গত পাঁচ বছরে শতকরা পাঁচভাগ বার্ষিক উন্নয়ন হয়েছে। এই প্রথম দেড়শো কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করলেন ভারতবর্ষের চাষীরা। কিন্তু গমবিপ্লবের তুলনায় ধানের তেমন কিছু হলো না গাঙ্গেয় উপত্যকায়। রুটির সঙ্গে প্রয়োজন ডাল এবং তেলের। ডালের কোনো সংগঠিত আন্তর্জাতিক বাজার নেই। তেলের আছে এবং আমরা বহু টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে খাবার তেল আনছি।

জহরবাবুর অভিমত, তেলবিপ্লবের দায়িত্ব বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হোক—তাঁরা 'তালতেল' তৈরি করুন পাম গাছ বসিয়ে। এই গাছ বসিয়ে তেল পেতে ১০ বছর সময় লাগবে এবং এই পথে পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছে। আন্দামানে তালতেল উৎপাদনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে, কয়েকটি কোম্পানি আগ্রহীও খুব, কিন্তু সরকার চাষাবাদের ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলোকে প্রবেশের অনুমতি দিতে সাহস পাচ্ছেন না, অথচ বড় কোম্পানি ছাড়া এসব কাজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা সম্ভব নয়। চা এবং রবারের ক্ষেত্রে গত শতাব্দীতে যা হয়েছে এখন তা রান্নার ক্ষেত্রে করতে হবে। জহরবাবু বলছেন, যেসব জমি পতিত রয়েছে, তা কিছুটা কোম্পানিগুলোকে দেওয়া হোক। "ভালো ফল না দেখালে তাড়িয়ে দেবেন।"

"বড় কোম্পানির হাতে যাওয়া মানে তো দাম বেশি হবে ?"—আমার এই সন্দেহভঞ্জনের চেষ্টায় জহরবাবু বললেন, "বড়কে সব সময় চড় মারবেন না। সারা বিশ্বে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে বড় বড় কলকারখানার মাধ্যমে। বিশ্বের বাজারে লড়াই করে বেঁচে থাকার জন্য আমাদেরও তাই করতে হবে।"

"কিন্তু যে জিনিস বাইরে একশো টাকায় পাওয়া যায় তার জন্য আমাদের প্রায় দেড়শো টাকা দিতে হয় কেন ?" এ প্রশ্নের উত্তরে জহরবাবু বললেন, "কোম্পানিরা লোভী এবং অপদার্থ বলে এমন ঘটছে তা ভাববেন না। জাপানে, কোরিয়ায়, আমেরিকায় যে কারখানা তৈরি করতে পাঁচ কোটি টাকা খরচ হয় সেই কারখানা এখানে বসাতে দশ কোটি টাকা লাগছে। তার কারণ যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক। কারখানা বসানোর ব্যাপারে হাজার রকমের ঝামেলা, ফলে যে কারখানা সিঙ্গাপুরে বসাতে দেড় বছর লাগে তা এখানে তিন বছরে চালু হলে ভাগ্যের ব্যাপার। ফলে অহেতুক মোটা টাকার সুদ গুনতে হয়। ভারতবর্ষের সুদের হার যে দুনিয়ার সব থেকে বেশি (দুই-একটা অভাগা দেশ ছাড়া) তা সকলেরই জানা। এক কোটি ধার নিলে বছরে সুদ গুনতে হয় জার্মানিতে ৯ লাখ টাকা, আর এই দেশে সাড়ে সতেরো লাখ টাকা। উৎপাদন শুরু হতে তিন বছর দেরি হলে কী ক্ষতি হয় বুঝতেই পারছেন।"

হতাশা না বাড়িয়ে জহরবাবু বললেন, "তা বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা চলবে না, বিশ্বের বাজারে ভারতবর্ষের সুদিন বেশি দূর নয়। আন্তর্জাতিক টেকনোলোজির ব্যবহারে ভারতীয়দের দক্ষতা অনেক দেশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। তবে স্বনির্ভরতা কথাটার সংজ্ঞা পাল্টাচ্ছে—এখন সব জিনিস নিজে মাথা খাটিয়ে একেবারে গোড়া থেকে তৈরি করা নির্বুদ্ধিতা। যে দেশে যে টেকনোলোজি সেরা তা কিনতে হবে—স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপির মতন।

"টেকনোলোজি কেনার মধ্যে কোনো লজ্জা নেই—জাপান পর্যন্ত অনেক টেকনোলোজি কিনছে। তবে নানা কারণে সব ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বের সেরা টেকনোলোজি পাচ্ছি না, যাঁদের এই টেকনোলোজি আছে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন পাঁচ বছর পরে ভারত তাঁদের কলা দেখাবে।"

"তাহলে আপনি বলছেন, আমাদের স্বনির্ভর হওয়ার সাধনা ত্যাগ

করতে হবে?"—উত্তরে জহরবাবু বল্লেন, "মোটেই নয়, বরং আমাদের বৈজ্ঞানিক ও গবেষকদের আরও সক্রিয় হতে হবে, যাতে বিদেশ থেকে আনা টেকনোলোজি তাঁদের হাতে পড়ে অল্প সময়ের মধ্যে আরও উন্নত হয়—গুরুমারা বিদ্যা কথাটা তো এই দেশে অজানা নয়।"

এই প্রসঙ্গে রুগ্‌ণ শিল্পের কথাটা উঠলো। জহরবাবুর বক্তব্য "মানুষের মত প্রোডাক্টেরও মৃত্যুর সময় হয়। প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে যা রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে তাকে সব সময়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা দরিদ্র দেশের পক্ষে একধরনের বিলাসিতা। এই চেষ্টা করতে গিয়ে সরকার শত শত কোটি টাকা জলে ঢেলে দিচ্ছেন অথচ রোগী বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে না। যার বাঁচবার সম্ভাবনা নেই তাকে যেতে দেওয়াই ভালো। একমাত্র চিন্তার ব্যাপার, রুগ্‌ণ শিল্পের কর্মীদের কী হবে? একটি জাতীয় তহবিল থেকে তাঁদের মাইনের ষাট ভাগ দেওয়া হোক। এতে জাতীয় অপচয় অনেক কম হবে। তবে মনে রাখবেন, সামান্য চিকিৎসায় যে শিল্প সুস্থ হয়ে উঠতে পারে তার কথা আমি বলছি না, আমার অভিযোগ চিররুগ্‌ণদের সম্বন্ধে।

প্রশ্ন : "কিছু মনে করবেন না, কাগজ পড়লে ধারণা হয়, বিত্তবানদের জন্য সারাক্ষণ দেহি-দেহি করাই বণিক সংস্থার একমাত্র কর্ম। এই বিষয়ে আপনি কী বলেন?"

"যে সব দেশ শিল্পবাণিজ্যে বড় হচ্ছে সেসব দেশে সরকার এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি দুপক্ষের সহযোগিতা ছাড়া দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। এবং আমি সরকারের বহু কাজ সগর্বে সমর্থন করি। আমি বিশ্বাস করি দেশের সংহতি বিপন্ন হলে, সরকারের ন্যায্য কর আদায় না হলে ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেসব বিজ্ঞানী প্রচারের আড়ালে থেকে এই দেশকে মহাকাশ চর্চা, পরমাণু বিজ্ঞান, সমুদ্রতথ্য, কৃষিবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাধনায় মগ্ন রয়েছেন তাঁদের আমি নমস্কার জানাই। বিখ্যাত লেখক রোস্টো তাঁর বই 'টেক-অফ'-এ বলেছেন, উন্নত দেশগুলি বর্তমানে শিল্পবিপ্লবের চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে। এই যুগ হলো, মাইক্রোচিপ, জেনেটিকস এবং নবউদ্ভাবিত শিল্পসম্পদের যুগ। পেরিয়ে আসা তিনটি যুগ হলো—ঐতিহাসিক শিল্পবিপ্লব, ভারী শিল্পের যুগ এবং ইলেকট্রোনিক যুগ।

"এদেশে আমরা আদি শিল্পবিপ্লব এবং ভারী শিল্পযুগের মাঝামাঝি

কোথাও অবস্থান করছি—বিজ্ঞানসাধক এবং প্রযুক্তিবিদরাই আমাদের তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন।”

প্রশ্ন : “দেশের দারিদ্র্যের কথা কি আপনাদের মনে পড়ে ?”

উত্তর : “অবশ্যই পড়ে। পরিবেশ সম্পর্কে চোখ বুজে থেকে শিল্পবাণিজ্য চালানো যায় না। তাছাড়া মনে রাখবেন, এ দেশের বিপুল সম্ভাবনার কথা। দেশের দরিদ্ররা যেদিন দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করে জামাজুতো তেল সাবান রেডিও টিভি কিনতে আরম্ভ করবে তখন ভোগ্যপণ্যের বাজারের কী বিপুল বিস্তার ঘটবে। সেই মার্কেটে লাভবান হবো আমরাই। সুতরাং দারিদ্র্যসীমার বাইরে বেরিয়ে আসবার প্রচেষ্টায় আমাদের সমর্থন রাজনৈতিক নেতাদের থেকে একবিন্দুও কম নয়। এবং শিল্পবাণিজ্য, কৃষির উন্নতির মাধ্যমেই এই অগ্রগতি সম্ভব। এবং কেন নয় ? দেখুন, জনসংখ্যায় আমরা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। আমাদের থেকে কষ্টসহিষ্ণু মানুষ পৃথিবীতে নেই। বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের সংখ্যায় আমরা পৃথিবীতে চতুর্থ। তবু মাথাপিছু উৎপাদনের পরিসংখ্যানে আমরা পৃথিবীর দরিদ্রতম কয়েকটি দেশের মধ্যে। এমন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই—গত এক বছরের অভিজ্ঞতা আমার চোখ খুলে দিয়েছে।

প্রশ্ন : “পশ্চিমবঙ্গের কথা কে ভাবছে ?”

জহরবাবুকে চিন্তিত দেখালো। “সব কিছু থেকেও কেন আমরা পিছিয়ে পড়ছি তা গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে। দায়িত্বটা রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিল্পপতিদের পশ্চিমবঙ্গে আনার চেষ্টা করা যাক। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বণিক সম্প্রদায়েরও দায়িত্ব রয়েছে। আশার কথা, নতুন নতুন ছেলেরাও বহুযুগের কুণ্ঠা ত্যাগ করে বাণিজ্যলক্ষ্মীর বন্দনায় উৎসাহ দেখাতে শুরু করেছে। আরও এক দলের কথা মনে পড়ে—বিদেশে বসবাসকারী বাঙালিদের কথা। লন্ডন, নিউইয়র্ক, শিকাগো, সানফ্রান্সিসকোতে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের নবনির্মাণে তাঁদের নিমন্ত্রণ জানালে কেমন হয় ? মনে রাখবেন, এটা দাক্ষিণ্যভিক্ষা নয়—পশ্চিমবঙ্গে ঠিক এই সময় শিল্পপ্রতিষ্ঠা করলে ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর।”

চেয়ারম্যান সায়েব

আমাদের দুর্ভাগ্য এদেশে বাণিজ্যলক্ষ্মীর বরপুত্রদের সম্বন্ধে কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হয় না। সুদূর অতীতের সম্রাটদের জনপদ বিজয় সম্পর্কে আমরা বহু কিছু জানি। কিন্তু প্রায় কিছু জানি না এই যুগের সফল শ্রেষ্ঠীদের কার্যধারা সম্পর্কে। ইদানীং যে কিছু কিছু কাজ শুরু হয়নি তা নয়, কিন্তু সেখানে হয় অবিমিশ্রিত প্রশংসা, না-হয় অবিমিশ্রিত নিন্দা। ব্রিটেনের এক বিখ্যাত সাংবাদিক একবার আমাকে বলেছিলেন যে এই ধারাটি আমরা পেয়েছি উনিশ শতকের ইংলিশ মনোভাব থেকে যেখানে অর্থনৈতিকভাবে ব্যবসায়ীদের শক্তি থাকলেও কোনো সামাজিক সম্মান ছিল না।

বিজনেসম্যানকে স্বীকৃতি দিয়েছে জার্মানি, সম্মান দিয়েছে জাপানিরা, আর তাকে হিরো বানিয়েছে আমেরিকানরা। মার্কিনি হাওয়া অবশেষে আটলান্টিক পেরিয়ে পৃথিবীর বহুদেশে উপস্থিত হয়েছে এবং লক্ষ্মীর বরপুত্ররা এখন ইতিহাসের প্রয়োজনীয় উপাদান হয়ে উঠেছেন। তাল বুঝে ইংরেজও নিজের ভুল শুধরে নিতে শুরু করেছে এবং বণিকেরা মানদণ্ড কীভাবে বিভিন্ন যুগে সমাজজীবনে ছায়াপাত করেছে তার গভীর অনুসন্ধান শুরু হয়েছে ব্রিটেনের সম্মানিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে।

যেমন ধরুন, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইতিহাসের অধ্যাপক চার্লস উইলসনের কথা। বিরাট বিরাট তিন খণ্ডে তিনি সাবান ও মাখন ব্যবসায়ের ইতিহাস সুগভীর নিষ্ঠায় রচনা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁর রচিত এই অসাধারণ বইটির মুখবন্ধে উইলসন দুঃখ করেছেন যে, অনুসন্ধানী পাঠকের পক্ষে নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়িক ইতিহাস সহজপ্রাপ্য নয়—যা সাধারণত পাওয়া যায় তা প্রায়ই শ্রেষ্ঠীর অষ্টোত্তরী শতনাম, না-হয় কেচ্ছাকাহিনী। উইলসন বলেছেন, হয় তিনি অরণ্যদেবের মতন হিরো,

না-হয় ক্রিমিন্যাল।

সাত বছরের চেষ্টায় উইলসন ইউরোপীয় সাবানের যে-ব্যবসায়িক ইতিহাস রচনা করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। এই ইতিহাসের প্রধান চরিত্র একটি কোম্পানি, যার নাম ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হবে যথাসময়ে। আপাতত চলুন আমার সঙ্গে কলকাতায় আলিপুরের ট্রামলাইনের ধারে এক ফ্ল্যাটবাড়িতে।

বিজনেসের প্রাঙ্গণে যাঁকে জিজ্ঞেস করবেন তিনিই বলবেন, ভারতবর্ষের সবচেয়ে সম্মানিত কোম্পানিগুলির অন্যতম হল হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড। সংবাদপত্রে যখন কোনও সমীক্ষা হয় তখনই হিন্দুস্তান লিভারের নাম সবার উপরে এসে যায়। এমন সুপরিচালিত সুষমামণ্ডিত প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা বিদেশিদের। কিন্তু কোম্পানির হাবভাব সম্পূর্ণ স্বদেশি। বহু স্বদেশি কোম্পানির হৃদয়ে রয়েছে বিদেশিয়ানার প্রতি দুর্বলতা। আর হিন্দুস্তান লিভারের ঠিক উল্টো। ওখানে কেউ বলবার আগেই কর্তৃপক্ষ স্বদেশি হাওয়া ঢুকিয়ে দিয়েছেন—ওই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররা দীর্ঘদিন ধরে এদেশেরই লোক।

ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞানের দিকপাল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানের একদা কর্ণধাররা—যেমন পাঞ্জাবি পি এল ট্যান্ডন এবং কেরলীয় টি টমাস। ট্যান্ডন নিজেও ইংরজিতে অনবদ্য স্মৃতিকাহিনী রচনা করেছেন। বিলেত থেকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পাশ করে চাকরির সন্ধানে কলকাতায় এসেছিলেন। ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন কলকাতার ডানলপে। কিন্তু ওখানকার সায়েবরা তাঁকে নিম্নমানের মনে করলেন। চাকরি হলো না। অনেক ঘাটের জল খেয়ে ট্যান্ডন শেষ পর্যন্ত বোম্বাইতে লিভারে যোগ দিলেন এবং স্রেফ নিজের সাধনায় ওই কোম্পানির সর্বেসর্বা হলেন। হিন্দুস্তান লিভার থেকে অবসর নেওয়ার পরে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ম্যানেজমেন্ট বিশারদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়লো। দিল্লির শক্তিমানদের কাছেও তিনি একটি শ্রদ্ধেয় নাম।

সীরিয়ান খ্রিস্টান টি টমাসও একই পথের পথিক। ১৯৫০ সালে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় কেরালা থেকে মহারাষ্ট্রে এসেছিলেন এই ভদ্রলোক। নিজের প্রতিভায় শেষ পর্যন্ত সাফল্যের সর্বোচ্চ ধাপে উঠলেন হিন্দুস্তান লিভারে। সেখানেও শেষ হলো না, শেষ পর্যন্ত খোদ বিলিতি কোম্পানির

প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর হলেন।

অর্থাৎ প্রতিভা থাকলে, স্বপ্ন থাকলে, সাধনা থাকলে, একেবারে সামান্য অবস্থা থেকে সাফল্যের হিমালয় শিখরে পৌঁছনো যায় হিন্দুস্তান লিভারে।

এই সব বিষয়েই আলোচনা করার জন্যই লিভারের চেয়ারম্যান শ্রী এস এম দত্ত-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলাম। ভারতের সবচেয়ে সম্মানিত কোম্পানির কর্ণধার যে একজন দেশোয়ালি, ভাবতে কিছুটা গর্ব হচ্ছিল। তা হলে আমরা বাঙালিরা এখনও পুরোপুরি শেষ হয়ে যাইনি—চান্স পেলে আমরা এখনও দুনিয়া জয় করতে পারি। অর্থাৎ জাত হিসাবে আমরা কারুর থেকে নিকৃষ্ট নই—আমাদের শুধু সুযোগের অভাব, ধৈর্যের অভাব, সাধনার অভাব।

মস্ত বড় কোম্পানি এই লিভার। সারা দুনিয়া জুড়ে এঁদের ব্যবসা—শুরু হয়েছিল বিলেতে এবং হল্যান্ডে। ডাচদের বলা হয় ইউরোপের মাড়োয়ারি। ব্যবসার প্রয়োজনে দোকানদার ইংরেজ এবং দোকানদার ডাচ যখন হাত মেলায় তখন হয়ে ওঠে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। লিভারও বিশ্বজয় করেছে—পৃথিবীর এমন দেশ থাকতে পারে যেখানে সূর্যালোক বা সানলাইট্ তেমন নেই। কিন্তু 'সানলাইট' সাবান নেই এমন দেশ অকল্পনীয়। ভারতবর্ষেই দেখুন না—হিন্দুস্তান লিভারের বিক্রি হাজার কোটি টাকার উপরে। সুপরিচালনার শক্তিতে আসমুদ্র হিমাচলের ঘরে-ঘরে এঁদের উপস্থিতি। লাভের পরিমাণও বেশ ভাল। বিদেশে মুনাফা যায় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এদেশ থেকে বেশ কিছু রপ্তানিও করে হিন্দুস্তান লিভার।

এহেন কোম্পানির বড়সায়েব যে কোনও ইন্দ্রপুরীতে অথবা কোনও পাঁচতারা হোটেলের সবচেয়ে দামি সুইট আলো করে বসে থাকবেন, এইটাই ভারতীয় পরিবেশে প্রত্যাশিত। এদেশের কোম্পানির কর্তৃপক্ষের প্রধান অংশ মোগল স্টাইলে থাকায় বিশ্বাসী। হাই লিভিং এবং প্লেন থিংকিং এদের মূলমন্ত্র। স্টাইলে না থাকলে প্রেস্টিজ থাকে না এদেশে এবং প্রেস্টিজ না থাকলে এদেশে নাকি ব্যবসা করা দায়! এই বিশ্বাসটি 'কোই হ্যায়' ইংরেজ এদেশ ছাড়বার আগে ব্রাউন সায়েবদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছেন অত্যন্ত সফলভাবে। ফলে এদেশে বিগ বিজনেস মানেই নির্লজ্জ বিলাসিতা, কোম্পানির খরচে বিত্তের দম্ভ এবং এর ফলে যা হওয়ার-তাই হয়েছে। বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষের সন্দেহভাজন

হয়ে উঠেছে, প্রীতির প্রসন্ন আসনে তাঁদের এখনও স্থান হয়নি।

কিন্তু আলিপুরের নিরাভরণ ফ্ল্যাট দেখে আমার ঘুম ভাঙলো। ভারতবর্ষের অন্যতম সফল কোম্পানির বড়া সাব ট্যুরে এসে এইরকম অর্ডিনারি জায়গায় রাত্রিযাপন করেন ভেবে আশ্চর্য লাগলো।

শুনলাম, এইটাই হিন্দুস্তান লিভারের ধর্ম। প্রাচুর্যের দম্ভ দেখিয়ে ব্যক্তিজীবনে যেমন সাফল্য আসে না, প্রাতিষ্ঠানিক জীবনেও সেই একই কথা। হিন্দুস্তান লিভারের এই মানসিকতার অন্যতম প্রবক্তা টমাসের পরবর্তী চেয়ারম্যান অশোক গাঙ্গুলি। এই বিনয়ী বাঙালি গবেষকটি মূল লিভার কোম্পানির বোর্ডে যোগ দিয়ে আমাদের সকলের মুখোজ্জ্বল করেছেন। যে-দেশে কোম্পানির কর্তাদের আয়ারাও প্লেনের এগজিকিউটিভ ক্লাস ছাড়া ভ্রমণ করেন না সে-দেশে অশোক গাঙ্গুলি সারাক্ষণ প্লেনের নিম্নতম শ্রেণীতে ভ্রমণ করতেন। দু'একবার আমার পাশেও সিট পড়েছে। কথাবার্তা শুনে কে বলবে এই মানুষটির পিছনে রয়েছে এই ধরনের প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক সাফল্য। বিদেশি কোম্পানির চাকরি করেন বলে অশোক গাঙ্গুলি নিজের স্বদেশিয়ানা বিসর্জন দেননি—ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতিতে তিনি চমৎকার একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের আনন্দ, গাঙ্গুলিমশায়ের সিংহাসনে এসে বসলেন একজন মিস্টার দত্ত। বাঙালির ডেথ সার্টিফিকেট এখনও তাহলে সই হয়নি, কিংবা মরা হাতিও লাখ টাকা।

মিস্টার এস এম দত্ত মস্ত এক সায়েব হবেন আন্দাজ করেছিলাম। কারণ খবর পাওয়া গেলো যে তিনি যে-সাম্রাজ্যের অধিশ্বর সেখানে হিন্দুস্তান লিভার ছাড়াও আরও ছ'টি কোম্পানি আছে। নাম শুনুন কয়েকটির— ব্রুকবন্ড, লিপটন, পন্ডস। এইসব কোম্পানির বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ যোগ করলে দাঁড়ায় আড়াই হাজার কোটি টাকার মতন। এহেন কর্ণধার বড়সায়েবি করবেন না তো কে করবেন?

কিন্তু যৎসামান্য আসবাবপত্রে ভরা ঘরে যিনি আমাকে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে আমাদেরই লোক মনে হলো। দত্ত মশায়ের নামটি একটু খটোমটো। পনেরো কোটি বাঙালির মধ্যে আর একটি ডুপ্লিকেট খুঁজে পাবেন না।

নাম-রহস্যে আলোকপাত করলেন দত্তমশাই। ওঁর দাদার নাম রাখা হয়েছিল মঞ্জিমমুকুল দত্ত। ঠিক দশ বছরের ব্যবধানে যখন আর একটি

পুত্রসন্তানের জন্ম হলো তখন পিতৃদেব মহিমচন্দ্র দত্ত বিপদে পড়ে গেলেন। দাদার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাম প্রয়োজন। তখন পণ্ডিতমশায়ের শরণাপন্ন হওয়া গেলো। সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই ভেবেচিন্তে বললেন, 'কোনও চিন্তা নেই। ওর নাম দাও সুষীমমুকুল।'

'সুষমা থেকে সুষীম', আমাকে নিজের নাম ব্যাখ্যা করলেন দত্তমশাই। যা শোভন, সুন্দর অথবা চারু তা যদি সুষীম হয়, তা হলে এক্ষেত্রে কানাছেলের নাম পদ্মলোচন রাখা হয়নি। কারণ সুষীমবাবু প্রকৃতই সুদর্শন। সুশাসিত সুদীর্ঘ শরীরটি যে কোনও টেনিস খেলোয়াড় অথবা ফিল্মস্টারকে লজ্জা দিতে পারে।

শরীরে আভিজাত্যের ছায়া—কিন্তু জীবনে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে মধ্য-পঞ্চাশের সুষীম দত্তকে। ব্যাপারটা আজকের এই জটিল যুগে প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়।

কোথায় বোম্বাইয়ের ব্যাক বে রিক্লেমেশনে লিভার হাউস, আর কোথায় মেদিনীপুরের নাড়াজোল মহকুমার ভবানীপুর গ্রাম। নাড়াজোল টু মিডনাপুর টু ক্যালকাটা টু লিভার হাউস, বম্বে—দূরত্ব অনেকখানি। এভারেস্টের চূড়ায় ওঠাও বোধ হয় এর থেকে সহজ। দেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য অনেক কিছু করলেও মেদিনীপুরিদের স্মার্ট বলে নাম নেই, কিন্তু দেশের সবচেয়ে স্মার্ট কোম্পানির কর্ণধার হলেন একজন যাঁর দেশ মেদিনীপুরে।

ব্যাপারটা এই রকম। সুষীমমুকুলের ঠাকুর্দা ছিলেন দারোগা। বাবা মহিমচন্দ্র ইংরেজিতে এম-এ পাশ করে ওকালতি পড়েছিলেন। বুদ্ধিমান ছেলেটি নজরে পড়ে গিয়েছিল এক জেলা জজসায়েবের। এককালে খুবই কৃতী হবে অগ্রিম এই আশা করে জজসায়েব তাঁর অসামান্য সুন্দরী লাবণ্যময়ী কন্যাকে তুলে দিলেন মহিমচন্দ্রের হাতে। মহিমচন্দ্র কিন্তু আইন পেশায় সফল হলেন না। শ্বশুর চেয়েছিলেন, তিনি মুঙ্গেরে এসে প্র্যাকটিস করেন—কিন্তু মহিমচন্দ্র পড়ে রইলেন মেদিনীপুরে। একেবারে টুকটাক প্র্যাকটিস—বেশিরভাগ ল্যান্ড সেটলমেন্ট সংক্রান্ত কাজ। এর আগে কিছু কিছু কংগ্রেসিও করেছেন। কিন্তু পরে রাজনীতি পরিহার করেন।

আর্থিক অনটনের মধ্যেও সংসারের যে চরিত্রটি সারাক্ষণ উজ্জ্বল হয়ে থাকতো সেটি হলো মা লাবণ্যবতী। "মা ছিলেন এক্সট্রিমলি লয়াল টু বাবা। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভীষণ ভাবতেন। আমি যদি'কিছু

হয়ে থাকি তা সব মায়ের জন্য। পড়াশোনায় ভাইবোনেরা ভাল ছিলাম। মা বলতেন, জীবনে উন্নতি করতে হলে মেদিনীপুর থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে তোদের। নিজের গহনা বিক্রি করে দাদাকে প্রথমে বাইরে পাঠালেন। তারপর আমার পালা।"

এ এক চমৎকার কাহিনী। এই ধরনের মানুষদের খুঁজে বার করতে আমার ভাল লাগে। বুকের মধ্যে আগুন থাকলে এখনও এই অভাগা দেশে কী করা যায় তার কত প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে, আমরা খোঁজ রাখিনা। ফলে মানুষের ধারণা হচ্ছে নিজের চেষ্টায় কিছু করা সম্ভব নয় এই পৃথিবীতে—সমাজের যা কিছু উন্নতি তা পলিটিসিয়ানরাই করে দেবেন। এই সর্বনাশা বিশ্বাসের জালে সকলেই জড়িয়ে পড়লে এদেশের মানুষের মুক্তি নেই।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে বাধা পড়লো। একটা ফোন ধরবার জন্য সুষীমমুকুল দত্ত ঘরের ভিতর চলে গেলেন। আর আমার মনে পড়লো লিভারের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম লিভারের কথা। এঁর বাবা জেমস লিভার গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বিলেতে একটা মুদির দোকানে চাকরি করতেন। পরে সুযোগ বুঝে নিজেই দোকানদার হন। এই মুদির দোকান থেকেই লিভারের বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যসাম্রাজ্যের সূচনা।

উইলিয়মের যখন ১৪ বছর বয়স তখন জেমস মুদি পাইকারি ব্যবসায় নামলেন—খুচরো দোকানে ঘুরে ঘুরে মাল সাপ্লাই করা তাঁর কাজ। ১৬ বছর বয়স হতেই ছেলের পড়াশোনার পাট চুকিয়ে তাকে দোকানে ঢুকিয়ে দিলেন জেমস। তখন প্যাকেটে ট্যাবলেট সাবান বিক্রির রেয়াজ ছিল না। তাল সাবান আসতো কাপড় কাচার জন্য। তিন পাউন্ড ওজনের এই তালকে কেটে ছোট করে কাগজে মুড়ে রাখা ছিল ছেলেটির কাজ, যে ভবিষ্যতে পৃথিবীর অন্যতম সফল বহুজাতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা হবে।

বাবার দোকানে তিন বছর সাবান কাটার পর সামান্য পদোন্নতি হলো উইলিয়মের। মাসিক তিরিশ শিলিঙের চাকরি থেকে ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যানের পদ পেলেন। দুঁদে সেলসম্যান হিসাবে জেমস লিভার এমনই কাজ দেখালেন যে দু'বছর পরেই বাবার দোকানের পার্টনার হলেন। কোনও এক সময়ে উইলিয়ম লিভার একখানা বই উপহার পান। স্মাইলস-এর 'সেল্‌ফ-হেল্‌প' তার কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে। নিরন্তর চেষ্টায় আত্মোন্নতির অনুপ্রেরণা এই বই থেকে আসে। পরবর্তী জীবনে উইলিয়ম যখন লর্ড

উপাধি পেয়েছেন তখনও এই বই পড়তেন এবং প্রিয়জনকে উপহার দিতেন।

অনেকের ধারণা, উইলিয়ম লিভার সাবানের আবিষ্কর্তা। এটা ঠিক নয়। সাবানের উৎপত্তি ইতিহাসের আদিকালে। নানা ভাবে সাবান তৈরি হতো। এর মধ্যে থাকতো নানা রকমের স্নেহজাত পদার্থ। ম্যানচেস্টার অঞ্চলের নামকরা আড়তদার হওয়ার পর উইলিয়ম লিভারের মনে হলো, কাপড়কাচা সাবান নানা কোম্পানি তৈরি করছে, কিন্তু গুণগত মানের তারতম্য রয়েছে এবং সাবান চিনে নেওয়ার কোনও উপায় নেই। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো, যদি সাবানের একটা নাম দেওয়া যায়, এবং গুণগত বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে একটা মোড়কে এই সাবানের ছোট্ট ট্যাবলেট বাজারে ছাড়া যায়, তাহলে কী হয়?

এই সময় তাঁরা বাজারে ছাড়লেন 'লিভারস্ পিওর হানি' গায়ে মাখা সাবান। প্রচণ্ড কোনও সাফল্য এলো না। তারপর মুদির ছেলে গেলেন ট্রেডমার্ক অ্যাটর্নির বাড়ি। এমন একটা নাম রেজিস্ট্রি করাতে হবে যা আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। অ্যাটর্নি মিস্টার টমসন ভেবেচিন্তে একটা কাগজে পাঁচ-ছটা নাম লিখলেন। কাগজটা বাড়ি নিয়ে গেলেন উইলিয়াম লিভার এবং যে-নামটা পছন্দ করলেন সেটা 'সানলাইট', যা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত কাপড়কাচা সাবান। সানলাইট প্রথমে বেরিয়েছিল বার সোপ হিসাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বোরার্লি পার্চমেন্ট কাগজে মোড়া ট্যাবলেট সানলাইট। স্মাইল্স-এর 'সেল্ফ-হেল্প' মাথায় ছিল, উইলিয়ম লিভার নাম দিলেন সেল্ফ-ওয়াশার। কাচাকাচির মধ্যে তখন ছিল অত্যধিক পরিশ্রমের গ্লানি। গৃহিণীদের হাতে তেল লাগতো, দুর্গন্ধ ছিল। ফেনা ভাল হতো না। উইলিয়ম লিভার এবার সানলাইটের বিজ্ঞাপন শুরু করলেন। দৈনন্দিন গ্লানি থেকে গৃহবধূদের মুক্তি দেবার জন্যই যেন এই সানলাইটের আবিষ্কার।

ফল হলো। গৃহিণীরা মুদির দোকানে গিয়ে কাপড়কাচা সাবান দাও না বলে বলে 'সানলাইট' সাবান দাও বলতে লাগলো। বিক্রি বাড়লো হু-হু করে। প্রথম পর্বে উইলিয়ম লিভার কিন্তু সাবানের কারখানা করেননি, অন্যের কারখানায় তৈরি করিয়ে নিতেন। ১৮৫৫ সালে উইলিয়ম লিভার কারখানা করতে চাইলেন, কিন্তু বাবা রাজি হলেন না। তাঁর ধারণা মুদি মুদিই থাকবে, সে কেন কারখানা করবে? অবশেষে ধার করে কিছু টাকা

জোগাড় করে উইলিয়ম নিজেই একটা পুরনো কারখানা লিজ নিলেন। শুরু হলো জয়যাত্রা। পাঁচ বছর পর ১৮৮৯ সালে একটা পোড়ো জমি কিনে সমুদ্রের ধারে নিজের কারখানার পত্তন করলেন উইলিয়ম লিভার, যা এখন বিশ্বব্যাপী পোর্ট সানলাইট নামে পরিচিত।

সামান্য সাবান দিয়েই যে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের হৃদয় জয় করা যায় তা দেখিয়ে দিলেন উইলিয়ম লিভার। তিনি সাবান অবশ্যই আবিষ্কার করেননি ; কিন্তু অভিনব পথে ব্র্যান্ডনেমের সূচনা করে, বিপণন ও বিজ্ঞাপনের সাহায্য শুধু নিজের দেশে নয়, পৃথিবীর ঘরে-ঘরে পৌঁছে গেলেন। তিনি সাবানকে সাবান হিসাবে বিক্রি করলেন না, নায়িকা করলেন বাড়ির গৃহিণীকে ; তাঁর কাজকে সহজ করার জন্যই তো সানলাইটের উপস্থিতি। ময়লা কাপড় কাচার বিড়ম্বনাতেই তো মেয়েরা কম বয়সে বুড়িয়ে যায়। মুক্তির উপায় সানলাইট, যা ম্যাজিকের মতন কাপড় ঝকঝকে করে দেয়।

ধুরন্ধর মানুষ ছিলেন এই উইলিয়ম লিভার—আলেকজান্ডার গ্রেটের মতন একের পর এক বিশ্বের বাজার জয় করতে লাগলেন। তাঁর অস্ত্র ছিল তিনটি : গুণগত মানের কোনও তারতম্য হবে না, যথেষ্ট বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে, অথচ ন্যায্য দাম। ন্যায্য দামের জন্য প্রয়োজন কম দামে সাবান তৈরির তেল কেনার সুযোগ। এই তেল কেনার জন্য সারা বিশ্বের দিকে তিনি নজর রাখতেন—এমনকি ভারতবর্ষের তৈলবীজও লিভার কিনতেন।

ভদ্রলোক ছিলেন ভীষণ হিসেবি। সানলাইট তৈরি হওয়ার পর এক ধরনের তলানি তেল পড়ে থাকতো যার ব্যবহার নেই। উইলিয়ম লিভার মাথা খাটাতে লাগলেন এবং ওই দুর্গন্ধযুক্ত তেলের সঙ্গে নানা ওষুধ মিশিয়ে বার হলো বিখ্যাত কার্বলিক সাবান 'লাইফবয়'। ১৮৯৪ সালে আবিষ্কৃত এই সাবানের শতবর্ষপূর্তি ১৯৯৪তে অনেকে জানে না, ভারতবর্ষে গায়ে মাখার সাবানের মধ্যে এক নম্বর বিক্রি এই লাইফবয়ের। ঝাঁঝের সঙ্গে জীবাণুমুক্ত ও স্বাস্থ্যের ইঙ্গিত মিশিয়ে দিয়ে উইলিয়ম লিভার দ্বিতীয়বার বাজার মাত করলেন।

তৃতীয় পর্বে এলো 'লাক্স', ১৮৯৯ সালে। প্রথমে ছিল ফ্লেক সাবান, দামি কাপড় কাচার জন্য, পরে টয়লেট সাবান। এঁদের বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সিরিজ 'চিত্রতারকাদের প্রিয় সৌন্দর্য সাবান'। এই বিজ্ঞাপন সিরিজ এখনও

চলছে। পৃথিবীর সর্বত্র বিখ্যাত চিত্রতারকারা লাক্স বিজ্ঞপনে অংশ নেন। কেমন একটা ধারণা হয়ে গেছে, যতক্ষণ না লাক্স-এর বিজ্ঞাপনে নাম উঠছে ততক্ষণ অভিনেত্রী জাতে ওঠেননি।

নিজের জীবনকালেই সাফল্যের তুঙ্গে আরোহণ করেছিলেন উইলিয়ম লিভার। সাবানের ব্যবসায়ের সঙ্গে যোগ হয়েছিল মারজ্যারিনের ব্যবসা, যা এদেশে একটু ভিন্ন স্টাইলে ডালডা বনস্পতি হিসাবে বিখ্যাত। সেকালে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী খুবই দরিদ্র ছিল। পাঁউরুটিতে মাখন লাগাবার ইচ্ছে থাকলেও আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। একবার মাখনের দাম খুব বেড়ে যাওয়ায় ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ঘোষণা করলেন, যে-বৈজ্ঞানিক মাখনের কমদামি বিকল্প বার করবে সে পুরস্কৃত হবে। প্রাইজের লোভে এক ফরাসি বৈজ্ঞানিক চর্বি তেল ইত্যাদি মিশিয়ে মারজ্যারিন আবিষ্কার করলেন। ওলন্দাজ ও ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদের হাতে পড়ে মারজ্যারিন আরও উন্নত এবং দানা বাঁধা হয়ে গরিবের ঘরে ছেলেমেয়েদের খাওয়ার টেবিলে হাজির হলো।

এই বনস্পতির ব্যবসাতে ডাচদের সুনাম বেশি থাকলেও, উইলিয়ম লিভার খারাপ করলেন না। সাবান থেকে বনস্পতিতে ছড়িয়ে পড়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে উইলিয়ম লিভার একবার বলেছিলেন, 'ওই যে ফ্যাট এবং অয়েল। সাবানেও লাগে, ম্যারজ্যারিনেও লাগে। একই জিনিস তো।'

বিশ্বের এক নম্বর মুদি হওয়ার বিশিষ্টতা অর্জন করার পরে উইলিয়ম লিভার লর্ড উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু ১৯২৫ সালে লর্ড লিভারহিউম হিসাবে।

প্রচণ্ড ছটফটে জাঁদরেল মানুষ ছিলেন এই লিভার। জগদ্বিখ্যাত হয়েও খরিদ্দারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন। বিশ্বের অন্যতম ধনী হয়েও নজর রাখতেন প্রতিটি পাই-পয়সার দিকে। এ-বিষয়ে কত যে গল্প ছড়িয়ে আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। একবার নিজের কোম্পানির কর্ণধারদের নিয়ে ইউরোপে গেছেন। হোটেলের ডাইনিং টেবিলে ফল চাওয়া হলো। ওয়েটার এক বাস্কেট ফল দিয়ে গেলো। ধনপতি লিভার একটা আপেল তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কত দাম?' ওয়েটার বললো, 'পাঁচ শিলিং।' 'যদি দুটো নিই?' লিভার জিজ্ঞেস করলেন। ওয়েটার বললো, 'আপনি যে ক'টা খুশি নিতে পারেন—একই দাম।' ওয়েটার সরে যেতেই উইলিয়াম লিভার দুটো আপেল পকেটে পুরে ফেললেন এবং অফিসারদেরও একই

নির্দেশ দিলেন, 'সকালে বিনা খরচে খাওয়া যাবে।'

একবার সন্ধ্যায় বিদেশে সিনেমা যাওয়ার শখ হলো। ওঁরা পাঁচজন ছিলেন। বৃষ্টি পড়ছিল, সুতরাং হাঁটা সম্ভব নয়। একটা ট্যাক্সিতে তাঁকে আর একজনের সঙ্গে তুলে দিয়ে অন্য তিনজন আর একটা ট্যাক্সি ডাকতে যাচ্ছেন, সেই সময় লর্ড লিভারহিউম ট্যাক্সি থামিয়ে বললেন, 'তোমরা কি পয়সা উড়িয়ে দেওয়ার অভ্যাস ছাড়তে পারবে না।' গাদাগাদি করে একই গাড়িতে সবাই চড়া হলো।

সেই সঙ্গে ছিল সময়ানুবর্তিতা। এক ভদ্রলোক নির্ধারিত সময়ের দু'মিনিট পরে ঘরে ঢোকায় লিভারহিউম একটা স্লিপে হিসাব করে দিলেন বিশ্বব্যাপী লিভার-এর চেয়ারম্যানের দু'মিনিটে কত রোজগার নষ্ট হতে পারে।

কিন্তু সৎ মানুষ ছিলেন লিভারহিউম। বুড়ো বয়সে পর্যন্ত চিন্তা করতেন কীভাবে বিক্রি বাড়িয়ে, খরচ কমিয়ে কোম্পানির উন্নতি করা যায়। তিনি এই সময় লেখেন, 'আমি নিজে অনেক অর্থ উপার্জন করেছি—এ পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি ভাবি সেই সব ছোট ছোট পরিবারের কথা, যারা তাদের কষ্টার্জিত অর্থে আমার কোম্পানির শেয়ার কিনেছে। আমি কিছুতেই তাদের সঞ্চয় নষ্ট হতে দেবো না।"

পোর্ট সানলাইটে শ্রমিক মঙ্গলের অনেক কাজ তিনি করেছিলেন। যেমন লিভারই বোধহয় প্রথম আটঘণ্টার শিফ্‌ট চালু করে। এইখানেই প্রথম শ্রমিকদের জন্য আদর্শ ছোট্ট টাউনশিপ গড়ে ওঠে। এ-বিষয়ে শেষ জীবনে অবশ্য লিভারহিউমের মতামত পাল্টেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'যারা একই জয়গায় কাজ করে তাদের একই জায়গায় বসবাস করতে দেওয়াটা মঙ্গলজনক নয়।'

উৎপাদনভিত্তিক বোনাসের ব্যাপারেও লিভারের অবদান আছে। তিনি বলতেন, 'প্রত্যেক শ্রমিকের আত্মসম্মানবোধ আছে--যোগ্য কাজ না দিয়ে সে অযথা সুখসুবিধা নেবে কেন?' একবার নরওয়ের লিভার অফিস দেখতে গেছেন তিনি। ওখানকার বড়কর্তা বললেন, 'এইমাত্র খবর এসেছে এ-মাসে রেকর্ড বিক্রি হয়েছে। আমাদের অভিনন্দন নিন।' লিভার বললেন, 'হ্যাঁ, তা তো শুনলাম। কিন্তু এক বছর আগে অফিসের কর্মীদের টয়লেট রুমটা যে ঢেলে সাজাবার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তার কী হলো?'

এই লিভারহিউম একবার কলকাতাতেও এসেছিলেন কলম্বো থেকে

ট্রেনে। তখন এয়ারকন্ডিশন কামরা ছিল না। তিন রাত ট্রেনে কাটিয়ে যখন হাওড়া স্টেশনে নামলেন, তখন সবাই ভাবলো তিনি হোটেলে গিয়ে একটু বিশ্রাম করবেন। কিন্তু বুড়ো লিভার টগবগে ঘোড়ার মতন বললেন, 'আগে কাজ তারপর বিশ্রাম। চলুন, আগে ফ্যাক্টরিটা ঘুরে দেখে আসি।' কলকাতার ফ্যাক্টরির ম্যানেজারকে তাঁর মোটেই পছন্দ হয়নি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথা থেকে এসেছো তুমি ?' সায়েব ম্যানেজার বললেন, 'ফরাসি দেশ থেকে।' লর্ড লিভারহিউম সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ফ্রান্স তোমাকে ফিরে পেয়ে এবার সুখী হবে।'

মৃত্যুর কিছুদিন আগে ১৯২৩ সালের এক চিঠিতে লিভারহিউম তাঁর সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করেছিলেন—'নিরন্তর চেষ্টা, সীমাহীন উচ্চাশা এবং সুদূরপ্রসারী কল্পনাশক্তি।'

আমার এইসব চিন্তার মধ্যেই হিন্দুস্তান লিভারের শক্তিমান চেয়ারম্যান টেলিফোনে কথাবার্তা শেষ করে তাঁর টেবিলে ফিরে এলেন।

আমি বললাম, মেদিনীপুরের ভাবানীপুর গ্রামের সেই ছেলেটি, যে আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেও মায়ের কাছ থেকে বড় হওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছিল, তার কথা বলুন।

সুষীমমুকুল দত্তর গল্প শুরু হল আবার। ১৯৪৮ সালে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করল সে। দু'বছর পরে মেদিনীপুর কলেজ থেকে আই এস-সি। স্কলারশিপ জুটলো। মা জোর করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠিয়ে দিলেন কেমিস্ট্রি অনার্স পড়তে। কলেজে মাইনে লাগতো না, কিন্তু ইডেন হোস্টেলে থাকতে মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা খরচ। এই টাকা মা কীভাবে জোগাড় করতেন তা স্মরণ করতে গিয়ে সুষীমমুকুল এখনও উদাস হয়ে ওঠেন।

'আমার দাদা ও আমি যে পড়াশোনায় মোটামুটি ভাল ছিলাম তার পিছনেও মা। তিনি নিজে আমাকে অঙ্ক, বাংলা, ভূগোল পড়িয়েছেন সংসারের শত ব্যস্ততার মধ্যেও।'

'আপনার হাইট কত ? ছ' ফুট ?' আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সুষীমমুকুলবাবু বললেন, "ছিলাম পাঁচ ফুট সাড়ে এগারো ইঞ্চি। তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হাইট কমতে পারে —স্পাইনাল ডিক্যালসিফিকেশন থেকে।"

নিজের সাধনায় কেমিস্ট্রি অনার্স-এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলেন সুষীমমুকুল। তারপর দু' বছর আপার সার্কুলার রোডে ফলিত রসায়নে এম-এসসি পড়া। 'এই সময়ে মা আমাকে একশ টাকা জোগাড় করে দিতেন প্রতিমাসে।'

এবারেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। মা বললেন, আরও পড়ো। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সুষীম একটা স্কলারশিপ জোগাড় করতে পারলেন না। ফলে, গবেষণা করে ডক্টরেট হওয়া সম্ভব হলো না।

চাকরির বাজার তখন খুবই খারাপ। এই রকম অসাধারণ রেজাল্ট সত্ত্বেও কেউ পাত্তা দিতে চায় না। অনেক কষ্টে মাসিক দেড়শ টাকা মাইনেতে একটা ইনডাসট্রিয়াল অ্যাপ্রেনটিসের কাজ পাওয়া গেলো সিন্দ্রিতে। 'এই মাইনে থেকে মাকে পাঠাতাম পঁচাত্তর টাকা আর বাকিটা আমার থাকা-খাওয়ার জন্যে।'

কিছুদিন পরে শুরু হলো চাকরির উমেদারি। অনেক জায়গায় আবেদনপত্র পাঠিয়ে শেষ পর্যন্ত ইন্টারভিউয়ের চিঠি এলো। একটা রাউরকেল্লার ইস্পাত কারখানা থেকে। অন্য সুযোগটি এলো বোম্বাইয়ের লিভার ব্রাদার্স থেকে। লিভারের গার্ডেনরিচ কারখানায় এম টেক-এর ছাত্র হিসাবে কিছুদিন ট্রেনিং-এ গিয়েছিলেন সুষীমমুকুল। ম্যানেজার মিস্টার ফ্রেজারকে জিজ্ঞেস করলেন কোনও চাকরির সম্ভাবনা আছে কি না। ফ্রেজার বললেন, 'ভেকান্সি নেই, তবে যদি সুযোগ আসে জানাবো।' সুষীম ভেবেছিলেন কথার কথা। কিন্তু সায়েব সত্যিই কথা রেখেছিলেন, প্রাথমিক সিলেকশনে ডেকে পাঠালেন। পরে বোম্বাইতে ফাইনাল সিলেকশন বোর্ড।

সৌভাগ্যক্রমে রাউরকেল্লা থেকে সাফল্য-সংবাদ এলো। লিভার ব্রাদার্স থেকেও জানানো হলো, অবিলম্বে কাজে যোগ দাও ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হিসাবে।

এই প্রথম একটু বাবুগিরি করলেন সুষীমমুকুল দত্ত। ভাবলেন, সামনে আরও ইমপর্টান্ট কাজ রয়েছে—কলকাতায় অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল খেলতে আসছে। টেস্ট খেলা দেখে নভেম্বর ১৯৫৬-র শেষে পকেটে সামান্য কয়েকটি টাকা নিয়ে রওনা দিলেন বোম্বাই। ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিল লিভারের আর এক চেয়ারম্যানের ভাগ্যে। পকেটে স্রেফ ৫০ টাকা, কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রির সার্টিফিকেট এবং বিধবা মায়ের আশীর্বাদ ভরসা করে টি টমাস একদিন কোচিন থেকে ট্রেনে বোম্বাই

হাজির হয়েছিলেন ভাগ্যসন্ধানে। এই টমাস পরে লন্ডনে ইউনিলিভার-এর ডিরেক্টর হিসাবে বছরে লক্ষাধিক পাউন্ড বেতনের বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন।

সুষীমবাবু স্মৃতিচারণা করলেন, 'মাইনে ৩৭৫ টাকা। সেই সময় আবার বাবা খুব অসুস্থ। মাকে নিয়মিত টাকা পাঠানো ভীষণ প্রয়োজন।' বোম্বাইতে এসে সস্তায় থাকা খাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগলেন সুষীমমুকুল। 'অবশেষে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের কাছে শিপ হোটেলে জায়গা পাওয়া গেলো। আকর্ষণ দুটি— মাসিক খরচ ১২৫ টাকার মধ্যে, আর এই প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন সদাশয় ওড়িশার ভদ্রলোক, নাম সুশীল মহান্তি। এঁদের এখানে রান্নায় সর্ষের তেল ব্যবহার করা হতো। হোটেল খরচ, গাড়িভাড়া বাদ দিয়ে যে দুশো টাকা থাকতো তা সোজা চলে যেতো মানিঅর্ডারে মায়ের কাছে।

বিলিতি কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিরা স্টাইলে থাকবেন এবং ট্যাক্সির নীচে কিছুতে চড়বেন না, সকলের এই প্রত্যাশা ছিল। সুষীমবাবুর উপায় ছিল না। একদিন পার্সোনেল বিভাগের ডিরেক্টর ডঃ কে এস বাসু জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই হোটেলটায় থাকা কেন?' সুষীম মাথা নীচু করে বললেন, 'উপায় নেই, স্যার। মাকে টাকা পাঠানো খুব দরকার।'

লিভারের ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি থেকে চেয়ারম্যান—সে এক দীর্ঘপথ। এমন কোনও বিভাগ নেই যেখানে সুষীমবাবু কৃতিত্বের পরিচয় দেননি। একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পারদর্শিতা, অন্যদিকে মার্কেটিং-সহ ম্যানেজমেন্টের নানা দিকে বিপুল অভিজ্ঞতা। সুষীমবাবু যেমন দক্ষ ছিলেন বনস্পতিতে তেমনি দক্ষ সাবানে। সুষীমবাবু নিজে কিছু বললেন না, কিন্তু শোনা গেলো ডিটারজেন্ট পাউডারকে কেক ডিটারজেন্টে পরিবর্তন করার টেকনিক্যাল কাজকর্মে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এইভাবেই সৃষ্টি হলো 'সার্ফ' থেকে 'রিন'। এই 'রিন' কেক এখন বিক্রিতে এক নম্বর।

উত্তরপ্রদেশের এটা-তে হিন্দুস্তান লিভার দুধ প্রকল্প নিয়েছিল। সেই সঙ্গে গাজিয়াবাদে কড়াইশুঁটি শুকনো করার কাজ। এই কাজেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সুষীমবাবু। তারপর আবার সাবানের প্যাকিং-এ।

এরপর প্রজাপতির নির্বন্ধ। কলকাতার ঘোষ পরিবারের এক মামা বোম্বাইতে থাকতেন। তাঁর উপর ভার পড়েছিল ভাগ্নী অর্চনার জন্যে একটি সুপাত্র সন্ধান করার। স্বভাবতই মামার নজরে পড়ে গেলেন সুদর্শন সুপণ্ডিত

সুষীমমুকুল। অবশেষে ১৯৬২ সালের মে মাসে বিবাহ। স্রেফ সম্বন্ধ করে—যা কিছু রোমান্স তা বিবাহের পরে।

সুষীমমুকুলের অন্যতম কৃতিত্ব পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়ায় লিভারের নতুন কেমিক্যাল কারখানা। বিশ্বব্যাপী লিভারের ইতিহাসে এটি একটি বড় ঘটনা এই জন্য যে, এই প্রথম নিজের টেকনলজির বাইরে কিছু করতে লিভার রাজি হলো। সুষীমবাবু যখন গার্ডেনরিচ কারখানার প্রধান, সেই সালে হলদিয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হলো, আর কারখানা চালু হলো সালে।

নানা পথ পেরিয়ে অবশেষে ভারতবর্ষের সবচেয়ে সম্মানিত কোম্পানির চেয়ারম্যান। কিন্তু উচ্চতম পদে বসলেও সমস্ত দিকে নজর সুষীমবাবুর। এখনও খোদ চেয়ারম্যান নিয়মিতভাবে বাজারে সাবান বেচতে বেরোন, কথাবার্তা বলেন সব রকমের খরিদ্দার ও দোকানদারের সঙ্গে।

কথার ফাঁকে-ফাঁকে কিছু মজার খবর পাওয়া গেলো। ভারতবর্ষে প্রায় ষোল কোটি ঘর-সংসার আছে। ভোগ্যপণ্যের জন্য মাসে তিনশ টাকা খরচ করতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা ষোল কোটি। হিন্দুস্তান লিভার তাঁদের সাবান ইত্যাদি বিপণন করেন তিন হাজারের উপর স্টকিস্ট-এর মাধ্যমে। এঁদের প্রত্যেকের বিক্রির পরিমাণ বছরে পাঁচ লাখ টাকা থেকে চার কোটি টাকার মধ্যে। এই রিডিস্ট্রিবিউসন স্টকিস্টরা প্রতি সপ্তাহে ১৩ লাখ দোকানদারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। ৮৮ কোটি ভারতীয়র মধ্যে অন্তত ৪০ কোটি লোক লিভারের তৈরি জিনিস ব্যবহার করেন। আর যাঁরা করেন না, তাঁদের অনেকেই দারিদ্র্যসীমার নীচে। ভারতের শতকরা ৪০ জন লোক এখনও জল-কাচা করে কাপড় পরেন—সাবান কেনবার সামর্থ্য তাঁদের হয়নি। গায়ে-মাখা সাবানের ক্ষেত্রে অবস্থা আরও খারাপ। শতকরা ৪০ ভাগের বেশি লোক গায়ে-মাখা সাবান কিনতে পারেন না।

ভারতবর্ষে দোকানদারের সংখ্যা কত, এ নিয়ে সামান্য একটু ভাবের আদান-প্রদান হলো। কাপড়কাচা ডিটারজেন্ট কেক বিক্রি করে, এমন দোকানের সংখ্যা তিরিশ লাখ। এর মধ্যে ২৩ লাখ দোকান গ্রামে। গায়ে মাখা সাবান বিক্রি হয় এমন দোকানের সংখ্যা ৩৩ লাখ, এর মধ্যে গ্রামীণ দোকান ২৬ লাখ। এর মধ্যে মুদির দোকান, মনিহারি দোকান ও কেমিস্ট শপও আছে। জেনে রাখুন, সবচেয়ে বেশি দোকান আছে উত্তরপ্রদেশে।

শুনুন আরও কিছু মজার কথা। গায়ে সাবান মাখতে মাখতে

ভারতীয়দের খরচ হয় বছরে অন্তত ৬০০ কোটি টাকা। কাপড়-কাচা সাবানের পিছনে খরচ অন্তত ৮০০ কোটি টাকা। আর ওয়াশিং পাউডারের চাহিদা সবচেয়ে বেশি—বছরে ১০ লক্ষ টনের মতো, যার দাম অন্তত ১২০০ কোটি টাকা। একমাত্র 'নিরমা' পাউডারের বাজারই ৫০০ কোটি টাকার মতো। ওয়াশিং পাউডারের চাহিদা বাড়ছে বছরে ১২ শতাংশ, সে-তুলনায় গায়ে-মাখা সাবানের চাহিদা বাড়ছে ৬ শতাংশ।

বিশ্বজয়ী 'সানলাইট' সাবানের কথা উঠলো। আগে এ-দেশে ৪৬,০০০ টন পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। এখন কমে দাঁড়িয়েছে ৮,০০০ টন— দামই এর কারণ। সুষীমবাবু নতুন গবেষণা চালাচ্ছেন উৎপাদন খরচ কমাবার। যদি সাড়ে চার টাকার জায়গায় তিন টাকায় দাম কমানো যায়, তা হলে সানলাইট আবার বাজিমাত করবে বলে সুষীমবাবুর বিশ্বাস।

শ্যাম্পু ও অন্যান্য প্রসাধনীর কথা উঠলো। জানা গেলো শ্যাম্পু যাঁরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দক্ষিণী ও বাঙালি মহিলারা। দাঁতের মাজন—সে তো এক ভীষণ ব্যাপার। প্রত্যহ অন্তত ৮৮ কোটি বার দন্ত মার্জন হচ্ছে এ-দেশে। সবার উপরে দাঁতন, তারপর কাঠকয়লা, তামাক, টুথপাউডার এবং টুথপেস্ট। প্রতিদিন কোটি কোটি দাঁতনের জন্য বনসম্পদের উপর ধকল পড়ছে। দাঁতের পেস্টে রাজাধিরাজ হয়ে বসে আছেন কোলগেট, যদিও লিভারের মাজনগুলির জনপ্রিয়তা এখন বাড়তির দিকে।

ফর্সা হবার ক্রিম-এর কথা উঠলো। ওঁদের 'ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি' ক্রিম পৃথিবীর সর্বাধিক বিক্রিত ক্রিমের বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। সুষীমবাবু বললেন, সারা দুনিয়ার মেয়েরা ফর্সা হতে চায়। নাইজিরিয়া থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত কোথাও কোনো পার্থক্য নেই। সাদা মেমরা আবার একটু কালো হতে চায়। রোদে পুড়িয়ে ট্যানিং করছে। আবার পার্টিতে যাবার সময় 'ব্লাশ অন' লাগাচ্ছে। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ক্রিমের বিক্রি এ-দেশে কয়েক কোটি টাকার।

হিন্দুস্তান লিভারের আর একটি গর্বের দিক, এঁদের গবেষণাকেন্দ্র। এখানে সাবান, পাউডার, স্নো ছাড়াও নানা কাজ হচ্ছে। বিশেষ করে বায়ো-টেকনোলজির ক্ষেত্রে। এঁরা নতুন ধরনের বীজ উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন।

ভারতবর্ষে লিভারের যে সাতটি কোম্পানি আছে, তার ন্যাশনাল

জয় করে নিলেন। সে এক দীর্ঘ গল্প, সময়মতন কোনো বইতে দেওয়া যাবে। শুধু এইটুকু বলে রাখা যেতে পারে যে, পাঁচবছর পরে গোয়েঙ্কারা যখন ডানলপ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন তখন বেনোজলের সঙ্গে কয়েকজন গোয়েঙ্কা-অনুরাগীও কলকাতায় ফ্রি স্কুল থেকে ভেসে বেরিয়ে ওঁর সঙ্গী হলেন। প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে নিরাপত্তা সম্মান ও সুখের চাকরি ছেড়ে যাঁরা এই কাজ করলেন তাঁরা কেউ বোকা নন। কিন্তু একটা ব্যাপার স্পষ্ট— যে একবার আর পি গোয়েঙ্কার কাছে কাজ করেছে এবং তাঁর ভালবাসা পেয়েছে সে পৃথিবীর কোনও লোকের কাছে কাজ করে সুখ পাবে না।

আর পি জি-র মধ্যে যে মাদকতা আছে তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ম্যানেজমেন্ট দর্শনের সমন্বয়ে তৈরি। সেই ফর্মুলা আজও গোপন আছে, কিন্তু ভারতীয় ম্যানেজমেন্টের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে, এর প্রচার না হোক অন্তত কোথাও লিখে রাখা প্রয়োজন।

আর পি জি লোকটি একটু গোলগাল, মাঝারি সাইজের। বেশিরভাগ সময় সাদা পাঞ্জাবি ও চটি পরে শক্তিমানদের অলিন্দে ঘুরে বেড়ান। অন্যসময় পরেন দুধসাদা সাফারি— যদিও জামাকাপড়ে ও ছবি তোলার ব্যাপারে ওঁর কোনও আগ্রহ নেই। দর্জির দোকানে ওঁকে নিয়ে যাওয়া, এমনকি বাড়িতে দর্জির ট্রায়াল দেওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার।

এই ধার্মিক ভদ্রলোকের বাঁহাতে একটি মঙ্গলসূত্র সবসময় জড়ানো। ১৯৯০ সালে যখন ষাটে পড়লেন তখন সব নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে জন্মদিনের মধ্যরাত্রে পড়ে রইলেন তিরুপতির মন্দিরদ্বারে। এইরকম নিষ্ঠাবান হিন্দু বোধহয় আজকাল বিরল।

একটা উদাহরণ দিই— যখন পিতৃপক্ষ পড়ে তখন সুইজারল্যান্ডে থাকলেও নিয়মিত তর্পণ করেন পরিবারের জ্যেষ্ঠ হিসেবে। টেলেক্সে সমস্ত ধর্মীয় বিবরণ ওঁর কাছে চলে যায়। কিন্তু আচারে বিশ্বাস থাকলেও কোথাও গোঁড়ামি নেই। সব ব্যাপারেই একটি ফচকে আড্ডাবাজ বাঙালি ওঁর মধ্যে সারাক্ষণ বসবাস করছে।

একবার আমাকে বললেন, সারাবছর ধরে কত জায়গায় কত অন্যায় হয়ে যাচ্ছে কে জানে? একটু পুজো করে পরিষ্কার হয়ে নেওয়া খারাপ কী?

রমাপ্রসাদবাবু যে শিল্পসাম্রাজ্য নিজের প্রতিভায় ও সাধনায় গড়ে

তুলেছেন তার একটু পরিচয় দেওয়া যাক। আর পি জি এই নামের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানিগুলির বার্ষিক বিক্রি তিন হাজার কোটি টাকার ওপর। কতরকমের বিজনেসের সঙ্গে এঁরা যুক্ত। রবার তৈরি হয় হ্যারিসন মালায়ালাম নামক এক দক্ষিণী কোম্পানিতে, রবারের জন্য প্রয়োজনীয় কেমিক্যালস তৈরি হয় বিখ্যাত জার্মান নামের বেয়ার কোম্পানিতে, রবারের সঙ্গে প্রয়োজন কার্বন ব্ল্যাক তৈরি হয় ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক কোম্পানিতে। টায়ার জগতে সবচেয়ে সফল দুটি ভারতীয় কোম্পানির একটি হলো সিয়াট। আর পি জি-র এই কোম্পানির তিনটি টায়ার কারখানা ছিল, এখন চারটে। এই কেন্দ্রটি শ্রীলঙ্কায়। এঁরা আবার টায়ারের জন্যে প্রয়োজনীয় নাইলন কর্ড কারখানা চালু করেছেন জগদ্বিখ্যাত জাপানি টোরে কোম্পানির সঙ্গে। টায়ার ছাড়াও রয়েছে গ্লাসফাইবার কারখানা —ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ এই কারখানার উৎপাদনও দ্বিগুণ হতে চলেছে। এতো কোম্পানির সঙ্গে আর পি জি-র যোগাযোগ যে নাম মনে রাখাই এক শক্ত কাজ। ধরুন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, যার নতুন নাম সি ই এস সি। কেবল কোম্পানি আছে তিনটি— এশিয়ান কেব্‌লস, আর পি জি টেলিকম ও আপকম্। দাড়ি কামানোর ব্লেড কারখানাটি মহিশূরে— উইলটেক ব্লেড এখন খ্যাতির শীর্ষে। এঁরা সম্প্রতি আবার ভারতবর্ষের প্রথম ফোম সাবান বার করেছেন। আর আছে কমপিউটার কোম্পানি— নাম আই সি আই এম। গানের জগতে এইচ এম ভি।

পলিয়েস্টার ফাইবার তৈরি করে ইন্ডিয়া পলিফাইবার। পেট্রোকেম কোম্পানি সিটেক্স কয়েকবছর চালু হয়েছে। আর রয়েছে বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিশন টাওয়ার তৈরির জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান কেইসি ইন্টারন্যাশনাল। আরও তিনটি হাইটেক কোম্পানি সুলজার ইন্ডিয়া ও রেকেম সম্প্রতি সচল হয়েছে। বিপণনে রয়েছে দক্ষিণের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান স্পেনসার —শতাব্দীর ওপর সুপরিচিত। হোটেল থেকে আরম্ভ করে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর পর্যন্ত আর পি জির কী নেই? আছে চা-বাগিচা। আর পি জি সংস্থাগুলিতে এখন কর্মীর সংখ্যা ষাট হাজার। শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা পাঁচ লাখের ওপর। সি ই এস সি-তে গোয়েঙ্কারা আসার সময়ে শেয়ারের দাম ছিল কুড়ি/একুশ। বাজারে প্রত্যাশা রেখে সি ই এস সি দুশোটাকা পেরিয়েছে। কারণ আর পি গোয়েঙ্কা নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে এসেছেন এই প্রতিষ্ঠানে। উৎপাদন বেড়েছে। নতুন জেনারেটিং প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের আগেই চালু

হয়েছে। কাজ চলেছে ৫০০ মেগাওয়াটের নতুন পরিকল্পনার— যেখানে বিনিয়োগের পরিমাণ হবে দু'হাজার কোটি টাকার।

এইসব কর্মোদ্যম সচল রাখার জন্যে আর পি জি টো টো করে ঘুরে বেড়ান— ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'কেয়ার অফ ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স।' সারাক্ষণ হাল্কা মেজাজে থাকেন। কেউ ওঁকে প্রকাশ্যে রাগতে দেখেনি। কম কথা বলেন। লেখেন আরও কম। একেবারে পঞ্চতন্ত্রের বিষ্ণুশর্মার ছাত্র— সার ছাড়া কিছুতেই আগ্রহ নেই।

এই রমাপ্রসাদকে আমি ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে রাইটার্সে নিয়ে গিয়েছিলাম। যেতে চাইছিলেন না, কারণ ডানলপ নেওয়ার ব্যাপারে একটু মতান্তর ছিল। গেলেন। যাবার আগে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সম্বন্ধে সকলের কী ধারণা ?'

আমি বলেছি, 'অপরাধ মার্জনা করবেন, আপনার সম্বন্ধে বাঙালিরা ভাল ভাববে কেন ? আপনি পশ্চিমবাংলায় তো কিছুই করেননি। বহুবছর আগে আপনার বাবা দুর্গাপুরে ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক করেছিলেন।'

ভদ্রলোক আমার কথা হজম করে গেলেন, কিন্তু কয়েকমাস পরে বললেন, 'আমাকে নিয়ে চলুন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।' সেই যাওয়া থেকেই শেষপর্যন্ত সই হলো ঐতিহাসিক হলদিয়া পেট্রোকেম চুক্তি। মনে রাখতে হবে, সেসময় একটা মাছিও পশ্চিমবঙ্গে শিল্পস্থাপনে আগ্রহ দেখাত না। এই পরিকল্পনাকে বাঁচিয়ে রাখতে ভদ্রলোককে অনেক দুর্ভোগ সইতে হয়েছে— অনেকের বিরক্তিভাজন হয়েছেন দিল্লিতে। পুরো পাঁচবছর অনেক ছোটাছুটি ও অর্থব্যয়। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের আগে ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন হলো। তবু কিছু হলো না— হলদিয়া হাতছাড়া হলো আর পি গোয়েঙ্কার।

দুর্দিনেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়, একথাটা বোধহয় সত্য। চরম ব্যর্থতার মুহূর্তে ওঁর মধ্যে যে আত্মসম্মানবোধ ও সৌজন্য দেখেছি তা অকল্পনীয়। এক প্রিয়জনই খুবই তপ্ত হয়ে উঠেছিল। আর পি জি তাঁকে বললেন, 'দেশের সরকার যেখানে আমাকে চাইছেন না সেখানে আমি কেন থাকবার কথা ভাবব ?' সোজা বললেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে, 'আপনাদের ইচ্ছে আমি মেনে নিচ্ছি মাথা পেতে। আমাকে কোথায় কোথায় সই করতে হবে বলুন, এখনই করে দিচ্ছি। আমার জন্য যেন হলদিয়া একদিনও পিছিয়ে না যায়।'

অথচ এই অবস্থায় মামলা মোকদ্দমা হয়ে ব্যাপারটা পিছিয়ে যেতে

পারত। হলদিয়ার সঙ্গে আমারও মানসিক সম্পর্ক ছিল। পাঁচবছর ছোটাছুটি করেছি মায়াবন বিহারিণী হরিণীর পিছনে। খুব কষ্ট হয়েছিল একজন নিরপরাধ ভদ্রলোককে এর মধ্যে টেনে নিয়ে এসে শেষপর্যন্ত তাঁকে বিপদে ফেলায়।

যেদিন সিদ্ধান্ত জানা গেলো, সেদিন রাত্রে আমি ওঁর কাছে পদত্যাগের অভিপ্রায় জানালাম। ক্ষমা চাইলাম সমস্ত অপরাধের জন্যে।

পরের দিন খুব ভোরে তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বললেন, 'পদত্যাগ করে মন্ত্রীরা, পদত্যাগপত্র পাঠায় মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর কাছে। আমি তো এখনও সি এম বা পি এম হইনি। শুনুন মণিশংকরবাবু, জীবনে কত জিনিস হাতের মধ্যে পেয়েও হারিয়েছি। সে তালিকা আপনাকে দেবো। তার মধ্যে বামার লরি আছে। বোম্বে ডাইং আছে। কিন্তু একটা মজা, যখনই কিছু হারিয়েছি তখনই আরও বড় একটা কিছু পেয়েছি। সুতরাং বসে বসে মন খারাপ করার সময় কোথায়? আপনি ভাল করে আমার জন্যে হলদিয়া সম্পর্কে একটা বিবৃতি তৈরি করুন, লোকে যাতে বোঝে আর পি গোয়েঙ্কা শুধু পয়সার পিছনে ছোটে না। একজন আদর্শ বাঙালির যে আত্মসম্মানবোধ তা আর পি জি-রও আছে।'

আমার মন তখনও শান্ত হচ্ছিল না। তখন বললেন আপনিই তো শেষ পর্যন্ত জিতবেন— একটা বড় বই এ বিষয়ে আপনি লিখতে পারবেন! আমি জড়িয়ে থাকলে আপনার অসুবিধে হতো।

তারপর ছেলেকে বললেন, 'পরের ফাইলটা নিয়ে এসো, ওঁর সঙ্গে বসা যাক। মনে রেখো সমস্ত পৃথিবী পড়ে রয়েছে আমাদের সামনে। কত কিছু করতে হবে আমাদের।'

এই অসীম প্রাণশক্তি আমাকে বিস্মিত করেছিল। সম্পর্কটা চাকরির হলেও ভদ্রলোক আমার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন।

যেমন বিজয়ে ঠিক তেমন পরাজয়ে— মানুষটি কখনও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন না। কেউ কেউ রটায়, 'আর পি গোয়েঙ্কা অমায়িক কিন্তু খল। মিষ্টি কথা বলতে বলতে যখন হ্যান্ডশেক করবেন তখন হঠাৎ দেখবে তোমার হাতটাই নেই! শেঠজিকে সাবধান।'

কিন্তু কথাটা যে কতবড় মিথ্যা তা আমি এই ক'বছরে অনেকবার দেখেছি। প্রখর বুদ্ধিমান লোক অবশ্যই— না হলে স্রেফ এক যুগের প্রচেষ্টায় ৮০ কোটি টাকার সাম্রাজ্যকে তিনহাজার কোটি টাকার সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত

করতে পারতেন না।

কিন্তু যাঁরা ওঁর সঙ্গে কাজকর্মে অথবা ব্যবসায় সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাঁরা ওঁর ভক্ত। মানুষকে খুশি করার জন্যে প্রায়ই নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বসেন। তবে আলোচনা ও নেগোশিয়েশনে অসাধারণ দক্ষতা এই মানুষটির। কী করে নেগোশিয়েশন চালাতে হয় তা শিখতে গেলে এই লোকটিই বোধহয় এদেশের সেরা কয়েকজনের একজন।

একজন সেরা বাঙালির যে গুণগুলো থাকা প্রয়োজন সবই আছে আর পির। ভীষণ আড্ডাবাজ— এই আড্ডায় ব্যবসাদারের থেকে বেশি আসেন সমাজের অন্যস্তরের লোক। বন্ধুবৎসল মানুষ। সবসময় রঙ্গরসিকতায় পূর্ণ।

গান ভালবাসেন, খেতে ভালবাসেন, ঘুরে বেড়াতে ভালবাসেন। বই কেনার শখ— ইতিহাসের ছাত্র, প্রেসিডেন্সি থেকে অনার্স পেয়েছিলেন। নিজেকে নিয়েও হাজাররকম রসিকতা করতে পারেন। বাংলা খবরের কাগজ পড়েন, বাংলা বই আজকাল আর পড়তে পারেন না।

সাহেবিয়ানাও আছে। ঘরদোর সবসময় ছিমছাম। টেবিলে একখানা কাগজও পড়ে থাকে না। সায়েবরা তো আর পি বলতে অজ্ঞান। পৃথিবীর নামকরা কুড়ি-পঁচিশটি সংস্থার সঙ্গে তাঁর কাজকর্ম। এইসব কোম্পানির সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। সত্যি কথা বলতে একবার যে বিদেশি প্রতিষ্ঠান আর পি-র সঙ্গে কাজ করেছে তারা আর কখনই ছেড়ে যায়নি।

কাজের ব্যাপারেও তাই। যার কাজকর্ম ওঁর পছন্দ, তার মুক্তি নেই আর পি জি থেকে। বাঙালিস্বভাবের সঙ্গে ব্যবসায়ীস্বভাবের মিল হওয়া যারা অসম্ভব ভাবে তাদের উচিত আর পি গোয়েঙ্কার সঙ্গে একবার দেখা করা।

সাতপুরুষের এই বাঙালি ভদ্রলোকটি বাঙালিদের গর্ব। হলদিয়ার অঘটনের পরে এক ভদ্রলোক ওঁর কাছে কলকাতার নিন্দা শুরু করেছিলেন। উনি বললেন, 'আপনি চুপ করুন। কলকাতার নিন্দা করে আমার কাছে লাভ হবে না। আমার জন্ম, আমার বাবার জন্ম, আমার ঠাকুর্দার জন্ম সব এখানে। ১৮২০ সাল থেকে এই শহরে আছি আমরা। আর শুনে রাখুন, হোয়াটেভার ইজ গুড ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ গুড ফর আর পি জি।'

আমাকে বললেন, 'হলদিয়া হতিছাড়া হয়েছে তো কী হয়েছে? আসুন

আবার উঠেপড়ে লাগা যাক। কলকাতায় একটা ভাল মেয়েদের ইস্কুল এবং একটা ছোট হাসপাতাল করি। আপনি লেখা টেখা শেষ করে একটু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। আমাদের সাতপুরুষের বসতবাটি ওঁদের দিয়েছিলাম হাসপাতাল করার জন্য। সেটারও কী হল খোঁজখবর করুন।' এই বলে আর পি গোয়েঙ্কা আমাকে তাঁর বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

গোয়েঙ্কা নিবাসে যে অতিথিই আসেন তাঁকে একজন গোয়েঙ্কা গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন— আর পি গোয়েঙ্কার বাড়িতে এইটাই নিয়ম, এর কোনও ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই।

জয় হোক অনাবাসী বাঙালির

হেঁচকি তুলে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অবশেষে কোনওক্রমে ১৪০০ সালের প্রথম দিনটিতে পৌঁছনো গেলো।

ঈশ্বর আল্লা গড সবাই জানেন, ফোর্টিনথ সেঞ্চুরিটা বাঙালির পক্ষে মোটেই ভাল গেলো না। একের পর এক এতো কষ্ট, এতো দুঃখ, এতো অপমান, দুনিয়ার আর কোনও জাত কখনও সহ্য করেনি যা বাঙালিরা করেছে এই শতাব্দীতে।

তারও আগের শতকেও বাঙালিরা মার খেয়েছে, স্রেফ। তিয়াত্তরের মন্বন্তরে এককোটি মানুষ ঘায়েল হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতাব্দীতে যাদের যন্ত্রণার কথা দুনিয়ার সমস্ত ঐতিহাসিকদের মুখে মুখে সেই ইহুদিরাও নতুন ইহুদি বাঙালিদের দুঃখ দেখলে চোখের জল ফেলবেন। অতএব, হে প্রভু, নতুন শতাব্দীতে বাঙালিকে একটু সুখ দাও, সান্ত্বনা দাও—বলো পঞ্চদশ শতাব্দী হবে বাঙালির সাফল্যের এবং জয়যাত্রার শতাব্দী। বাঙালি

এবার হাসবে, বাঙালি এবার বিকশিত হবে।

কোনো এক মহাপুরুষ বাঙালিকে আত্মবিস্মৃত জাতি বলে আক্ষেপ করেছিলেন। ভদ্রতা করে তিনি বলেননি, বাঙালি আত্মনিগৃহীত জাতিও বটে। নিজেকে বারংবার নিজের শরীর এবং মন দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে পারলে বাঙালি আর কিছু চায় না। যাঁরা বাঙালিকে আজও ভালবাসেন তাঁরা বলেন, বড় জাতি, কিন্তু খুব কাছাকাছি একাধিক বাঙালি থাকলে পরস্পরকে জর্জরিত ও রক্তাক্ত করা ছাড়া বাঙালির পথ থাকে না। ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বাঙালি বুঝে নিয়েছে, বিশ্বসংসারে বাঙালির সবচেয়ে বড় শত্রু বাঙালি নিজেই। বাঙালি আর যাই চাক, নিজের লোকের সাফল্য, স্বীকৃতি বা সুখ চায় না। এই মনোভাব থেকেই চূড়ান্ত বিপদ ঘটেছে। বাঙালি নিজের গুণের স্বীকৃতি পায় না, সে বাঙালি বড় কাজ করলেও তা কারও নজরে পড়ে না, অথবা তার ভুল ব্যাখ্যা শুরু হয়ে যায়।

প্রমাণ? প্রমাণ শত শত। জগদ্বিখ্যাত এক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিনের গবেষণায় কিছুদিন আগে একটি বই প্রকাশ করেছেন—গ্রেট ইভেন্টস অফ দ্য টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি। ইংরিজি ১৯০৩ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে মানুষের ইতিহাস। তন্নতন্ন করে খুঁজলাম—একজন বাঙালিরও নাম নেই ঢাউস বইতে, এমন কি শান্তিনিকেতনের ঐ ভদ্রলোক অনুপস্থিত যিনি বিংশ শতাব্দীতে একচল্লিশ বছর মানবচিন্তাকে রূপে-রসে-গানে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। দক্ষিণ এশীয় মুক্তিসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে একজন বোস অথবা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন ঘোষের নাম থাকবে প্রত্যাশা করেছিলাম, তাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। বলা চলতে পারে, দুনিয়ার খরচের খাতায় চলে গিয়েছি আমরা। বাঙালি থাকলো বা না থাকলো তাতে বিশ্বসংসারে কিছু আসে যায় না।

অথচ কী আশ্চর্য, বাঙালি নামটা পনেরো-ষোলো কোটি মানুষের শরীরে এখনও শিহরণ জাগায়। বাঙালি বলে ভাবতে তাদের ভাল লাগে, বাঙালিরা যে সব ব্যাপারে দুনিয়ার ওঁচা তা মেনে নিতে চায় না বাঙালি মনটা।

তেরশ সালের ১লা বৈশাখ ভারতসভায় বাঙালি ছিল কেষ্টবিষ্টু। সাহিত্যে, সাধনায়, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, আইনে, আদালতে, চিকিৎসালয়ে বাঙালির ছিল বিশিষ্টতা যা শতবর্ষের ভাটায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কোনো বৃদ্ধিতেই আমাদের কোনো কৃতিত্ব

এই উপমহাদেশে চিহ্নিত হয়নি। এই বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে মারাত্মক মন্বন্তর পেরিয়ে, মহামারী পেরিয়ে এবং শ্রেফ বাঙালি হওয়ার অপরাধে অন্যের হাতে নিগৃহীত হওয়ার কালরাত্রি পেরিয়ে।

এখন তাহলে অবস্থাটা কী? পরিস্থিতি যদি সত্যিই কেরোসিন হয় তা হলে বাঙালি জাতের আদ্যশ্রাদ্ধর কার্ড ছাপতে হয় মোটা কালো বর্ডারে; অথবা খোঁজখবর করতে হয় কোন্ কোন্ ব্যাপারে বাঙালি গত একশ বছরের নরকযন্ত্রণার মধ্যেও নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, নিজেকে বিশিষ্টতা দিয়েছে এবং যে সব ব্যাপারে অপার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে নতুন শতাব্দীতে।

সাবধানী পাঠক, যাঁরা আমার সাম্প্রতিক মতিগতি জানেন তাঁরা হয়তো এখনই আন্দাজ করতে পারছেন আমি প্রবাসী অথবা অনাবাসী বাঙালির প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চলেছি। আমার এক বন্ধু তো প্রকাশ্যেই বলে চলেছেন, বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, কিন্তু বাঙালি সুন্দর পরবাসে। বাঙালির যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা প্রবাস যন্ত্রণায় সুসিদ্ধ না হলে গ্রহণযোগ্য হয় না। শ্রেষ্ঠ বাঙালি হবার একমাত্র পথ পশ্চিমবঙ্গ কিংবা বাংলাদেশ থেকে অবিলম্বে বিনা নোটিশে বেরিয়ে পড়া। দেশের ভিটের মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে পরচর্চা-পরনিন্দায় সদাসজ্জিত থেকে কোনো বাঙালির পক্ষে ফিফটিনথ্ সেঞ্চুরিতে আর নামকরা সম্ভব হবে না। সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও আগাম নোটিশ জারি করেছিলেন বঙ্গজননীকে—হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি—তব গৃহক্রোড়ে/চিরশিশু করে আর রাখিও না ধরে।/দেশ-দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান/ খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান। অমন ভদ্রলোক কবিও ধৈর্যশূন্য হয়ে তাঁর দেশজননীর মুখের ওপর বলে দিয়েছেন—"শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে/ দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।"

অনাবাসী, অভিবাসী, প্রবাসী এবং নন রেসিডেন্ট ছাড়াও বিদেশের বাঙালিদের আরেকটি নাম জুটেছে 'ভাভাবা' অর্থাৎ ভারত-সে-ভাগা-বাঙালি। বাংলাদেশের অনাবাসী হলে বলা চলে বাভাবা! চতুর্দশ বাংলা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফসল এই অনাবাসী বাঙালি, প্রবাসী বললে যাঁরা খুব কষ্ট পান। এঁদের আর একটা নাম দেওয়ার ইচ্ছে ছিল বিজয়সেনা— সিংহলজয়ী বাঙালির ছেলে বিজয় সিং-এর পথ অনুসরণ করে। কিন্তু বাঙালির মজ্জায়-মজ্জায় ভদ্রতা এবং আন্তর্জাতিকতা—শিবসেনা, বিজয়সেনা, কোনোটাই

তার মনে ধরবে না।

বাঙালি কবে ঘরছাড়া হবার অনুপ্রেরণা পেলো? ইতিহাসের মস্ত এক কোশ্চেন। কলকাতার কাছে হুগলির বলাগড় থেকে নৌকো চড়ে যারা একদিন প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপময় ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল তারা যে বাঙালি এমন কথা শুনে থাকবেন হয়তো। কিন্তু আমি একজন সন্ন্যাসীকে জানতাম যাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, সায়েবরা আমেরিকায় আসবার অনেক আগেই বাঙালিরা মার্কিন মহাদেশে হাজির হয়েছিল। নিউইয়র্কে স্ট্যাচু অব লিবার্টির বেদিমূলে ছোট্ট একটা মিউজিয়ামে অসাবধানী সায়েবদের এবিষয়ে কিছুটা স্বীকৃতি আছে : "ইউরোপীয়রা আটলান্টিক অতিক্রম করার কুড়ি হাজার বছর আগে মার্কিন ভূখণ্ডে এশীয়দের পদধূলি পড়েছিল—এঁরাই চাষ শুরু করেছিলেন ভূট্টা, আলু এবং তামাকের।"

ইতিহাসের শেষপ্রান্তে বাঙালিরা হাতগুটিয়ে মাথা নিচু করে কেন কালাপানি না পেরোবার নির্দেশ মেনে নিলো সে বিরাট এক গবেষণার বিষয়। এইসব বিষয়ে ইদানীং চমৎকার কাজ করছেন বাংলাদেশের নূরুল ইসলাম। প্রবাসীদের নিয়ে হাজারপাতার একখানা বই তিনি ইতিমধ্যেই বাংলায় লিখে ফেলেছেন একদশকের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায়। এই উৎসাহী সিলেটি গবেষকের সঙ্গে আচমকা দেখা হয়ে গেলো ১৯৯২ সালের অক্টোবরের লন্ডনে।

নূরুল ইসলাম অনুপ্রাণিত হয়েছেন আমার 'জানা দেশ অজানা কথার' কয়েকটি জাহাজী চরিত্রর কথা পড়ে যাঁরা উনিশ শতকের দ্বিতীয়পর্বে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিলেন। আমি অবাক হলাম নূরুলের জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তৃতি দেখে। ভারতবর্ষ থেকে কালাপানি পেরোবার পথিকৃৎ হিসেবে আমরা কেবল রামমোহন রায়ের কথাই শুনে এসেছি। নূরুল ইসলামের বইতে দেখলাম ভারতবর্ষ থেকে প্রথম বিদেশযাত্রী হিসেবে যার নাম লিপিবদ্ধ তিনি হলেন মির্জা শেখ ইতিসামুদ্দিন — ১৭৩৫ সালে তিনি লন্ডন যান দিল্লির সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে। এরপর অঙ্কশাস্ত্রে গবেষণার জন্যে লন্ডন যান ফজলে হোসেন। ১৭৯৯ সালে পরিব্রাজক হিসেবে বিলেতে যান মির্জা আবু তালেব খান— তিনি বছর তিনেক লন্ডনে থাকেন, তারপর কলকাতায় ফিরে আসেন ১৮০৩ সালে। কলকাতায় তাঁর পরিচিতি ছিল আবু তালেব লন্ডনী বলে।

দিল্লির বাদশা ২য় আকবরের দূত হিসেবে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করে

রামমোহন বিলেত যান ১৮৩০ সাল—সেই ভ্রমণ অবস্মরণীয় হয়ে আছে, কিন্তু আমরা জানি না সিলেটের বাঙালি সৈদ আলি সম্পর্কে যিনি ১৮০৯ সালে নিজের চেষ্টায় বিলেত পৌছন। সৈদ আলির জীবনবৃত্তান্ত এতোই নাটকীয় যে ছোট্ট একটা সামারি দেবার লোভ সামলানো যাচ্ছে না। পরে কোথাও বিস্তারিত গল্পটা শোনানো যাবে।

১৭৮২ সালে মহরমের সময় সিলেটে হাদা মিয়া ও সাদা মিয়া নামে দুই সহদোরের নেতৃত্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভ্যুত্থান ঘটে। সিলেটের তৎকালীন কলেকটর রবার্ট লিন্ডসে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং হাদা মিয়া ও সাদা মিয়া দু'জনেই গুলিতে নিহত হন। সৈদ আলির বাবাও রণক্ষেত্রে আহত হন এবং কয়েকদিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সৈদ আলি যথাসময়ে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন পিতৃহন্তা লিন্ডসকে তিনি খুন করবেন। লিন্ডসে ততদিনে বিলেত ফিরে গিয়েছেন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য সৈদ আলি সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে কীভাবে বিলেত গিয়েছিলেন এবং দীর্ঘ দুই দশক পরে কীভাবে স্কটল্যান্ডের বল্‌ক্যারেস নামক জায়গায় পিতৃহন্তার মুখোমুখি হয়েছিলেন সে এক নাটকীয় কাহিনী যা সম্পর্কে আমরা একালের বাঙালি. লেখকরা কোনোরকম উৎসাহ দেখাইনি। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময় বহু দেশপ্রেমী ইংরেজ বাণিজ্যিক জাহাজ ছেড়ে দিয়ে নৌবহরে চলে যান, ফলে বাণিজ্যিক জাহাজে লোকের অভাব দেখা দেয় এবং সম্ভবত সেই সুযোগ নিয়ে সৈদ আলি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য বাণিজ্যিক জাহাজে কাজ সংগ্রহ করে লন্ডনে পদার্পণ করতে পারেন।

বাঙালি অনাবাসীদের আদিতে পৌছনোর কৌতূহলের নিবৃত্তি করলেন নূরুল সায়েব। বললেন, "ধরে নিতে পারেন, ১৭৪৪ সাল থেকে বৃটিশ জাহাজে বাঙালিরা কাজ করছে। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮৫ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করবার সময় এদেশ থেকে দু'জন বালক দাস ও চারজন দাসী নিয়ে যান। রানী ভিক্টোরিয়ার দুই ব্যক্তিগত ভৃত্য ছিল—আব্দুল করিম এবং মোহম্মদ বক্স। এঁরা অবশ্য বাঙালি ছিলেন না। রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পরে আব্দুল করিম আগ্রায় ফিরে আসেন এবং ওইখানেই মারা যান ১৯০৯ সালে। গৃহভৃত্যের কাজ করে সি আই ই হওয়া এই প্রথম এবং শেষ।

নূরুল সায়েবের কাছ থেকে জানলাম, ১৮৫২ সাল নাগাদ লন্ডনে

ভারতীয় ভিখিরির সংখ্যা ভীষণ বেড়ে যায়। ১৮৬৮ সালে লন্ডনে নিঃস্ব ভারতীয়র সংখ্যা প্রায় হাজার। এঁদের অনেকেই বাঙালি। আরও জানা যাচ্ছে, জন্মস্থান খোদ কলকাতার অধিবাসী জনৈক ঢুলি এবং একজন সাপুড়ে তখন লন্ডনে জীবিকা নির্বাহ করছেন। লন্ডনে আর ছিল বাঙালি আয়ার ভিড়। গত একশ বছর ধরে যে সব আয়া এই কলকাতা বন্দর ছেড়ে বিলেত পাড়ি দিয়েছেন তাঁদের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে কেউ যদি একখানা বই লিখতেন তা হলে তা পড়বার মতন হতো। জোসেফ সল্টার নামে এক মিশনারি লন্ডনে এশিয়াটিক ও আফ্রিকানদের মধ্যে সেবাকার্য চালাতেন। এঁর লেখায় জানা যায়, উদ্বাস্তু আয়াদের ত্রাণের জন্যে লন্ডনে লজিং হাউস গড়ে উঠছে, যেখানে ৫০/৬০ জন আয়া কষ্টের দিনযাপন করতেন।

এইসব আয়াদের যাঁরা জাহাজে বেবি সিটার হিসেবে নিয়ে যেতেন দেশে পৌঁছেই তাঁরা আয়াকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতেন। চাকরিহারা অভাগিনী আয়া আবার অপেক্ষা করতেন নতুন সায়েব মালিকের সন্ধানে যিনি সপরিবারে ইংলন্ড থেকে ভারতে আসতে মনস্থ করেছেন। আয়াদের অনেকেই কলকাতার লোক। এই সব মহিলারা ইংরিজি ভাষায় রপ্ত হয়ে উঠতেন কিন্তু লেখাতে পারদর্শিতা ছিলো না। ইংরিজির ভাগ্যে এঁরা লেখেননি দিনলিপি, তাহলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজের অস্বস্তিকর অন্তরঙ্গ রূপটা ধরা পড়ে যেতো। ধরুন এক মহিলার কথা যিনি ১৬ বছর বয়স থেকে আয়ার কাজ করছেন বিভিন্ন সায়েব পরিবারে—ইনি ছোট ছোট ইংরেজের দায়দায়িত্ব আবার তুলে নিয়ে ৫৪ বার ইংলন্ড পাড়ি দিয়েছিলেন এদেশ থেকে।

শুধু আয়া বা চাকর নয়, আচ্ছ আচ্ছা বাঙালিরাও অনাবাসী হতেন, কিন্তু হিসেব করে কয়েকমাস বা কয়েক বছরের জন্যে। সায়েব ও বাঙালির মধ্যে এ-ব্যাপারে মতের পার্থক্য ছিল না— সায়েবও ভাবতেন না এই ইন্ডিয়ায় তাঁর স্থায়ী শিকড় গজাবে, আর ইন্ডিয়ানের তো কথাই নেই। হয় শিক্ষা, না হয় চাকরির পরীক্ষা, না হয় ব্যারিস্টার অথবা ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন। বিলেতে প্রবাসের অর্থ বড়জোর কয়েক বছর বিদেশে বসবাস, তারপর ফিরে আসা স্বদেশে, কখনও কখনও বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মেমসায়েব বউ সহ। কয়েকটা ক্ষেত্রে ফেরা হয়ে উঠতো না যেখানে বিধুমুখী বেঁকে বসতেন স্বামীকে ঘরজামাই করবার জন্যে। এইসব প্রবাসীরাই শিবরাত্রির সলতের

মতন বাঙালিয়ানাকে বাঁচিয়ে রাখতেন বিদেশে সেই উনিশ শতক থেকে। মুসলমানদের মধ্যে প্রথম আই-সি-এস ছিলেন সিলেটের গজনফর আলি খান। তিনি এক প্রবাসীর স্নেহধন্য হয়েছিলেন লন্ডনে। সিকন্দর মিয়া এক ইংরেজ ললনাকে বিবাহ করে এন-আর-আই হয়েছিলেন, যদিও ওই শব্দটা তখনও ডিকশনারিতে ওঠেনি। গজনফর আলি ১৮৯৩ সালে বিলেত যান, আই সি এস থেকে অবসর নেন ১৯৩২ সালে এবং তারপরেও ২৭ বছর বেঁচেছিলেন ১৯৫৯ সন পর্যন্ত। প্রবাসের স্মৃতিতে তিনি ছিলেন ভরপুর—বাঙালিদের দুঃখ, ইতিহাসের জন্যে কেউ কিছু করে না। নিজের কলমে না লিখলেও এঁরা মুখে মুখে পুরনো দিনের কথা বলে যান না অনাগতকালের জন্যে। আমাদের তাই লিখিত ইতিহাসও নেই, মৌখিক ইতিহাসও নেই। আমরা আত্মবিস্মৃত হবো না তো কারা হবে?

এইসব মৌখিক ইতিহাসের প্রয়োজন আছে। বাঙালিকে যায় ঘরকুনো বলে, মায়ের আঁচলটি দাঁতে চিবিয়ে বাঙালি আপন গৃহপ্রাঙ্গণে পড়ে থাকতে চায় বলে যারা বদনাম রটাতে চায় তারা জানে না, কিছু বোম্বেটে সায়েব বাদ দিলে বাঙালির মতন অ্যাডভাঞ্চারাস এবং পরিব্রাজক জাত পৃথিবীতে নেই। বাংলাদেশি যুবকদের অ্যাডভেঞ্চার মানসিকতার কথা ধরলে এই মুহর্তে বাঙালিই সবচেয়ে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় জাত, নিঃস্ব হয়েও বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। একমাত্র তুলনীয় ফিলিপিনোরা। ওরা দুনিয়ার ১৯০টি দেশে চাকরি করে। বাঙালির অ্যাডভেঞ্চার-এর কোনো হিসেব রাখা হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এক একটা ইংরেজ জাহাজে জার্মান টর্পেডো আঘাত করেছে আর ডজনে ডজনে বাঙালি প্রাণ দিয়েছে। কিছু কিছু বাঙালি সারেং-এর স্মৃতি চিরতরে হারিয়ে যায়নি। যেমন দুই ভাই সুরাব মিয়া ও তরজ মিয়া। কলকাতা থেকে এঁরা জাহাজে চড়েছিলেন ১৯১৭ সালে লিভারপুলের পথে। আলেকজান্ড্রিয়ার পথে জার্মান সাবমেরিনের আঘাতে এই জাহাজ ধ্বংস হলো, আহত তরজ মিয়া ভাইয়ের কোলেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, বেঁচে গেলেন সুরাব মিয়া। কিন্তু দুর্ঘটনার পরেও তিনি জাহাজী জীবন পরিত্যাগ করেননি। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেই ১৯৪০ সালে তিনিও সলিল সমাধি লাভ করলেন আটলান্টিকে। এবারেও জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণে। আমাদের দরকার বাঙালি জীবনের বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করার জন্য ঘরছাড়া বেপরোয়া প্রবাসী বাঙালির ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার কাজে হাত দেওয়া ব্যাপকভাবে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী তো এখনও চোখের সামনে রয়েছে। এখনও আমাদের ঘুম না ভাঙলে, কয়েক বছরের মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না ; শুধু সায়েবদের এঁটো ইতিহাস সেবন করলে আমাদের অনাগত উত্তরপুরুষরা আত্মবিশ্বাস থেকে বঞ্চিত হবে।

এসব গেলো তো সেকালের কথা। একালে বাঙালি অনাবাসী বলতে বাংলা সাহিত্যে আমরা পেয়েছি বর্মার বাঙালিদের। এককালে চাকুরে বাঙালিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে অল্পসময়ের মধ্যে লক্ষপতি করবার একমাত্র উপায় ছিল তাঁকে বর্মামুলুকে পাঠিয়ে দেওয়া। তারপর রক্তমুখী নীলা, হীরা চুনি পান্না, সোনা, রস ও রোমাঞ্চ নিয়ে যতখুশি লিখে যাওয়া! বাঙালি লেখকদের পোড়া কপালে বর্মা টিকলো না জাপানিদের আক্রমণে।

এরপর ? বাঙালি প্রথমে পাড়ি দিলো ইংলন্ডে— পাঁচ বছরের যুদ্ধে ক্লান্ত ও ক্ষত বিক্ষত ইংরেজকে আজেবাজে কাজের ধকল থেকে মুক্তি দিতে। ইংলন্ডপর্বের বাঙালিরা তেমন বড়লোক হতে পারেনি, কিন্তু সংখ্যায় তা পুষিয়ে নিয়েছে। বাঙালিরা বিশেষত্ব লাভ করেছে শত শত রেস্তোরাঁর ব্যবসায়। ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁর জন্মকাল ১৯২৫ থেকে—প্রবর্তক উত্তরপ্রদেশের দুইভাই মোহম্মদ ওয়ছিম ও রহিম, ঠিকানা জেরার্ড স্ট্রিট, লন্ডন। কিন্তু প্রায় একই সময় দুই বঙ্গ সন্তানের নাম পাওয়া যাচ্ছে—কলকাতার নগেন ঘোষ এবং অশোক মুখার্জি। ঘোষ-মশায়ের রেস্তোরাঁর নাম 'দিলখোস' এবং মুখুজ্যে মশায়ের দোকান 'দরবার', ঠিকানা পার্সি স্ট্রিট, লন্ডন। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এখন এই ধরনের বাঙালি রেস্তোরাঁর সংখ্যা হাজার তেরো খোদ ব্রিটেনে।

যুদ্ধের পর জার্মানিতেও ছুটেছে অনাবাসী বাঙালি। এঁরা প্রায়ই তখনকার আই-এস-সি পাশ, হাতে কলমে কাজ শেখার স্বপ্ন নিয়ে বিদেশে রওনা হয়েছেন। বাঙালির জার্মান প্রবাস খুব সুখের হয়েছে অথবা সম্মানের হয়েছে একথা জোর করে বলা যায় না। কারণ জার্মানরা বিদেশীকে কখনও পাত্তা দেয়নি। ওয়ার্ক পারমিট দিয়েছে বছরের হিসেব বছর। ভাগ্যবানরা জার্মান স্ত্রী সংগ্রহ করে ঘরজামাই হবার সুযোগ নিয়েছেন, বাকি অনেকেই নতুনভাবে ভাগ্যসন্ধানে রওনা হয়েছেন কানাডায়। টরন্টো ইত্যাদি বড় বড় শহরে এঁদের এখনও দেখতে পাবেন।

মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রবাসজীবনের গর্বের চরম অধ্যায় হলো ইউ-এস-এ। একসময় বিপ্লব করতে বাঙালিরা যেতো আমেরিকায়, দু'একজন

ওখানে থেকে গিয়েছিলেন। এরপর ইংরেজের অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ও গ্লাসগোতে কিছুটা অরুচি ধরলো বাঙালির—তাঁরা দুনিয়ার অন্য মানুষের মতন আমেরিকা আবিষ্কারে বেরুলেন। কী বিজ্ঞানে, কী প্রযুক্তিতে, কি চিকিৎসায় আমেরিকা যে দুনিয়ার প্রথম সারিতে তা বুঝতে পেরে কিছু বাঙালিও ভালভাবে লড়ে গেলেন। এঁরা আর দেশে ফিরলেন না— শুরু হলো নতুন একধরনের বাঙালির, যাঁরা এখনও সাতডলারের বাঙালি বলে পরিচিত। কারণ তখনকার ভারতীয় আইন অনুযায়ী মাত্র সাতডলার সম্বল করে এঁরা পাড়ি দিয়েছিলেন আটলান্টিকের অপর পারে। এঁদের অসামান্য সাধনা ও সাফল্যের কিছুটা ছবি এঁকেছি দুই পর্যায়ে দুটি বইতে—সাতষট্টি সালের অভিজ্ঞতায় 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' ও আটের দশকের অভিজ্ঞতায় 'জানা দেশ অজানা কথা'। প্রবাসের এই বাঙালিরা আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দাবি করেন।

অনাবাসী বাঙালির এই স্রোত ছিল প্রবল, এঁরা সবাই উচ্চশিক্ষিত। যত আই-আই-টি আছে সেখান থেকে স্নাতকরা ঝেঁটিয়ে চলে গিয়েছেন বিদেশে। আমাদের দেশে হানড্রেড পার্সেন্ট এক্সপোর্ট উদ্যোগ বলতে বোঝায় এই আই-আই-টি। সেই সঙ্গে ভায়া ইংলন্ড বেশ কিছু ডাক্তার। এই বাঙালি ডাক্তার অদ্ভুত এক আন্তর্জাতিক জাত— পৃথিবীর পাঁচ মহাদেশে অগণ্য সব জায়গায়, এমনকি পাপুয়া নিউগিনিতেও দেখতে পাবেন এই ডাক্তারদের। এঁরা আমাদের প্রিয়ও বটে, নমস্যও বটে।

প্রবাসের অনাবাসী বাঙালিই যে আচরণে চিন্তায় ও বিশ্বাসে একমাত্র খাঁটি বাঙালি সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকলে যেসব ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা আমেরিকায় বাঙালির দুর্গোৎসব অথবা নববর্ষ উৎসব দেখেছেন তাঁদের জিজ্ঞেস করুন। আসলে বাঙালিদের শিকড় বাইরে থেকে দেখা যায় না, বাঙালি নিজেও বুঝতে পারে না তার শিকড় আছে, ব্যাপারটা টান ধরে যখন পুনরোপিত হবার জন্য বাঙালি উৎপাটিত হতে চায়।

প্রবাসের বাঙালি শুধু বাঙালি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সমর্থক নয়, সে বড় সজ্জন। আতিথেয়তায় দুনিয়ার এক নম্বর। আর প্রবাসের প্রতিকূল পরিবেশে কাজে কর্মে সে যে অদ্বিতীয় তা বলাই বাহুল্য। তাই কলকাতার সমস্ত প্রতিষ্ঠানের যতই বদনাম থাকুক, পৃথিবীর সেরা কোম্পানিতে, সেরা কারখানায়, সেরা হাসপাতালে প্রথিতযশা বাঙালিদের দেখবেন যাঁরা মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছেন এবং স্বদেশের গৌরব বর্ধন করছেন।

এই সব অনাবাসীদের একসময় দেশে ফিরে আসার ইচ্ছা ছিল। সময় যতই গড়াচ্ছে তাঁরা ততই বুঝছেন, আমেরিকায় ঢোকা শক্ত, কিন্তু বেরুনো আরও শক্ত। প্রবাসের দুঃখ দূর করবার জন্যে এঁরা মন দিয়ে দোল-দুর্গোৎসব করছেন, বাংলা গান শুনছেন, মন্দির করছেন, মসজিদ করছেন। কিন্তু তবু হৃদয়ের কোথাও অপূর্ণতা এবং অপ্রাপ্তির বেদনা থেকে যাচ্ছে।

কিন্তু এই যে প্রবাসের মাটিতে বাঙালিয়ানার রমরমা, তা কতদিন টিকবে? এঁরা দেখছেন, কোনো সময়ে ভেতো বাঙালির সংসারে ঈশ্বর আমেরিকান নাগরিক পাঠিয়ে দিয়েছেন। নতুন এই প্রজন্ম, অর্থাৎ বিদেশে জন্মানো বাঙালি, তাঁদের মধ্যে বাঙালিয়ানার প্রবলত্ব এখনও তেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এঁদের কাছে বোস, ঘোষ, মুখুজ্যে, মহম্মদ, আলি টাইটেলটা একটা আক্সিডেন্ট ছাড়া কিছুই নয়। এঁদের নাড়ির টান আমেরিকার দিকেই। নতুন এই প্রজন্ম নিয়ে তেমন লেখাও হয়নি। তবে লেখা প্রয়োজন।

এঁরা ভীষণ কৌতূহল জাগান আমার মনে। এঁরা যখন এই ভারতীয় উপমহাদেশের সন্ধান করবেন তখন কেমন ভাবে করবেন কে জানে? হয়তো নতুন এক ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া আমরা উপহার পাবো। ইতিমধ্যে পড়াশোনায়, গবেষণায় এঁরা ভীষণ ভাল করছেন। বাঙালির সোনার ফসলে ভরে উঠছে প্রবাসের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এঁরা এখনও বৃত্তিমুখী, কিন্তু সৃষ্টিমুখী হবেন এঁরা অকস্মাৎ। তখন এঁরাই হয়তো হাল ধরবেন ইংরিজি কবিতার কিংবা উপন্যাসের অথবা পশ্চিমী সঙ্গীতের অথবা চিত্রকলার। হয়তো উপস্থিত হবে নতুন এক সৃষ্টির যুগ যার বহিরঙ্গটা পশ্চিমী হলেও ভিতরটা হবে প্রাচ্যমুখী। হয়তো এঁরাই আমাদের বেদ উপনিষদ পুনরুদ্ধার করবেন নতুন যুগের প্রয়োজনের আলোকে। বাঙালি আবার জগৎসভায় সম্মানের আসন পাবেন ঢাকা— ক্যালকাটা— লন্ডন— নিউ ইয়র্ক— বোস্টন— শিকাগো সানফ্রানসিসকো রুটে।

আসুন আমরা নবযুগের এই বাঙালির জন্য জয়ধ্বনি তুলি, বলি বেঁচে থাকো, বড় হও, বিজয়ী হও। ঈশ্বর তোমার কপালে জয়তিলক এঁকে দিন, আমাদের নিজস্ব নতুন শতাব্দীতে।

পথের পাঁচালীর সত্যজিৎ

সেই ১৯৫৫ সালের কথা। সেবার ভাদ্রমাসের ভর দুপুরে বেঙ্গল চেম্বারের অফিস পালিয়ে আমরা একটা ছবি দেখার ষড়যন্ত্র এঁটেছি।

যতদূর মনে পড়ছে সেই সপ্তাহে অনেকগুলো নতুন ছবির আকর্ষণ ছিল—বাংলায় 'কঙ্কাবতীর ঘাট', হিন্দিতে 'নগদ নারায়ণ' এবং ইংরিজিতে 'দেয়ার্স নো বিজনেস লাইক শো বিজনেস' এবং সেইসঙ্গে একজন অখ্যাত চিত্রপরিচালকের নতুন ছবি। বন্ধুর পাল্লায় পড়ে অখ্যাত ছবিটাতেই গিয়েছিলাম কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বীণা সিনেমায়, তাই এতোদিন পরেও গর্ব করতে পারছি কলকাতায় প্রথম দিনের প্রথম শোতে পথের পাঁচালী দেখার বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

চলচ্চিত্র বিশারদ নই আমি, অজস্র ছবি দেখার অভিজ্ঞতাও নেই আমার, তবু বহুবছর আগের সেই অভিজ্ঞতা যেভাবে আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল তার রেশ মৃত্যু পর্যন্ত কাটবে না। জীবনে এমন ঘটনা কমই ঘটে থাকে।

ইতিমধ্যে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে, ডি জে কিমার বিজ্ঞাপন সংস্থার কলকাতা শাখার আর্ট ডিরেকটর এবং কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার প্রচ্ছদশিল্পী সত্যজিৎ রায় বিশ্ববন্দিত হয়েছেন। দুর্ভাগা বাঙালির ঘরে জন্মগ্রহণ করেও আমাদেরই এক আপনজন জগৎসভার জয়মাল্য অর্জন করেছেন এবং সবচেয়ে যা আনন্দের, সৃষ্টির যে উৎসমুখ সেদিন বীণা সিনেমায় উন্মুক্ত হয়েছিল তা এই তিন দশকের বেশি সময় ধরে নানা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এবং উদ্ভাসিত হয়ে বারে বারে আমাদের বিস্মিত করেছে।

অর্থাৎ 'পথের পাঁচালী' যে রসসৃষ্টির ইতিহাসে এক কীর্তিস্তম্ভ, এমন চলচ্চিত্রের সঙ্গে পরিচয় যে জীবনে একবারই সম্ভব, এসব কথা আজ আমার বলবার জন্যে অপেক্ষা করে নেই। পথের পাঁচালীর স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়

এমন এক উর্ধ্বলোকে বিরাজ করছেন যেখানে কোন প্রশস্তিই পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। আর্টের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এমন দুর্লভ ঘটনা ক্বচিৎকদাচ ঘটে থাকে, তাই সেদিন এই মহৎ সৃষ্টি এবং তার বিরল স্রষ্টাকে নতমস্তকে প্রণাম জানানো ছাড়া আমার মতো মানুষের আর কিছুই করার ছিল না।

তিরিশ বছরের ব্যবধানে পথের পাঁচালী আবার দেখেছি। এতদিন আবার দেখিনি এই আশঙ্কায় যে প্রথম দর্শনে বুকের মধ্যে যে বিস্ময়ের রসায়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা নষ্ট হতে পারে এমন কোনো ঝুঁকি আমি নিতে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলাম না।

তিরিশ বছর পরে পুনর্দর্শনের দুঃসাহস দেখিয়ে ভুল করিনি। মনে হলো নতুন ছবি দেখছি। ছবিটা পাল্টেছে, না এই ত্রিশ বছরে আমি নিজে পাল্টিয়েছি ঠিক বুঝতে পারলাম না। পথের পাঁচালীর দেশেই আমার জন্ম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার গাঁয়ের লোক, দারিদ্র্য কাকে বলে তা আমার নিজেরও জানা আছে। তিরিশ বছর আগে অপু-দুর্গা-সর্বজয়া-হরিহরের দুঃখটা দুর্বিষহ মনে হয়েছিল, ছবিটা আরও পনেরো মিনিট চললে আমি ভেঙে পড়বো ভয় হয়েছিল। কিন্তু এই তিরিশ বছর পরে মনে হলো দুঃখের সঙ্গে চিরন্তন আনন্দের, মলিনতার সঙ্গে সীমাহীন সৌন্দর্যের এমন দুর্লভ মিলন যিনি এমন অনায়াসে করতে পারেন রস সৃষ্টির ইতিহাসে তিনি চিরদিন তাজমহলের মতো বিরাজ করবেন, এবং সর্বশ্রেণীর শিল্পস্রষ্টার প্রণম্য হয়ে উঠবেন।

তিরিশ বছর পরে যে পথের পাঁচালী দেখলাম, তার বিস্ময়-রেশ কাটবার আগেই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা হলো অগ্রহায়ণের এক নির্জন দুপুরে। ভেবেছিলাম, খোঁজ করবো—সৃষ্টি বড় না স্রষ্টা বড়। স্রষ্টা নিজেই অনেক সময় তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন কি না।

কিন্তু কলকাতার বিশপ লেফ্রয় রোডের তিন তলার সেই বিখ্যাত ঘরে সত্যজিতের মুখোমুখি হয়ে কোনো প্রশ্ন করার বাসনাই রইলো না। যে-মানুষ পথের পাঁচালী সৃষ্টি করতে পারেন সে-মানুষকে প্রশ্নোত্তরের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জেরা করার মতো উকিল তো নই আমি।

সত্যজিৎ রায় বোধহয় আমার সমস্যা বুঝলেন। বললেন, "তিরিশ বছর ধরে পথের পাঁচালী সম্পর্কে এতো জায়গায় এতো কথা বলেছি যে নতুন কথা কিছুই অবশিষ্ট নেই।"

বুঝলাম, উনি জানতে চাইছেন, আমি তিরিশ বছর ধরে কী করলাম? দেখা করতে এতো দেরি হলো কেন?

নূতনত্ব সম্পর্কে আমার অহেতুক চিন্তা নেই, কারণ পথের পাঁচালী সংক্রান্ত কোনো কথাই কোনোদিন পুরনো হবে না, চিরনূতনের পরশপাথর যে অপু-দুর্গার ছবির মধ্যেই চিরদিনের মতো লুকিয়ে রয়েছে।

সত্যজিৎ রায় শুরু করলেন : "বিজ্ঞাপনের অফিসে আর্ট ডিরেক্টরের চাকরি করতাম, কোনোদিন যে চিত্রপরিচালক হবো এমন ধারণা ছিল না। তবে ছবি দেখতে ভাল লাগতো এবং পরে এই ভাললাগাটাই সিরিয়াস টার্ন নিলো।

"অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু মূল উপন্যাসটা পড়বার আগেই আমি পথের পাঁচালী ছবি তৈরির সিদ্ধান্ত নিই। ডি কে গুপ্তর প্রকাশন সংস্থা সিগনেট প্রেসের জন্যে সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'-র ইলাসট্রেশন করছিলাম, সেই সময় আইডিয়াটা মাথায় এসে গেলো। সংক্ষিপ্তসারটাই আমাকে ভরসা দিল ছবিটা ম্যানেজেবল ফর্মে আনা যায়, মূল উপন্যাসটা প্রথমে পড়লে এই সাহস হয়তো আমার হতো না।

"এই সময় বিজ্ঞাপন এজেন্সির কাজকর্ম সম্পর্কে আমার ক্লান্তি এবং বিতৃষ্ণা জাগছিল। প্রত্যেকটি ক্লায়েন্টকে খুশি করার কাজ ভাল লাগছিল না। তার ওপর অনেক খেটেখুটে হয়তো একটা ভাল কাজ করলাম, অবুঝ ক্লায়েন্ট এক কথায় তা নাকচ করে দিলেন। মনের মধ্যে তখন স্বাধীন হবার ইচ্ছে, আমার এমন কোনো কাজ চাই যেখানে আমিই সর্বেসর্বা হবো।

"সেই সময় আমি আপিসের কাজে সামান্য সময়ের জন্যে বিলেত যাই। চাকরির ফাঁকে-ফাঁকে ওখানে অন্তত একশটা ছবি দেখে ফেলেছি। ইউরোপীয় গুরুদের ছবি দেখে মনে হলো নতুন ভাবে, নতুন পথে, অল্প খরচে, মানবিক আবেদনসম্পন্ন ছবি আমরাও বা তৈরি করতে পারবো না কেন?

"তখনই নেশা চেপে গেলো। ১৯৫০ সালের অক্টোবরে দেশে ফেরবার পথে জাহাজেই চিত্রনাট্যের একটা খসড়া তৈরি করে ফেললাম। তারপর কলকাতায় অফিস-কাজের ফাঁকে ফাঁকে চিত্রনাট্যের কাজ করেছি। এবার ভাবলাম কোনো প্রোডিউসারকে আগ্রহী করা যায় কি না। ধর্মতলায় প্রোডিউসারদের দরজায়-দরজায় ঘুরেছি, কত লোককে বার বার শুনিয়েছি,

জুতোর গোড়ালি খয়ে গিয়েছে, কিন্তু কাউকে রাজি করাতে পারিনি। তখন রাগ হতো, এখন দোষ দিই না ওঁদের। আমাদের কারও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রোডিউসারদের নিশ্চয় সন্দেহ হতো ওঁরা কি পারবেন ?

"ছবি করার ইচ্ছেটা তখন এতোই প্রবল যে আমার অফিসের ইংরেজ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলি, একটা ছবি করে দেখতে চাই। ম্যানেজার বললেন, উইক-এন্ডে কাজ করো, ছুটিছাটায় কাজ করো। আমি এক মাসের সবেতন ছুটিও পেলাম। প্রোডিউসারের দ্বারস্থ না হয়ে, আমাদের নিজেদের যে সঙ্গতি আছে তাই দিয়েই কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত হলো। ইতিমধ্যেই অপু এবং দুর্গাকে পাওয়া গিয়েছে। আমরা ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে জগদ্ধাত্রী পূজোর দিনে এক কাশবনে সুটিং আরম্ভ করলাম। লোকেশন শক্তিগড়ের আগে পালসিট স্টেশনের কাছে। প্রকাণ্ড মাঠে কাশবন, সেখানে থেকে অপু-দুর্গা ট্রেন দেখবে।

"প্রথম দিনেই আমাদের অনেক ভুল ভাঙলো। আমরা অনেক থিয়োরি আয়ত্ত করেছি, কিন্তু হাতে-নাতে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই আমাদের। কিন্তু আমরা দমে যাইনি, কাজ করতে করতে আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি এবং এগিয়ে গিয়েছি।"

"আমার মনে আছে আবার যখন গিয়েছি তখন কাশফুল শুকিয়ে গিয়ে মাঠের রূপ অন্য হয়ে গিয়েছে। আমরা আবার একবছর পরে সেখানে ফিরে এসেছি কাশবনের খোঁজে।"

এবার চরিত্রদের কথা উঠলো। বিশেষ করে ইন্দিরা ঠাকরুণের। সত্যজিৎ তাঁর একটি লেখার উল্লেখ করলেন। অপু, দুর্গা, হরিহর, সর্বজয়ার ভূমিকা নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। প্রসন্ন, সেজোঠাকরুণ, নীলমণির স্ত্রীর সম্বন্ধেও মনস্থির হয়ে গিয়েছে। চুনিবালা দেবীর হদিস দেন রেবাদেবী। চুনিবালা দেবী নাকি নিভাননী দেবীর মা, একসময় তারাসুন্দরী, নগেন্দ্রবালার সঙ্গে মঞ্চে অভিনয় করেছেন।

পাইকপাড়ায় "চুনীবালা দেবী আমাদের হতাশ করলেন না। পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বর্ণনার সঙ্গে অমিল হলো না।

"চুনীবালা দেবীকে নিয়ে কাজ করার সময় বার-বার এই কথাটাই মনে হয়েছে যে, এঁর সন্ধান না পেলে আমাদের পথের পাঁচালী সার্থক হতো না।"

সত্যজিৎ বললেন, "যে আড়াই বছর ধরে পথের পাঁচালী তৈরি করেছি সেই সময়ে আমার অফিসে তিনজন ম্যানেজার এসেছেন—এঁরা তিনজনই আমাকে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন। কখনও পুরো ছুটি, কখনও হাফ পে, কখনও উইদাউট পে ছুটি দিয়েছেন। শেষ ম্যানেজার নিকলসন ছবিটা যখন প্রায় শেষ করে এনেছি তখন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এটাও বোধ হয় বুঝেছিলেন, একে বোধ হয় আর অফিসে ধরে রাখা যাবে না।

"টাকার অভাবে দীর্ঘ সময় যখন কাজ বন্ধ তখনকার যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ কে যেন বললো, একবার ডঃ বিধান রায়কে ধরে দেখলে হয় না? বিধানবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে সেদিন যিনি পথের পাঁচালীকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন সেই শ্রীমতী বেলা সেন আজও বেঁচে রয়েছেন। এই উদার-হৃদয় মহিলা কিন্তু কোনোদিন কোনোরকম প্রচার চাননি, নিজেকে সযত্নে আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন।

"বিধানবাবু আমাদের ছবি দেখলেন, খুশি হলেন এবং ছবির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। যা নিজেদের পকেট থেকে এবং ধার করে খরচ হয়েছিল তা মিটিয়ে দিলেন এবং বাকি টাকা দেবার নির্দেশ দিলেন।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক দায়িত্ব নেবার পরেও এক বছর লেগেছিল। কারণ টাকাটা থোক পাওয়া যায়নি। কিছু কিছু করে টাকা রিলিজ হতো, হাজার রকম হিসেব দিতে হতো।

"কয়েকটা বৃষ্টির দৃশ্য দরকার, কিন্তু বর্ষাকালটা অভাবে-অনটনে মাঠে মারা গেলো। যখন টাকাটা হাতে এলো তখন শরৎকাল। রোজ গ্রামে গিয়ে অপেক্ষা করি যদি বৃষ্টি আসে। আমাদের ভাগ্য ভাল সেবার অক্টোবরে প্রচণ্ড বৃষ্টি নামলো, আমাদের ইচ্ছা পূরণ হলো।

"ছবি করতে গিয়ে মানুষ হিসেবেও আমার অনেক অভিজ্ঞতা হলো। শহরে জন্মেছি, গ্রাম এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোনো ধারণাই ছিল না। ছবি করতে গিয়ে এমন পোক্ত হয়ে উঠলাম যে মেঘের টুকরো দেখলেই বুঝতে পারতাম, বৃষ্টি হবে কি না। কোন্ দিন কীরকম যাবে তা আন্দাজ করতে আমরা হাওয়া-অফিসের মতোই এক্সপার্ট হয়ে উঠেছিলাম। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই থেকে গ্রামকে জেনেছি, কিন্তু শুটিং করতে গিয়ে গ্রামকে ভালবেসেছি, সেখানেই যে আমার শিকড় রয়েছে তা বুঝেছি। ছবিটা করতে গিয়ে শুধু ছবি তোলার অভিজ্ঞতা হয়েছে তা নয়, তার বাইরেও প্রচুর

অভিজ্ঞতা যা আমাকে মানুষ হিসেবে পরিণত করেছে, আমাকে দেশকে ভালবাসতে শিখিয়েছে।"

ছবিটা তৈরি করতে দু-আড়াই লাখ টাকা লেগেছিল। একসময় রাণা অ্যান্ড দত্ত থেকে হাজার কুড়ি টাকা হুন্ডিতেও নিতে হয়েছিল। ধার চেয়েও অনেক সময় পাওয়া যায়নি। যে ভাঙাবাড়িটায় বেশিরভাগ শুটিং হয়েছিল তা মাসিক পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। শুটিং হোক না হোক আড়াই বছর ধরে ওই মাসিক ভাড়া গুনতে হয়েছিল। চিত্রস্বত্বের জন্য বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার বোধ হয় পেয়েছিলেন হাজার দশেক।

সমস্ত কাজের জন্যে পথের পাঁচালী থেকে সত্যজিৎ রায় কিন্তু আট/দশ হাজারের বেশি পাননি। আলোচনার সময় মৌখিক কথা হয়েছিল, বিদেশী স্বত্বের একটা লভ্যাংশ তিনি পাবেন। কিন্তু পরে দেখা গেলো সরকারের প্রচার অধিকর্তা মাথুর সায়েব সেই শর্তটি লিখিতভাবে ঢোকাননি, ফলে প্রায় কিছুই জোটেনি সত্যজিৎ রায়ের কপালে।

সত্যজিৎ রায় কিন্তু ওইসব চিন্তায় মোটেই বিব্রত নন। তিনি বললেন, "কোনো দুঃখ নেই। নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগটা ওখান থেকেই পেয়েছি, সেটার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। ছবিটা শেষ না হলে আমাকে বিজ্ঞাপন অফিসের দাসত্ব করতে হতো। আমি যে ফিল্মমেকার হতে পেরেছি এর জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারই দায়ী।"

"নিজের কাজের সমালোচনা করতে আপনার তুলনা নেই।"

পথের পাঁচালীর সমালোচনার অনুরোধে গভীর চিন্তায় ডুব দিলেন সত্যজিৎ রায়।

বললেন, "ছবিটা তুলেছিলাম এমনভাবে যাতে কঠিন দৃশ্যগুলো গল্পের শেষের দিকে আসে। গল্পোটা গোড়া থেকে আরম্ভ করে যেরকম বিন্যস্ত সেইভাবে তুলেছিলাম। ফলে ছবিটায় শেষের দিকের কাজ প্রথম দিকের থেকে অনেক পাকা। প্রথম দিকে অনভিজ্ঞতার অনেক ছাপ রয়ে গিয়েছে।

"পথের পাঁচালীকে নতুন করে এডিট করতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম। নতুন করে কাঁচি চালাতে পারলে প্রথম দিকের কিছু কিছু দীর্ঘ দৃশ্য ছোট হত। জিনিসটা আরও পরিপাটি ও ছিমছাম হতো, গতি বাড়তো। গোড়ার দিকের কিছু দৃশ্য বড্ড কাঁচা লাগে।"

পুরনো দিনে ফিরে গেলেন সত্যজিৎ রায়। পথের পাঁচালীর ওয়ার্লড প্রিমিয়ার হয়েছিল আমেরিকায় মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অফ মডার্ন

আর্টে। হঠাৎ ঠিক হলো নিউইয়র্কে ছবি পাঠাতে হবে। "ফলে সম্পাদনা করতে গিয়ে দশদিন দশ রাত আমরা ঘুমোইনি—মানুষ যে দশরাত একটানা জেগে থাকতে পারে এ ধারণা আমার ছিল না। কিন্তু শরীরের ওই অবস্থায় অনেক সূক্ষ্ম বিচারশক্তি বোধ হয় নষ্ট হয়ে যায়, যাতে এডিটিং-এ যথেষ্ট ত্রুটি থেকে গিয়েছে। এখনও দুঃখ হয় কেন আরও মন দিয়ে কাজ করিনি।"

এই সব কথার পর আর কোনো কথাই বলা চলে না, রসভঙ্গ হয়। তবু সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসাবে আমার কিছু অপ্রিয় দায়িত্ব থেকে যায়। তাই জিজ্ঞেস করলাম, "কবে আপনি বুঝতে পারলেন যে পথের পাঁচালী বিশ্বজয়ী হতে চলেছে?"

সত্যজিৎ আবার চিন্তাসাগরে ডুব দিলেন। "আমেরিকায় রিলিজ ডে-তে হলের লবিতে বসে আছি। রাত তখন বোধহয় আটটা সাড়ে আটটা। হল থেকে সাদা এবং কালো মানুষ বেরিয়ে আসছেন। তাঁদের সকলের চোখে জল। কেউ কেউ আমার দিকে এগিয়ে এলেন, বললেন, কোনো ছবি এমনভাবে বুকে লাগেনি।"

আবার চিন্তা করলেন সত্যজিৎ রায়। "তবে মনে রাখবেন, বিদেশ জয় করবার পর পথের পাঁচালী স্বদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে, এই অভিযোগ নিছকই গুজব মাত্র। প্রথম দিন থেকে দেশের মানুষ আমাকে যা প্রাপ্য তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম দেননি।"

"গুজবের কথা যখন তুললেন, কেউ কেউ বলেন, ছবি শেষ হবার আগেই নেহরু পরিবার আপনাকে সাহায্য করেছিলেন।"

"আগে কিছু সাহায্য পাইনি। তবে বিদেশমন্ত্রকের কিছু আমলা যখন ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে অতিমাত্রায় প্রচারিত করা হয়েছে এই অভিযোগে বিদেশে পথের পাঁচালী প্রদর্শনে বাগড়া দিচ্ছিলেন সেই সময় জওহরলাল ছবিটা দেখেছিলেন। সেই শোতে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং বিজয়লক্ষ্মী-তনয়া নয়নতারা উপস্থিত ছিলেন। ছবির শেষে জওহরলাল কাঁদতে লাগলেন এবং অবশ্যই বিদেশে প্রচারের সব বাধাবিপত্তি সরিয়ে নিলেন।"

"আরেকটি গুজব ঃ আনন্দবাজারে নাকি প্রথমে নিন্দা এবং পরে প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল?"

"ঠিক কথা নয়। বসুশ্রী-বীণাতে মুক্তির পরের সপ্তাহেই আনন্দবাজারে লেখা হয়েছিল ঃ 'বিশ্বের একখানি সেরা ছবি তোলার কৃতিত্ব দেখাবার মতো প্রতিভাও যে এদেশে আছে পথের পাঁচালী দেখার আগে তা নেহাতই

স্বপ্নকথা ছিল।' নিউইয়র্ক টাইমসের জাঁদরেল সমালোচক ক্রাউযার কিন্তু প্রথমে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। পরে প্রতিবাদে বহু চিঠি প্রকাশিত হতে লাগলো নিউইয়র্ক টাইমসে। তখন ক্রাউযার তাঁর মত পাল্টে আর একটি প্রশংসাসূচক সমালোচনা লেখেন।"

পুরনো গ্লানি তিরিশ বছরের দূরত্ব পেরিয়ে সত্যজিৎ রায় পুনরাবিষ্কার করতে চাইলেন না। অনেক অনুরোধের পর জানালেন, সবচেয়ে খারাপ মন্তব্য হয়েছিল কলকাতায়। এক বিখ্যাত এবং বহুপুরস্কৃত সাহিত্যিক জানিয়েছিলেন, ছবিটি দেখে বোঝা গেল সত্যজিৎ রায় সাহিত্যের কিছুই বোঝেন না।

সবচেয়ে স্মরণীয় সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল আমেরিকার ফিল্ম কোয়ার্টারলিতে—আর্লিন ক্রোচে নামক এক মহিলা "দারুণ রিভিউ করেছিলেন। ভদ্রমহিলা ছবির অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছিলেন, কী করে পেরেছিলেন তা আমি নিজেও জানি না।" বললেন সত্যজিৎ রায়।

সত্তরে সত্যজিৎ

ছাব্বিশে এপ্রিল ১৯৯০ বিকেল পাঁচটা। বিশপ লেফ্রয় রোডের তিনতলায় আমার লুকিয়ে রাখা হৃদয় ক্যামেরার সামনে যিনি বিশ্বভুবন আলো করে বসে আছেন তাঁর নাম সত্যজিৎ রায়।

না, আজ বিষয় কেবল চলচ্চিত্র নয়। পথের পাঁচালি মুক্তিলাভের পর গত পঁয়ত্রিশ বছরে সত্যজিৎ রায় বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার ছাড়াও আরও কিছু হয়ে উঠেছেন আমাদের জীবনে। তিনি ভারতীয় রেনেসাঁসের শেষ নিদর্শন এবং নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে সম্মানিত ও সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ভারতীয়। একদিন আমাদের বাণীর দেউল ছিল পরিপূর্ণ, আমাদের পর্ণকুটিরে ছিল শতপ্রদীপের সমারোহ—বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আমরা

ক্রমশ নিষ্প্রদীপ হতে চলেছি। সত্যজিৎ রায় তাই সর্ব অর্থে আমাদের সাত রাজার ধন এক মানিক। টেলিফোনেই সত্যজিৎ রায় রসিকতা করেছিলেন। কেমন আছেন, এই সৌজন্যমূলক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "ডাক্তাররা অবশেষে বুঝেছেন কাজই আমার সেরা ওষুধ ; তাই কাজে লেগে থাকার অনুমতি দিয়েছেন, আমি চমৎকার আছি। মধ্যিখানে কয়েক বছর কাজের অভাবে ভেজিটেবল হয়ে গিয়েছিলাম।"

বৃহস্পতিবারের অপরাহ্ণেও সত্যজিৎ রায় রসিকতা করলেন, "আমার স্ত্রী ও আমার ডাক্তাররা দুষ্প্রাপ্য অর্কিডের মতন আমাকে আগলে রেখেছেন। এল আই সি-র সিম্বল দেখেছেন তো। অতি যত্নে দুটি হাতে প্রদীপের শিখা অনির্বাণ রাখা হয়েছে। আমি নিজের কাজ করে যাচ্ছি।"

এরপর সত্যজিৎ বললেন, "আপনারা কি একবছর আগেই আমাকে সত্তর বছরের বুড়ো করতে চান ? আমি রবিশঙ্করের থেকে এক বছরের ছোট ; ২ মে আমার ৬৯ হবে ; যদিও বাংলা মতে ওইদিন সত্তরে পা দেবো।"

বললাম, "আপনার বিশ্ববিজয়ী চলচ্চিত্রপ্রতিভা, আপনার সৃষ্টির বৈচিত্র্য নিয়ে সারা বিশ্বে আলোচনা ও লেখালিখি চলেছে। এই তো এনড্রু রবিনসন আপনার তৃতীয় নয়ন নিয়ে বেস্টসেলার বই লিখে ফেললেন। বিশ্বপথিক হয়েও আপনি আমাদের লোক। আপনাকে আমাদের পক্ষে ইন্টারভিউ করবার শ্রেষ্ঠ লোক লালমোহন গাঙ্গুলি।"

হা হা করে হাসলেন সত্যজিৎ রায়। সবিনয়ে স্বীকার করলেন, "লালমোহন চরিত্রটা খেয়েছে ভাল। বাঙালিরা ওইরকম একজন লেখকের সঙ্গে আইডেনটিফায়েড হতে ভালবাসে।"

লালমোহন গাঙ্গুলির স্টাইলেই আমার প্রথম প্রশ্ন, "খ্যাতির হিমালয় শীর্ষে আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কিন্তু আপনার আসল উচ্চতা কত ?"

খুব খুশি হয়ে উত্তর দিলেন, "কয়েক বছর আগে মাপ নিয়েছিলাম—ছ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি। এখন বলতে পারবো না, বুড়ো হলে হাইট কমে যায় বলে গুজব আছে।"

মোটেই বৃদ্ধ নন এই সত্যজিৎ—সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে এই মুহূর্তে তিনি বাঙালির হৃদয়সিংহাসনে বসে আছেন। জন্মদিনের জন্যে সাক্ষাৎকার। স্বভাবতই একটু 'নস্টালজিয়া' এসে যায়। যদিও স্মৃতিচারণ সত্যজিতের ধর্ম নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়েই তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে

রয়েছেন। সত্যজিৎ জানালেন, তাঁর জন্ম ভোর রাতে— ইংরিজি মতে সোমবার ২ মে, বাংলা মতে রবিবার ১৯শে বৈশাখ।

দিনের চিতা জ্বালিয়ে অম্বরতল থেকে তরল-অনল স্প্রে করে বৈশাখ আমাদের কষ্ট দেয় বটে ; কিন্তু বিন্দুমাত্র অভিযোগের উপায় নেই। লালমোহনবাবু উপস্থিত থাকলে মনে করিয়ে দিতেন, বৈশাখ উপহার দিয়েছে রবীন্দ্রনাথকে, সত্যজিৎ রায়েকে। অমন যে অমন শেক্সপিয়র তাঁরও জন্মসমারোহ এই বৈশাখে। 'আমার জন্মসময়েই বাবা অসুখে পড়েন। আড়াই বছর ধরে যমে মানুষে টানাটানি। কালাজ্বরের কোনও চিকিৎসা তখন ছিল না।" বাবার কোনও স্মৃতিই স্মরণে নেই সত্যজিতের।

সুকুমার রায়কে আমরা চিনি তাঁর মৃত্যুহীন সাহিত্যসৃষ্টির মাধমে। কিন্তু চিনি না আমরা সত্যজিৎজননী সুপ্রভাকে।

মা ছিলেন কালীনারায়ণ গুপ্তর বংশের মেয়ে—গান যাঁদের শুধু গলায় নয়, দেহের শিরায় শিরায়। কালীনারায়ণ (১৮৩০) জালালউদ্দীন নামে এক মুসলমান যুবককে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দেন এবং এক বিবাহের প্রীতিভোজে তাঁর সঙ্গে পঙক্তি ভোজন করেন। এর জন্য তাঁকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় এবং তিনি পুত্র ও ভৃত্যসহ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

"মাকে এতো কাছ থেকে দেখেছি, কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি আমার জন্যে তিনি কী করেছেন। এখন যতই ভাবি, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। মায়ের জীবনটা স্ট্রাগলে ভরা। আমাদের ব্যবসা উঠে গেলো, পৈত্রিক বাড়ি ছাড়তে হলো, কিছুই নেই। ছোটমামা দয়া করে একটু আশ্রয় দিলেন। লেডি অবলা বসুকে ধরে চা করি নিলেন বিদ্যাসাগর বাণীভবনে— সেলাইটা জানতেন তাই রক্ষে। এমব্রয়ডারি করে আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করার জন্যে মা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করতেন। আমার মায়ের গুণের শেষ নেই। মডেলিং শিখেছিলেন নিতাই মল্লিকের কাছে। পেন্টিং শিখেছিলেন, চামড়ার কাজ শিখেছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা কাজ করার আদর্শ আমি মার কাছ থেকে পেয়েছি।"

"এত অভাবের মধ্যেও মা আমাকে ভাল ইস্কুলে, ভাল কলেজে পড়িয়েছেন। ১৪ বছরে যে ম্যাট্রিক পাশ করি সেও মায়ের জন্যে ; কারণ ৯ বছর বয়সে সোজা বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন ; তার আগে আমাকে নিজে পড়িয়েছেন। মার ত্যাগটা যে কত বড় ব্যাপার তখন বুঝিনি, এখন বুঝি।"

শেষ বয়সে মায়ের ডায়াবিটিস হল, সেই সঙ্গে হার্টের গোলমাল। "এখনকার মতন পেসমেকার থাকলে হয়তো আরও অনেকদিন বাঁচতেন।" বললেন সত্যজিৎ।

"কালীনারায়ণ গুপ্তর নাতনি আমার মা অসাধারণ গান গাইতেন। আমার মাসি কনক দাশের থেকেও ওঁর ভাল গলা ছিল ; কিন্তু অকালবৈধব্য ও দারিদ্র্য সব নষ্ট করে দিল। আমি চাকরি পেয়ে মাকে আর চাকরি করতে দিইনি। এই মা ভীষণ মর্মাহত হয়েছিলেন যখন আমি সায়েব কোম্পানির কাজ ছেড়ে ফিল্মের নেশায় মাতলাম। পরে যখন সাফল্য এলো তখন অবশ্য মা নিশ্চিন্ত হলেন। এতো খুশি হয়েছিলেন একটা যে লাল খাতায় আমার সম্পর্কে সব খবরের কাটিং এঁটে রাখতেন। মা একটু চাপা প্রকৃতির ছিলেন। পথের পাঁচালী দেখে চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। আমি যখন ভেনিস থেকে গোল্ডেন লায়ন নিয়ে দেশে ফিরলাম তখন মা দমদম এয়ারপোর্টে গিয়েছিলেন। মা জানতেন না, পথের পাঁচালী ছবি করার সময় আমি বউয়ের গহনা বন্ধক রেখেছি। জানলে খুব কষ্ট পেতেন। আমি যখন রবীন্দ্রনাথের ওপর ডকুমেন্টারি তৈরি করছি তখন মা অসুস্থ হলেন, ছবিটা উনি দেখে যেতে পারলেন না। গানকে ভালবাসা আর কাজকে ভালবাসা এ দুটোই মা আমাকে দিয়েছেন।"

কাজ কী করে করতে হয় তার বিস্ময়কর নিদর্শন এই সত্যজিৎ রায়। সকাল ছটায় উঠে রাত বারোটায় শুতে যাওয়া। তখনও সঙ্গে বই থাকে। "আগে একটা- দেড়টার আগে ঘুমোতাম না। এখনও মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়—বিশেষ করে মিউজিক তৈরির সময় রাতদুপুরে সুর এসে যায় গুনগুনিয়ে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে আলো জ্বালিয়ে নোটবইতে লিখে ফেলি, পাছে ভুলে যাই।"

সময় নষ্ট করা সত্যজিতের স্বভাবে নেই। বাঙালিকে যাঁরা অকেজো বলেন তাঁদের দু-একটা গপ্পো জেনে রাখা ভাল। একবার বোম্বাইতে এরোপ্লেনের সময়সূচির গোলমাল হলো- যাত্রা দেড় দিনের জন্য স্থগিত। যাত্রীদের হোটেলে এনে তোলা হলো। কিন্তু সান-অ্যান্ড-স্যান্ডে তখনও কামরা খালি হয়নি ; জানা গেল বেশ কয়েক ঘণ্টা হোটেলের লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে হবে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। সত্যজিৎ রায় সময় কাটাবার জন্য ব্যাগ থেকে কাগজ বার করে বাবার 'আবোলতাবোল' ইংরিজিতে অনুবাদ করে ফেললেন। বাংলা কবিতাগুলো স্মৃতিতেই ছিল।

সেই বই যথাসময়ে বিলেত থেকে প্রকাশিত হলো।

"তাহলে আড্ডা? লালমোহন গাঙ্গুলি তো আড্ডা না মেরে থাকতেই পারেন না!"

'আছে—জমিয়ে আড্ডা আছে আমার জীবনে।" কিন্তু সে-কথায় আসবার আগে প্রথম জীবনের কাহিনীটা একটু এগিয়ে নেওয়া যাক।

তা হলো, চোদ্দ বছরে ম্যাট্রিক এবং আঠারো বছরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এ। চোস্ত ইংরিজি বলতে সত্যজিতের যে জুড়ি নেই, তা এখন অনেকেরই অজানা নয়। যে সামান্য কয়েকজন বাঙালি ইংরিজিটা সত্যিই লিখতে শিখেছিলেন সত্যজিৎ অবশ্যই তাঁদের একজন।

বাংলা ইস্কুলে পড়েও সায়েবি উচ্চারণ। হাসলেন সত্যজিৎ, "ওটা কিছু নয়, একটু কান খাড়া রাখলেই শিখে নেওয়া যায়। বারো-তেরো বছর পর্যন্ত ইংরিজি বলায় আমার বেশ জড়তা ছিল, পরে আস্তে-আস্তে সড়গড় হয়ে গেলো।"

"ইস্কুলে অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার জ্যোতির্ময় লাহিড়ি খুব ভাল ইংরিজি বলতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বিখ্যাত সব লোকের কাছে পড়েছি—হামফ্রেহাউস, সোমনাথ মৈত্রর উচ্চারণ ছিল খুব ভাল। অসাধারণ বাইবেল পড়াতেন এইচ কে ব্যানার্জি। আমার সহপাঠী বন্ধু ছিল অসিত গুপ্ত ও অনিল গুপ্ত। লর্ড সিনহার নাতি অনিল। সন্ধ্যায় আড্ডা মারতাম এক গ্রিক ভদ্রলোকের সঙ্গে এবং কেশব সেনের বংশধর কে সি সেনের সঙ্গে। ইংরিজিটা এসে গেলো। তারপর যুদ্ধর সময় এক সায়েব বন্ধু জুটে গেল—নর্মান ক্লেয়ার। রয়াল এয়ারফোর্সে কাজ করতো। মিউজিক ও দাবার ভক্ত, দাবা খেলার তাগিদে ইংরিজিটা আরও সড়গড় হয়ে গেলো।"

বি এ পাশ করে সত্যজিৎ গেলেন শান্তিনিকেতনে। "কলাভবনে পাঁচ বছরের কোর্স—আমি আড়াই বছর পরে ফিরে এসেছি। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে আমার খুব ভাল ধারণা ছিল না। কিছু আশ্রমবাসীর বাচনভঙ্গি, চলাফেরা বড্ড মেয়েলি মনে হতো। কিন্তু শান্তিনিকেতনে গিয়ে ভুল ভাঙলো, সবাই ওরকম নয়। নন্দলাল, বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর-এর পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করলো।"

মা সোজা নন্দলালকে বলেছিলেন, "আমার ছেলে কিন্তু আপনাদের ওরিয়েন্টাল আর্ট একদম পছন্দ করে না।"

"আমি কিন্তু শান্তিনিকেতনে আঁকা শিখিনি। তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে

আমি পোর্ট্রেট করতাম। ওটা জন্মসূত্রে পাওয়া। ইলাসট্রেশনে দাদু (উপেন্দ্রকিশোর) মস্ত বড়। বাবা আর ক'দিন বাঁচলেন? যদিও বাবা যা এঁকেছেন, ও জিনিস কারও হাত দিয়ে বেরুবে না। দক্ষতার বিচারে উপেন্দ্রকিশোর অবশ্যই বড়—মারা গেলেন ৫২ বছর বয়সে, ওঁরও ডায়াবিটিস। নন্দলাল আমার ঘাড়ে বেঙ্গল স্কুল চাপিয়ে দেননি।"

"শান্তিনিকেতনে আমার নবজন্ম হ'লো। আমার আঁকার ঢং বদলালো। গুহামানব ধরলে মানুষের আঁকার ইতিহাস ২৫,০০০ বছরের। এর মধ্যে মাত্র ২৫০/৩০০ বছর ইউরোপীয় রিয়ালিজম। ইমপ্রেশনিজম্ এসে তাও বদলে দিল। বিনোদবিহারী ও আমার বন্ধু পৃথ্বীশ নিয়োগী (পরে হনুলুলুতে) আমার চোখ খুলে দিলেন। আমি ভারতবর্ষের শিল্পধারাকে সম্মান করতে শিখলাম। ওখানে এক জার্মান ইহুদি সঙ্গীতপ্রেমীর সঙ্গে আলাপ হ'লো—ডঃ অ্যালেক্স অ্যারোনিসন। গ্রামোফোন যন্ত্র গান শুনতে রোজ সন্ধ্যাবেলায় ওর বাড়িতে যেতাম।" এই ভদ্রলোক পরে হাইফা, প্যালেসটাইন থেকে সত্যজিৎকে চিঠি লেখেন—"আমি তখনই বুঝেছিলাম। পশ্চিমী সঙ্গীত সম্পর্কে এরকম 'সেনসিটিভ রেসপন্স' অকল্পনীয়।"

আড়াই বছর পরে সত্যজিৎ আবার কলকাতায়। "মায়ের চেনা এক ভদ্রলোক, নাম ললিত মিত্র— আমার কমার্শিয়াল আর্টে আগ্রহ শুনে বললেন, তা হলে সোজা রামময় রোডে দিলীপ গুপ্তর বাড়িতে যাও। সে এক অভিজ্ঞতা। ওঁর বাড়িতে পেল্লাই সাইজের এক অ্যালসেশিয়ান কুকুর। ডি-কে এলেন কথা বলতে। হঠাৎ আবিস্কার করলেন ,আমি সুকুমার রায়ের ছেলে। ওঁর চোখ চকচক করে উঠলো। আমাকে একটা বিজ্ঞাপনের নমুনাসহ দেখা করতে বললেন। তৈরি করলাম এক পারফিউমের বিজ্ঞাপন। উনি আমাকে ডি জে কিমার কোম্পানির ম্যানেজার মিস্টার ব্রুসের কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন, "তুমি যা মাইনে পাবে ইট উইল ব্রেক ইওর হার্ট—রাজি আছো তো?"

৬৫ টাকা মাইনে, ১৫ টাকা ডি এ। সায়েব বললেন, "কিন্তু বেড়ে যাবার কোনও সীমা নেই?" প্রথম পদ— জুনিয়র ভিসুয়ালাইজার। তখন আর্ট ডিরেক্টর অন্নদা মুন্সী। আর একজন শিল্পী ছিলেন পূর্ণ ঘোষ। এক বছর পরে তড়িৎগতিতে ২০০ টাকা মাইনে বাড়লো। পাঁচ বছর পরে আর্ট ডিরেক্টর। পথের পাঁচালীর পরে যখন চাকরি ছাড়লাম তখন মাইনে দু'হাজার টাকা। ১৯৫০ সালে বিলেতে কাজ করে এসেছি। বলা প্রয়োজন

বিয়েটা সেরে নিয়েছেন ইতিমধ্যে। বিজয়া দাস তখন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র তারকা। শুধু কলকাতা নয়, বোম্বাইতে তিনি কিছুদিন বাসা বেঁধেছিলেন এবং হিন্দি ছবিতেও কাজ করেছিলেন।

"বিজ্ঞাপন লাইনে অনেক ভাল ভাল অ্যাকাউন্টে কাজ করেছি। লিপটন, আই সি আই, টি বোর্ড। 'অনলুকার' কাগজের জন্য একটা রঙিন বিজ্ঞাপনও করেছিলাম। 'সানডে ইজ প্যালুড্রিন ডে' তখনকার বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সিরিজ। ডানলপের কাজও করেছি—'হাওয়া দিন' বলে একটা হালকা বিজ্ঞাপনও অনেকের নজর কেড়েছিল।

একটা মজার কথা জানা গেলো। বিশ্বের অগ্রগণ্য চলচ্চিত্রকারের ফিলমে হাতেখড়ি বিজ্ঞাপন ছবির মাধ্যমে। "ডিরেকশন দিইনি—বন্ধু হরিসাধন দাশগুপ্তর জন্য চিত্রনাট্য লিখেছি। ডিলুক্স টেনর বলে এক সিগারেটের দশ মিনিটের বিজ্ঞাপন-চিত্র—সারাদিনে দশটা সিচুয়েশন। বন্ধুবান্ধব অনেকেই অভিনয় করেছিল। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত তখনও রোগা, ও ছিল একটা বক্সিং সিনে!"

"এর পরে টাটা স্টিলের জন্যে এক ঘণ্টার এক ডকুমেন্টারি। আমার চিত্রনাট্য, সুর রবিশঙ্কর। পরিচালনা হরিসাধন। ক্যামেরা ক্লদ রেনোয়ার। জামশেদপুর ডিমনা লেকের ধারে সাত দিন একনাগাড়ে কাজ করে চিত্রনাট্য লিখেছিলাম। ছবিটা হাউসে দেখানো হয়নি, কোম্পানির নিজের জন্যে টাটার ইতিহাস।"

বিজ্ঞাপনে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলেন সত্যজিৎ। "এই সময় আনন্দ পেয়েছি বইয়ের প্রচ্ছদচিত্র এঁকে। বিশেষ করে কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও ক্যালিগ্রাফি কিছুটা কাজে লেগে গেলো। কিন্তু বুঝলাম, স্বাধীন শিল্পী না হলে চলবে না। বিজ্ঞাপনের তাড়নায় অনেক মূর্খ ক্লায়েন্টের খপ্পরে পড়তে হয়েছে। এ বলছে একরকম, ও বলছে আরেক রকম। ভাল ভাল বিজ্ঞাপন নষ্ট হয়েছে। বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে গ্ল্যামার আছে, কিন্তু কেউ বোঝে না মাইনেটাই সব নয়। শিল্পীদের তারিফ প্রয়োজন, ওটা ওদের পাওনা।"

"উদয়ের পথের সাফল্যের পর জ্যোতির্ময় রায় তাঁর পরবর্তী ছবিতে আমাকে আর্ট-ডিরেক্টর হতে বলেছিলেন। পরে সুভো ঠাকুর তাঁর আর্ট ডিরেক্টর হলেন। ওঁর সহকারী হয়ে এলেন বংশী চন্দ্রগুপ্ত, যিনি পরে আমৃত্যু আমার সহযোগী বন্ধু হয়েছিলেন।"

এবার অবশ্যই পথের পাঁচালী পর্ব। প্রথম খবর : ছবিটা করার সিদ্ধান্ত। আম আঁটির ভেঁপু নামক সংক্ষেপিত সংস্করণের অলঙ্করণের সময় মাথায় পরিকল্পনাটা আসে। "সংক্ষিপ্তসারটাই আমাকে ভরসা দিল ছবিটা ম্যানেজেব্‌ল ফর্মে আনা যায়। মূল উপন্যাসটা প্রথমে পড়লে এই সাহস হয়তো আমার হতো না।"

ছবি করার ইচ্ছেটা তখন এতই প্রবল যে ম্যানেজার ব্রুস সায়েবের সঙ্গে কথা বললেন সত্যজিৎ রায়। তিনি বললেন, "উইক-এন্ডে কাজ করো, ছুটিছাটায় কাজ করো।"

প্রোডিউসারের দ্বারস্থ না হয়ে, নিজেদের যা সঙ্গতি আছে তাই দিয়েই কাজ শুরু হলো। ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে জগদ্ধাত্রী পূজোর দিনে এক কাশবনে শুটিং আরম্ভ হলো। লোকেশন শক্তিগড়ের কাছে পালসিট স্টেশনের কাছে। প্রকাণ্ড মাঠে কাশবন, সেখানে অপু-দুর্গা ট্রেন দেখবে।

আড়াই বছর ধরে পথের পাঁচালি তৈরি হয়েছে। ম্যানেজাররা যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন, কিন্তু কখনও পুরো মাইনে, কখনও হাফ পে, কখনও উইদাউট পে। শেষপর্বে ম্যানেজার নিকলসন ছবিটার কিছু দেখলেন। "খুব তারিফ করলেন। বললেন, চিন্তা কোরো না। চালিয়ে যাও। কান-এ যখন বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট পুরস্কার পেলাম, তখন নিকলসন লিখলেন, এই ছবি তৈরির পিছনে যে হিউম্যান ডকুমেন্ট আছে তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। নিকলসন এখনও বেঁচে আছেন। ওঁর একটা স্কেচ করে দিয়েছিলাম, সেটা বাঁধিয়ে রেখেছেন।"

"ছবিটার পিছনে দু-আড়াই লাখ টাকা ঢালা হয়েছিল। এক সময়ে রাণা অ্যান্ড দত্ত থেকে হুন্ডিতেও হাজার কুড়ি টাকা নিতে হয়েছিল।"

অর্থাভাবে পথের পাঁচালির যখন অকালমৃত্যু হতে চলেছে তখন শ্রীমতী বেলা সেনের মাধ্যমে কী ভাবে বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয় এবং বিধানবাবু খুশি হয়ে কীভাবে ছবির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সে এক মস্ত গল্প। কিছুটা সবারই জানা আছে। যা অনেকের জানা নেই, তা হল পথের পাঁচালী সমস্ত কাজের জন্য সত্যজিৎ রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে মোট আট-দশ হাজার টাকার বেশি পাননি। কিন্তু সে জন্য কোনও দুঃখ নেই সত্যজিতের। পাঁচবছর আগেই তিনি আমাকে বলেছিলেন, "ছবিটা শেষ না হলে আমাকে বিজ্ঞাপন আপিসের দাসত্ব করতে হতো। আমি যে ফিল্মমেকার হতে পেরেছি এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারই দায়ী।"

পথের পাঁচালীর বিশ্ববিজয় মস্ত এক কাহিনী। রবীন্দ্রপরবর্তী বাঙালির ইতিহাসে সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমিও একজন সাক্ষী—প্রথম দিনে অফিস পালিয়ে ম্যাটিনি শোতে বীণা সিনেমায় ছবি দেখার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সত্যজিৎ একবার আমাকে বলেছিলেন, "সম্পাদনা করতে গিয়ে দশদিন দশরাত আমরা ঘুমোইনি—মানুষ যে একটানা দশরাত জেগে থাকতে পারে এ ধারণা আমার ছিল না।"

তারপর তো গত পঁয়ত্রিশ বছরে গঙ্গা দিয়ে কত জল বয়ে গেলো। সত্যজিৎ তাঁর জীবিতকালেই এক কিংবদন্তী পুরুষ হয়ে উঠলেন। চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ কোন্ ফাঁকে ফেলুদা ও প্রফেসর শঙ্কুর অদ্বিতীয় স্রষ্টা হয়ে দাঁড়ালেন। আমরা লালমোহন গাঙ্গুলিকেও পেলাম।

লালমোহনবাবুর হয়েই ওঁর স্টাইলে জানতে চাইলাম সত্যজিতের খাওয়াদাওয়া, গপ্পোগুজবের কথা।

সত্যজিৎ বললেন, "আমার প্রিয় খাবার অড়র ডাল, সোনা মুগের ডাল। আগে মাংস খুব খেতাম— এখন সপ্তাহে একদিন। আগে মুরগি খুব ভাল লাগতো, এখন গা-সওয়া। ভাল ইলিশ, কিংবা ভাল রুই— অন্য কোনো মাছের ভক্ত নই। স্যরি, ভেটকি মাছের ফ্রাই আলাদা একটা ব্যাপার। সব্জির ভক্ত নই, বড় জোর কড়াইশুঁটি। মিষ্টি বলতে বর্ধমানের মিহিদানা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, জয়নগরের মোয়া, রাজস্থানের জিলিপি। মোস্ট ফেভারিট: নতুন গুড়ের সন্দেশ— বোথ কড়া অ্যান্ড নরম পাক। দইও ভাল লাগে, ছানার গজা। একটা জিনিস আজকাল পাই না, বোধ হয় উঠে গিয়েছে— মুগের নাড়ু। চায়ের সঙ্গে কেক-ফেক নয়—হয় লঙ্কা দিয়ে মুড়ি, না হয় চিড়েভাজা। দিনে চার-পাঁচ কাপ চা। একবার ফেলুদাকে দিয়ে একটা গল্পে মকাইবাড়ির চা খাওয়ালাম। তারপর ওই বাগানের কর্তৃপক্ষ মকাইবাড়ির চা নিয়ে হাজির। লাস্ট পনেরো বছর ধরে সাপ্লাই পাচ্ছি কনসেশনে।"

"গুজব আছে আপনি ধোঁকার অন্ধ ভক্ত। আপনার জন্মদিনে মাস্ট।"

দরাজ হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিলেন সত্যজিৎ রায়। "সে কয়েক বছর আগেকার কথা। এখন তো জন্মদিনে ভক্তদের এড়াবার জন্যে গৃহত্যাগ করে অজ্ঞাতবাস করতে হয়। ফাইভস্টার হোটেলে কে আমাকে ধোঁকা সাপ্লাই করবে?"

"আরও চেপে যাচ্ছেন—আপনিই পৃথিবীর একমাত্র সাহিত্যিক চলচ্চিত্রকার

যিনি নতুন একটা মিষ্টান্ন আবিষ্কার করেছেন। আপনি নিজেই তার নাম দিয়েছেন 'ডায়ামণ্ডা'।"

"ওটা একধরনের সন্দেশ—ডায়মন্ড শেপ। একটু কড়াপাকের দিকে। দাঁড়ান, দাঁড়ান—কে একজন ফোন করে ডায়ামন্ডা তৈরির অনুমতি চাইলেন, আমি ফোনেই পারমিশন দিয়ে দিলাম, কিন্তু আজও নমুনা পাইনি।"

"ওহো একটা কথা বলা হয়নি। শান্তিনিকেতনে গিয়ে মানুষটাই বদলে গেলাম। এর আগে বাংলা খুব পড়তাম না। দিলীপ গুপ্ত একবার জিজ্ঞেস করলেন, তারাশঙ্করের 'কবি' পড়েছো? পড়িনি শুনে রাগ করলেন। একখানা বই আনিয়ে উপহার দিলেন, তাতে লিখলেন—বাংলা সাহিত্যে যিনি গোল্লাজ্ঞানী সেই সত্যজিৎ রায়কে।" আরও অনেক কথার পরে শেষ পর্বে হাজির হলাম। এখন সন্ধে সাতটা। আমার প্রশ্ন: "কোনও অপ্রাপ্তির দুঃখ আছে?"

গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন সত্যজিৎ রায়। স্মোকিং ত্যাগ করেছেন, কিন্তু তামাকহীন পাইপ দাঁতে চিবোতে চিবোতে তিনি বললেন, "প্রথম ছবিতেই খ্যাতি পেলাম। যা করেছি উতরে গিয়েছে। আমার জীবন মোটামুটি একটা সফলতা, আমি খুব ভাগ্যবান বলবো। বয়স বেড়ে গেলে বন্ধু বিচ্ছেদের দুঃখ বুকে বাজে। মায়ের কথা ছেড়ে দিলে, ডেভিড মাকাচিয়ন, বংশী চন্দ্রগুপ্ত এদের বিয়োগ আমাকে কষ্ট দেয়।"

একটু থামলেন সত্যজিৎ রায়। "আমি এসেনসিয়ালি ফ্যামিলিম্যান—স্ত্রী, ছেলে এরাই আমার কাছের লোক। আমার কাজের সঙ্গেও এরা জড়িয়ে আছে। আর আছে নির্মাল্য আচার্য— আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু। আমার চিত্রনাট্যের গবেষণার কাজটা নির্মাল্যই করে দেয়। সুখে-দুঃখে সব সময় আছে। আমার সব কাজই স্ত্রী প্রথমে শোনে. ছোটছোট অসঙ্গতিগুলো ও দেখিয়ে দেয়, আমি সংশোধন করে নিই। সঙ্গীত রচনা করলে পিয়ানোতে ওদেরই প্রথম শোনাতে হয়। ছেলে ভাল কাজ শিখেছে। বাবুর স্ত্রী চমৎকার মেয়ে। ওর নাম ললিতা। তিন মাস আগে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়েছে, এখনও রিসেপশনের ব্যবস্থা করা যায়নি।"

"এ যুগের মানুষদের কাছে কিছু বলার আছে?"

সত্যজিৎ রায় আবার একটু ভাবলেন। "আমার প্রত্যেক ছবিতেই কিছু কিছু মন্তব্য করেছি। 'শাখা-প্রশাখা' ছবিটা তো প্রায় তৈরি—সমকালীন

সমাজ সম্বন্ধে আমার যা মনোভাব সব বলে দিয়েছি।"

বাঙালিদের সম্বন্ধে সত্যজিৎ কিছু বলতে চাইছিলেন না ; মনে হলো অনেক কটু কথা, অনেক কামড় এখনও ভুলতে পারেননি। শেষে বললেন, "শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও তিক্ত সমালোচক দুই বাঙালিরা সাপ্লাই করেছে। কিন্তু আই অ্যাম ইন গুড কম্পানি। রবীন্দ্রনাথকেও ভোগান্তি ভুগতে হয়েছে।"

"তা হলে সবচেয়ে কোন সাফল্য আপনার ভাল লেগেছে?"

"বাচ্চাদের রি-অ্যাকশন। ভীষণ ভাল লাগলে ওরা চিঠি দেয়, টেলিফোন করে—ওটা খুব তৃপ্তিদায়ক।"

ঘড়িতে এখন সাড়ে-সাতটা। "এই ভাবে কথা বললে আপনার তো একটা বই হয়ে যাবে!" রসিকতা করলেন বিশ্ববন্দিতের চেয়েও বন্দিত সত্যজিৎ রায়—সত্তরে পা এগিয়ে দিয়েও যিনি সৃষ্টির মধ্যগগনে। "আরেকদিন আসুন—জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে, আরও জানবার থাকলে বলা যাবে," এই বলে ছ'ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের মানুষটি আমাকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

এন্টালির দিদিমণি ও বাগবাজারের দিদিমণি

মেয়ে ইস্কুলের দিদিমণিদের যাঁরা ধর্তব্যের মধ্যে ধরেন না, এঁদের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য শক্তি থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা সাবধান। মধ্য কলকাতার একজন স্কুলের দিদিমণির জয়গাথায় বিশ্ববিমোহিত, শত সহস্র মানুষ নতমস্তকে দুঃস্বপ্নের নগরী কলকাতায় আসছেন দীন যথা যায় দূর তীর্থ দর্শনে। বিশ্ববিমোহিনী জননীকে তাঁরা হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চান। হতে চান তাঁর সাধন সঙ্গী।

এক বছর নয়, দু'বছর নয়, টানা সতেরো বছর এই দিদিমণি ক্লাসে ভূগোল এবং ইতিহাস পড়িয়েছেন। সেই সময় যারা তাঁকে দেখলো, তাঁর সান্নিধ্যে এলো, এই ছোট্টখাট্ট মানুষটির মধ্যে মহত্ত্বের তেমন কিছু ইঙ্গিত

পেলো না। শত শত সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীদের একজন মনে হয়েছে তাঁকে—যিনি ভিড়ে হারিয়ে যান, কথা কম বলেন। তবে কাজে নিষ্ঠা সীমাহীন। সেই সঙ্গে সীমাহীন ভক্তিও। যে-কাজই দেওয়া হয়েছে ভূগোলের দিদিমণিকে, তা তিনি হৃদয় ঢেলে করেছেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস সব কাজই ঈশ্বরের কাজ। সর্বত্রই তো তাঁর উপস্থিতি। প্রেমের মধ্যেই তো সকল প্রাপ্তি। হে ঈশ্বর, মানুষকে ভালবাসা মানেই তো তোমাকে ভালবাসা, সর্ব ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে যে মানবধর্ম তাকে প্রণাম করি, সর্ব নীচতাকে দহন করুক তোমার হৃদয়ের দাহ।

মেয়ে ইস্কুলের এই ছোট দিদিমণির কয়েকটি প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসতে হবে। কিন্তু তার আগে বলি, আমাদের চোখের সামনে নানা কলঙ্কে কলঙ্কিত, নানা যন্ত্রণায় জর্জরিত কলকাতা মহানগরী হঠাৎ মানবতীর্থে পরিগত হলো জননী টেরিজার শহর বলে। সারা বিশ্বে ধনগর্বে গর্বিত, সাফল্য গর্বে সম্মোহিত নানা জনপদ রয়েছে, সেখানেও মানুষ আছে, মনুষ্যত্বও আছে নিশ্চয়, কিন্তু পৃথিবীর মানুষের পুষ্পাঞ্জলি নির্ধারিত রইলো সেই শীর্ণকায়া শ্বেতাঙ্গিনী যিশুসেবিকার জন্য। মানবসমাজকে নতুন কোনও তত্ত্বকথা তিনি শোনাননি, শুধু সুপ্রাচীন প্রেমের সুরটিকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করে, অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন, অতি চুপি চুপি--মানুষকে ভালবাসো, ভালবাসো। মানুষকে ভালবাসা মানেই তো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ভালবাসা।

সারা বিশ্ব যে টেরিজার জয়গানে মুখরিত তা ইস্কুলের এই দিদিমণিকে স্পর্শ করে না। ধনীকে সবিনয়ে তিনি বলেন, আপনার চেকবুক মুড়ে রাখুন, অর্থের চেয়েও আমি ত্যাগ চাই। ভালবাসা এই ত্যাগকে প্রাণময় করে, পবিত্র করে।

কিছুদিন আগে এই কলকাতারই ৫৪এ জগদীশচন্দ্র বসু রোডে মিশনারিজ অব চ্যারিটিজ-এর ঘটনা—একজন ইউরোপীয় ধনপতি এসেছে ,অর্থ দান করতে। মা তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন, কিন্তু কাছে টেনে আনলেন একটি লাজুক বাঙালি যুবককে, যে চুপিচুপি মাকে কিছু বলতে চায়। কথা শুনে মা প্রথমে ওকে বারণ করলেন কিন্তু সে শুনলো না। তখন তিনি গ্রহণ করলেন। নিম্নবিত্ত পরিবারের এই সন্তানটি চাকরিতে প্রথম মাইনে পেয়েছে, গর্ভধারিণী জননীর নির্দেশে সবটাই নিয়ে এসেছে জননী টেরিজার পাদপদ্মে নিবেদন করতে। সংসারে কষ্ট হবে। তবু সে এসেছে। মা টেরিজার কাছে

এই দানটির মূল্য ধনীর দানের চেয়ে অনেক বেশি কারণ এর সঙ্গে ত্যাগ রয়েছে যার উৎস ভালবাসায়।

এক কোকিলে বসন্ত হয় না—একজন দিদিমণির উদাহরণে যাদের মনের দ্বিধা কাটবে না, তাঁদের সবিনয়ে জানাই আর এক ইস্কুল দিদিমণির কথা যিনি এই বিংশ শতাব্দীর কলকাতাকে তাঁর সকল কর্মের কেন্দ্রভূমি করেছিলেন এবং মাদার টেরিজার প্রসঙ্গ উঠলেই যাঁর কথা মনে পড়ে যায়। তিনি যে সিস্টার নিবেদিতা তা অবশ্যই কৌতূহলী পাঠককে মনে করিয়ে দিতে হবে না।

নিবেদিতাকে আমি দেখিনি, কিন্তু হাওড়া বিবেকানন্দ স্কুলের দৌলতে আশৈশব তাঁর সম্বন্ধে শুনেছি এবং পড়েছি। তাঁর নিজস্ব রচনা তো বটেই, পরবর্তীকালে তাঁর কিছু পত্রাবলীর পাণ্ডুলিপি, যা তখনও কোনও অজ্ঞাত কারণে অমুদ্রিত থেকে গিয়েছে, আমার নজরে এসেছে।

আরও আশ্চর্য, পশ্চিমের যে দু'জন মানুষ সুদূর ইউরোপ থেকে এসে এই দেশকে স্বদেশ করলেন তাঁরা দু'জনেই রমণী। প্রাণবন্ত পুরুষরা এসেছেন পশ্চিম থেকে দলে দলে। তাঁদের কেউ কেউ এদেশকে করেছেন শাসন, কেউ করেছেন শোষণ, আবার কেউ ভারতবর্ষকে উপহার দিয়েছেন নানা বিষয়ে গবেষণার স্বর্ণভাণ্ড। কিন্তু বিদেশি পুরুষদের কেউই এদেশের মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পারেননি বলাটা বোধহয় অন্যায় হবে না। আশ্চর্য কিছু নয়, পররাজ্য-বিজয়ী পরাক্রান্ত পুরুষরা এমনিই হয়ে থাকেন ; যুগে যুগে দেশে দেশে তাঁদের সন্ধান মিলবে। কিন্তু ইতিহাসের কী বিচিত্র রসিকতা—ভারতবর্ষকে এবং যথাসময়ে বিশ্বকে নাড়া দেওয়ার জন্য যে দু'জন নির্বাচিত হলেন তাঁরা দু'জনেই ক্ষীণাঙ্গিনী রমণী। সবিনয়ে আরও নিবেদন। পৃথিবীর আর কোনও শহরই এই বিংশ শতাব্দীতে একই সঙ্গে নিবেদিতা ও টেরিজার মতন মহীয়সী মহিলার কর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি।

ট্রামে-বাসে আমি শুনেছি ভগিনী নিবেদিতাই পরজন্মে জননী টেরিজা হিসাবে এই পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। যাঁরা জানেন নিবেদিতার মৃত্যু ১৯১১ সালে এবং টেরিজার জন্ম পূর্ববর্তী বছরের ২৭ শে আগস্ট তারিখে, তাঁরাও বলেন, টেরিজা হলেন একালের নিবেদিতা। নিবেদিতাকে যদি বলা হয় সেকালের টেরিজা, তা হলেও আপত্তি নেই তাঁদের।

আমার এক শিক্ষিকা আত্মীয়া আছেন, যিনি আমাকে মনে করিয়ে

দিয়েছেন—এদেশে আসবার আগেই মার্গারেট নোবেল স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন, আর কলকাতার সেন্ট মেরিজ স্কুলের দিদিমণিই একদিন বিশ্বজনের জননী হওয়ার দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করলেন আমাদের চোখের সামনে। অর্থাৎ যা কেউ পারে না তা ইস্কুলের দিদিমণিরাই পারেন, তাঁদের মধ্যে যখন শক্তির, বিশেষ করে অধ্যাত্ম শক্তির বিকাশ হয়, তখন তাঁকে রোধ করার শক্তি কারও থাকে না।

এই যে অসামান্য সম্মান ও সৌভাগ্য কলকাতার, এর পিছনে কোন শক্তি কাজ করছে? কলকাতার দারিদ্র্য? কলকাতার মানসিকতা? না মার্গারেট নোবেল ও অ্যাগনেস বেজাক্সহিউ-এর উপস্থিতি নিতান্তই কাকতালীয়? আমার আত্মীয়া বলেন, শক্তি সাধনার পীঠস্থান কালীকাক্ষেত্র থেকেই তো দেবীরা নারীরূপে আবির্ভূতা হবেন, এইটাই তো স্বাভাবিক, এইটাই তো সম্ভব। কলকাতার অনেক দোষ, কিন্তু এই নগরী এখনও ভক্তিতে বিশেষ করে শক্তিপূজায় নিমজ্জিত—ঘরের ছেলে এবং ঘরের মেয়ের চোখে বিশ্বরূপের ছায়া দেখা এখানে অস্বাভাবিক নয়। বিধাতা তাই শত বঞ্চনা শত যন্ত্রণার মধ্যেও কলকাতাকে দিয়েছেন নিবেদিতাকে, দিয়েছেন জননী টেরিজাকে।

নিবেদিতা অথবা টেরিজার জীবনের গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ এই মুহূর্তে নেই। তবু কিছু কিছু কথা মনে এসে যায়। আইরিশ পাদ্রির মেয়ে মার্গারেট নোবেল শিক্ষা শেষে ১৮ বছর বয়সে ইস্কুলের শিক্ষিকা হলেন। আরও দশ বছর পরে, আঠাশ বছর বয়সে হিন্দু সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনতে গিয়ে এমন মুগ্ধ হলেন যে ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে হাজির হলেন কলকাতায় শিব ও বুদ্ধের সন্ধানে। সে ১৮৯৮ সালের কথা। গুরুর ভরসায়, গুরুর ডাকে মিস নোবেল এলেন কলকাতায়, বিশ্বজনের ভগিনী হওয়ার জন্য নাম পেলেন সিস্টার নিবেদিতা। গুরুই পথ নির্দেশ দিলেন, তুমি আগামীকালের ভারতীয়দের "শিক্ষিকা, সেবিকা এবং বান্ধবী" হও—"mistress, servant and friend in one"। এই শিক্ষিকা-সেবিকা-বান্ধবীকে টুক করে কোন সময়ে সেবিকা, বান্ধবী ও মাতা'য় পরিবর্তন করা হলো। সেই পরিবর্তনে আমরা মানুষের ইতিহাসে নিবেদিতার ভূমিকার প্রতি অবিচার করলাম কি না তাও সময় একদিন বিচার করে দেখবে।

রবীন্দ্রনাথ কোনো সময়ে ভগিনীর পরিবর্তে লোকমাতা শব্দটি ব্যবহার করে বসলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, ১৮৬৭-তে তাঁর জন্ম, ১৮৯৫-

তে ২৮ বছর বয়সে বিবেকানন্দ-দর্শন, ৩০ বছর বয়সে ভারতবর্ষে আগমন ও ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা, পাঁচবছর পর বিবেকানন্দর দেহত্যাগের পরেই ১৯০৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন এবং মাত্র ৪৫ বছরে অকালমৃত্যু। অর্থাৎ ভগিনী থেকে মাতৃত্বে উন্নীত হওয়ার বিশেষ সময় পাননি মার্গারেট নোবেল।

জননী টেরিজার ছবিটি একনজরে এই রকম। যুগোস্লোভিয়ায় জন্ম ১৯১০ সালের ২৭ আগস্ট। বাবা বিলডিং কন্ট্রাকটর ছিলেন (কলকাতায় রিয়াল এস্টেট প্রমোটাররা অবহিত হন)। ব্যবসায়ে ঠকেছেন। মারা যান অল্প বয়সে, মা এমব্রয়ডারির কাজ করে সংসার চালিয়েছেন। অ্যাগনেস বেজাক্সহিউ ১৬ বছর বয়সে কলকাতা সম্পর্কে আগ্রহিণী হন জেসুইটদের কল্যাণে। পরে লোরেটো সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো এবং দেশ ছেড়ে ১৮ বছর বয়সে তিনি নিবেদিতার দেশ অ্যায়ারল্যান্ডে হাজির হলেন লোরেটো হেডকোয়ার্টারে। নিবেদিতার তিরিশ বছর পরে, ১৯২৮ সালের নভেম্বরে, অ্যাগনেস কলকাতা পাড়ি দেন। দার্জিলিং লোরেটোতে দু'বছর ব্রহ্মচারিণীর জীবন, ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষা এবং দু'বছর পরে সন্ন্যাসিনী জীবনে প্রথম দীক্ষা। ফরাসি-সন্ত টেরিজার অনুসরণে (ইনি ২৪ বছর বয়সে যক্ষ্মায় মারা যান) নতুন নামকরণ টেরিজা। এই সময় ওখানে আরেকজন টেরিজা ছিলেন, পার্থক্য বোঝানোর জন্য এঁকে 'বাঙালি টেরিজা' বলা হত।

এর পরের কথা আগেই বলেছি, ১৭ বছর কলকাতার সেন্ট মেরিজ ইস্কুলে দিদিমণি, প্রধান বিষয় ভূগোল। সবচেয়ে আশ্চর্য, প্রায় দু'দশক ধরে যিনি ভূগোল পড়ালেন, তিনি টানা তিরিশ বছরে একবারও বাংলার বাইরে পদক্ষেপ করেননি। এন্টালির দিদিমণি ও বাগবাজারের দিদিমণির আপাত কোনো পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না।

এবার টেরিজার জীবনে সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত, যাকে ভিতরের ডাক, না বৈপ্লবিক বিদ্রোহ, না যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বলা হবে, তা একসময় ইতিহাস স্থির করবে। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ ট্রেনে যেতে যেতে সিদ্ধান্ত নিলেন যে লোরেটোর আনুষ্ঠানিক বন্ধন থেকে সরে এসে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবেন। এই ব্যাপারে নিবেদিতার সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে, বাগবাজার স্কুলের এই দিদিমণিও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, যার পশ্চাৎপট নিয়ে এখনও কানাঘুসোর শেষ নেই, যদিও

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন সরলভাবে। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সাম্প্রতিক গবেষণা পড়লেও এ-বিষয়ে তেমন সন্দেহ থাকে না। দুই বিদ্রোহিণী দিদিমণির এই সংগ্রামীপর্বের পার্থক্য, নিবেদিতার মুক্তি মিলেছিল সঙ্গে সঙ্গে (পত্রপাঠ বিদায় করে কেউ কেউ খুশি হয়েছিলেন?) আর টেরিজার কেস নানা সিনিয়র সন্ন্যাসীর হাত ঘুরে অবশেষে ভ্যাটিকান পর্যন্ত গড়ালো। লাল ফিতে ধর্মক্ষেত্রেও কত দীর্ঘ তা জানা যাচ্ছে সাম্প্রতিক কিছু অনুসন্ধান থেকে। এখানেও শম্বুকগতি ফাইল নড়ানড়ির ব্যাপার ছিল এবং রুদ্ধ প্রতীক্ষায় কেটে গেলো দু'বছর। যখন মুক্তি মিললো, তখনও সব সহসন্ন্যাসিনীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল তোমরা এই ব্যাপারে-না প্রশংসা না-নিন্দার ভূমিকা গ্রহণ করবে।

এর পরেও এক মহাবিপ্লব—লোরেটো সন্ন্যাসিনীর পরিচ্ছদ ত্যাগ করে শাদা খোলের নীলপাড় শাড়ি পরে বাংলার মেয়ে হলেন টেরিজা। বাগবাজারের দিদিমণির সঙ্গে পার্থক্যটা নজর কাড়ে। একজন সায়েবি নাম ত্যাগ করে নিবেদিতা নামে শিব ও বুদ্ধের মহিমা প্রচারে নামলেন, কিন্তু একটা পশ্চিমী স্টাইলের আলখাল্লা পরলেন, শাড়ি নিলেন না। আরেকজন নামধাম পশ্চিমী রেখে, যিশুর মহিমা প্রচারে নিজেকে উৎসর্গ করলেন বাংলার বধূর বেশে—এমনকি ঘোমটা পর্যন্ত।

দু'জনেই সঙ্গতিহীন। বিদেশে কোথায় মাথা গুঁজবেন তার ঠিক নেই—বিদেশিনীর পক্ষে এটা কত বড় বিপদ তা অনেকেই জানেন না। শাড়ির খুঁটে-বাঁধা পাঁচটি টাকা, একটি প্যাঁটরায় রাখা দু খানি নীলপাড় শাড়ি নিয়ে শুরু হলো এই শতাব্দীর সর্বাধিক আলোচিত বিপ্লবের, ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে। টেরিজা ছুটলেন পাটনায় নার্সিং ট্রেনিং নিতে, মতিঝিলের রাস্তায় প্রথম ইস্কুল খুললেন, আর বিসর্জন দিলেন বিদেশি পাসপোর্ট, গ্রহণ করলেন ভারতীয় নাগরিকত্ব।

প্রায় নিরাশ্রয় এই মহিলা এই পর্বে আশ্রয় নিয়েছিলেন কলকাতায় ১৪ নম্বর ক্রিক লেনের তিন তলার এক ঘরে। আশ্রয়দাতা এক বাঙালি ক্রিশ্চান, নাম গোমেজ। এঁকে খুঁজে বার করে চমৎকার একটি স্মৃতিচিত্র ইদানীং পাওয়া গিয়েছে। কালো বাক্সটি ছাড়া কোনও সম্বল নেই টেরিজার। ওইটার বসার জায়গা। সঙ্গে এক বাঙালি সেবিকা—চারুমা। ইনি টেরিজাকে এত ভালবাসতেন যে লোরেটোর কাজ ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে চলে এসেছিলেন। মিস্টার গোমেজ ভাড়া নিতেন না। কিন্তু খাবার পাঠালে এঁরা নিতে চাইতেন

না। তবে কয়েকবার চাল ধার নিয়েছেন, ফেরত দেবেন এই শর্তে। পাঠক একবার বাগবাজারের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার গলিতে নিবেদিতার জীবন কল্পনা করুন, দুই দিদিমণির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাবেন।

দিদিমণিরা খুব নরম মানুষ, কিন্তু একবার যে সিদ্ধান্ত নেন তাতে অনড়। নিবেদিতাও কোনও সঙ্ঘ থেকে অর্থসাহায্য পাননি। খরচ চালিয়েছেন, সংবাদপত্রের ঠিকে লেখিকা হিসাবে। নিজের মুখের অন্নও অপরকে বিলিয়ে দিয়ে অর্ধাহারে বা অনাহারে থেকেছেন। আর শুনুন পঞ্চাশের দশকে এন্টালির দিদিমণির এমন দিন গিয়েছে, যখন সঙ্গে তিন আনা এবং দুটি ডিম সেদ্ধ নিয়ে সেবায় বেরিয়েছেন তিনি। আহারের আগেই শুনলেন, একটি পরিবার অনাহারে। মাসিক চারটাকা ভাড়া বাকি থাকায় বর্ষার দিনে বাড়ির চাল কেটে দেওয়া হয়েছে। দুটি ডিম এবং তিন আনার মুড়ি কিনে ওদের খাইয়ে, ভাবলেন হেঁটে বাড়ি ফিরে যাবেন। বাসের পয়সা তো নেই। পথে সেদিন প্রবল বৃষ্টি। পথের শেষের দিকে এক চার্চে পরিচিত কর্তার সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, কিছু টাকা পাওয়া যায়? তিনি লাল ফিতে দেখালেন। বললেন, নিয়ম-কানুন আছে, ওই পথে যেতেই হবে।

বর্ষামুখর পথে সেদিন বেরিয়ে এলেন আর এক বিদ্রোহিণী মহিলা। কখনও চার্চের টাকা চাইবেন না। ভিক্ষে করেই চালাবেন। সেই যে বৌদ্ধ যুগে দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে কোন মহিলা বুদ্ধকে বলেছিলেন, আমার ভাণ্ডার আছে ভরে তোমা সবাকার ঘরে ঘরে। সবাই জানে মাদার টেরিজা একটি পয়সা অপচয় করেননি, কিন্তু টাকার উপর তাঁর মায়া নেই, ভরসাও নেই! দান নিয়ে সুদে খাটানোতে আপত্তি তাঁর। যদি টাকা জোটে ভাল, না জুটলে বুঝতে হবে ঈশ্বর একাজ এখন চান না। টাকাকে দুই দিদিমণিই চটির তলায় রেখেছেন।

বাগবাজারের সিস্টারও সীমাহীন সেবা করেছেন। প্লেগের সময় দুর্গত কলকাতাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তিনি যা করেছিলেন তা আজও কিংবদন্তীর বিষয়। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে সেবাধর্মে ভূগোলের দিদিমণি যা করলেন গত চার দশক ধরে তা বিশ্বের বৃহত্তম কিংবদন্তী। তাঁর সঙ্ঘ-কন্যাদের তিনখানি নীলপাড় শাদা শাড়ি ও একটি ক্রস ছাড়া কোনও পার্থিব সম্পদ নেই। এঁরা কারও কাছে অন্নগ্রহণ করেন না। খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসের মূল তিনটি মন্ত্র—পভার্টি (দারিদ্র্য), চেস্টিটি (কৌমার্য) এবং

ওবিডিয়েন্স (যিশুকে মানো) এঁরাও অনুসরণ করেন। কিন্তু চুপি চুপি অন্য একটি নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন টেরিজা। তাঁর মিশনের চতুর্থ মন্ত্রটি হল, 'দরিদ্র-সেবা', ধনীর জন্য কাজ করবো না আমরা, আর যে কাজই করি দরিদ্রের কাছ থেকে এক পয়সা নেবো না।

সেবাধর্মের পথে এই সন্ন্যাসিনীদের অবদান বহুযুগের আগেকার বৌদ্ধ শ্রমণদের সেবার কথা মনে করিয়ে দেয়। এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা যার পরিচয় শত শত বৎসর ধরে পৃথিবীর মানুষ পায়নি। মা বলছেন, আমাকে রোগগ্রস্ত শিশু ভিক্ষা দাও, আমাকে অনাথ বালক দাও, মৃত্যুপথযাত্রীকে আনো আমার কাছে, যার কেউ নেই, সবাই যাকে ত্যাগ করেছে, ঘৃণা করেছে তাকে আনো, আমি ভালবাসা দিতে চাই। কেউ বলে, মা দুর্গা, কেউ বলে মর্ত্যের মানবী, কেউ বলে আর্তের শুভ্রবসনা জননী। কী আশ্চর্য এই পৃথিবী ! বিয়ে করেননি, গর্ভে সন্তান ধারণ করেননি, তবু মা। তোমার মা, আমার মা, সবার মা। মা টেরিজা।

যে ত্যাগের মহিমায় মা টেরিজা বিশ্ববাসীর হৃদয় হরণ করলেন এবং অনাগত কালের সমস্ত মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করলেন, তার তাৎপর্যটাও অনুসন্ধানের মতন। কেউ কেউ বলেন, খ্রিস্টবাণীর প্রচারক না-হলে এইভাবে পশ্চিম জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতো না—পৃথিবীর সাড়ে পাঁচশ কোটি মানুষের মধ্যে খ্রিশ্চানের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। আমি মোটেই এই যুক্তিতে বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি, একালের সচ্ছল মানুষের বিচিত্র মানসিকতা এই অসম্ভব শ্রদ্ধাকে সম্ভব করেছে। আমরা ত্যাগ করতে পারি না, কিন্তু ত্যাগদীপ্তজীবন মানুষের বুকে এখনও আবেগের সঞ্চার করে। চোখে জল আসে এবং সবাইকে চিত্তশুদ্ধির দিকে ঠেলে দেয়। তাই মাদারের সেবাসদনগুলি মানবজাতির তীর্থক্ষেত্র।

দুই দিদিমণির জীবন ও বাণীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরে আমার প্রায়ই মনে হয়, স্কুলের দিদিমণিদের মধ্যে যে সুপ্ত সংগঠনী শক্তি আছে তার পূর্ণ বিনিয়োগ হলে এই পৃথিবী অন্য রূপ গ্রহণ করতো। সংগঠনী শক্তিতে মা টেরিজা যে বিশ্বের সেরা তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে ফেলি। একজন ম্যানেজমেন্ট-বিশেষজ্ঞ সকৌতুকে বললেন, গত অর্ধশতাব্দীর সর্ববৃহৎ, সর্বাধিক আলোচিত এবং সর্বাধিক সফল মাল্টিন্যাশনাল (বহুজাতিক) কর্পোরেশনের হেড অফিস এই কলকাতায়। প্রতিষ্ঠাত্রী অবশ্যই জননী টেরিজা, যাঁর আদি মূলধন আঁচলের খুঁটে বাঁধা পাঁচটি

টাকা। এমন কোনও দেশ নেই যেখানে আজ মিশনারিজ অফ চ্যারিটিজ-এর শাখা নেই, এমন কোনও দেশ নেই যেখান থেকে সন্ন্যাসিনী, সেবিকা ও সেবকরা আসছেন না, এর রহস্য কী? কেমন করে এই উদ্যম সফল হলো তা ম্যানেজমেন্ট গবেষক ও জননেতাদের অনুসন্ধানের বিষয়। শুধু কথায় কাজ হয় না, মানুষ দৃষ্টান্ত দেখলেই থমকে দাঁড়ায়। তারপর আহ্বান এলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কুষ্ঠরোগী, এইড্‌স রোগী, মৃত্যুপথযাত্রী ভিখিরিকে তখন আপনজন মনে হয়।

সেবার পরিমাপে টেরিজার তুলনায় নিবেদিতার দান আকারে ক্ষুদ্র। কিন্তু তিনি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন ভারতের মুক্তি সাধনায়। এই মুক্তির প্রথম পর্ব রাজনৈতিক মুক্তি, এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাসে রেনেসাঁসের প্রথম পদক্ষেপ। তিনি ভারতকে বীর্যবান হওয়ার মন্ত্র শিখিয়েছেন.।

সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়েছেন রেনেসাঁসের বীজ বপনে, যার বিস্তারিত বিবরণ পৃথিবীর মানুষ তো দূরের কথা, ভারতবর্ষের মানুষরাও এখন জানেন না। জননী টেরিজা যেন বর্তমান ভারতের অসুস্থ অঙ্গে প্রেমের প্রলেপ মাখিয়ে দিতেই নিজেকে নিবেদন করেছেন, নিবেদিতা তেমনি ভারতবর্ষকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করার চেষ্টা করেছেন। সামান্য এক দশকে পুনরুজ্জীবনের কাজ যে কতখানি পথ এগিয়েছিল তার অসামান্য ছবি এঁকেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রায় তিনদশকের সন্ধান চালিয়ে। কিন্তু আমরা এখনও ব্যাপারটা ভালভাবে জানি না।

সাংগঠনিক শক্তি যে সে তুলনায় বিদ্রোহিণী নিবেদিতার মধ্যে বিকশিত হয়নি তার একটা কারণ বোধ হয় বিদেশি সরকারের দাসত্ব। শক্তিমান বিদেশিরা নিবেদিতাকে বিষদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। বাগবাজার ইস্কুলের দিদিমণি সেদিন কিন্তু একা অসুর দমনে এগিয়ে এসেছিলেন। কার্জনের মতন মহাশক্তিমানের মুখে চুনকালি দিয়েছিলেন।

প্রকাশ্যসভায় কার্জন ভারতীয়দের মিথ্যেবাদী বলেছিলেন, নিবেদিতাই ফাঁস করে দিলেন, কার্জন কীভাবে কোরিয়ার রাজার কাছে মিথ্যে বয়স ভাঁড়িয়েছেন, মিথ্যে পারিবারিক পরিচয় দিয়েছেন। আবার তা নিয়ে পরবর্তীকালে বড়াই করেছেন। একজন ছোটলাট কীভাবে মত্ত অবস্থায় বর্ধমানের রানীর সঙ্গে বেমানান ব্যবহার করেছেন, সায়েবদের কে কত ঘুষ খাচ্ছেন সব ফাঁস করেছেন নিবেদিতা। এমনকি আলিপুর বোমা

মামলায় সরকারি ব্যারিস্টার নর্টন সায়েবের অর্থলোভ এবং অন্যান্য দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি যেসব খবর সংগ্রহ করেছেন সম্প্রতি প্রকাশিত পত্রাবলিতে তার ইঙ্গিত পেয়ে আমরা মুগ্ধ।

মাদার টেরিজা বহুদিনের সাধনায় তাঁর 'ফোকাস' ঠিক করে নিয়েছেন। যাদের কেউ নেই, যাদের সম্বন্ধে স্বজন আশা ছেড়ে দিয়েছে, যারা মরণপারের যাত্রী, তাদের দিকেই সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবন্ধ করে তিনি বৃহৎ সাফল্য লাভ করেছেন। আর বিবেকানন্দ-তিরোধানের পরে নিবেদিতা নিয়েছিলেন সংগ্রামীর ভূমিকা যা সফল হবে না জেনেও কিছু আত্মাহুতির প্রয়োজন ছিল। বাগবাজারের দিদিমণির পিছনে সারাক্ষণ পুলিশের গুপ্তচর ঘুরছে, তাঁর চিঠিপত্র সারাক্ষণ সেন্সর হয়েছে। তিনি কখনও বেনামে, কখনও ছদ্মনামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। স্কুলটুকু ছাড়া প্রকাশ্য কোনও সংগঠন তৈরির সুযোগ আসেনি, তার আগেই তাঁর ৪৫ বছরের পরমায়ু শেষ হয়ে গিয়েছে।

ভাগ্যক্রমে টেরিজা দীর্ঘজীবী হয়েছেন, না-হলে সেন্ট মেরিজ স্কুলের ভূগোলের অর্ডিনারি দিদিমণিকে আজ কে মনে রাখতো?

আরও একটি কথা। শুধু প্রেমে নয়, চিন্তা দিয়ে, মস্তিষ্ক দিয়ে নিবেদিতা ভারতবর্ষের সমস্যা সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত এসে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছেন। হাজার হোক বিবেকানন্দের শিষ্যা তো! তাঁর অজস্র রচনা ও চিঠিতে তার সংখ্যাহীন প্রমাণ রয়েছে, যার কিছুমাত্র এখনও আমরা গ্রহণ করিনি। অধ্যাত্ম ভারতের সন্ধানে এসে বিপ্লব-ভগ্নীর ভূমিকায় নিবেদিতার যুক্তিটি বলে রাখা ভাল। তখনকার জাতীয় আন্দোলন তখন নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়– দেশাত্মবোধের উদ্বোধনী সাধনা। এর নাম জাতীয়তা, যার অন্তর্ভুক্ত শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি। অর্থাৎ রেনেসাঁস।

মা টেরিজা মস্তিষ্কের পথ পরিহার করেছেন, সেদিক দিয়ে তাঁর তুলনা চলে রামকৃষ্ণের সঙ্গে। মস্তিষ্ক দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে ভক্তি দিয়ে, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ-পথে ভারত জয় করতে গিয়ে তিনি বিশ্ববিজয় করে বসলেন। ঈশ্বরের প্রেমে তিনি এমনই নিমগ্ন যে, ভূগোলের বিভিন্ন সীমারেখা তাঁর নজরে পড়লো না। তিনি সমস্ত মানবজাতিকে সহজ এবং সরল বাণীটি পাঠালেন—"ঈশ্বর তোমাকে ভালবাসেন, তুমি অপরকে ভালবাসো ঈশ্বর যেভাবে তোমাকে ভালবাসেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমার ওপর বর্ষিত হোক।"

বাণীটা নতুন নয়। দু'হাজার বছর ধরে শত সহস্র সন্ত পৃথিবীকে এই কথা বলেছেন। কিন্তু অঘটন ঘটলো এই বিংশ শতাব্দীর কলকাতায়, মানুষ দেখলো নীলপাড় শাড়ির দিদিমণি ডাকছেন 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন, ওঠো জাগো, উত্তিষ্ঠিতং, জাগ্রতং।'

সমকালের সন্দেহ ও অগ্নিপরীক্ষা থেকে নিবেদিতা অথবা টেরিজা কেউ মুক্তি পাননি। পুলিশি উৎপাত ছাড়াও যেসব নোংরা কথা নিরন্তর শুনতে হয়েছে নিবেদিতাকে এবং এখনও কিছু কিছু মহলে আড়ালে কী বলা হয় তার মোকাবিলা অন্য কোথাও করা যাবে। কিন্তু শুনুন টেরিজার অগ্নিপরীক্ষার কথা। হিন্দুর পীঠস্থান কালীঘাটের বুকে খ্রিস্টানের প্রতিষ্ঠান যেসব বাধার এবং হামলার মুখোমুখি হয়েছে তা লিখে রাখা ভাল। পুলিশও এসেছিল। বলা হয়েছে তিনি মৃত্যুপথযাত্রীদের খ্রিস্টান করেন। ডাহা মিথ্যে কথা—একজন মৃত্যুপথযাত্রী হিন্দুর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার যে মর্মস্পর্শী বিবরণ ইদানীং পড়েছি, ভাবলে চোখে জল এসে যায়। মাদার অনাথ শিশুদের খ্রিস্টান করেন—বাজে কথা। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই যে মধ্যবিত্ত হিন্দুঘরে দত্তক হিসাবে ফিরে যায়, তা আমরা জানি না। মাদার টেরিজা আর্তের সেবারই নিবাস খুলবেন শুনে স্থানীয় লোকরা খেপে উঠেছে, নেতারা স্লোগান তুলেছে, মিছিল বেরিয়েছে, ইট ছুড়ছে। সমধর্মীয়দের কাছ থেকেও নিগ্রহ জুটেছে সীমাহীন। একবার তিনি মুখ খুলেছিলেন। একজন গবেষক জিজ্ঞেস করেছিলেন : "আপনি একবার বলেছিলেন প্রত্যেক মানুষের সবচেয়ে বেশি ভয় অপমানের, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের।"

মায়ের উত্তর : "ভগবানের দয়া পেতে হলে অপমানকে মেনে নেওয়াই ভাল।"

এরপর প্রশ্ন : "আপনি কখনও অপমান, অবজ্ঞা, অবহেলা পেয়েছেন?"

মায়ের উত্তর : "যথেষ্ট পেয়েছি।"

আসলে বড় বেশি পেয়েছেন। একবার ট্রামে হাওড়ায় যাচ্ছেন। শাড়িপরা শ্বেতাঙ্গিনী দেখে টিটকিরি, "এরা পয়সা নিয়ে খ্রিস্টান করে। বিদেশে পাচার করে।" তারা বোঝেনি মা বাংলা জানেন। মা শুদ্ধ বাংলায় বলেন, "আমি ভারতের, ভারত আমার!"

বাগবাজার ও এন্টালির দুই দিদিমণির কথায় আবার আসা যাক। একজন পেয়েছিলেন মাত্র বারো বছরের সময়—তার মধ্যেও নিরন্তর বাধা।

বিশ্বজোড়া সংগঠন গড়ার চেয়ে ভারতবর্ষকে জাগানোই তিনি বড় কাজ মনে করেছেন। পুলিশের অপমান ছাড়াও, মহাত্মা গান্ধীর অসম্মানও পেয়েছেন। আমাদের মা টেরিজা ভারতবর্ষে পেয়েছেন সাত দশক। লোরেটো থেকে বেরিয়ে পুনর্জন্মের পরও প্রায় পাঁচ দশক। বাগবাজারের দিদিমণি তেমন স্বীকৃতি পাননি একশ বছর পরেও। এন্টালির দিদিমণির মাধ্যমে বিশ্ববাসী চিনেছে ভারতকে, কলকাতাকে। তিনি প্রেমের সহজ সরল পথে অবিচলিত থেকে আর্তের সেবাকেই সঙ্ঘের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করেছেন, তারপর বিপুল শক্তিতে সেই বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন সমস্ত বিশ্বে। তিনি বড় শান্ত। তিনি প্রেমময়ী দেবীর ভূমিকায় মর্ত্যলোকে নেমে এসেছেন। অন্যজন মহিষাসুরমর্দিনী রূপে আবির্ভূতা হতে বাধ্য হয়েছেন সময়ের তাড়নায়, সময়ের আর্ত ক্রন্দনে। কিন্তু তিনি অনেক লিখে গিয়েছেন। অনাগতকালের জন্য তাঁর রচনা ও বাণী অপেক্ষা করছে। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু এই দিদিমণিকে বলেছিলেন, "বজ্র।" আর তিনিও রসিকতা করেছেন, 'বজ্রকে তো কৃষ্ণমেঘের অন্তরালে থাকলে হবে।'

আমাদের অসীম ভাগ্য একই শতাব্দীতে আমরা দুই বিদেশিনীকে পেয়েছি দেবীর ভূমিকায়, পরিত্রাতার ভূমিকায়। পুরুষের পক্ষে যা সম্ভব নয় তা-ই করেছেন এই দু'জন, আপন আপন স্বপ্ন অনুযায়ী। মনে রাখতে হবে, একজন সিস্টার অর্থাৎ ভগিনী। আরেকজন, মাদার অর্থাৎ জননী। দু'টি ভূমিকায় কিছু তফাত থাকে। দু'জনের মধ্যে তুলনা অসম্ভব। একজন সীমাহীন শান্ত আকাশ আর একজন অতলান্ত উদ্দাম সমুদ্র। আকাশ ও সমুদ্রের মিলন হয় দূর দিগন্তে, কিন্তু তাদের মধ্যে তুলনা চলে না।

সাহিত্যসাধক বিমল মিত্র

২রা ডিসেম্বর ১৯৯১। এখন রাত অনেক। মধ্যরাতের কিছু আগেই সংবাদপত্র অফিস থেকে টেলিফোনে খবর এলো বিমল মিত্র আর নেই। সোমবার সূর্যাস্তের সময় বাংলা কথাসাহিত্যেরও সূর্যাস্ত হয়েছে।

বিমল মিত্রের সঙ্গে ইদানীং আমার যোগাযোগ একটু কম ছিল, কিন্তু তিনি তো আমার নাগালের মধ্যে ছিলেন। টলস্টয় সম্বন্ধে গোর্কি একবার তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, যতক্ষণ টলস্টয় জীবিত রয়েছেন ততক্ষণ এই পৃথিবীতে আমি অনাথ নই। বিমল মিত্র যতক্ষণ ছিলেন আমার চিন্তা করার কিছু ছিল না। অন্ধকারে পথ হারালে, মনে সংশয় উপস্থিত হলে তিনি পথ প্রদর্শন করবেন, সমস্ত দ্বিধার অবসান ঘটাবেন— সত্যকে তিনি সমস্ত জীবনের সাধনায় সন্ধান করেছেন, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের প্রকৃত পথ কোনটি সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল নিতান্তই স্পষ্ট।

বয়স হয়েছিল প্রায় আশি, তবু তাঁর তিরোধান আমার কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন। রবিবার পর্যন্ত লেখার মধ্যে তিনি ডুবেছিলেন, বৃহৎ কোনো ব্যাধির ইঙ্গিত ছিল না। তিনি যেমন চাইতেন শেষপর্যন্ত তেমনই হলো। আচমকা কাউকে কোনো ইঙ্গিত না-দিয়েই ভারতবর্ষের সারস্বত সমারোহ থেকে বিদায় নিলেন আমাদের কালের মহোত্তম ঔপন্যাসিক। লাজুক প্রকতির মানুষ ছিলেন বিমল মিত্র, মৃত্যুকালেও সেই স্বভাবের পরিচয় দিয়ে গেলেন।

টেলিফোনে সংবাদপত্র অফিসের সঙ্গে দু'-একটা কথা বলে আমি নিজের বিছানায় ফিরে এলাম। অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুম এলো না। যাকে বিমল মিত্র একদিন বলেছিলেন, ঘুম কমান, না হলে সময়ের সাশ্রয় হবে কী করে? সেই ঘুমকাতুরে মানুষটা আজ ঘুমোতে পারছে না, আর যিনি

সারাজীবন ধরে একটু ঘুমের জন্যে ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়েছেন, তিনি কেমন সমস্ত দুঃখ, সমস্ত যন্ত্রণার উর্ধ্বে উঠে গিয়ে তাঁর চেতলা সেন্ট্রাল রোডের বাড়িতে ঘুমিয়ে রয়েছেন।

বিমল মিত্র ও আমি একসময় টোটো করে কলকাতা চষে বেড়াতাম, মাইকেল মধুসূদনের কবরখানাতেও কয়েকবার গিয়েছি, সেখানেই বিমল মিত্র বলেছিলেন, "নিজের স্মৃতিফলকের জন্যে মহামূল্যবান কথা লিখে গিয়েছেন। 'জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম, মহীর ক্রোড়ে মহানিদ্রাবৃত' যাদের চোখে ঘুম আসে না তারা ছাড়া এর অর্থ কেউ বুঝতে পারবে না।"

বিনিদ্র বলে একটা বইও বিমল মিত্র ধারাবাহিক লিখেছিলেন, কিন্তু কোনো কারণে সে বই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। সেখানেও ছিল ওঁর এক প্রিয় বিনিদ্র মানুষের কথা, নাম গুরু দত্ত।

রাত আরও বাড়ছে। আমি এই ঘরে একলা বসে রয়েছি। শুয়ে থাকার সামর্থ্যও নেই। আমি ভাবছি তাঁর কথা, গত সাঁইত্রিশ বছর ধরে আমার জীবনের সবকিছুর সঙ্গেই যিনি জড়িয়েছিলেন।

এই মুহূর্তেই বিমলবাবু, আপনাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পথেঘাটে এখন কোনো যানবাহন নেই। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে সেই ভোরবেলা পর্যন্ত। আপাতত মন চলো অতীতে। সেই সব সোনার দিনে যা চিরদিনের মতন হারিয়ে গিয়েছে এবং যা আর কখনও ফিরে আসবে না।

বিমল মিত্রের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯৫৪ সালে বর্মণ স্ট্রিটে দেশ পত্রিকার অফিসে। তিনি তখন খ্যাতির মধ্যগগনে, তাঁর সদ্যপ্রকাশিত 'সাহেব বিবি গোলাম' বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এমন আলোড়ন কোনো উপন্যাসকে কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর আর হয়নি। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, স্টিমারে, ট্যাক্সিতে রিকশায়, ওয়েটিং রুমে, বাসস্ট্যান্ডে আমি মানুষকে সাহেব বিবি গোলাম পড়তে দেখেছি। এই সময় একটা ব্যঙ্গচিত্র দেখেছিলুম, বউভাতে লজ্জাবনতা নববধূ বসে রয়েছে, সামনে নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'আর সাহেব বিবি গোলাম লওয়া হইবে না'। এই উপন্যাস যখন দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তখন আমার আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ যে কাগজ কেনবার সামর্থ্য ছিল না। হাওড়া ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরিতে অন্য একজন পাঠকের দেশ পত্রিকা তাঁর ঘাড়ের ওপর দিয়ে কিছুটা আড়চোখে পড়েছি প্রতি সপ্তাহে। তখনও যে এমন

বিরাট সাফল্য আসবে তা কল্পনা করা কারুর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেউ কেউ বলেছেন, এতো বড় বই কেউ পড়বে না।

কিন্তু প্রকাশিত হবার পরে সে কী উন্মাদনা! ঝাঁকায় ঝাঁকায় বই আসে আর অদৃশ্য হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালে আমার বয়স তখনও একুশ পুরো হয়নি। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে কেরানিগিরি করি, মনে নানা কষ্ট। সেই কষ্ট ভোলবার জন্যে আমার পুরনো মনিব সদ্যপ্রয়াত ব্যারিস্টার নোয়েল বারওয়েল সায়েবের স্মৃতিচিত্র লিখতে আরম্ভ করেছি এবং গৌরকিশোর ঘোষ ও সাগরময় ঘোষের দাক্ষিণ্যে তা হাইকোর্টের একটা ছবিসহ দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। লেখাটা তখনও সম্পূর্ণ হয়নি, অফিস থেকে বেরিয়ে বিকেলে বর্মণ স্ট্রিটে মাঝে মাঝে কিস্তি জমা দিতে যাই। তখন এই অফিসে দিক্‌পাল লেখকদের ভিড়, আমি সামান্য একজন ব্যারিস্টারের বাবু, মনের দুঃখে প্রাণের কথা লিপিবদ্ধ করে চলেছি, সাহিত্য নক্ষত্রদের সম্বন্ধে কৌতূহল আছে, কিন্তু তাঁদের কাছে যাবার সাহস নেই।

সেই সময় একদিন বিকেলে গিয়ে দেখি সাগরময়বাবুর ঘরে নক্ষত্র-সমারোহ। একবার উঁকি মেরে লজ্জাবশত বাইরে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি, কখন ঘর খালি হবে, সাগরময়বাবুকে একলা পাবো। আধঘণ্টা পরে বেয়ারা বললো, "ওইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ঘর এখন খালি হবে না, ওঁরা কাজ করছেন না, গল্প করছেন। আপনিও ভিতরে ঢুকে যান।"

সেই প্রথম বিমল মিত্রকে দেখলাম। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, একটু মোটার দিকে শরীর। সাগরবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, "হাইকোর্টের ছবিসহ একটা ধারাবাহিক দেশে বেরুচ্ছে, দেখে থাকবেন।"

বিমল মিত্র আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু তাঁর চোখেমুখে কোনো ঔৎসুক্য লক্ষ্য করলাম না। খ্যাতনামা লেখকের সঙ্গে তো এমন কত সাহিত্যযশপ্রার্থীর দেখা হয়, তাদের সম্বন্ধে আগ্রহী হবার সময় কোথায়? আমারও কোনো প্রত্যাশা ছিল না, প্রখ্যাতদের কাছ থেকে স্নেহ-ভালবাসা পাবার কী অধিকার আমার আছে? আমি ঝটপট কয়েকটা কিস্তি জমা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ঘরের বাইরে এসে আমি আবার চলমান হয়েছি, এমন সময় আবার অবাক হবার পালা। স্বয়ং বিমল মিত্র নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছেন আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। ভিড়ের মধ্যে যিনি দূরত্ব বজায় রাখলেন তিনি

আড়ালে খুব কাছে চলে এলেন। বললেন, "আপনার লেখা পড়েছি, আমার প্রকাশকের সঙ্গে আলোচনা করেছি। নিউ এজ-এর জানকীবাবু আপনাকে খুঁজছেন। প্রথম সৃষ্টিকে আজেবাজে জায়গায় পাত্রস্থ করবেন না।"

বিমলবাবু যা বললেন তাতে আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। দৃষ্টিপাত, দেশে-বিদেশে ও সাহেব বিবি গোলামের প্রকাশক আমার বই ছাপাবেন, এ তো স্বপ্ন!

বিমলবাবু বললেন, "আপনি এক মিনিট দাঁড়ান। একটা চিঠি লিখে দিই প্রকাশককে। আপনি চলে যান ওখানে, শুভস্য শীঘ্রম্।"

সেই আমার প্রথম পরিচয়পত্র। কাগজটা হাতে দিয়ে বিমল মিত্র বললেন, "ওঁকে বলবেন, আমি একটু পরেই যাচ্ছি। আপনি ওখানে অপেক্ষা করুন। গল্প করা যাবে।"

সাহিত্যের রাজাধিরাজের পরিচয়পত্র পকেটে নিয়ে বীরদর্পে নিউ এজের কলেজ স্ট্রিট পাড়ার অফিসে প্রবেশ করা গেলো। সে এক অকল্পনীয় অভ্যর্থনা—চা এলো, টোস্ট এলো বেঙ্গল চেম্বারের কেরানির জন্য। একটু পরে বিমল মিত্র হাজির হলেন, আমার মঙ্গলের জন্যে নিজের আড্ডায় বিরতি দিয়েছেন। তরুণ লেখকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে কীভাবে তার ভাল করা যায় এ সম্বন্ধে তাঁর গভীর চিন্তা। আমি অভিভূত।

সেই থেকেই আলাপ। বিমল মিত্র তখনও রেল-অফিসের কর্মী। থাকেন চেতলায় সবজিবাগানে পৈতৃক বাড়িতে। দেশ পত্রিকায় কিস্তিতে আমার লেখা মন দিয়ে পড়ে দাগ দিয়ে নিয়ে আসতেন, বলতেন, এই জায়গাগুলো আমার পছন্দ হয়নি। কখনও বলতেন, "আপনার রচনার সরলতা আমাকে টানে, কিন্তু আপনি অতি দ্রুত এক ঘটনা থেকে আর এক ঘটনায় ঢুকে যাচ্ছেন। একটু প্রস্তুতির সময় দিচ্ছেন না পাঠককে।"

তারপর 'কত অজানারে' প্রকাশের সময় এসে গেলো। একটা মুখবন্ধ রচনার প্রয়োজন। আমি একটা খসড়া খাড়া করেছি, কিন্তু কোথায় যেন ছন্দপতন হচ্ছে। শেষপর্যন্ত বিমল মিত্র তাঁর সোনার পার্কার কলম বের করলেন, কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে আমার লেখাটা ঢেলে সাজালেন। প্রথম বইয়ের প্রথম লাইনটা ওঁরই আশীর্বাদ নিয়ে নবজন্ম লাভ করলো— "সংসার পরিক্রমার পথে কত বিচিত্র সঞ্চয়ই তো দিনে দিনে পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে, যা একদিন অচেনা থাকে তাইই একদিন চিনে ফেলি জেনে ফেলি।"

তারপর সাঁইত্রিশ বছর ধরে এই লাইনটা আমি অনেকবার পড়েছি,

প্রতিবারই মনে হয়েছে, সাহিত্যিক বিমল মিত্র আমার মতন এক অসহায় অনভিজ্ঞ অভিভাবকহীন অনুপ্রবেশকারীর হাত ধরে আছেন—ওই 'সংসারপরিক্রমা' শব্দটি আমাকে তাঁর প্রথম পরিচয়ের প্রীতি উপহার। বাজারে তখনই কথাবার্তা চলতো বিমল মিত্র উদার নন, অন্য লেখকদের সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু তখন বিমল মিত্র কাসুন্দের এক অনভিজ্ঞ যুবকের প্রুফ দেখছেন, তার জন্য বিজ্ঞাপনের কপি লিখে দিচ্ছেন তাঁর সোনার কলমে।

কত অজানারে প্রকাশিত হলো, কিন্তু সংবাদপত্রে রিভিউ পর্যন্ত বেরুলো না। প্রকাশক উদ্বিগ্ন, শুরুতেই আপনার এইসব বাধা কেন? একুশ বছর বয়সের লেখক, একটু তারিফ প্রয়োজন বৈকি। বিমল মিত্র উল্টোকথা বললেন, "আপনার খুব ভাগ্য ভাল। শুরুতেই জাতে উঠে গেলেন। প্রশংসার থেকে বড় শত্রু নেই লেখকের। মনে রাখবেন যেসব খাবার জিভ পছন্দ করে যেমন তেলেভাজা ঘিয়ে-ভাজা রসে-ভাজা সেসব শরীরের পক্ষে ভাল নয়। আর শরীরের পক্ষে যা মঙ্গলজনক, যেমন নিমপাতা, হিঞ্চেপাতা, উচ্ছে, এসব জিভ পছন্দ করে না। যদি কখনও আপনার এমন হয় যে শুধু প্রশংসাই পাচেছন তখন মাইনে-করে নিন্দের লোক রাখবেন যাতে প্রতিদিন মনটা স্নান করে পরিচ্ছন্ন হতে পারে।"

এ সব আশ্চর্য কথা, কোনো বইতে লেখা থাকে না, কিন্তু অনভিজ্ঞ লেখকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় পথনির্দেশিকা।

এই পর্যায়ে বিমল মিত্র আমার গুরুর আসন গ্রহণ করলেন। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাদের দেখা হতো, জগৎ সংসারে এমন বিষয় নেই যে ব্যাপারে আমাদের না আলোচনা হতো।

ওঁর পারিবারিক বাড়িতে নানা অসুবিধে হচ্ছিল। তা ছাড়া মায়ের ওপর আমৃত্যু অভিমান ছিল। বিমল মিত্র চেতলা সেন্ট্রাল রোডে নতুন বাড়ি কিনলেন। পরে যখন গাড়ি কিনলেন, তখনও নানা রস-রসিকতা হয়েছে। তিনি নিজেই বললেন, "পড়শিদের চোখে আমি জাতে উঠলাম। যে গাড়ি কিনতে পারে সে নিশ্চয় অর্ডিনারি লেখক নয়।" গাড়ির চালনা সম্বন্ধেও কথা হতো। "আমার একটা চোখ নেই। কোনোদিন ড্রাইভার হতে পারবো না, তাই আপনার বউদি ড্রাইভিং শিখছে। ও আমাকে সব ব্যাপারেই ড্রাইভ করছে।"

এ ছাড়াও ছিল বৃহত্তর সমস্যা। চাকরি। চাকরিকে তিনি কোনোদিন ভালর চোখে দেখেননি। কর্মক্ষেত্রে সুখ তাঁর জন্যে কখনও লেখা ছিল

না। নানা জায়গায় বদলি হয়ে হয়ে যখন গার্ডেনরিচে বদলি হয়ে সাহেব বিবি গোলাম লেখা শুরু করলেন, তখনও অস্বস্তি। প্রায়ই রাত ডিউটি পড়তো এবং রাগের মাথায় রেল কোম্পানির কাগজের উল্টোদিকে নিজের লেখা লিখতেন সারা রাত ধরে। বিমলবাবু বলতেন, "বিশাল অফিস গার্ডেনরিচে, নাইট ডিউটি দেবার অভিজ্ঞতা অন্য রকমের। অত বড় বাড়িতে একটা ঘরে আপনি একা, অনেক সময় আন্ডারওয়্যার পরে নাইট ডিউটি দেওয়া।" আর সেই সঙ্গে দিনে জাতীয় গ্রন্থাগারে পড়াশোনা করা।

কর্মজীবনের এক অধ্যায়ে তিনি যে রেলের অ্যান্টি-কোরাপশন বিভাগে কাজ করেছিলেন এবং এই ভূমিকায় বেশ কিছু লোককে জেলে পাঠিয়েছিলেন তা আজ আর পাঠকদের অজ্ঞাত নয়। এই কাজের প্রভাবেই হয়তো প্রায় সব ব্যাপারেই ছিল তাঁর সন্দেহ, সততার অভাব তাঁকে ভীষণ বিচলিত করে তুলতো। একমাত্র মুক্তি ছিল সঙ্গীতে। সঙ্গীতের প্রাণদায়িনী শক্তি সম্বন্ধে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই সাহিত্যের গুরু সন্ধানেও তিনি সঙ্গীতের আনন্দলোকে ডুব দিয়েছিলেন, তাঁর সাহিত্যজীবনে ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের গানের প্রভাব সম্বন্ধে তিনি নিজেই সবিস্তারে লিখেছেন। কতকগুলি লাইন অবিস্মরণীয় : "গান শুনি আর সেই গানের সুরের মধ্যে আত্মসমর্পণ করি। সুর যে সত্যিই ব্রহ্ম তা উপলব্ধি করি। ক্লাসিক উপন্যাস আর ঠুংরির গঠনকৌশলের মধ্যে যেন আপাত কোন তফাত নেই। এ তো আমাদের সেই উপন্যাসেরই টেকনিক। দু-পা এগিয়ে এক-পা পেছোন। সুরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে, কখনও ভেঙে পড়া, আবার তখনই উঠে দাঁড়ানো। উঠতে-উঠতে আবার লুপ লাইনে চলে গিয়ে তান বিস্তার করে তাল-লয় ঠিক রেখে সহজ সাবলীল গতিতে সমে এসে পড়া।"

ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ ও ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সায়েবের গানের কথা অন্তত একশবার ওঁর মুখে শুনেছি। উনি কিছুতেই ভুলতে পারতেন না ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে করিম খানের কণ্ঠে 'যমুনা কে তীর গোকুল টড়ি বিনদাবন টড়ি কোন্ ক্যায়সে লাগে তীর।' এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি নিজে যখন লিখেছেন তখন অন্যের মুখে ঝাল খাওয়ার কোনো মানে হয় না—"গান গাইতে লাগলেন ওস্তাদজী আর আমি নিজেকে আবিষ্কার করতে লাগলাম। মনে হলো এ গান নয়, এ যেন কোনও এপিক উপন্যাস পড়ছি। পড়তে পড়তে মুহূর্তে, দিন মাস বছর কেটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে চলুক, আরো চলুক। এই ভাল লাগা যেন থেমে না

যায়। .. গান শুনে বুঝতে পারলাম গ্রহণ আর বর্জনের সমন্বয়ই সব শিল্পের মূল কথা। তা সে গানই হোক আর সাহিত্যই হোক।"

সাহিত্যে আর গুরু পেলেন না! গানের খাঁ সায়েবদের কাছে নাড়া বাঁধতে হলো! এ নিয়ে নিন্দুক মহলে তখনও অবিশ্বাস ছিল। ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে হাজরা রোডের মোড় পর্যন্ত হাঁটতে-হাঁটতে বিমল মিত্র প্রবল উৎসাহে আমাকে সাহেব বিবি গোলামের সঙ্গীতের অদৃশ্য ভূমিকাটি বোঝাতেন। তিনি বলতেন, "গানের ব্যাপারে ভরসা না পেলে সাহেব বিবি গোলাম লেখার স্পর্ধাই আমার হতো না। ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ সেবারে তিন ঘণ্টা গাইলেও আমার ক্লান্তি আসতো না। আপনি সাহেব বিবি গোলামের গল্পটা দেখুন—মূল গল্পটা ইচ্ছে করলেই পঞ্চাশ পাতায় লিখে ফেলা যেতো। কিন্তু সাতশ পাতার বিস্তার না হলে পাঠকের মন ভরতো না, এটা ক্লাসিক হয়ে উঠতো না।" সাহেব বিবি গোলাম উপন্যাস আমি সাতবার পড়েছি, প্রতিবারই শেষ হবার পরে মনটা হাহাকারে ভরে উঠেছে, সত্যিই মনে হয়েছে কেন শেষ হলো?

দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক লিখে যখন কোনো বড় উপন্যাস শেষ হয়ে যায় তখন লেখকের মনের অবস্থা কেমন হয় সে-কথাও বিমলবাবুর মুখে শুনেছিলাম। পরে তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন সাহেব বিবি গোলাম সমাপ্তির কথা। "সুরসপ্তকের শেষ পর্দায় এসে পৌঁছতেই তবলচি তেহাই দিয়ে তখন গানের সমাপ্তি ঘোষণা করছে, আর গায়কও সমে এসে পৌঁছে তার ক্ষীণ স্বর ক্ষীণতর করে গানের রেশটুকু টেনে চারদিকের আবহাওয়ায় সুরের তরঙ্গ মিলিয়ে দিচ্ছে আমি তখন নিঃস্ব রিক্ত সর্বস্বরহিত। কিছুক্ষণের জন্যে যেন আমিও বোবা হয়ে গিয়েছি...আমার মনে হচ্ছিল এতদিন যার সঙ্গে আমি ঘর-সংসার করেছি, যে ছিল একান্তই আমার নিজস্ব সম্পদ সেই পটেশ্বরীকে যেন আমি হাটের সকলের নির্লজ্জ লোভাতুর দৃষ্টির সামনে নিয়ে গিয়ে নিরাবরণ করে ছেড়ে দিলাম।"

আমার সঙ্গে যখন বিমল মিত্রের সখ্য তখন তিনি সাফল্যের তুঙ্গে আরোহণ করছেন। কিন্তু তবু তাঁর মনে শান্তি নেই। প্রধানত তিনটি কারণে। তাঁর সাফল্যের ঈর্ষায় কিছু সাহিত্যিক বন্ধু তাঁকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। একদল নির্বোধ সমালোচক তাঁকে চোর অপবাদ দেবার চেষ্টা করছে। এবং ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হাস্যকর জেনেও কেউ তাঁর পক্ষে কথা বলছেন না; আত্মপক্ষ সমর্থনের দায়িত্বটা তাঁর ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া

হচ্ছে। তৃতীয় কারণটি কর্মক্ষেত্রের। সারা ভারতজোড়া সম্মান অর্জন করলেও, কর্মক্ষেত্রের নীচতা তাঁকে আঘাত করছে। এঁরাই আগে তাঁর এক গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করে কর্তাদের কাছে পাঠিয়েছে যাতে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এই সময় লাটসায়েব হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখার ভক্ত হয়ে ওঠেন। রাতের ডিউটি সারছেন বিমল মিত্র—সকালবেলায় এ-ও-এস্ বাড়ি থেকে ফোন করলেন, "কে কথা বলছে?" "ডিপুটি চিফ্ কনট্রোলার, স্যর।" সায়েব কিছুতেই ডেপুটির সঙ্গে কথা বলবেন না, বললেন, "তোমার চিফ-কে বলো আমার সঙ্গে কথা বলতে।" মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো। ডিউটি সেরে গার্ডেনরিচ বিল্ডিংস-এর বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরলেন বিমল মিত্র, এবার লক্ষ্য রাজভবন। দিনটা ১লা বৈশাখ, খোদ লাটসায়েব নেমন্তন্ন করেছিলেন খ্যাতনামা লেখককে। বিদায়কালে লাটসায়েব বললেন, "আপনি ব্যস্ত লোক, বলতে সাহস হয় না, কিন্তু মাঝে মাঝে চলে এলে ভীষণ আনন্দ হয়।" রাজভবনের বাইরে এসে বিমলবাবু ভাবতে লাগলেন কোন্ গ্রহের ফেরে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে একজন এ-ও-এস ও একজন গভর্নর তাঁর সঙ্গে এইভাবে ব্যবহার করেন?

এর পরের ঘটনা অনেকের জানা। তিনি স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে চাকরিতে ইতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কীভাবে তা করেছিলেন তা অনেকে হয়তো জানেন না। রেজিগনেশন পাঠাননি, স্রেফ অফিস যাওয়া বন্ধ করলেন। মাসের পর মাস বছরের পর বছর এইভাবে চললো। কিন্তু সরকারি চাকরি হওয়া যত শক্ত খোওয়ানোও তত শক্ত। অফিস থেকে চিঠি এসেছে, তিনি উত্তর দেননি। সময় নেই! শেষ পর্যন্ত এক তরুণ সহকর্মী এসে ওঁকে ধরলেন, আপনি রেজিগনেশন দিলে আমার একটু সুবিধে হয়, আমি পোস্টটায় পাকা হই। তখন তিনি কাগজে সই করেছিলেন, এর আগে দীর্ঘদিন চাকরির প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি কিছুই তিনি সংগ্রহ করেননি, পণ করেছিলেন, কর্মচারী হিসেবে গার্ডেনরিচের ওই বড় গেট আর পেরুবেন না।

জীবনের এক পর্যায়ে বিমল মিত্র আমার মস্ত উপকার করেছিলেন। কয়েকটা ঘটনার জন্যে মনের দুঃখে কয়েক বছর আমি লেখা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, একখানা বইয়ের লেখক হিসেবেই জীবন অতিবাহিত করবো। সেই সময় বিমল মিত্র একদিন আমার আপিসে দেখা করতে এলেন। বললেন, "আমার মতন ভুল করবেন না। কলমে একবার

মরচে পড়লে তা পরিষ্কার করা খুব কঠিন কাজ। আমি কম বয়সে লেখক হয়েছিলাম, তারপর দীর্ঘদিন বনবাসে কাটিয়েছি। লেখার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই ছিল না। বহু কষ্টে, ওই সাগরময় ঘোষের সাহায্যে ফিরে এসেছি এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। আপনি ওই পথে যাবেন না। জেনে রাখবেন, যে যত নিন্দে করছে সে আপনার সাহিত্যকৃতীকে তত সম্মান করছে। শুনুন, আমি বসুধারা পত্রিকায় যোগ দিয়েছি—সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, আর আমি ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সহসম্পাদক। আপনার লেখা চাই, অমুক তারিখের মধ্যে।"

মরচে পড়া কলমেই আবার একটা গল্প লিখে ফেললাম। লেখা পড়েই বিমলবাবু চিঠিতে উৎসাহ দিলেন—লেখা পড়েছি। এখনও পর্যন্ত ফার্স্ট! অন্য কিছু ঘটলে জানাবো।

এই সময় এই উৎসাহটুকু আমার ভীষণ প্রয়োজন ছিল। বসুধারা আপিসে তখন নিয়মিত আড্ডা বসতো। আড্ডার শেষে আমরা দুজনে বিবেকানন্দ রোড থেকে হাঁটতে-হাঁটতে কলেজ স্ট্রিটে আসতাম। ওখানেও গল্পগুজব চলতো। এই সময় তিনি প্রায়ই বলতেন, "আড্ডা হচ্ছে পড়ার শত্রু, আর পড়া হচ্ছে লেখার শত্রু। পড়বার নেশা চাপলে লেখবার শক্তিটা কমে যায়, কলমের ঝিমুনি আসে। যতটা পারেন লিখে যাবেন, তা বলে ঐ অচিন্ত্য সেনগুপ্তর মতন দিনে এত পাতা লিখতে হবেই ওই ফাঁদে পা দেবেন না। লেখাটা কোনো ব্যাপারই নয়, আসলে কী লিখবেন তা ঠিক করাটাই বড় কাজ। আরও এক পা এগোলে বুঝবেন, ইট ইজ নট দ্য ম্যাটার দ্যাট ম্যাটারস্, ইট ইজ দ্য ম্যানার অফ পুটিং ইট।"

অসম্ভব স্মৃতিশক্তি ছিল বিমল মিত্রর। ইংরিজি বইয়ের পোকা ছিলেন। কোনো লেখকের স্মৃতিকাহিনী বা জীবনী বোধহয় বাদ যায়নি। এইসব বই থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করতেন, মনে রাখতেন এবং উদ্ধৃতি দিতেন। কত মূল্যবান কথাই যে শুনেছি ওঁর কাছ থেকে! দুঃখ হয় তা নিয়মিত লিখে রাখিনি, রাখলে পরবর্তী প্রজন্মের অনেক কাজে দিতো।

বিমলবাবু অন্য রসিকতা করতেন। "আমি যে ভুলগুলো করেছি, আপনি জেনে-শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। আমি রেল ছাড়লাম, আপনি রেলে ঢুকলেন, আমি কলমকে লং লিভ দিয়ে পরে দুঃখ করলাম, আপনি লেখায় মন দিচ্ছেন না। ওয়ান বুক অথরের কত দুঃখ পরে বুঝবেন।"

এইভাবে পরম স্নেহে নিশ্চিত অন্ধকার থেকে আমাকে আলোকের পথে ফিরিয়ে আনলেন বিমল মিত্র। অভিমানের বশে নিজের যা ক্ষতি করতে চলেছিলাম তার থেকে রক্ষা পেয়ে গেলাম তাঁর দয়ায়।

আমার সাহিত্যজীবনে পরম পাওয়া দু'জন সৃষ্টিধরের সান্নিধ্য। একজন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, আর একজন, বিমল মিত্র। অল্পবয়সে পিতৃহীন হয়েছি, শরদিন্দু পরম স্নেহমমতায় আমার সেই অভাব মুছে দিয়েছিলেন। সন্তানের হাতে পরাজিত হয়েও তিনি সুখ পেতেন। যখন শুনতেন, আমার কোনো বই ওঁর থেকে দ্রুত সংস্করণ হয়েছে তখন ভীষণ খুশি হতেন। কিন্তু তাঁর স্নেহের মধ্যে জ্বালা ছিল না, আমার মধ্যে কোনো দোষই খুঁজে পেতেন না, পেলেও তা নিয়ে কোনো কথা তুলতেন না। আর বিমল মিত্র ছিলেন কঠিন গুরু। তিনি সান্নিধ্য দিতেন, সময় দিতেন, কিন্তু সারাক্ষণ সমালোচনায় ছিন্নভিন্ন করতেন। বলতেন, এইটা হচ্ছে না, ওইটা হচ্ছে না। সুরসঙ্গতি ঘটছে না। অমুক ক্যারাকটারকে ওখানে আচমকা আনলেন কেন ? আসলে বেসুরো লেখা তিনি পছন্দ করতে পারতেন না, অন্যের খারাপ লেখা পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। বলতেন, অমুক গল্পকানা। গল্পটা কীভাবে সাজাতে হয় তা কিছুতেই শিখবে না।

এক-এক দিন হাঁটতে হাঁটতে আমরা ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে এসপ্ল্যানেডের নিউ ক্যাথে বার পর্যন্ত এসেছি। ওখানে তখন আড্ডা জমতো। সেই আড্ডায় একসময় উপস্থিত থাকতেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ এবং অন্যান্য দিকপালরা। অতিথিসেবার দায়িত্ব থাকতো নিউ এজের জানকিনাথ সিংহরায়ের ওপর। বিমলবাবু, আমাকে নিয়ে চিন্তা করতেন। বলতেন, "এখানে আসবেন, আসর জমাবেন, কিন্তু ড্রিংক করবেন না। একটা নেশাই লেখকের পক্ষে একশ—সেটা হলো লেখার নেশা।"

আরও বলতেন, "যখন লেখায় বসবেন তখন বিশ্বসংসারের সব কিছু ভুলে যাবেন। ডেলিলাইফের সুইচটা অফ্ করে দিয়ে নিজের প্লাগটা পুরে দেবেন আপনার সৃষ্টির জগতে। তখন আপনি মার্চেন্ট আপিসের টাইপিস্ট নন, আপনি তখন দুনিয়ার ভাগ্যবিধাতা, আপনি যা চাইবেন তাই হবে।"

এরপর কিছুদিন মুষড়ে পড়েছিলেন বিমল মিত্র। সেই ১৯৫২-৫৩ সালে সাহেব বিবি গোলাম লিখেছিলেন, তারপর বেশ কয়েকবছর কেবল ছোটখাট লেখা। কব্জির জোর আর নেই এমন একটা গুজব ছড়াচ্ছে। সেই পর্যায়ে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে ওঁর একটু সংঘাত বাধে। ওঁর বাড়িতে জন্মদিনে আমন্ত্রিত হয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য শুনেছিলেন। সেই রাত্রে ফিরে এসে তিনি আর ঘুমোলেন না, আগামী উপন্যাসের পটভূমি পাল্টালেন এবং সমকালীন বিষয়েও যে ক্লাসিক উপন্যাস লেখা যায় তা প্রমাণ করবার জন্যে কড়ি দিয়ে কিনলাম ধারাবাহিক শুরু করলেন ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে।

তখন আমিও নিয়মিত ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যেতাম। উনি যেতেন প্রায় ছাত্রের নিষ্ঠায়—সমস্ত দিন ওখানে অতিবাহিত করতেন। আমাদের স্থানীয় অভিভাবক ছিলেন নকুল চট্টোপাধ্যায়। এই মানুষটি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমাদের সব অনুসন্ধানে শুধু সাহায্য করতেন না নয়, প্রায় প্রতিদিনই চা খাওয়াতেন। বিমলবাবুর টেবিলে তখন যে রেফারেন্স বইটি পড়ে থাকতো তার নাম ফ্যাক্টস অন ফাইল। আর সারাক্ষণ ওঁকে অপার আনন্দে সাহায্য করছেন নকুলবাবু।

এইসময় আমরা দু'জনে বাড়তি চায়ের জন্যে ক্যানটিনে যেতাম। গল্প আটকে গেলে লাইব্রেরি বাড়িটা চক্কর দিতাম। আমার কাজ শুরু হয়েছে চৌরঙ্গী উপন্যাসের আর উনি মাঠে নেমে পড়েছেন কড়ি দিয়ে কিনলাম নিয়ে।

এইসময় অজস্র মজার কথা হতো। সাহেব বিবি গোলামের ভূতনাথ যে লেখক নিজেই তার প্রমাণ ভূতনাথের দেশের বাড়ির যে ঠিকানা কয়েকবার বলা হয়েছে উপন্যাসে, সেটা বিমলবাবুর দেশের বাড়ির ঠিকানা। আর দীপঙ্করও যে লেখক তার ইঙ্গিত, দীপঙ্কর ও বিমল মিত্রের জন্ম সময় এক—১৯১২ সালে।

আমিও একটু পরে দেশ-এর ক্রিজে নামলাম ব্যাট করবো বলে, দুটো উপন্যাস একই সঙ্গে বেরুচ্ছে, যদিও কড়ি দিয়ে কিনলাম আকারে অনেক বৃহৎ। তখনও বিমল মিত্র আমার লেখা পড়ছেন এবং চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন, চরিত্রটা এইভাবে ঘুরোন, পাঠক যা প্রত্যাশা করছে ঠিক তার উল্টো করুন।

একদিন খুব বিরক্ত হলেন। "আপনি তো মশাই বেশ লোক। মুখ বুজে সব উপদেশ শুনে যান, কিন্তু তারপর নিজে যা করবার ঠিক তাই করেন। অথচ বলেন, আমি আপনার শিক্ষক। স্যাটাদার চরিত্রে কোনো সারপ্রাইজ থাকছে না। ন্যাটাহারির মধ্যে পাণ্ড দিচ্ছেন না আপনি, অথচ পই পই

করে বলছি, সাসপেন্স নষ্ট হলে একেবারে পথে বসবেন।"

আমি সেদিন বাড়িতে এসে নিজের নোটবইতে লিখলাম, "বিমল মিত্র অবশ্যই আমার গুরু। কিন্তু আমি তাঁর নকল করবো না, অনুকরণের কোনো সম্মান নেই শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে। আমি নিজের পথ ধরেই চলবো।"

পরামর্শমতন দু-একটা চরিত্রকে নড়াচ্ছি না দেখে বিরক্ত ও ব্যথিত হয়ে উনি ক'দিন আমার সঙ্গে কথা বললেন না। তারপর আমি এই লেখা নিয়ে রেল আপিসে সহকর্মীদের কাছে ভীষণ ধাক্কা খেলাম। লেখাটা কিসসু হচ্ছে না, আর আমি কাজে অবহেলা করছি। মন খুব খারাপ। অপমানে, অবহেলায়, অবজ্ঞায় আমি ভেঙে পড়েছি। ভাবলাম, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোথাও চলে যাই, সম্পাদক একদিন জানবেন, লেখক বেপাত্তা। তাকে তো হুলিয়া দিয়ে অ্যারেস্ট করাতে পারবেন না।

মনের এই অবস্থা নিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নিজের সিটে বসে আছি। বিমল মিত্র আমাকে দূর থেকে দেখলেন। সব অভিমান ভুলে বিমর্ষ শিষ্যকে তিনি ডেকে নিলেন। আমরা পায়ে পায়ে হাঁটতে শুরু করলাম। আমার মনের ভাব চেপে রাখলাম না। বিমল মিত্র সব শুনলেন। তারপর বললেন, "আমাব একটা চোখ নেই জানেন? চাকরি নেই জানেন? অমন সহ্যশীলা স্ত্রী তিনিও ধৈর্যহীনা হয়ে প্রতিদিন আঁকাবাঁকা কথা বলছেন তা আপনি জানেন না। আপনি জানেন এক বছর ধরে শত শত চরিত্র আমি আসরে নামিয়ে দিয়েছি। তাদের শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যেতে হবে তা আমি ছাড়া কেউ জানে না। অথচ আমি দিন আনি দিন খাই, এক সপ্তাহ লেখা না হলে লেখা বেরুবে না, শেষ মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে লাইনো টাইপ অপারেটরকে কপি দিয়ে আসি। কুৎসিত চিঠি আসছে কাগজে। কোনো এক বন্ধু বেনামে লিখেছে, আমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেওয়া হোক। উকিলের ভয়ও দেখাচ্ছে দু-একজন। এখানে এসে দু'দণ্ড সাধনা করি—সেখানেও উড়ো ফোন করে লোকে বলছে, লাইব্রেরিটা পড়বার জায়গা, ওখানে লিখতে দেওয়া হচ্ছে কেন ওই বিমল মিত্তিরকে? এ সত্ত্বেও আমি শান্ত হয়ে স্রেফ চরিত্রগুলোর কথা ভেবে যাচ্ছি। আর আপনি এতো সহজে দেশছাড়া হয়ে পালাবার কথা ভাবছেন? আপনি বিয়ে করেননি, কিন্তু আপনার বিধবা মা রয়েছেন, ভাইবোন রয়েছেন! এসব কী কথা? আপনি শাজাহান হোটেলে বুঁদ হয়ে থাকুন। কোনো শালার কথা শুনবেন না।"

আমি বেঁচে গেলাম। অবার পূর্ণ উদ্যমে লিখতে বসে গিয়েছি। কোনো এক সময়ে টয়লেটে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আমার খাতার উপর বিমল মিত্র একটা উদ্ধৃতি রেখে গিয়েছেন। সমারসেট মম : "Success is greatest enemy of a writer." তারপর নিজের হাতে লিখেছেন : "Poverty is a curse, but insecurity is a blessing for a writer...Insecurity makes him industrious and security makes him idle and complacent."

আরও অনেকদিন পরে আমরা দু'জনে মুখোমুখি হয়েছিলাম। তখন গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। মুখ বুজে এই কলকাতা শহরে বসে তিনি অসাধ্যসাধন করেছেন—রচনা করেছেন এক বিচিত্র সময়ের বিচিত্র ইতিহাস। এই সময়ের শুরু ১৬৯০ সনে কলকাতার পত্তন থেকে শেষ বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে। এই অক্ষয় সাহিত্যমালার নাম বেগম মেরী বিশ্বাস, সাহেব বিবি গোলাম, কড়ি দিয়ে কিনলাম, একক দশক শতক ও চলো কলকাতা। পঞ্চপ্রদীপ এই উপন্যাসমালার প্রস্তুতিতে বিমল মিত্র তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন বলাটা বোধ হয় অন্যায় হবে না। তিন দশকের নীরব সাধনা, যা তাঁর শরীর স্বাস্থ্য সব কিছুকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বিমল মিত্রর জন্ম হয়েছিল মৌনী অমাবস্যায়, সমস্ত জীবন তিনি মৌনব্রতই অবলম্বন করেছিলেন, কখনও প্রচার চাননি।

সত্য কথা বলতে কি, প্রচারকে তিনি লেখকের শত্রু বলেই মনে করতেন। নিজের সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু সাহায্য গ্রহণ করলে পাঠকের দিক্‌ভ্রান্তি অসম্ভব নয়। কিন্তু এই ভ্রান্তি কেবল সাময়িক। সাহিত্যের অঙ্গনে শিরোপা দিয়েও তা বারবার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। লেখকের যা কিছু মূল্যায়ন তা মৃত্যুর পরে। জীবিতকালে লেখক যা পায় তাকে বিমল মিত্র তাঁর রসিক মনোবৃত্তিতে "খোরাকি" বলতেন। আর মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল স্যামুয়েল বাটলার। কতবার যে এই ভদ্রলোকের কথা শুনেছি ওঁর মুখে এবং শিল্পীর স্বাধীনতার কথা। এই স্বাধীনতা তাৎক্ষণিক সাফল্যের পথে বাধা কিন্তু স্থায়ী সাফল্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

সমকালের সাহিত্য সতীর্থদের মতামতের প্রতিও তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। নানা বই অনুসন্ধান করতেন এবং নির্যাসটুকু প্রিয়জনদের মধ্যে বিতরণ করতেন। ওঁর কাছেই শনেছি, জেমস জয়েসের যুগান্তকারী বই পড়ে ভার্জিনিয়া উলফ বলেছিলেন, "মুখে ব্রণ হওয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক আন্ডার

গ্র্যাজুয়েটের কাজ। কিছুই শেখবার নেই।" আর্নল্ড বেনেট সম্পর্কে ডি এইচ লরেন্সের মন্তব্য—"কাদাঘাঁটা শূয়োর।" হাক্সলি সম্বন্ধে রাসেল বলেছিলেন, "ওঁর কথা শুনেই আন্দাজ করে নেওয়া যায় এখন উনি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার কোন্ খণ্ড মুখস্থ করছেন!"

লেখকদের জীবনের কত গল্পই যে তিনি জানতেন! বলতেন, সিনক্লেয়ার লুইস যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন তখন আর একজন লেখক থিয়োডোর ড্রেসার তাঁকে প্রকাশ্যে চড় মেরেছিলেন। পুরস্কারের ব্যাপারে তাঁর মোহ ছিল না। ভারতবর্ষের উপন্যাসসম্রাট হয়েও সামান্য আকাদেমি পুরস্কার তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। রবীন্দ্র পুরস্কার সম্বন্ধে বলতেন, ওটা আমার পাবলিশার পেয়েছে। আর মনে করিয়ে দিতেন, শেখভ মারা যান ১৯০৪ সালে, টলস্টয় ১৯১০ সালে, কিন্তু তাঁরা নোবেল পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হননি। অথচ সুলি প্রুডহোম যে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন তা এখন কে মনে রেখেছে?

সমকালের অনেক স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর স্বস্তির সম্পর্ক ছিল না। বলতেন, আমার কড়ি দিয়ে কিনলাম নিয়ে কত কাণ্ড ঘটলো! একজন শ্রদ্ধেয় লেখক আমার প্রকাশককে গিয়ে বললেন, বইটা ছাপছো বটে কিন্তু পাঁচশো কপির বেশি বিক্রি হবে না। বই বেরুবার পর এক সাহিত্যিক বইটা যে কিসসু হয়নি তা প্রমাণ করবার জন্যে কাগজে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। আর একজন কাগজে বিবৃতি দিলেন, তিনি নিজে লিখলে দু হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাসকে আড়াইশ পাতায় সঙ্কুচিত করতে পারতেন। এসবে দমতেন না বিমল মিত্র। বলতেন, "অনুকূল পরিবেশের চেয়ে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই আমার একাগ্রতার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।"

অথচ শরৎচন্দ্রের পর বিমল মিত্রই যে গত অর্ধশতাব্দীতে সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করলেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কেরালার এক কাগজে তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশ শুরু হলো—কাগজের প্রচারসংখ্যা আট হাজার থেকে আশি হাজারে দাঁড়ালো। কেরালার গ্রামে গ্রামে কথকরা বিমল মিত্রের গল্প বলে বেড়ায়। প্রটোকলের তোয়াক্কা না করে পাকিস্তানের উর্দু ম্যাগাজিনে তাঁর উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশ হয়। আর হিন্দি—সে তো বিস্ময়কর এক স্মৃতি! সেখানে তো তিনি পাঠকদের হৃদয়েশ্বর। বহু পাঠক তো জানেনই না যে তিনি বাংলায় লেখেন এবং তা হিন্দিতে অনুবাদ হয়।

জনতার রায়ে সাহেব বিবি গোলামই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কিন্তু তাঁর ভোটটা পেয়েছিল কড়ি দিয়ে কিনলাম। বলতেন, এই বৃহৎ বইটাতে আমি সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছি। সেই ছাত্রাবস্থা থেকে এই বইটা লিখবার জন্যে আমি অপেক্ষা করে ছিলাম। আশুতোষ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক অমল রায়চৌধুরী ক্লাসে সক্রেটিস থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, "To a good man, whether alive or dead, no evil can happen, nor are the gods indifferent to his well being."

কিন্তু কথাটা কত দূর সত্যি? সাধু হীরাচাঁদ প্রশ্ন করেছিলেন, "আচ্ছা বলুন তো, ভক্তের এতো দুঃখ কেন?" বিবেকানন্দ উত্তর দিয়েছিলেন, "The scheme of the universe is devilish, I could have created a better world."

অমলবাবু তাঁর ছাত্রকে বলেছিলেন, "এর উত্তর কারো কাছে জিজ্ঞেস করে পাওয়া যায় না, এর উত্তর জীবন দিয়ে পেতে হয়, জীবন দিয়ে সন্ধান করলে তবে এর উত্তর পাবে।"

বিমল মিত্র নিজেই লিখেছেন, "দীপঙ্কর সেই যাত্রা শুরু করলো। আরম্ভ হলো সন্ধান। মানুষের মহাযাত্রার মিছিলে মিশে গেলো নগণ্য একটি গ্রামের ছেলে। ...সর্বরিক্ত হয়ে দীপঙ্কর তার সর্বস্ব নিবেদনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেল।"

তা হলে বিমল মিত্রের সাহিত্যের মূল সুরটি কী? সেবার সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরও পেয়েছিলাম সোজাসুজি "এই অর্থসর্বস্ব সমাজ ও সভ্যতাকে বারবার আক্রমণ করো। সমাজের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন (এবার ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলেন) Buying a sin may be alright but why should it be possible to buy goodness." তারপর বাংলায় বললেন, আপনি লক্ষ্য করবেন, "মূল্য ধরে দিলে এ সমাজে হয় না এমন কাজ নেই।"

সাহেব বিবি গোলাম প্রসঙ্গে বলতেন, "বইটার দুটো দোষ। প্রথম দোষ গল্পটা ভীষণ টানে। এত টানাটা উপন্যাসের পক্ষে ক্ষতিকর। দ্বিতীয় দুর্বলতা ওই বাঙালি বাবু-কালচারের সঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। কিন্তু শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মতন কড়ি-মাহাত্ম্যের সঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষের নিবিড় পরিচয়। অর্থই যে অনর্থ তা ভারতবর্ষের মানুষ হাড়ে হাড়ে জানে।"

পঞ্চ-প্রদীপ উপন্যাস সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তাও লিখে নিয়েছিলাম। "যে কেবল কবিতা পড়েছে কিন্তু ইতিহাস পড়েনি সে অভাগা। কিন্তু যে কেবল ইতিহাস পড়েছে অথচ কবিতা পড়েনি সে আরও অভাগা। আমি তিরিশ বছরের সাধনায় ইতিহাস ও সাহিত্যকে মিশ্রিত করেছি। সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্যে ইতিহাসবোধকে আমি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করি।"

আর একটি বড় বই বেগম মেরী বিশ্বাস সম্বন্ধেও তাঁর দুর্বলতা ছিল। আমাকে বলেছিলেন, "প্রত্যেক মহৎ উপন্যাসে একটা শাশ্বত সত্য ধরা থাকে। ওয়ার অ্যান্ড পিস-এ টলস্টয় দেখিয়েছেন, নেপোলিয়ন ইতিহাস তৈরি করেননি, বরং ইতিহাসই নেপোলিয়ন তৈরি করেছে। বেগম মেরী বিশ্বাসে আমি বলতে চেয়েছি, রাজার দোষেই সব সময় দেশের অধঃপতন হয় না, দেশের মানুষ যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তখনও দেশের অধঃপতন ঘটে।"

কার কথা মনে রেখে আপনি উপন্যাস লেখেন? আমি জিজ্ঞেস করেছি। বিমল মিত্র একটুও দ্বিধা না করে বলেছেন, "লেখার সময়ে পাঠক ছাড়া আর কারও কথা আমার মনে থাকে না। পাঠক আমার চোখের সামনে বসে থাকে। আমি তার সঙ্গেই কথা বলে যাই। মাঝে মাঝে আমি তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আমার ও পাঠকের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, কারণ ওই পাঠকটিও আমি ছাড়া কেউ নয়।"

তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী? বিমল মিত্র বললেন, "সহজ কথা। লেখকের সবচেয়ে যা প্রয়োজন তা হলো আত্মবিশ্বাস। আমি যা লিখবো তা দুনিয়ার আর কারুর কলম থেকে বেরুবে না এই বিশ্বাস লেখকের ভীষণ প্রয়োজন। আবার বই পড়বার সময় পাঠকের যদি মনে হয় লেখক তার থেকে বেশি পণ্ডিত তা হলে লেখকের সমস্ত শ্রম পণ্ড হলো। তাই আমার গল্পের নায়করা নিতান্ত সাধারণ মানুষ—আপনি ভূতনাথ, দীপঙ্কর ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে দেখুন। নায়ক যদি পাঠকেরই মতন কেউ হন, তা হলে তাকে সমাসনে বসিয়ে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়াটা খুব সহজ হয় পাঠকের পক্ষে।"

"পাঠক কখনও ভুল করে না", বিমল মিত্র বলতেন।

তবু কোনো দুঃখ? আমি জানতে চেয়েছি।

বিমল মিত্র একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, "একটাই দুঃখ। ডিকেন্স,

বালজাক, টলস্টয়, এমনকি শরৎচন্দ্রের যুগে পাঠকের হাতে অনেক সময় ছিল। এখন মানুষের নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পাঠক যদি ব্যস্ত থাকে তা হলে বড় বই পড়বার সময় পাবে কখন? পাঠকের ঘুম কেড়ে নিতে আমার মায়া হয়, একটু ঘুমের জন্যে আমি কত কাণ্ড করি।"

এইসব কথা যখন হচ্ছে তখন বিমল মিত্র সত্তর পেরিয়ে গিয়েছেন। বললেন, "নতুন যে উপন্যাসটা হাতে নিয়েছি তার নাম 'এই নরদেহ', ইংরিজিতে বলতে পারেন দ্য ফ্লেশ। পাঁচটা বছর আমাকে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে হবে কেবল এই উপন্যাসটার জন্যে। বেগম মেরী বিশ্বাস থেকে একক দশক শতক উপন্যাসের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক ধারাবাহিকতা আছে তারই চরম পরিণতি হবে এই নরদেহ উপন্যাসে। বিশ্বস্রষ্টা পৃথিবীর যাবতীয় জীবনকে সম্পূর্ণ করে সৃষ্টি করলেও মানুষকে তা করেননি। মানুষকে তিনি বলেছিলেন, যাও তোমাকেই একমাত্র অসম্পূর্ণ করে সৃষ্টি করলাম। তুমি নিজের চেষ্টায়, শ্রম, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সাধনা দিয়ে সম্পূর্ণ হও। সম্পূর্ণ হওয়া তোমারই কাজ।"

পাঁচ বছর নয়, আরও বেশি সময় লেগে গিয়েছে এই নরদেহ উপন্যাস শেষ করতে। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ একটু কমে গিয়েছে। আমরা দু'জনেই নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। ছেলেরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠলে যেমন নিজেদের নিয়েই একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সে জন্য বিমল মিত্রর দুঃখ ছিল না। দুঃখ ছিল কেবল আমি কেন সমস্ত সময় সাহিত্য সৃষ্টিতে নিবেদন করছি না? মাঝে মাঝেই কড়া চিঠি লিখতেন, "সময় সীমিত, আর সময়ের অপচয় করবেন না।" এই অপ্রিয় অথচ চরম সত্য কথাটা গুরু ছাড়া আর কে বলবার সাহস রাখেন!

সভায় দেখা হলো আবার। বললেন, "আমার আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই, 'এই নরদেহ' শেষ করে ফেলেছি। আমার বড় কাজ চুকে গিয়েছে। এখন তো কেওড়াতলার পাশেই রেডি হয়ে বসে আছি।"

তারপর বললেন, "আসবেন বাড়িতে। মনে আছে? আমরা দু'জনে বছরের পর বছর কত ঘুরে বেড়িয়েছি, কত জায়গায় চা খেয়েছি। কয়েকবার তো আপনাকে এগোতে গিয়ে বাসে করে হাওড়া পর্যন্ত চলে গেলাম। আপনি আবার এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ফিরে এলেন আমার সঙ্গে।"

আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছি। তিনি বলছেন, "কত লোককে দাগা

দিয়েছি, অকারণে ঝগড়া করেছি, এখন আর করি না। এখন যে গুটিয়ে নেবার সময়। আমি কি আপনার মনেও কোনো কষ্ট দিয়েছি?"

"কোনো মনঃকষ্ট দেননি। আপনার শাসন আমার প্রয়োজন ছিল, আপনি ছাড়া আমাকে পথ দেখাবার, ভরসা দেবার কেউ ছিল না।"

বিমল মিত্র বললেন, "আসুন। কতকগুলো দরকারি কথা বলে যাবো। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে আপনাকে যেসব কথা বলেছি, তার দু-একটা সংশোধন করে নিতে হবে। জানেন, আগে বলতাম ভালবাসার তোয়াক্কা করি না, এখন আর তা বলি না। আগে সবাইকে সমালোচনা করে আমার মতন করে গড়ে তুলতে চাইতাম, আজকাল তা করি না। যে যেরকম হতে চায় সে সেরকম হোক। কিন্তু একটা মত পাল্টাইনি, সাসপেন্স ছাড়া গল্প-উপন্যাস অসম্ভব। এই সাসপেন্স তৈরি করতে করতেই আমার শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো। ঘুম কাকে বলে তা ভালভাবে জানলামই না।"

আমি বললাম, আসবো। জানিয়ে আসবো, যাতে সেই সময় আপনি বেরিয়ে না পড়েন।

বলেছিলেন, "হাঁটতে হাঁটতে আমি প্লটের কথা ভাবি। শুয়ে শুয়েও প্লটের কথা ভাবি। প্লট ছাড়া জীবনের কিছু রইলো না।"

কিন্তু আমার দোষে দেখা হলো না। ৩রা ডিসেম্বর মঙ্গলবারের ভোরবেলায় চেতলা সেন্ট্রাল রোডে যখন গেলাম তখন তিনি সত্যিই বেরিয়ে পড়েছেন সেই অজানা রাজ্যে যেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না।

সমস্ত রাত জেগে বসে ভেবেছি তাঁর কথা যিনি আমার সাহিত্যজীবনের প্রায় সবটা জুড়েই বসে আছেন। সাহিত্যের অমৃতস্বাদ গ্রহণের আশায় তিনি নিজেকে সমস্ত সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছিলেন।

সংসারের ও সৃষ্টির সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে রাজবেশে রাজাধিরাজ রূপে শুয়ে রয়েছেন আমার প্রিয় মানুষটি।

আমি তাঁকে প্রণাম করলাম। এই প্রণাম তিনি জীবিতকালে কখনও গ্রহণ করতে চাইতেন না। আজ কোনো আপত্তি করলেন না।

বহু বছর আগে (১৯৭৫ সালে) দেশের সাহিত্যসংখ্যার জন্যে একটি লেখা তৈরি করে তিনি আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। শুনতে শুনতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। আত্মস্মৃতিমূলক এই রচনায় তিনি নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন। পড়া শেষ করে বললেন, "লোকের মনে থাকবে কি

না জানি না। যদি ভুলে যায় তা হলে আমি যাবার পরে শেষ ক'টা লাইন আর একবার লোককে মনে করিয়ে দেবেন।"

শেষ ক'টা লাইন আমি ওঁর সামনেই লিখে নিয়েছিলাম : "দিনের কর্ম শেষ হয়ে এল। আমারও আজ শেষ-স্বীকারোক্তি করবার লগ্ন এল। আমিও দিনের কর্ম-সম্ভার নিয়ে তোমাকে নিবেদন করতে এসেছি। আমিও বিচার প্রার্থনা করছি তোমার কাছ থেকে। আমি যদি কখনও প্রীতির চেয়ে প্রয়োজনকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি, যদি শারীরিক ক্লান্তির জন্য কখনও কর্তব্যচ্যুত হয়ে থাকি, পরমার্থকে অস্বীকার করে অর্থকে গুরুত্ব দিয়ে যদি সাহিত্যকে পণ্য করে থাকি, সাহিত্যের জন্যে জীবন-সর্বস্ব দেবার ব্যাপারে ভক্তির বদলে বাইরের পৃথিবীর চাপে যদি কখনও আপস করে বাঁচবার চেষ্টা করে থাকি, যদি সাহিত্যকে কখনও কার্যসিদ্ধির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকি তো তুমি আমায় ক্ষমা কোর না, তুমি আমার বিচার কোর।"

বহুবছর আগে লেখাটা নকল করতে গিয়ে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। জল মুছে আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখলাম, যে-মানুষ কখনও কাঁদেন না, তাঁর চোখটাও সেই মুহূর্তে চিকচিক করছে।